C

দ্বিজেন্দ্রলাল

(জীবন)

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী
প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণের (পুনর্মুদ্রণ)
আশ্বিন, ১৩৭১

প্রকাশক
শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ
বসুধারা প্রকাশনী
৪২, কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য—১৫ টাকা

মুদ্রক
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
মনোরম প্রিন্টার্স
৪০-এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
কলিকাতা-৬

প্রকাশকের নিবেদন

বিগত বৎসরে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের জন্ম-শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান দেশময় উদ্‌যাপিত হইল। কবিবরের জীবনী সম্পর্কে কিন্তু নূতন বিস্তৃত কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিবার প্রচেষ্টা দেখা গেল না। তখন মনে ক্ষোভ হইল। মনে পড়িল যে বহু বৎসর অতীত হইল—প্রায় অর্ধশতাব্দী হইবে—দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোকগমনের কিছু পরেই—১৩২৪ সনে—লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক, কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অকৃত্রিম সুহৃদ্‌ বরিশাল নিবাসী ৺দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় কবিবরের একখানি অতি সুবিস্তৃত অথচ উপাদেয় জীবন-চরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই জীবনী-গ্রন্থখানি তৎকালে এতটা সমাদৃত ও জনপ্রিয় হইয়াছিল যে পুস্তক প্রকাশের মাত্র সাত মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়, এবং অবিলম্বে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিতে হয়। সুবৃহৎ গ্রন্থ ছিল সেদিন প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা। সে গ্রন্থখানি এখন আর পাওয়া যায় না। সুতরাং সেই গ্রন্থখানির পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, কবিবরের জীবন-চরিতের অভাব কতকটা পূরণ করা যাইতে পারে; এবং দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম-শতবার্ষিকীর সম্মান কথঞ্চিৎ রক্ষিত হয়।

এই মনোভাব ও উদ্দেশ্য লইয়াই গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণের এই প্রয়াস। ইহাতেও বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে—তন্মধ্যে প্রধান বাধাই হইল গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা বা অপ্রাপ্যতা। কোথাও খোঁজ করিয়া ছাপিবার জন্য এক কপি বই পাওয়া গেল না—অবশেষে কবিবরের সুযোগ্য পুত্র শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতে হইল। তাঁহার নিকট একখানি কপি ছিল; তিনি অনুগ্রহপূর্বক সেই কপিখানি আমার নিকট প্রেরণ করিলেন; সেই কপিখানি হইতে হাতে সমস্ত বইখানি নকল করিয়া লইয়া ছাপাখানায় পাঠানর ব্যবস্থা করিতে হইল—যাহাতে মূল গ্রন্থখানি কোনমতে নষ্ট না হয়। দিলীপবাবু যে এইভাবে তাঁহার কপিখানি আমাদের হাতে দিয়া গ্রন্থপ্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা সাতিশয় কৃতজ্ঞ।

পুনর্মুদ্রণের সম্পর্কে আমরা এইটুকু সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি যে মূল গ্রন্থে যাহা ছিল তাহা যেন হুবহু রক্ষিত হয়। তবে পাঠসৌকার্যার্থে টাইপের

একটু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে—মূল গ্রন্থের স্মল্‌পাইকা ও বর্জ্জাইস্‌ টাইপের পরিবর্ত্তে পাইকা ও স্মল্‌পাইকা টাইপ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর ডবল ক্রাউন ফর্ম্মার পরিবর্ত্তে ডবল ডিমাই ফর্ম্মা করা হইয়াছে। ফলে গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় পূর্ব্ববৎ আছে।

তাছাড়া, এই গ্রন্থের পুরোভাগে, মূল গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে, গ্রন্থকার দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বংশ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদের অনুরোধে এই পরিচয়টুকু লিখিয়া দিয়াছেন শ্রদ্ধেয় শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়। তজ্জন্য এবং এই পুনর্মুদ্রণ সম্পর্কে নানাবিধ পরামর্শদানে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহার নিকটও আমরা কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, পুনর্মুদ্রিত এই গ্রন্থখানি—কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রামাণিক ও সুবিস্তৃত এই জীবন-কাহিনী—কবিবরের জন্ম-শতবার্ষিকীর এই যুগে দেশবাসিগণের দ্বারা সমাদৃত হইলেই সমস্ত পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। অলমতিবিস্তরেণ। ইতি—

৺মহালয়া
১৯শে আশ্বিন, ১৩৭১

শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ
প্রকাশক

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও বংশ-পরিচয়

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের এই জীবনীর লেখক দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় নিজেও একজন খ্যাতনামা কবি এবং সাহিত্যিক ছিলেন। পরম পরিতাপের বিষয় যে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে তিনি ইহলীলা সংবরণ করেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তদীয় বংশের কিঞ্চিৎ পরিচয় এইখানে প্রদত্ত হইল।

দেবকুমার রায়চৌধুরী পূর্ব্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ (বা বরিশাল) জেলার অন্তর্ভুক্ত লাখুটিয়া গ্রামের সম্রান্ত ভূম্যধিকারী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বংশ লাখুটিয়ার রায়চৌধুরী নামে খ্যাত। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ইতিহাসবিশ্রুত রামচন্দ্র খাঁ—যিনি একসময়ে বঙ্গ ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্ত্তী দেশসমূহের শাসনকর্ত্তা ছিলেন—তিনি পরে ভাগ্যক্রমে নবাবের রোষানলে পতিত হইয়া সেইস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক বরিশাল জেলার দক্ষিণ প্রান্তে আসিয়া বসবাস করেন। তিনিই এই জেলায় এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন তাই যেস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, জগন্নাথদেবের স্মরণার্থে সেই স্থানের নাম রাখিয়াছিলেন 'পুরী'। রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত সেই 'পুরী' গ্রামটি বর্ত্তমান পটুয়াখালির অন্তর্গত বাউফল থানার অধীনে অবস্থিত। কিন্তু বেশীদিন এই স্থানেও ইঁহাদের বসবাস করা সম্ভব হইল না। মগ দস্যুদিগের অত্যাচারে ঐ অঞ্চল বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। এই সময় রামচন্দ্র খাঁর প্রপৌত্র ঘনশ্যাম রায়চৌধুরী শিশু অবস্থায় বিপদ্ হইতে রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার ধাত্রী কর্ত্তৃক 'পুরী' হইতে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী মাধবপাশায় নীত হন। চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি অনুসন্ধানপূর্ব্বক শিশু ঘনশ্যামের বিখ্যাত বংশের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ যথেষ্ট ধনসম্পত্তি দিয়া লাখুটিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই গ্রাম বরিশাল শহরের পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে অসংখ্য টিয়া বা শুকপাখী বাস করিত বলিয়া এই গ্রাম 'লাখটিয়া' বা 'লাখুটিয়া' নামে পরিচিত হইয়াছে।

ঘনশ্যামের পৌত্র রামচন্দ্র রায়চৌধুরী একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। ইনি পারস্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। জীবনের প্রারম্ভে অল্পকাল ইনি পুলিস বিভাগে কর্ম্ম করেন; কিন্তু এই কাজ ভাল না লাগায়, কিছুকাল পরে পুলিসের কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বরিশাল জজ আদালতে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হন। নিজের অসাধারণ বিচক্ষণতা ও প্রতিভার প্রভাবে ইনি অল্পকাল মধ্যেই প্রভূত সম্পত্তির অধিপতি হইয়া বহু শুভ অনুষ্ঠান হেতু স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। দুঃস্থ ও নিঃসহায় ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে তিনি অকাতরে ও মুক্তহস্তে দান করিতেন। জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাজচন্দ্র বরিশাল সহর হইতে লাখুটিয়া গ্রামের প্রান্তবাহী নদী পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত পথ ও খাল নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারই সম্বন্ধে Beveridge সাহেবের বিখ্যাত History of Bakarganj গ্রন্থে সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে—"The Brahman family of Lakhutiya can boast of at least one member who would have done honour to any family; this was Raj-chandra Ray."

রাজচন্দ্রের তিন পুত্র সকলেই কৃতী সন্তান—রাখালচন্দ্র, বিহারীলাল ও প্যারীলাল; এবং ছয় কন্যা, তন্মধ্যে তারিণী দেবী সর্ব্বকনিষ্ঠা। জ্যেষ্ঠপুত্র রাখালচন্দ্র অত্যন্ত নিপুণতা ও যোগ্যতার সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ইনি পারস্য, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি বরিশাল শহরে জনসাধারণের সভা (People's Association) প্রতিষ্ঠার অন্যতম নায়ক। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল বাখরগঞ্জ জেলায় লোকমত সংগঠন ও সর্ব্বাধিক অভাব দূরীকরণ। সমগ্র বঙ্গদেশে তৎকালে যত সভাসমিতি বা প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহার প্রায় অধিকাংশের সহিতই তিনি সংযুক্ত ছিলেন। কয়েক বৎসর ইনি বরিশাল District Board-এর Vice-Chairman পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বরিশাল অঞ্চল নদীবহুল সকলেই জানেন; তাই জলপথে লোকজনের গমনাগমনের অসুবিধা দূর করিবার জন্য রাখালচন্দ্র নিজ ব্যয়ে বরিশাল হইতে পটুয়াখালি পর্য্যন্ত 'ভারতকুসুম' ও 'চারুকুসুম' নামে দুইখানি স্টীমার চলাচলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তৎকালে বরিশালে সর্ব্বপ্রকার সমাজ-হিতকর ও দেশহিতৈষণামূলক ব্যাপারেই রাখালচন্দ্র একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। সেই সময়ে বরিশালে আরও অনেক খ্যাতনামা

ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, যথা—বিখ্যাত উকিল দুর্গামোহন দাস (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতৃব্য), মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, গিরিশচন্দ্র মজুমদার (ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্য) প্রভৃতি। প্রাতঃস্মরণীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ও সেই সময়েই তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের সূচনা করেন। রাখালচন্দ্রের কন্যা সুশীলার বিবাহ হইয়াছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের সহিত। তাঁহারই সন্তান দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। রাখালচন্দ্রের কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী তারিণী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল ভাগলপুর নিবাসী শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁহারই সন্তান অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আই. সি. এস্ এবং জ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যারিস্টার (যিনি বহু বৎসর ধরিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের Chief Executive Officer পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন)। এই সতীশচন্দ্রেরই অন্যতম পুত্র ছিলেন বিখ্যাত সুব্রত মুখোপাধ্যায় (Air-Marshal)। রাখালচন্দ্র নিজে বিবাহ করিয়াছিলেন উত্তর প্রদেশস্থ মৈনপুরীর বিখ্যাত উকিল ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভগিনী কুসুম-কুমারীকে। এই ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ছিলেন খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব Minto Professor of Economics)। দেবকুমার রায়চৌধুরী রাখালচন্দ্র ও কুসুম-কুমারীর পুত্র। সুতরাং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেবকুমারের পিসতুতো ভাই, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মামাতো ভাই এবং দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভাগিনেয়। দেবকুমারের জননী কুসুমকুমারীও তৎকালে খ্যাতনামা লেখিকা ছিলেন। তাঁহার রচিত চারিখানি উপন্যাস ছিল—'স্নেহলতা' (ইহাই বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম মহিলা-বিরচিত উপন্যাস), 'প্রেমলতা', 'শান্তিলতা' ও 'লুৎফউন্নিসা' (নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার সাধ্বী মহিষীর অপূর্ব্ব কাহিনী); তদ্ব্যতীত 'প্রসূনাঞ্জলি' নামক ধর্ম্মসন্দর্ভমূলক একখানি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সাহিত্যের প্রতি মাতার এই অনুরাগ পুত্র দেবকুমারেও প্রসৃত হইয়াছে।

রাখালচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা বিহারীলালও বরিশালের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় তাঁহাদের পিতৃদেব রাজচন্দ্র রায় চৌধুরী নামে বরিশাল শহরে রাজচন্দ্র বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল।

বহুবৎসর ধরিয়া অশ্বিনীকুমার প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন কলেজ এবং বিহারীলাল প্রতিষ্ঠিত রাজচন্দ্র কলেজ—এই দুই কলেজই বরিশালে চলিয়াছিল। এই রাজচন্দ্র কলেজে বাঙ্গালার অনেক প্রথিতনামা অধ্যাপক এবং উত্তরজীবনে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি কিছুকাল অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, যথা—ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (শেষজীবনে পশ্চিম বাঙ্গালার রাজ্যপাল), মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক (বাঙ্গালার মুখ্যমন্ত্রী), ডাঃ হীরালাল হালদার (প্রসিদ্ধ দার্শনিক), ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। কিন্তু রাজচন্দ্র কলেজটি ১৯০৪ সনে উঠিয়া যায়। বিহারীলালের মধ্যমপুত্র সুশীলকুমার রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের চতুর্থ কন্যাকে বিবাহ করেন। ফলে এই দুই বিখ্যাত পরিবার কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ হন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্যারীলাল রায় উত্তর জীবনে ব্যারিস্টার হন এবং আইন ব্যবসায়ে বিশেষ সফলতা অর্জ্জন করেন। ফলে সরকার ইঁহাকে বাঙ্গালাদেশের Legal Remembrancer পদে নির্ব্বাচিত করেন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন ভারতবাসী এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ও একান্ত সম্মানিত উচ্চপদ লাভ করিতে পারেন নাই। ইনি পি. এল্. রায় (ব্যারিস্টার) নামেই পরিচিত ছিলেন। মধ্যমভ্রাতা বিহারীলালের ন্যায় প্যারীলালেরও দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রভূত আগ্রহ ছিল—বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারকল্পে প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে 'বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অন্তঃপুরে রমণীদিগের শিক্ষার জন্য পরীক্ষাদির ব্যবস্থা এই সভা কর্ত্তৃক করা হইত। সেই যুগে, যখন বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের শিক্ষার প্রচলন ছিলনা বলিলেই হয়, তখন এই সভা বাখরগঞ্জ জেলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

ধনে মানে কুলে শীলে বিদ্যায় লোকহিতৈষণায় প্রতিষ্ঠাপন্ন এই অভিজাত পরিবারে দেবকুমারের জন্ম হইয়াছিল ১২৯২ সনের ১১ই মাঘ শনিবার শুভ-মাঘোৎসবের দিনে, (জানুয়ারি ২৩,১৮৮৬)—সুভাষচন্দ্রের জন্মের ঠিক এগার বৎসর পূর্ব্বে। সুভাষচন্দ্রেরও জন্ম হইয়াছিল ১১ই মাঘ, ১৩০৩ সনে। বিখ্যাত ভূম্যধিকারী অভিজাত গৃহের একমাত্র সন্তান দেবকুমার স্বভাবতঃই খুবই আদর যত্নে সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যের ভিতরে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। তাছাড়া, দেবকুমারের শৈশবে ও কৈশোরে বরিশালে যে নৈতিক পরিবেশ ছিল, যে

সমাজসেবা ধর্ম্মপ্রাণতা ও দেশভক্তির তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল—তদীয় পিতৃদেব রাখালচন্দ্র, ধর্ম্ম-প্রাণ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, দেশনায়ক অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্ব ও প্রেরণায়—সেই তরঙ্গের প্রবাহে দেবকুমারও উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসভবন বরিশালের সমস্ত নেতৃবৃন্দের যেন মিলনতীর্থ হইয়া উঠিয়াছিল। রাখালবাবুর বাড়ীতে ভক্ত-সমাগমে জমাট কীর্ত্তন হইত। অশ্বিনীকুমার এইখানে ভক্তসঙ্গে মনের আনন্দে কত নৃত্য করিয়াছেন, ভাবাবেশে কত দশায় পড়িয়াছেন, এই কীর্ত্তনগৃহটির নাম ছিল 'মুক্তি-মণ্ডপ'। যে আদর্শে অশ্বিনীকুমার বরিশালের যুবকমণ্ডলীকে গড়িয়া তুলিতেছিলেন, স্বভাবতঃই দেবকুমার সেই আদর্শের দিকেই আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার জীবনের ধারা সেইদিকেই প্রবাহিত হইল।

অভিজাত বংশের সন্তান তিনি, তাঁহার পিতা তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। স্বয়ং অশ্বিনীকুমারকে আহ্বান করিয়া পুত্রের হাতেখড়ি দেওয়াইলেন। কথিত আছে, অশ্বিনীকুমার রাখালবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমাকে দিয়া ছেলের হাতেখড়ি দেওয়ানোর মৎলবটা কি?" তাহাতে রাখালবাবু উত্তর দিয়াছিলেন "আমি চাই আপনার মত ধার্ম্মিক হউক বিদ্বান্ হউক আর 'বজ্জাত' হউক।" অশ্বিনীবাবু তো অবাক্—"বজ্জাত মানে?"—রাখালবাবু হাসিয়া বলিলেন "আহা, আমি কিছু খারাপ ভাবিয়া বলি নাই; 'বজ্জাত' মানে বিচক্ষণ, Shrewd, আপনার মত—অর্থাৎ হাবাগোবা নয়"। মজার কাহিনী বটে! বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ঋষিকল্প পণ্ডিত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে দেবকুমারের সমস্ত শিক্ষার ভার রাখালচন্দ্র ন্যস্ত করিলেন। বহুবৎসর ধরিয়া আচার্য্য জগদীশ দেবকুমারকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে, ইংরেজীতে, সংস্কৃতে দেবকুমারের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিল। তাঁহার রচনাবলীতে ইহা স্বপ্রকাশ। আর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বোধ করি তাঁহার জননী দেবীর নিকট হইতে বহুল পরিমাণে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।

ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল—অতি অল্প বয়স হইতেই সাহিত্যরচনার দিকে দেবকুমার মনোনিবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে এক এক করিয়া চারিখানি গীতিকাব্য 'অরুণ', 'প্রভাতী', 'মাধুরী' ও 'ধারা' তিনি প্রণয়ন করিলেন। 'দেবদূত' নামে একটা নাট্যকাব্যও প্রকাশিত করিলেন। এই সমস্ত কাব্যরচনা

বাঙ্গালা সাহিত্যের দিক্‌পালদিগের দ্বারা সমাদৃত হইয়াছিল। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন বলিয়াছিলেন "কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি 'ষাটি বর্ষ মম পড়িলে তথাপি, শিরায় শিরায় শোণিত নাচে"—। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এককথায় বলিয়াছিলেন "চমৎকার"। খ্যাতনামা সমালোচক ও সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন "অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য"। বিখ্যাত 'প্রবাসী' মাসিকপত্রে মন্তব্য হইয়াছিল "সমস্ত কবিতাই যে সরস, মধুর কবিত্ব-বিমণ্ডিত হইয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য।" **তারপরে স্বদেশী আন্দোলনে যখন বাঙ্গালার সমাজ** আলোড়িত হইতেছিল, তখন তিনি জাতীয় অভ্যুত্থান ও ভারতের ভবিষ্যকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কয়েকটি সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছিলেন 'ব্যাধি ও প্রতিকার' নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "গ্রন্থকার এই গ্রন্থে নিপুণভাবে ও সরল ভাষায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার বিচার করিয়া যে প্রাজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেশের প্রধানগণের নিকট হইতে তিনি সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন; তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়া পাঠকগণকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।" এই সমস্ত রচনার ফলে দেবকুমারের কবিখ্যাতি অতি শীঘ্রই দেশময় ছড়াইয়া পড়িল।

দেবকুমারের জনপ্রিয়তা ও খ্যাতির আরও একটী কারণ এই যে শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে বাঙ্গালার বহু বিখ্যাত পরিবারের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল। ফলে দেবকুমার সহজেই বাঙ্গালার বিখ্যাত সাহিত্যরথিগণের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগলাভ করিয়াছিলেন অতি অল্প বয়সেই। ময়মনসিংহ জেলার সন্তোষের বিখ্যাত জমিদার কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় ইহাকে সোদরসম স্নেহ করিতেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে দেবকুমারকে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেন। সেই পরিচয় ক্রমশঃ অন্তরঙ্গ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। এমনকি পারিবারিক ব্যাপারেও—দেবকুমার যদিও বয়সে দ্বিজেন্দ্রলাল অপেক্ষা অনেক ছোট ছিলেন তথাপি বহু বিষয়ে তাঁহাকে পরামর্শ দিবার ভরসা করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন 'পূর্ণিমামিলন' সংস্থাপন করেন তখন গোড়া হইতেই দেবকুমার তার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। কোন কোন বার দেবকুমারের ৪১নং সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ ভবনেও পূর্ণিমামিলনের অধিবেশন হইয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের মাত্র পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ১৩২০ সনে অকালমৃত্যু যে দেবকুমারকে অত্যন্ত মর্মাহত করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি! তাই দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর দুই এক বৎসর পরেই দেবকুমার তদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধুর জীবনকাহিনী রচনা করা মনঃস্থ করিলেন। তাহারই ফলে ১৩২৪ সনে এই বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ। এই জীবনী গ্রন্থখানি উৎসর্গীকৃত হয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের নামে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে চিত্তরঞ্জনের পিতৃব্য দুর্গামোহন দাস মহাশয় বরিশালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন; তখন হইতেই এই পরিবারের সহিত রাখালচন্দ্রের পরিবারবর্গের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল; সুতরাং চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেবকুমারের খুবই সখ্যবন্ধন ছিল। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে এই রায় পরিবার আবদ্ধ ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ছিলেন দেবকুমারের ভগ্নীপতি; দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেবকুমারের ভাগিনেয়, সুতরাং কবি রবীন্দ্রনাথও দেবকুমারকে খুবই জানিতেন ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। নাটোরের গুণগ্রাহী সাহিত্যরসিক মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সঙ্গেও দেবকুমার খুবই পরিচিত ছিলেন। রূপেও দেবকুমার ছিলেন অতি সুপুরুষ—দীর্ঘাবয়ব গৌরকান্তি—কুঞ্চিত কেশদাম—হাস্যোজ্জ্বল আননখানি; ব্যবহারও সাতিশয় বিনয় ও সৌজন্যপূর্ণ। তদুপরি দেবকুমার ছিলেন একজন সুগায়ক। এইসকল কারণের সমাবেশে যাঁহারাই দেবকুমারের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই দেবকুমারের রূপে, গুণে, ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য বোধ হয় যে দেবকুমারের সর্ব্বশেষ এবং দীর্ঘতম রচনা 'কবি দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী'—যখন লিখিত হয় তখন দেবকুমারের বয়স ২৯।৩০ বৎসর মাত্র। এই অল্পবয়সের ভিতরেই তরুণ দেবকুমারের খ্যাতি সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন বরিশালে বিখ্যাত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয় ১৪।১৫ই এপ্রিল তারিখে (১৩১৩ সনের ১লা ও ২রা বৈশাখ) সেই অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী সম্মিলন বরিশালে আহূত হয়—'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন'। ইহার একটু ইতিহাস আছে। ইহার কয়েকমাস পূর্ব্বে যখন লর্ড কার্জ্জন কৃত বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, 'Partition of Bengal' অনুষ্ঠিত হয়, তখন সমস্ত বাঙ্গালা দেশময় বিপুল আন্দোলন উপস্থিত হয়—ইহাই ইতিহাসে বিখ্যাত 'স্বদেশী আন্দোলন'। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দেশভক্ত

সাহিত্যিকগণ স্থির করিলেন যে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সত্ত্বেও বাঙ্গালীজাতির সংস্কৃতিগত ঐক্য অটুট রাখিতে হইলে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের' প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই প্রস্তাবের ফলে দুই স্থান হইতে আহ্বান জানান হয় এই সম্মিলনের অধিবেশনের জন্য—রঙ্গপুর ও বরিশাল। বরিশাল হইতে আহ্বায়ক ছিলেন দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়—তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর। এই তরুণ যুবকের আকুল আহ্বানে বরিশালেই অধিবেশন হওয়া স্থির হইল, এবং ইহাও স্থির হইল যে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের' যে মণ্ডপ, সেই মণ্ডপেই সাহিত্য সম্মিলনেরও অধিবেশন হইবে। কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সভাপতি পদের জন্য নির্ব্বাচিত হইলেন। যথাসময়ে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর প্রভৃতি সাহিত্যিকবৃন্দ বরিশালে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটিল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন অধিবেশন শেষ হইবার পূর্ব্বেই কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। এই গোলমাল বিশৃঙ্খলা এবং রাজরোষের বেড়াজালের মধ্যে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনও আর হইতে পারিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা বরিশাল হইতে ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি দেবকুমার আযৌবন অনুরক্ত ছিলেন। ১৩১৮ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখে বরিশাল শহরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শাখাসভা স্থাপিত হয়, দেবকুমারেরই যত্ন ও চেষ্টার ফলে এবং তাহার কার্য্যালয়ও ছিল তাঁহারই বাড়ী 'বিরাম' নিবাসে। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর। সাহিত্য পরিষদের এই বরিশাল শাখায় মাঝে মাঝে অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ পঠিত হইত ; তন্মধ্যে একখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সেখানি বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড মহাশয়ের রচিত 'চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ'—নামক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধটি পরে বিস্তৃতভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

দেবকুমার বিবাহ করেন নদীয়া নিবাসী কবিরাজ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী শকুন্তলাকে। তাঁহার একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার এবং তিন কন্যার মধ্যে দুই কন্যা জীবিতা আছেন—তাঁহারা বিবাহিতা। দিলীপকুমারের বিবাহ হয় হেতমপুর রাজপরিবারের এক কন্যার সহিত। দেবকুমারের শ্বশুর সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় খ্যাতনামা কবিরাজ ছিলেন ; তিনি এখন

জীবিত নাই; তাঁহার পুত্রগণ বেহালাতে বসবাস করিতেছেন এবং সেই অঞ্চলে তাঁহারা সুপরিচিত।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতেই লক্ষিত হইয়াছে—যে শুধু সাহিত্য রচনাতেই দেবকুমারের চেষ্টা নিবদ্ধ ছিল তাহা নহে; দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার দিকেও তিনি মনোযোগ দিতেন। ইহার একটা নিদর্শন পাওয়া গেল ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে। তখন তিনি রাজনৈতিকক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবার প্রয়াস করিলেন। সেই বৎসরের শেষভাগে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (Bengal Legislative Council) সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। সেই নির্ব্বাচনে দেবকুমার পদপ্রার্থী হইলেন,—বাখরগঞ্জ জেলার উত্তরাংশের প্রতিনিধি হিসাবে। কিন্তু তাঁহার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইলেন—কংগ্রেস-প্রার্থী হিসাবে—স্বয়ং অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সরলকুমার দত্ত। সরলকুমার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড়ানতে দেবকুমার মনে খুবই আঘাত পাইলেন; কারণ অশ্বিনীকুমারকে তিনি অন্তরের সহিত পিতৃবৎ ভক্তি করিতেন এবং সরলকুমারকে কনিষ্ঠ-সহোদরবৎ স্নেহ করিতেন। যাহা হউক, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবারণ করা গেলনা; এবং এই নির্ব্বাচনসমরে দেবকুমার বিফলকাম হইলেন—সরলকুমার জয়লাভ করিলেন। এই নির্ব্বাচনের সময়ে দেবকুমারের বয়স আন্দাজ ৩৮ বৎসর। নির্ব্বাচনব্যাপারে অতিরিক্ত পরিশ্রম এবং তৎপরে অসাফল্য তাঁহার দেহ ও মনে বড় একটা আঘাত হানিল।

আবার প্রায় এই সময়েই, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর তারিখে (১৩৩০ সনের ২১শে কার্ত্তিক বুধবার ৺কালী পূজার দিন) কলিকাতাতে অশ্বিনীকুমারের দেহাবসান হইল। তৎপরে অবিলম্বে অশ্বিনীকুমারের স্মৃতিরক্ষার্থ এক সমিতি গঠিত হইল; সেই সমিতির সভাপতি হইলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় এবং নিজের দৈহিক অস্বাস্থ্য ও মনোবেদনা সত্ত্বেও দেবকুমার ঐ সমিতির সম্পাদকের গুরুভার নিজহস্তে গ্রহণ করিলেন। বঙ্গের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ নিখিলভারতে যাঁহারা জননায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের অনেকেই এই সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই স্মৃতিরক্ষা সমিতির চাঁদা সংগ্রহ এবং সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই দেবকুমার আন্তরিক আগ্রহসহকারে শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারের পরলোকগমনের কিছুদিন পরে দেবকুমার উঁহার একখানি বিস্তৃত জীবনী রচনা

করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং তন্নিমিত্ত আবশ্যক উপাদানও সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে অশ্বিনীকুমারের জীবনী রচনার অন্য ব্যবস্থা হইতেছে, তখন তিনি তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলেন। অশ্বিনীকুমারের অন্যতম জীবনী লেখক সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় তদীয় গ্রন্থের ভূমিকায় দেবকুমারের এই উদার মনোবৃত্তির সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহার পর যে কয়বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, তাহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ার দরুণ দেবকুমার কি সাহিত্য কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আর বেশী কিছু কাজ করিবার সুযোগ পান নাই। অবশেষে ১৩৩৬ সনের ২৪শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার (১৯২৯ এর ১০ই ডিসেম্বর) তারিখে মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে দেবকুমার ইহলীলা সংবরণ করিলেন। তরুণ বয়সে যে অসামান্য প্রতিভাদ্যুতি বাঙ্গালাকে চমৎকৃত করিয়াছিল, অকালে জীবনমধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সেই দ্যুতি অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। বাঙ্গালী জাতির ও বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।—

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ !

উৎসর্গ

মহাপ্রাণ, 'দেশবন্ধু',
প্রসিদ্ধ লেখক ও কবি
শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়
সুহৃদ্বর করকমলে

৺

ভূমিকা

নিজেকে নিতান্ত অযোগ্য জানিয়াও, বন্ধুদের উত্তেজনায় ও পুনঃ পুনঃ দ্বিজেন্দ্রলালের স্বজন-সুহৃদ্‌গণের সাগ্রহ অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমি এই দুরূহ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, জানি না। যদি এতদ্দ্বারা মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্লভ জীবনের কিঞ্চিন্মাত্র আভাসও প্রস্ফুট করিতে-পারিয়া থাকি, আমার সকল শ্রম সার্থক হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মীয়-বন্ধুরা সকলে মিলিয়া এ গ্রন্থ-রচনায় আমার অনেক উপকার করিয়াছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে তজ্জন্য তাঁহাদের নিকটে আমি একান্ত কৃতজ্ঞ। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী মোহিনী দেবী, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী, এবং সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ৺জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, সার আশুতোষ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদদাস গোস্বামী, গিরিশচন্দ্র বসু, সার জগদীশচন্দ্র বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ললিতচন্দ্র মিত্র, অধরচন্দ্র মজুমদার, হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সহৃদয় সজ্জনগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত, আরও যাঁহারা এ কার্য্যে আমার সহায় হইয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাইতেছি।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন ও সাহিত্য—এই দুইটি বিষয় দুইভাগে বিবৃত করিব বলিয়া, প্রথমে এ পুস্তকখানি আমি লিখিতে আরম্ভ করি। আশা ছিল,—একই সঙ্গে উক্ত উভয় বিষয় সম্পূর্ণ করিয়া, এ পুস্তক প্রকাশিত করিতে পারিব। কিন্তু, লিখিতে-লিখিতে এ-জীবনীর অংশটাই এত-বেশী দীর্ঘ হইয়া-পড়িল যে, এখন আর এ সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের কোন আলোচনা বা পরিচয় প্রদান করা হাস্যকররূপেই অসম্ভব। ভরসা করি—পাঠকবর্গ আমার এ অনিচ্ছাকৃত অক্ষমতা অবস্থানুসারে মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। বিধাতার ইচ্ছা হইলে, এ

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের যথোচিত সমালোচনা ও তৎসম্পর্কে বহু অজ্ঞাত সংবাদাদি, অনুকূল অবসরে, আমার সাধ্য-শক্তি মত,—বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

এ পুস্তক-প্রণয়নে সোদরোপম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ হেমন্তকুমার সেনের নিকটে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঋণী। তিনিই প্রথম আমাকে এ কার্য্যে ব্রতী হইতে বাধ্য করেন। তদবধি নানা প্রকারে,—কত রকমেই যে তিনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাহা বলিবার নহে। প্রেমময় ঠাকুর-আমার তাঁহাকে নিয়ত অভয় পদাশ্রয়ে রক্ষা করুন।

একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত মহাকবি রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব ছিল। বিশেষ, দ্বিজেন্দ্রলালের দিব্য প্রতিভা ও দুর্লভ জীবন সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে-পারেন, এমন শক্তিমান্ পুরুষ বর্ত্তমান বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথের তুল্য আর বড়-বেশী যে কেহ আছেন, আমি তাহা মনে করি না। এই কারণে, এ গ্রন্থের একটা ভূমিকা লিখিয়া-দেওয়ার জন্য আমি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি তদনুসারে অতি-সংক্ষেপে আমাকে যেটুকু লিখিয়া-পাঠাইয়াছেন কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহাই এখন আমি এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

"দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বাংলার পাঠকসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন না তখন হইতেই তাঁহার কবিত্বে আমি গভীর আনন্দ পাইয়াছি এবং তাঁহার প্রতিভার মহিমা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সত্য, অর্থাৎ আমি যে তাঁর গুণপক্ষপাতী, এইটাই আসল কথা এবং এইটাই মনে রাখিবার যোগ্য। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে এখনকার অনেক পাঠক দ্বিজেন্দ্রলালকে আমার প্রতিপক্ষশ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া কলহের অবতারণা করিয়াছেন। অথচ আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি এ কলহ আমার নহে এবং আমার হইতেই পারে না। পশ্চিম দেশের আঁধি হঠাৎ একটা উড়ো হাওয়ার কাঁধে চড়িয়া শয়ন বসন আসনের উপর এক পুরু ধূলা রাখিয়া চলিয়া যায়। আমাদের জীবনে অনেক সময়ে সেই ভুল-বোঝার আঁধি কোথা হইতে আসিয়া পড়ে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু উপস্থিতমতো সেটা যত বড় উৎপাতই হোক্ সেটা নিত্য নহে এবং বাঙালি পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা এই ধূলা জমাইয়া রাখিবার চেষ্টা যেন না করেন,

করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। কল্যাণীয় কবি শ্রীমান্ দেবকুমার তাঁহার বন্ধুর জীবনীর ভূমিকায় আমাকে কয়েকছত্র লিখিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই উপলক্ষ্যে আমি কেবলমাত্র এই কথাটি জানাইতে চাই যে. সাময়িক পত্রে যে সকল সাময়িক আবর্জ্জনা জমা হয় তাহা সাহিত্যের চির সাময়িক উৎসব-সভার সামগ্রী নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে আমার যে পরিচয় স্মরণ করিয়া রাখিবার যোগ্য তাহা এই যে আমি অন্তরের সহিত তাঁহার প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং আমার লেখায় বা আচরণে কখনও তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি নাই।—আর যাহা কিছু অঘটন ঘটিয়াছে তাহা মায়া মাত্র, তাহার সম্পূর্ণ কারণ নির্ণয় করিতে আমি ত পারিই না, আর কেহ পারেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

বইখানাতে বর্ণাশুদ্ধি, পুনরুক্তি, বাহুল্য বর্ণনা ও আরও বহুবিধ ত্রুটি ও দোষ অবশ্যই পরিলক্ষিত হইবে। সে সমস্ত দোষ সর্ব্বথাই আমার এবং তজ্জন্য আমিই সম্যক্ দায়ী। বইখানা 'ধীরে-সুস্থে', বেশ বিচার ও বিবেচনা পূর্ব্বক লিখিতে পারি নাই; এবং ছাপিবার পূর্ব্বে একটিবারও 'দেখিয়া-শুনিয়া' দেওয়া হয় নাই। যখন যতটা লেখা হইয়াছে, অমনই ছাপিতে পাঠাইয়াছি; এবং অত তাড়াতাড়ি ছাপাইতে-গিয়া প্রুফও তেমন সংশোধন করা যায় নাই। সহৃদয় পাঠক আমার শত অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। ইতি

'বিরাম'
বরিশাল,
১২ই ভাদ্র, ১৩২৪।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

(পুনর্মুদ্রণ)

এই পুস্তক মুদ্রিত হওয়ার পর মাত্র সাত মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া-যাওয়ায়, পুস্তকবিক্রেতারা তখনই ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু, তৎকালে আমার দেহ ও মনের অবস্থা অনুকূল না থাকায় এবং তদবধি বহুকাল প্রবাসীভাবে দূর দেশে—বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতিহেতু এ সম্পর্কে এতদিন আমি আদৌ মনোযোগী হইতে পারি নাই। তখন যে এ বইখানার অতটা আদর ও প্রচার হইয়াছিল তাহার প্রধান ও বোধ হয় একমাত্র কারণ—দ্বিজেন্দ্রলালের পুণ্য নামের মহিমা।

এই পুস্তক-প্রণয়নে যাঁহারা আমাকে নানাপ্রকারে প্রচুর সাহায্য করিয়াছিলেন তন্মধ্যে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সার রাসবিহারী ঘোষ, 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, 'দাদা মহাশয়' প্রসাদদাস গোস্বামী প্রভৃতি অনেকে আজ ইহসংসার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। কিন্তু, আমার স্মৃতিতে এ গ্রন্থ সম্বন্ধে আজিও তাঁহারা জীবিত রহিয়াছেন। এই কারণ বশতঃ, এবারেও আমি ইঁহাদের নাম এ পুস্তকে শ্রীহীন ভাবে মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সহৃদয় পাঠক আমার এই দুর্ব্বলতাটুকু মার্জ্জনা করিবেন।

এই সংস্করণে বিহার ও ওড়িষ্যার বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা, মাননীয় লর্ড শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় বন্ধুর বিষয়ে যে স্মৃতি কথাটুকু আমাকে লিখিয়া-পাঠাইয়াছেন তাহা এই জীবনী গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলাম। তদ্ব্যতীত, স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালের আরও অনেক নূতন পত্র ও রচনাদি এবারে মুদ্রিত করা হইল। উদ্ধৃত রচনা ও উক্তিগুলি এবার ক্ষুদ্রতর 'হরফে' মুদ্রিত করার দরুণ, মোটের উপরে গ্রন্থ-কলেবর পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূলতর হয় নাই বটে; কিন্তু এ সংস্করণে যে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিষয় নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা পাঠক একটু মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। পাঠকগণের সুবিধার জন্য গ্রন্থশেষে একটি 'সাহায্য-সূচী'ও প্রদত্ত হইল।

কলিকাতা, **শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী**

১২ই আশ্বিন, ১৩১৮।

বিষয়-সূচী

সাহায্য-সূচী
(বর্ণানুক্রমিক)

প্রথম পর্য্যায়

আরম্ভ

জন্ম, জন্ম-স্থান, প্রতিপালক রাজ-বংশ ও রায়-বংশের পরিচয়।

১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪'ঠা শ্রাবণ, বঙ্গদেশের শিক্ষা ও সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে বারেন্দ্রশ্রেণীর সিদ্ধ-শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় জন্ম-লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাৎস্য গোত্র, পঞ্চ প্রবর, কুতব শাখা, এবং সঞ্জামণি গাঁই। কুল-ক্রমাগত নিয়মানুসারে বহু দিন হইতে, কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ 'চক্রবর্ত্তী দেওয়ানে'র বংশ বলিয়া, এই বংশ সর্ব্বত্র প্রচুর প্রতিষ্ঠা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। বলা বাহুল্য—দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্বজ পুরুষগণের মধ্যে অনেকে এবং তাঁহার পিতা পুণ্যাত্মা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় স্বয়ং বঙ্গের গৌরব-স্তম্ভ কৃষ্ণনগর-মহারাজগণের প্রধানতম অবলম্বনরূপে তাঁহাদের রাজত্বে দেওয়ানী-পদে অভিষিক্ত ছিলেন; এবং অদ্যাপি তাঁহারই পুত্রগণের মধ্যে কেহ-না-কেহ এই কর্ম্মে নিযুক্ত রহিয়া, একান্ত বিশ্বস্তভাবে জীবনপাত করিতেছেন।

জন্ম।

যে রায়-বংশ বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী কৃষ্ণনগরের কল্যাণ-ক্রোড়ে লালিত ও পালিত হইয়া, মহাপ্রাণ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাবে, আজ যথার্থই এ বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে তদ্বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে, প্রথমতঃ

জন্মভূমির পরিচয়।

তাঁহাদের জন্মস্থান কৃষ্ণনগর সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন বিবেচনা করি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কৃষ্ণনগরই বিশেষভাবে দক্ষিণ বঙ্গের সর্ব্বাগ্রগণ্য ও সম্পন্ন রাজধানী ছিল। এখনও বোধ হয়—কলিকাতার পর এক ঢাকা ভিন্ন এতাদৃশ সদ্‌গুণ-শালী, শিক্ষিত ও সুসভ্য শহর বা জনপদ আর এ বঙ্গদেশের কোথ্যাও নাই। তৎকালে কলিকাতায় কোন নূতন আলোচনা, আন্দোলন অথবা সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত হইবামাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণনগরকে ব্যাপ্ত ও পরিপ্লাবিত করিয়া-ফেলিত, এবং এ নগর সে সময়ে সভ্য-সমাজের সদ্দৃষ্টান্তসমূহের একটি যেন আদর্শ আধার স্বরূপ গণ্য হইত। এমন কি,—কলিকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠা ও অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই, নবদ্বীপ-রাজগণের রাজধানী বলিয়া, কৃষ্ণনগর সর্ব্ববিধ সংস্কার ও শিষ্টাচারের মূল উৎস বা উৎপত্তি-স্থান ছিল। এক দিকে যেমন নবদ্বীপধামের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাদের অপূর্ব্ব ও বিচিত্র জ্ঞানালোকে সমগ্র ভারতভূমিকে উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিতেন, তেমনই আবার নদীয়া জেলার—কৃষ্ণনগরের অধিবাসি-বৃন্দের শিষ্টাচার, সদাচার, রসিকতা, শিল্প-নৈপুণ্য ও সাহিত্যানুরাগ এ দেশের সর্ব্বত্র নব-নব আদর্শ ও সৎশিক্ষার প্রসার বা বিস্তার সাধন করিত। এই তো গেল মাতৃভূমির অতি-তুচ্ছ ও যৎসামান্য পরিচয়।

কৃষ্ণনগর রাজকুলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অতঃপর, যে বহুগুণমণ্ডিত, বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-রাজবংশের অধীনে রহিয়া এতদ্দেশের এবংবিধ উৎকর্ষ ও উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল; এবং যাঁহাদের আশ্রয়-ছায়ায় পুষ্ট ও পালিত হইয়া, এই দেওয়ান-বংশ এতটা সংবৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা ও যশোপার্জ্জন করিয়াছিলেন,—এক্ষণে প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বা বিবরণ এস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া-লইয়া, আমরা আমাদের আলোচ্য মূল বিষয়ে ক্রমশঃ অগ্রসর হইব।

কথিত আছে যে, ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি আদিশূর এক সুবৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ সদ্‌ব্রাহ্মণ এদেশে আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীভট্টনারায়ণ অন্যতম। এই ভট্টনারায়ণ হইতে উনবিংশ পুরুষ পরে কাশীনাথ নামে একজন এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন; ইনি—যতদূর জানা যায়, একজন বিশেষ ধনবান্ ভূম্যধিকারী ছিলেন। আকবর শাহ্ যখন দিল্লীর সিংহাসনে দীপ্ত তপনের ন্যায় অধিষ্ঠিত তখন এই সুদূর পূর্ব্ববঙ্গে—বিক্রমপুরে, কাশীনাথ বঙ্গদেশের তৎকালীন নবাব-সুবাদারের অত্যাচারে অত্যধিক উৎপীড়িত হইয়া, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন;—কিন্তু, তথাপি তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন না,—পথে একস্থানে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় নবাবের সৈন্যকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া অতি নিষ্ঠুররূপে নিহত হইলেন। কাশীনাথের অনাথা বিধবা পত্নী তখন অনন্যোপায় হইয়া, বাগওয়ান (বর্ত্তমান বাগনান) পরগণার জমিদার, আন্দুল-নিবাসী হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার মহাশয়ের গৃহে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।—অন্তঃসত্ত্বা তিনি তখন আসন্ন-প্রসবা! জমিদার মহাশয়ের ভবনে অচিরেই তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে; সে পুত্রের নাম রামচন্দ্র। সদাশয় সমাদ্দার মহাশয়ের কোন সন্তানাদি ছিল না।—তিনি এই সৎকুলোদ্ভব, সুন্দর শিশুটিকে স্বীয় অপত্য-নির্ব্বিশেষে লালন-পালন করেন; এবং পরে তাঁহাকেই দত্তক পুত্র গণ্য করিয়া, আপন সমাদ্দার উপাধি ও যথাসর্ব্বস্ব বিত্ত-সম্পত্তি দান করিয়া যান। এই রামচন্দ্র সমাদ্দারের চারি পুত্র; তন্মধ্যে ভবানন্দ মজুমদারের নাম ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া সম্রাটের বিপক্ষে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে, যখন মহাবীর সেনাপতি মানসিংহ তাঁহার দর্পচূর্ণ করিবার জন্য বঙ্গদেশে আসেন তৎকালে এই ভবানন্দ সমাদ্দারই তাঁহাকে প্রভূত সাহায্য

করিয়াছিলেন। কেহ-কেহ এখনও বলেন যে, এই চতুর ও দুঃসাহসী ব্যক্তির অতটা সহায়তা না পাইলে মানসিংহের ন্যায় বীরের পক্ষেও প্রতাপাদিত্যকে সে সময়ে পরাজিত করা নিতান্তই দুরূহ হইত। যাহা হউক, ভবানন্দের এবংবিধ আচরণে পরম প্রীত হইয়া, সম্রাট্ যথাকালে তাঁহাকে নবদ্বীপ প্রভৃতি কতিপয় পরগণা ও মজুমদার উপাধি প্রদান করেন। বলা বাহুল্য—এই ভবানন্দ মজুমদারই প্রকৃত পক্ষে এই বক্ষ্যমাণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও পূর্ব্বপুরুষ।

ভবানন্দের সময়ে ও তাঁহার পরে এক পুরুষ পর্য্যন্ত মাটিয়ারি নামক স্থানে প্রথমে এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। পরে তাঁহার পৌত্র রাঘব বর্ত্তমান কৃষ্ণনগরে রাজধানী উঠাইয়া আনেন। ঐ স্থানে তখন রেঁয়ে নামে একটি অতি তুচ্ছ ও সামান্য গ্রাম মাত্র ছিল; তাহাতে অনেক ঘর গোপ বা গোয়ালা জাতীয় লোক বাস করিত। ইহারা কৃষ্ণ-ভক্ত ছিল ও প্রতি বৎসর অতি সমারোহ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের দোল ও রাসযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। রাঘবের পুত্র রুদ্র এই কারণবশতঃ তাঁহার রাজধানীর নাম কৃষ্ণনগর রাখেন এবং এই সময় হইতে নদীয়ারাজগণের রাজধানী বলিয়া এই নগর সমগ্র বঙ্গদেশে প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে। রাজারা এই নগরেই স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করিলেন বটে; কিন্তু, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে একবার মাত্র তিনি বর্গীর অশ্রান্ত উপদ্রবে বাধ্য হইয়া, ইহার ছয় ক্রোশ দূরে, স্বীয় আত্মজ শিবচন্দ্রের নামে 'শিবনিবাস' বলিয়া এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করাইয়া, কিছু কালের নিমিত্ত সেখানে গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত রাজা রুদ্রের পুত্র রামজীবন। রামজীবনের পুত্র রঘুরাম। এই রঘুরামের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ১৭১০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে এই বংশ চরম উন্নতিশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ভবানন্দের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এই

রাজত্বের ক্রমাগত শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন সিংহাসনে আসীন তখন এই বঙ্গদেশে ন্যূনকল্পে প্রায় চৌরাশীটি সুবিস্তৃত পরগণা এই রাজত্বের আয়ত্ত ও শাসনাধীনে আসিয়াছিল। কবি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা।
খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশীদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গা-সাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধূল্যাপুর বড় গঙ্গাপার॥"

তৎকালে নদীয়ার রাজগণ এই বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি ও শাসনকর্ত্তা ছিলেন। নামমাত্র মোগল বাদশাহগণের সরকারে যৎসামান্য রাজস্ব প্রদান করিয়া, তাঁহারা কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ-ই স্বাধীন ও প্রবলপ্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে সময়ে ইহাঁদের বহুসংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সতত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিত; এবং প্রায়শঃ পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ ও স্বাধিকারে বিদ্রোহী বা দুর্দ্দান্ত ভূম্যধিকারিবৃন্দের সহিত তাঁহাদিগকে যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হইত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই বিশেষ গুণবান্, গুণগ্রাহী, কর্ম্ম-কুশল, অতি নিপুণ, সূক্ষ্মদর্শী ও চতুর ব্যক্তি ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কিছুকাল পরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও বিশেষভাবে এই বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা —আপামর-সাধারণ সকলে—উচ্ছৃঙ্খল মহারাষ্ট্রীয়গণের অদম্য অত্যাচারে নিতান্ত বিপন্ন ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই ভীষণ উপদ্রবই অদ্যাপি এদেশে 'বর্গীর হাঙ্গামা' নামে, অশান্ত ও বিনিদ্র বালককুলের অন্তরে বহু রজনীতে বিভীষিকা ও অজ্ঞাত আতঙ্কের সঞ্চার করিয়া দেয়। এই অকথ্য উৎপাতে বাধ্য হইয়া

বঙ্গদেশের ছোট-বড় সকলেই সে সময়ে আত্ম-রক্ষার্থ নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও এই সময়েই কৃষ্ণনগরের ছয় ক্রোশ উত্তরে শিবনিবাস নামে নগর স্থাপন করিয়া, কিছুকালের জন্য তথায় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। সেস্থানে এখনও রাজপ্রাসাদ, দেব-মন্দির ও রাজাত্মীয়গণের বাস-ভবনের বহুসংখ্যক ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সঙ্গে সেই শহরের সন্নিহিত আরও এক ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে কৃষ্ণচন্দ্র এক গঞ্জ স্থাপন করেন। ইচ্ছামতী নদীতটে সেই গঞ্জ এখনও 'কৃষ্ণগঞ্জ' নামে কীর্ত্তিত রহিয়াছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালের মধ্যভাগে বঙ্গের হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার হস্তে সমগ্র বঙ্গের শাসন-ভার সমর্পণ করিয়া তদীয় মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁ লোকান্তরিত হইলেন ; এবং এই অস্থিরমতি, বিলাস-মদ-মত্ত, তরুণবয়স্ক নবাব অতি অল্পকাল-মধ্যে স্বীয় বিবিধ দুর্ব্যবহার ও উৎপীড়নে এদেশের যাবতীয় প্রধানগণের অন্তরে এমনই অশান্তি, আতঙ্ক, ক্রোধ ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করিলেন যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া বহুবিধ পরামর্শের পর স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, যে, যে-ভাবে হউক, তাঁহাকে সিংহাসন হইতে অপসৃত করিতেই হইবে। এই বিদ্রোহ-ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে যে সকল প্রভাবশালী ব্যক্তি ও রাজগণ লিপ্ত ছিলেন তন্মধ্যে আমাদের কৃষ্ণচন্দ্র এক জন। অবশ্য এ বিষয়েও কল্পনা-প্রবণ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে ; কিন্তু, খাস কৃষ্ণনগর-রাজপরিবারে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহাতে জানা যায় যে, পলাশী-যুদ্ধাবসানে হতভাগ্য সিরাজ রাজ্যচ্যুত হইলে, খোদ ক্লাইভ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃতোপকারের প্রতিদান-চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে পাঁচটি কামান উপহার দিয়াছিলেন। সে কামান কয়টি এখনও নাকি কৃষ্ণনগর-প্রাসাদে বিদ্যমান রহিয়া এই কীর্ত্তির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ! ইংরাজেরা জয়ী হইল বটে ; কিন্তু, তখনই বঙ্গের

রাজ্যভার গ্রহণ করিল না। বঙ্গের সিংহাসনে অতঃপর প্রথম বসিলেন মীরজাফর, তার পরে তাঁহার পুত্র মীরণ। বিধি-রোষে অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে মীরণের ভোগলালসার অবসান ঘটিলে, মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম কিছুকাল নবাব হইয়া বঙ্গের শাসন-ভার পরিচালন করেন। মীরকাশিম রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে রাজ্যের কন্টকোৎপাটনে ও অকল্যাণ-দমনে মনোযোগী হইলেন। এই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্গতির আর অবধি রহিল না। সিরাজের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, মীরকাশিমের আদেশে তাঁহাদের একে-একে সকলেই মুঙ্গের রাজধানীর প্রাসাদ-দুর্গে নীত, অবরুদ্ধ ও নিহত হইতেছিলেন। স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় পুত্র শিবচন্দ্র সম্বন্ধেও যথাক্রমে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল না। তাঁহারাও মুঙ্গের দুর্গে বন্দী হইলেন। এই সময়ে দৈবাৎ ইংরাজেরা সদলবলে মুঙ্গের আসিয়া পড়ায় মীরকাশিম অপ্রস্তুত ভাবে রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, এবং ইংরাজের অনুগ্রহেই সে যাত্রা সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাণ-রক্ষা হইল।

যাহাহৌক, তাহার পরে, দিল্লীর সম্রাট্ শাহ্ আলমের নিকট হইতে ইংরাজেরা এই সমগ্র বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী-সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া, এদেশের রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারের উন্নতি-বিধানকল্পে তৎপরতা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু, অভিজ্ঞতার অভাবে সে সব কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল। জমিদারেরা ভয়ে-ভয়ে প্রজাদের নিকট হইতে জোর-জবরদস্তি পূর্ব্বক বাকি কর সম্পূর্ণ আদায় করিয়া লইলেন; ফলে, প্রজারা একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। তাহার উপর, শাস্ত্রানুসারে রাজ-বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী সূচনাস্বরূপ, কয়েক বৎসর যাবৎ উপর্য্যুপরি অনাবৃষ্টি হওয়ায়, এদেশে ১২৭৬ সালে ভয়ঙ্কর মন্বন্তর আরম্ভ হইল। এই 'ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর' এক অকথ্য, ভীষণ ব্যাপার! এ সম্বন্ধে শুধু এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে

যে, সেবারে শুধু সাতটি মাসের মধ্যে এই বঙ্গদেশে প্রায় এক কোটি এবং এক কলিকাতায় কেবল মাত্র তিনটি মাসের মধ্যে ৬৭ হাজার লোকের মৃত্যু হইয়াছিল! এমন ভয়াবহ কাণ্ড কেহ কখনও আর দেখে নাই,—শোনেও নাই।

এই ঘটনার পরেই ইংরাজ-রাজ নানা পরগণা বিভক্ত করিয়া, জমিদারদের সহিত নূতন-নূতন ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই অবকাশে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এক দান-পত্র সম্পাদনপূর্ব্বক পুত্র শিবচন্দ্রের নামে সমগ্র জমিদারীর নূতন করিয়া বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন, এবং অতি-বার্দ্ধক্যবশতঃ, নিজে অলকানন্দা নদী-তীরে 'গঙ্গাবাস' নামে এক মনোহর উদ্যানাবাস নির্ম্মাণ করাইয়া, জীবনের অবশিষ্ট কাল তথায় গিয়া বাস করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে অন্যূন ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মর-লীলা সাঙ্গ হয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র দোষে-গুণে একজন বড় লোক ছিলেন। তিনি চরিত্রবান্, বিদ্বান্, কর্ম্মদক্ষ, কৌশলী, চতুর ও অসাধারণ দৃঢ়-মনা, সাহসী পুরুষ ছিলেন। আজন্ম অসংখ্য বিপজ্জালে বিজড়িত হইয়াও, তিনি তিলার্দ্ধ ব্যাকুল বা আত্মহারা হন নাই। যখন ঘনায়মান অসংখ্য বিপদ্‌রাশি মেঘমালার ন্যায় তাঁহার অদৃষ্টাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আনিয়াছে,—ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া, তখনও তিনি সভাসদ্-পাত্র-মিত্রগণে পরিবৃত হইয়া প্রমোদালাপে ব্যাপৃত রহিতেন। ভারত-বিশ্রুত রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব রাজ-সভা গুণী, জ্ঞানী, সুপণ্ডিত, সুকবি ও সুরসিক সভ্য জনে সতত পরিপূর্ণ থাকিত। যোগ্যতানুযায়ী তদধিকারস্থ অগণ্য গুণিজন রাজ-কোষ হইতে নিয়মিত বৃত্তিবার্ষিক প্রাপ্ত তো হইতেনই, তদ্ভিন্ন তিনি কত-শত যোগ্য ব্যক্তিকে যে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহাঁরই রাজসভায় 'রায়-গুণাকর' কবিবর ভারতচন্দ্র উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিরাজিত ছিলেন।

ইহাঁর মৃত্যুর পর রাজা শিবচন্দ্র মাত্র ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করেন। শিবচন্দ্র অত্যন্ত ধর্ম্ম-প্রাণ, উদার ও স্বজন-বৎসল রাজা ছিলেন। তদীয় ন্যায়বিচারে ও পুণ্যবলে রাজ্যের কোথাও কোন দিন অকল্যাণের ছায়া স্পর্শ করে নাই। কিন্তু, ইহাঁর পরে যিনি রাজ্য-ভার প্রাপ্ত হইলেন তাঁহার অপরিমিত ঔদাস্য, উপেক্ষা, অপব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খল যথেচ্ছাচারের ফলে, অপমানিতা, অভিমানিনী ভাগ্য-লক্ষ্মী চিরতরেই এই দুর্ভাগ্য রাজ-সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়া পড়িলেন।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র কেবল যে আপন উদ্দাম লালসা-হুতাশনে এই-সব সোনার রাজ্যরাশি ইন্ধনবৎ অবিরাম ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন, তাহা নহে ;—হাস্যকর, বিবিধ, অদ্ভুত খেয়াল মিটাইবার জন্যও তিনি যখন-তখন অজস্র অর্থের অপব্যয় করিতেন। শোনা যায়—একবার তাঁহার এক সোহাগের বানরী-বিবাহে তিনি ন্যূনকল্পে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন! নিজে তো বিষয়-কর্ম্ম বিন্দুমাত্র দেখিতেনই না ; তাহার উপরে, দুর্ভাগ্যক্রমে, এই সময়ে—ইংরাজী ১৭৮৬ সালে, বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এ দেশের ভূম্যধিকারিগণের দেয় রাজস্বের হার দশ বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন ; এবং কথা থাকে যে, এই নির্দ্ধারিত রাজস্ব বিলাতের শাসক-সম্প্রদায়, অর্থাৎ—পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তাহা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইবে। রাজস্বের হার নির্দ্দিষ্ট হইল বটে ; কিন্তু, সেই সঙ্গে, সেই সময় হইতে ইহাও নিয়ম হইল যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দেয় রাজস্বসমূহ দাখিল না হইলে প্রত্যেকের সম্পত্তি নির্ব্বিচারে নিলাম হইয়া যাইবে। এই 'দশ-শালা বন্দোবস্তের' মূল উদ্দেশ্য এ দেশবাসীর পক্ষে যথেষ্ট কল্যাণকর হইলেও, রাজস্ব দাখিল করা সম্পর্কে এই কঠোর বিধানের ফলে, অন্যমনা ও উদাসীন বহু ভূম্যধিকারী পৈতৃক সম্পত্তি

হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। পার্লামেণ্টের সম্মতিক্রমে, ক্রমে এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী আইনে পরিণত হইলে অন্তঃসারশূন্য ঈশ্বরচন্দ্র আপন স্বভাবদোষে, প্রতি বর্ষে বর্ষে এই সব অমূল্য সম্পত্তি একে-একে ক্ষুয়াইয়া, উত্তরোত্তর ক্রমেই দুঃস্থ হইয়া পড়িলেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর এই স্থূলবুদ্ধি দুর্ভাগ্য রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু ভবানন্দ মজুমদার হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত—সাত পুরুষ ধরিয়া ক্রমাগত যে সুবিশাল রাজ্য সঞ্চিত ও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, নিতান্ত নগণ্য এই কয় বৎসরের মধ্যেই তাহার অধিকাংশ 'দাউ-দাউ' করিয়া, জ্বলিয়া, পুড়িয়া, ছারখার হইয়া-গেল!

ঈশ্বরচন্দ্রের পর গিরিশচন্দ্র উনবিংশ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। ইনি পিতার ন্যায় বিলাস-ব্যসনাসক্ত ছিলেন না; বরং তাহার একেবারেই বিপরীত,—অত্যধিক ধর্ম্ম-ভাবোন্মত্ত ও বিষয়-বিরাগী উদাসীনের ন্যায় ছিলেন। ইহাঁর ঔদাসীন্য হেতু এই রাজ্যের সারভূত প্রধান ও প্রসিদ্ধ উখ্ড়া পরগণাটিও নিলাম হইয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্র রাজার আমলে যে বিস্তীর্ণ রাজ্য চৌরাশীটি প্রকাণ্ড পরগণায় পরিব্যাপ্ত ছিল, গিরিশচন্দ্রের সময়ে তাহা কেবল ৫।৬'টি পরগণা ও কতিপয় নিষ্কর গ্রামে পরিণত হইল। চঞ্চলা লক্ষ্মীর এমনই বিচিত্র লীলা! যাহাহৌক, একটি দত্তক পুত্র রাখিয়া নিঃসন্তান গিরিশচন্দ্র মানবজন্ম সমাপ্ত করেন। গিরিশচন্দ্র বিদ্বান্, কাব্য ও সাহিত্য-রসিক ও তন্ত্রশাস্ত্রের তন্ময় সাধক ছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করিলে তাঁহার সাগ্রহ যত্ন, চেষ্টা, উৎসাহ ও অধ্যবসায় গুণে সমাজের, দেশের ও রাজ্যের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। অবশ্য তাঁহার যাবতীয় সদ্‌বুদ্ধি ও সদিচ্ছার নিয়ামক ও পরিচালক ছিলেন আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালের পুণ্যশ্লোক পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়। কিন্তু, প্রথম জীবন এইরূপ সদ্‌ভাবে যাপন করিয়াও, সর্ব্বনাশকর কুসঙ্গের অনিবার্য্য

প্রভাবে, অবশেষে অকালে তিনি আত্মহারা হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সম্বন্ধে দেওয়ানজী আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"রাজা বাল্যাবস্থা হইতে পৈঁত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নিজের ও স্বদেশের হিতবিধান ও মঙ্গলসাধনে সতত রত ছিলেন। তাহার পর কলিকাতাবাসী কতিপয় মধুরভাষী ধনশালী ব্যক্তির সুধাচ্ছাদিত বিষপূরিত সংসর্গে তাঁহার আন্তরিক ও বাহ্যিক ভাবের বিস্তর বিপর্য্যয় হইতে লাগিল। তাঁহার বিষয়-কার্য্যে মনোনিবেশ করা অতি ক্লেশকর জ্ঞান হইতে লাগিল; এবং সুহৃদ্বর্গের সুহৃদ্বাক্য কর্ণকুহরে কণ্টকবৎ বোধ হইয়া উঠিল। আহার, বিহার, শয়ন সকলই নিয়ম-বহির্ভূত হইতে আরম্ভ করিল; দিবানিশি কেবল মদিরাপানে ও গীতবাদ্যের আমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। * * * তাঁহার মনোবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া উঠিল এবং শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। অবশেষে * * ৩৮ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।"

শ্রীশচন্দ্রের পরে সতীশ রাজা হইয়া মাত্র তেরো বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনিও বিষয়-ব্যাপারে অবহেলা পূর্ব্বক অবিরাম কুসঙ্গীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। অত্যধিক সুরাপানে ইহাঁরও অকালে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল। ইহাঁর লোকান্তর-প্রাপ্তির অব্যবহিতকাল পরে, তদীয় বিধবা পত্নী একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন; নাম ক্ষিতীশচন্দ্র। বিদ্যাবুদ্ধি, সচ্চরিত্র ও বহুবিধ সদ্‌গুণের জন্য রাজা ক্ষিতীশচন্দ্রকে সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিত এবং আন্তরিক শ্রদ্ধাসহকারে ভালওবাসিত। ইহাঁরই পুত্র মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র এক্ষণে রাজাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। বিধাতা তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দেশের ও রাজ্যের অশেষ কল্যাণসাধনে সতত নিযুক্ত রাখুন!

নিতান্ত সংযতভাবে, বিশেষ সতর্কতার সহিত, অতি সংক্ষেপে, বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ রাজবংশের সামান্য-একটু পরিচয়, কর্ত্তব্য বলিয়াই, এস্থলে যথাসাধ্য বিবৃত হইল। যাঁহাদের 'নিমকে'র গুণে, যাঁহাদের অন্নে পুষ্ট ও পালিত হইয়া, আজ এই রায়-বংশের

এ-হেন সম্মান ও এতদূর উন্নতি ; এবং প্রধানতঃ, মূলে যে রাজকুলের কৃপায়, আজ এই রায়-বংশ দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় একখানি দুর্লভ ও অমূল্য জীবনরত্ন এ বঙ্গদেশের বক্ষ-বিলম্বিত মণিময় মালায় সন্নিবিষ্ট করিয়া, তাহার মহিমা ও মহোজ্জ্বল দীপ্তি শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন—এ গ্রন্থ-প্রণয়নে, সর্ব্বাগ্রে সেই মান্য বংশের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করিলে আমরা অকৃতজ্ঞতা দোষে অভিযুক্ত ও অপরাধী হইতাম।

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা মহাত্মা ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন,—

"রাজা রুদ্রের সময় হইতে রুদ্রের পৌত্র রাজা রঘুরামের সময় পর্য্যন্ত আমার অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার পুত্র রামরাম চক্রবর্ত্তী দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। * * কুলশাস্ত্রে যে যে স্থানে ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী ও রামরাম চক্রবর্ত্তীর নামের উল্লেখ আছে, তাঁহারা দেওয়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।"

বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-সমাজের একমাত্র কর্ণধার, নমস্য পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় তদীয় 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ' নামক মহামূল্য গ্রন্থখানির একস্থানে লিখিতেছেন,—

"অতএব দেখা যায় যে বহুপূর্ব্ব হইতে এই রায়বংশীয়গণ বহু পুরুষ ধরিয়া কৃষ্ণনগরের রাজসংসারে দেওয়ানীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পদে, সম্ভ্রমে, কুল-মর্য্যাদাতে ইঁহারা বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়াছেন। এমন কি ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীনের এক নূতন দল স্থাপন করেন ; সেজন্য ইঁহারা 'মত-কর্ত্তার বংশ' বলিয়া বারেন্দ্র-দলের মধ্যে সম্মানিত। কুল-মর্য্যাদাসম্পন্ন দেওয়ানগণ স্বীয় স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিবার জন্য সময়ে সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজাদিগের দ্বারা নাটোরের রাজাকে অনুরোধ করিয়া, তাঁহাদের সাহায্যে বরেন্দ্র-ভূমি হইতে কুলীনদিগকে আনাইয়া, নদীয়ার রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। অনুমান করি এইরূপে লাহিড়ী, খাঁ, সান্যাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র-শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণনগরের সন্নিধানে আসিয়া বাস করিয়াছেন।"

বংশবিবরণ।

বিস্তৃতরূপে যথার্থ ইতিহাস-সংকলনের এখন আর কোন উপায় নাই, তবে, বহু অনুসন্ধানে এইটুকু মাত্র জানিতে পারা গেল যে, সুদূর অতীত সময়ে, এই রায়বংশও পূর্ব্ববঙ্গেরই কোন-এক সম্পন্ন ভূম্যধিকারী হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। কালক্রমে, অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ও ঘটনাচক্রে, পরে ইহাঁরা কৃষ্ণনগরে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন; এবং অবশেষে আপনাদের জন্ম-গত মনীষা, সুশিক্ষা ও সম্ভ্রান্ত বংশের প্রভাবে ইহাঁরা কৃষ্ণনগর-রাজগণের প্রধান পরামর্শদাতা—মন্ত্রী ও তাঁহাদের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ অপরিহার্য্য অবলম্বন হইয়া ওঠেন। সত্যনিষ্ঠা, আশ্রিত-বাৎসল্য, পরোপকার, এবং কি সম্পদে, কি বিপদে সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মের প্রতি অপলক লক্ষ্য,—এই সকল দুর্লভ সদ্‌গুণরাশি এই বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-পরিবারকে দেশে ও সমাজে অক্ষুন্ন গৌরব ও প্রভূত প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল। সমকক্ষ বা তাদৃশ অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ না হইয়াও, এই বংশের পূর্ব্ব-পুরুষগণ কখনও কোন রাজা-মহারাজা অথবা উচ্চপদস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকটে অসম্মানী বা ক্ষীণ-জ্যোতিঃ হন নাই; বরং, অনম্য আত্ম-মর্য্যাদার প্রভাবে ইহাঁরা চিরকাল সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে ন্যায্য সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা-কবি, 'রায় গুণাকর' কবিবর ভারতচন্দ্র তদীয় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে রাজার সভা-বর্ণনস্থলে বলিয়াছেন,—

"চক্রবর্ত্তী গোপাল দেওয়ান সহবতি।
রায় বকসি মদনগোপাল মহামতি ॥"

এই মদনগোপাল 'রায় বক্‌সী'ই কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রপিতামহ। 'অন্নদামঙ্গল'-কাব্যে তাঁহাকে রাজ-সেনাপতি ও তাঁহার অগ্রজ রামগোপালকে 'দেওয়ান' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, মদনগোপাল এই রায়বক্‌সী পদবী-ভূষিত হওয়া অবধি তাঁহার বংশ 'রায়'-উপাধিতে খ্যাত হইয়া আসিতেছে।

একপক্ষে হিন্দুসমাজে—বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে, এই বংশ যেমন সমাজপতি, গোষ্ঠীপতি বা 'মত-কর্ত্তা' বলিয়া সম্পূজিত হইয়াছেন, অপর পক্ষে আবার তেমনই কৃষ্ণনগরের রাজ-পরিবার ইহাঁদের বিশ্বস্ততা, কর্ত্তব্যানুরাগ ও অপরিমেয় অধ্যবসায়ের দরুণ, এত দৈব দুর্বিপাক ও ক্রমাগত অসংখ্যবিধ ঝঞ্ঝা-বিপৎপাতে বারংবার মজ্জমান ও বিধ্বস্ত হইয়াও, অদ্যাপি নিশ্চিহ্ন হইয়া কাল-গর্ভে বিলীন হইয়া যায় নাই। ইহাঁদের মহত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়া, মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ' নামক পুস্তকের এক স্থানে লিখিতেছেন—

"ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তিনি খাঁ, ভাদুড়ী, সান্যাল, লাহিড়ী, মৈত্রেয় প্রভৃতি ছয় ঘর প্রসিদ্ধ কুলীনকে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ছয় ঘরের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। তদবধি দেওয়ান বংশের অনেকেই রাজবাটীর দেওয়ানের কাজ করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁরা যদি ধর্ম্মভীরু লোক না হইতেন, তাহা হইলে মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদিগের ন্যায় রাজাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া নিজেরাই কার্য্যতঃ রাজ্য-সম্পদের অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু ইহাঁরা তাহা না করিয়া বরং আপনাদিগকে দিয়া রাজাদের বিষয় রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এখনও রাজবাটীর অনেক বিষয় ইহাঁদের নামে বেনামী রহিয়াছে। সে সকল বিষয় ইহাঁরাই নিলামে ডাকিয়া রক্ষা করিয়াছেন। প্রভুদিগকে মারিয়া আত্ম-পোষণ করা দূরে থাকুক, দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের আত্ম-জীবনচরিতে দেখিতেছি, মধ্যে মধ্যে ইহাঁদের বিলক্ষণ সাংসারিক অসচ্ছল উপস্থিত হইয়াছে। এই বংশের পূর্ব্ব-কথা যতদূর জানা যায় তাহাতে বংশপরম্পরাক্রমে ইহাঁরা যাহাকিছু উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহা প্রায় খাত-পূর্ত্তাদি খনন, দেবালয়াদি নির্ম্মাণ, ব্রাহ্মণ-দারিদ্রে দান প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্মেই নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে এক-এক জন এমন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যাঁহাদের গুণাবলীর কথা শুনিলে শরীর কণ্টকিত হয়।"

তন্মধ্যে একজনের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি—যাহা

শুনিলে, অনেকে উপন্যাসের বর্ণিত বিষয় বলিয়া অনুভব করিবেন; কিন্তু, তাহা সত্য ঘটনা। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার আত্ম-জীবন-চরিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত তারাকান্ত রায় মহাশয়ের বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"আমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের এই সকল মহৎ গুণ এত অধিক ছিল যে, তাঁহার সমতুল্য ব্যক্তি আমরা কখনও দেখি নাই। তিনি এমন মিষ্টভাষী ছিলেন যে কখনও কাহাকেও তুই বলেন নাই; এমন দানশীল ছিলেন যে সাধ্যাতীত না হইলে কখনও কোন যাচককে নিরাশ করেন নাই; পর-স্ত্রী অভিলাষ বোধ হয় তাঁহার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই, শত্রুমিত্রে সমান জ্ঞান—এই দুর্লভ ধর্ম্ম কেবল তাঁহাতেই দেখিয়াছি। যে সকল হিংস্রক জ্ঞাতিরা তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়াছেন ও তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও কখনও একটি কষ্টদায়ক বাক্য বলেন নাই; এবং তাঁহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশে কখনও ত্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের দুঃসময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহাদের পীড়ার সময়ে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন; মৃত্যুকালে তাঁহাদের গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ করিয়া দিয়াছেন এবং পরিশেষে তাঁহাদের শ্রাদ্ধের কালে সহায় হইয়াছেন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দেওয়ানজী তাঁহার উদার স্বভাবের কয়েকটি আশ্চর্য্য উদাহরণ দিয়াছেন। দেওয়ানজীর এই অতুল আত্মজীবন-চরিতখানা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া, আমি বাহুল্য-ভয়ে, সে সকল বিষয়ের আর এস্থলে পুনরুল্লেখ করিলাম না। এই গ্রন্থখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে আগ্রহে ও বিস্ময়ে আদ্যন্ত শেষ না করিয়া তৃপ্তি হয় না; পড়িয়া শেষ করিলে আনন্দ হয়, বিস্ময় হয়,—আপনাকে উন্নত ও উপকৃত বলিয়া অনুভব করা যায়। যাহাহৌক, তারপরে উক্ত তারাকান্ত বাবুর সম্বন্ধে দেওয়ানজী বলিতেছেন,—

"তাঁহার গুণ বর্ণনায় শেষ করা যায় না। তাঁহার সাতটি পুত্র অকালে কাল-কবলিত হয়; তথাপি তাঁহার বদনে ক্ষণকালের নিমিত্ত কেহ কখনও

শোকচিহ্ন দেখেন নাই। প্রত্যেক পুত্রবিয়োগসময়ে তিনি স্থিরভাবে থাকিতেন এবং তাঁহার অধৈর্য্য পরিবারগণের শোকশান্তির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইতেন। যাঁহার কোমল হৃদয় চিরশত্রুর দুঃখে কাতর হইত, তাঁহার চিত্তকে যে জীবনাধিক পুত্রশোকেও বিচলিত করিতে পারিত না, এ সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।"

এই পূজ্য পরিবারে ইহাঁদেরই পুণ্য শোণিত-প্রবাহ দেহ-ধমনীতে ধারণ করিয়া দেবোপম দ্বিজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;—শুদ্ধমাত্র এই কথাটি মনে রাখিলেই আমরা অতঃপর তাঁহার চরিত্রে একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইব।

২

পিতৃদেব

মহাত্মা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়।

এই পূজ্য বংশের যাবতীয় মহদ্‌গুণাবলী আবার প্রধানতঃ দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের জীবনেই একাধারে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। বাস্তবিক এই মহাত্মাই রায়-বংশের অগণ্য গুণের দিব্য রত্নাকর বা উজ্জ্বলতম, স্বর্গীয় জ্যোতিষ্কস্বরূপ। দেওয়ানজী তদীয় আত্ম-চরিতে নিজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে অতি অল্পই চিনিতে পারা যায়। সৌজন্য ও বিনয়ের আধার কার্ত্তিকেয়চন্দ্র আত্ম-কথা বিবৃত করিতে গিয়া আপনার মহত্ব ও গুণের কথা তেমন তো কিছু বলেনই নাই; বরং, অত্যধিক সত্যনিষ্ঠা ও সারল্যবশতঃ আপনাকে যেন নিতান্তই 'খাটো' ও তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়াছেন। তথাপি যাঁহাদের একটু বুদ্ধি-বিবেচনা বা অন্তর্দ্দৃষ্টি আছে তাঁহারা সে গ্রন্থ পাঠে,—সেইসব অনতিরঞ্জিত, 'শাদা-সিধা' আত্ম-কথা ও ঘটনাবলীর ভিতর দিয়াই, এই পুণ্যশ্লোক সাধুপুরুষটির প্রচ্ছন্ন স্বরূপটি ধরিয়া ফেলিতে পারিবেন। তাঁহার সততা, সরলতা, সত্য-নিষ্ঠা, পরোপকার, জিতেন্দ্রিয়তা ও উদারতার কথা স্মরণ করিলেও আজ হৃদয় সদ্‌ভাবে ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে। শেষ জীবনে, একদিন মনে পড়ে,—মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল তদীয় পিতৃদেবের সম্বন্ধে বাষ্পাকুল-লোচনে বলিয়াছিলেন,—"তাঁহার মহত্ত্বের আজও আর একটি তুলনা দেখিলাম না।" দুর্ভাগ্য আমরা, রূপে-গুণে সে কার্ত্তিকেয়কে দেখি নাই; তবে, তাঁহার কথা শুনিয়া ও পড়িয়া যতটুকু ধারণা করিতে পারিয়াছি

তাহাতে আমাদেরও মনে হয়—এ কলুষ-ম্লান সংসারে বুঝিবা সহজে সে চরিত্রের তুলনা মেলে না।

ঐ আকাশেরই মত বিশুদ্ধ জীবনখানি মেলিয়া-ধরিয়া, কার্ত্তিকেয়চন্দ্র যখন এদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য-শিক্ষার সেই প্রথম প্রবর্ত্তনের যুগে, বঙ্গের 'মরা গাঙ্গে' সেই যখন দুর্ব্বার বেগে নবীনের উদ্দামোন্মত্ত, প্রলয়ঙ্কর বান গর্জ্জিয়া আসিল তখন এদেশের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও সংস্কার,—এক কথায় আমাদের আপন বলিতে ভাল-মন্দ যাহা-কিছু ছিল—সে সমস্তই সহসা ডুবিল ; ডুবিল তো আবার এমনই ডুবিল যেন বোধ হইল—একেবারে চিরদিনের তরেই সে সব তলাইয়া ফুরাইয়া গেল ! সেই প্রলয়-বন্যার শঙ্কাকর ভয়ঙ্কর অবস্থার, সমাজের সেই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ বা ইতিহাস এস্থলে এখন বিবৃত করার বিশেষ কোন আবশ্যক বা অবকাশ আমাদের নাই। তবে, তৎকালের অল্প-একটু আভাস এইজন্য দিতে চাই যে, পাঠক তদ্দ্বারা বুঝিবেন—কত বড় সে শক্তি, কি অপরিসীম সে নৈতিক বল যাহার অপ্রতিহত প্রভাবে, কার্ত্তিকেয়চন্দ্র সে সময়ের সে বিষম সংগ্রামেও, অক্ষত শরীরে আপন মহোজ্জ্বল বিজয়-নিশান উন্নতবক্ষে উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পাঠক দেখুন একবার,—তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থাটা কি ভয়াবহরূপেই শোচনীয় ! শিবনাথবাবু লিখিতেছেন,—

"* * পরাধীনতাবশতঃ হিন্দুদিগের প্রাচীন সত্যনিষ্ঠা একেবারে চলিয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে লোকে মিথ্যা কহিতে ও প্রবঞ্চনা করিতে লজ্জা পাইত না। * * লোকে জাল জুয়াচুরি দ্বারা ধনলাভ করিয়া সমাজমধ্যে গৌরব লাভ করিতে লাগিল। কৃতকার্য্য হইয়া স্পর্দ্ধা করিতে আরম্ভ করিল। উৎকোচাদি দ্বারা দেশের সাধারণ নীতির এই দুর্গতি হওয়াতে সর্ব্বত্রই লোকের প্রতিদিনের আলাপ আচরণ তদনুরূপ

হইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণনগরও সেই দূষিত বায়ুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সময়ে * * কৃষ্ণনগরে পরস্ত্রী-গমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তারের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত। সুতরাং তাঁহাদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে গ্রীসদেশে যেমন পণ্ডিতসকলও বেশ্যালয়ে একত্রিত হইয়া সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাঁহারাও আমোদের ও পরস্পর সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্য্যন্ত বেশ্যালয় লোকে পূর্ণ থাকিত। বিশেষতঃ পর্ব্বোপলক্ষে সেথায় লোকের স্থান হইয়া উঠিত না। লোকে পূজার রাত্রিতে যেমন প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্যা দেখিয়া বেড়াইতেন! * * আদালতের আম্‌লা মোক্তার প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভদ্রলোকের নিকটে পরস্পরকে পরিচিত করিয়া দিবার সময়ে—"ইনি ইহাঁর রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দিয়াছেন," এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া দেওয়া একটা মানসম্ভ্রমের কারণ ছিল। * * দেশের সর্ব্বত্রই জাতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। * * তখন অল্পবয়স্ক বালকদিগেরও আচার ব্যবহার আলাপ পরিচয়ে দূষিত নীতি প্রবেশ করিত।"

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তৎকালীন দুর্গতি-বর্ণনে আরও স্ফুটতর ভাষায় লিখিয়াছেন,—

"* * * ছাত্রগণ ভ্রম ও কুসংস্কার সংশোধনের নামে ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্বাধীনতা অর্থে স্বেচ্ছাচার ও সংস্কার অর্থে সমূলোৎপাটন, এই তাঁহারা বুঝিয়া লইলেন। পুরাণোক্ত তেত্রিশ কোটি দেবতার উচ্ছেদ করিতে যাইয়া তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হইলেন, এবং হিন্দুসমাজে সহমরণ প্রথার ন্যায় কুসংস্কার ছিল বলিয়া, সমাজ-প্রচলিত যে কোন প্রথাই তাঁহারা কুসংস্কারমূলক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সুরাপান, গোমাংসভক্ষণ, এবং যবনান্নগ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য তাঁহারা সমাজ-সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কাহারও

কাহারও এই অদ্ভুত সংস্কার জন্মিল যে, পৃথিবীতে যখন 'গোখাদক' জাতিরাই অপর সকল জাতিকে পরাজিত করিয়া আসিতেছে তখন বাঙ্গালীরাও 'গোখাদক' না হইলে তাহাদিগের উন্নতির আশা নাই। এই অদ্ভুত সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতেও তাঁহারা ত্রুটি করিতেন না। সকলে দলবদ্ধ হইয়া, গো-মাংস ভক্ষণপূর্ব্বক কখন কখন, প্রতিবাসীদিগের গৃহে ভুক্তাবশেষ নিক্ষেপ করিতেন, এবং যে সকল আচার, ব্যবহার সম্পূর্ণ সমাজ-বিরুদ্ধ তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া আপনাদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার (তাঁহাদের মতে নৈতিক বলের) পরিচয় দিতেন। ** গৃহে গৃহে হুলস্থুল পড়িয়া গেল, এবং অনেক পিতামাতা সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ভীত হইলেন।"

সমাজ-বিপ্লবের এবংপ্রকার দেশব্যাপী বহ্নি যখন সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত ; নীতি, ধর্ম্ম, সদাচার যখন সে জ্বলন্ত চিতাগ্নিতে 'দাউ-দাউ' করিয়া, জ্বলিয়া, পুড়িয়া ছারখার হইতেছে ; যখন যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা সভ্যতা ও সংস্কারের ছদ্মবেশ ধরিয়া দুর্দ্দম বিক্রমে এদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ফিরিতেছে,—ইংরাজী শিক্ষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াও, তখন ঐ দেখুন—অক্ষুণ্ণ ধৈর্য্যের সহিত, একান্ত সংযত ও প্রশান্ত চিত্তে, অবিকম্পিত, সুদৃঢ় পদক্ষেপে মহাত্মা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র আপন ধ্রুব লক্ষ্য ও কর্ত্তব্য-পথে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইতেছেন !

কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের তৃতীয় তনয়, 'সেঝ্‌দা' শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছেন,—

"আমি আপনার নিকটে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমি তাঁহাকে প্রকৃতই দেবতা—মানবদেহে যথাসম্ভব ঈশ্বরের অবতার মনে করি। মানব-চরিত্রভাবে তাঁহাকে আলোচনা করিলে তাঁহার দোষ এই যে, তাঁহার কোন দোষই ছিল না! দ্বিজুর (দ্বিজেন্দ্রলালের) 'দুর্গাদাস' চরিত্রে শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত যে দোষ বলিয়াছিলেন, পিতৃদেবের চরিত্রেরও ঠিক সেই দোষ—যে, কোন দোষ নাই, কোনই ছিদ্র নাই,—একেবারে অকলঙ্ক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর! এই জন্যই মনে হয়, যেন তাহা মানব-চরিত্রের বহু ঊর্দ্ধে, তাই যেন তাহা অস্বাভাবিক, তাই যেন অধিকাংশ লোকেরই সহানুভূতি ও ধারণার অতীত সেই অমিশ্রিত

গুণরাশি! দ্বিজুও স্বয়ং পিতৃদেবকেই সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার আলোকোজ্জ্বল, অচ্ছিদ্র অপূর্ব্ব সেই দুর্গাদাস চরিত্র চিত্রিত করিয়াছিলেন। * * একদিন পিতৃদেবের পরম বন্ধু মনীষী ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য আমাকে বলিয়াছিলেন—"Your father was the last specimen of Hindu nobility of character coming under the influence of English civilization"† ক্ষেত্রমোহনবাবু মনে করিতেন যে, পিতৃদেব তাঁহার আত্মজীবনীতে আপনাকে যেরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা তিনি বহুগুণে মহত্তর ছিলেন। এ স্থানে মোটামুটি দু'একটি লোকের ধারণার কথাই আমি অল্পের মধ্যে বলিয়া, বুঝাইতে চাহিতেছি যে, তিনি কি ছিলেন; আর একবার মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর আমাকে বলিয়াছিলেন,—"আমি অসবর্ণ সাহেবকে (M. A. Oxon, মহারাজের গৃহ-শিক্ষক) একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"Patrician bearing" কাহাকে বলে,—রোমান Patrician'দের চাল-চলন কিরূপ ছিল?" তাহাতে মিষ্টার অসবর্ণ আমাকে বলিলেন—"আমি, এক কথায় তোমায় বুঝাইয়া দিতেছি, তোমার দেওয়ানের চালচলন যেরূপ †† Patrician'এর চালচলনও ঠিক তদ্রূপ।" আমার পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলে প্রথম যখন পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি অকৃত্রিম বন্ধু-বিয়োগে অজস্র কাঁদিতে লাগিলেন; পরে বলিলেন যে সংসারে কেবল মাত্র দুইটি লোক দেখিলাম যাঁহারা যথার্থই মহৎ, প্রকৃতই অকপট, যাঁহাদের মুখে একখানা ও পেটে একখানা নহে। তোমার পিতা একজন, আর—।" প্রকৃতই পিতৃদেব এরূপ অকপট ও সত্যবাদী ছিলেন যে, আমি কখন কখন ভাবিতাম, এতটা সারল্য ও সত্যনিষ্ঠা লইয়া তিনি কি করিয়া কার্য্যপটু বৈষয়িক লোক হইয়াছিলেন, কিরূপে চক্রান্তকারী দুষ্ট লোকদিগকে দমন করিয়া জটিল পার্থিব কার্য্যেও সফলতা লাভ করিতেন। শেষ বয়সে তিনি সমাজে যাঁহারা সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত, বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের অসাধুতা দেখিয়া, এক দিন অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—"সাধুতা কি নির্ব্বুদ্ধিতা?

† "ইংরাজী সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হিন্দু-সমাজের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুর চরিত্রগত মহত্ত্ব বজায় রাখিয়া গিয়াছেন, তোমার পিতাই তাঁহাদের সর্ব্বশেষ নিদর্শন।"

†† অভিজাত বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

যদি তাহা না হয় তবে এত বুদ্ধিমান্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অসাধু কেন?" তাঁহার চরিত্রে এক দিকে যেমন আন্তরিক বিনয় ছিল, অন্যদিকে তেমনি অনমনীয় তেজস্বিতা ছিল। তিনি সত্যের অনুরোধে, কর্ম্মচারী হইয়াও, অনেক সময়ে মহারাজদিগের মুখের উপরে অতি স্পষ্ট ও কঠোর প্রতিবাদ করিতেন; কর্ত্তৃপক্ষ কোন সাহেবও কখনও অন্যায় করিলে নির্ভীকভাবে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিতেন।"

আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব—মহাতেজস্বী দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনেও পিতার এই সকল মহত্ত্ব ও গুণনিচয় অতি স্পষ্ট ও উজ্জ্বলরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

স্বার্থ-সিদ্ধি ও কার্য্যোদ্ধারের জন্য কোন-কোন সময়ে ইংরাজেরা তোষামোদ বা স্তাবকতার প্রতি প্রশ্রয় ও সমাদর দেখাইয়া থাকেন বটে; কিন্তু, মনে-মনে আন্তরিকভাবে তাঁহারা তদ্‌বিধ হীনতাকে অত্যন্তই ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। অধিকন্তু, যেখানে যথার্থ গুণ ও মনুষ্যত্বের সন্ধান পান, সেখানে সে মূল্যবান্ পদার্থ স্তাবকতার 'গিল্‌টি-করা' না হইলেও, তাহাকে চিনিয়া লইতে তাঁহাদের বিলম্ব হয় না। এই কারণে, যদিচ দেওয়ানজী উচ্চ-পদস্থ, কর্ত্তৃপক্ষীয় ইংরাজ-কর্ম্মচারীর অনেক অবৈধ কার্য্যের অনেক সময়ে প্রতিবাদ করিতেন,—তাঁহারা তাহাতে তাঁহার প্রতি বিরক্ত বা রুষ্ট হওয়া তো দূরের কথা,—বরং যথেষ্টই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এমন কি,—তিনি একজন সামান্য কর্ম্মচারী হইলেও উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীরা কৃষ্ণনগরে গেলে, সাধারণতঃ তাঁহার সঙ্গে একটিবার সাক্ষাৎ না করিয়া আসিতেন না। একবার তিনি যখন কঠিন রোগে শয্যাগত, তৎকালীন ছোটলাট Sir Rivers Thompson (সার রিভার্স টম্‌সন্) সে সংবাদে অতিমাত্র ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া, নিজেই 'কার্ত্তিক-ভবনে' তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার মত সামান্য, মধ্যবিত্ত-সম্পন্ন

জনৈক কর্ম্মচারীর অদৃষ্টে এহেন অযাচিত সম্মান-লাভ আর কখনও কোথাও ঘটিয়াছে কিনা, সন্দেহ। আমরা অতি অল্পের মধ্যে, সংক্ষেপে আমাদের কর্ত্তব্য-পালন করিতেছি ; অতএব, এই একটি মাত্র ঘটনা হইতেই, এই অনাড়ম্বর, আত্ম-গোপনক্ষম মহাজনের পদবী ও শক্তির যথোচিত পরিমাণ পাঠকগণ অনুমান করিয়া লইবেন। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, লোহারাম শিরোরত্ন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নাট্য-গুরু দীনবন্ধু, মহাকবি মধুসূদন, বিখ্যাত বক্তা রামগোপাল ঘোষ, বারাশতের কালীকৃষ্ণ মিত্র, দ্বারকানাথ দে, পূর্ণচন্দ্র রায় প্রমুখ বঙ্গবাসীর মুখোজ্জ্বল ব্যক্তিবর্গ কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের গুণ-মুগ্ধ, অকৃত্রিম, সমপ্রাণ বন্ধু ছিলেন।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র বাঙ্গলা, পার্শী ও ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন। বঙ্গ-সাহিত্যের সেই 'সবেমাত্র' শৈশব কালের তুলনায় তাঁহার রচনা-শক্তি দেখিলে সত্যসত্যই বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইতে হয়। তৎপ্রণীত 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত' ও 'আত্ম-জীবনচরিত' নামক সুলিখিত গ্রন্থদ্বয় চরিতাখ্যান-বিভাগে তাঁহার নাম চিরদিন যশোমণ্ডিত করিয়া রাখিবে। বন্ধুবাৎসল্যে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি অতি সুকণ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, সুভাষী, সুরসিক, সুন্দর, সরল ও সুশিক্ষিত ছিলেন ; কাজেই, তিনি স্বতঃই তদীয় সুহৃজ্জনগণের মনোহরণ করিতেন। (অন্যান্য গুণের ন্যায় এই গুণটিও দ্বিজেন্দ্র-চরিত্রে অতি অপরূপরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।) গুণগ্রাহী নাট্যকার-কবি ৺দীনবন্ধু ইহাঁর পরিচয়চ্ছলে, তদীয় 'সুরধুনী' কাব্যের একত্র বলিয়াছেন,—

"কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য-প্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান্ ;

স্থললিত স্বরে গান কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা হয় শুনি হ'য়ে উজানবাহিনী !"

পিতার চরিত্রের সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের অতি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। স্বভাবতঃ কার্ত্তিকেয়চন্দ্র একদিকে যেমন কুসুম-কোমল,—কর্ত্তব্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে,—অন্যদিকে আবার তেমনই বজ্রাদপি কঠোর ছিলেন। দ্বিজেন্দ্র-চরিত্রে সম্ভবতঃ আমরা এই সকল প্রকৃতির পূর্ণতর ও স্ফুটতর বিকাশ দেখিতে পাইব। কার্ত্তিক বাবুর জীবন-কথার বিস্তৃত আলোচনা আমরা এস্থলে করিব না ;—তদীয় আত্মজীবনী হইতেই পাঠক পরিতৃপ্তি লাভ করিবেন। আমরা এখানে আর দু'একটি কথার মাত্র অবতারণা করিয়া, ক্রমে আমাদের গন্তব্য লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক হইয়াছি।

ক্ষুদ্র-তুচ্ছ ঘটনার ভিতরেই মানুষ ঠিক খাঁটি ভাবে নিজেকে ধরা দেয়। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রবাবুর প্রেরিত নিম্নোক্ত ঘটনা দুইটি হইতে পাঠক বুঝিবেন, তিনি কিরূপ কোমল-প্রকৃতি ও কর্ত্তব্য-কঠোর লোক ছিলেন।—

"একদিন আলাপ করিতে করিতে এক বন্ধুর বাটীতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। বন্ধু তাঁহার সঙ্গে একটি চাকরকে লণ্ঠন লইয়া যাইতে বলিলেন। পিতৃদেব তাহা নিবারণ করিলেন, লইলেন না। বাটীতে আসিয়া বলিলেন—'চাকরটি তখন পাঠাইলে গৃহস্বামীর হয়ত অসুবিধা হইত, তারপর নিজের একটু অসুবিধা হইবে বলিয়া একটা গরীব মানুষকে অকারণ কষ্ট দেওয়া হইত,—এইজন্য আমি সঙ্গে আলো আনি নাই, অম্‌নি আসিলাম।"

কি সুন্দর ! অপর দিকে শুনুন আর একটি ঘটনা।—

"মাইকেল পিতৃদেবের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলেন। পিতৃদেবের স্বভাব এমনই ছিল যে, তিনি স্বজন-বন্ধুর কোনরূপ প্রীতি-সাধন করিতে পারিলে, বিশেষ কোন কারণ ব্যতিরেকে, সে সুযোগ প্রায়ই পরিত্যাগ করিতেন না। মাইকেল পিতৃদেবের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তিনি যখন তাঁহার জীবনসঙ্গিনী সেই ইউরোপীয় মহিলাকে তত্ত্বাবধায়িকারূপে

রাজবাটীতে সংস্থাপিত করার প্রস্তাব করেন তখন বন্ধুতা সত্ত্বেও পিতৃদেব তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের অসুবিধার জন্য কাহারও অসুবিধা,—এমন কি তাঁহার কোন সন্তানেরও কিছু অসুবিধা হইতে দিতেন না। অথচ, ন্যায় ও কর্ত্তব্যের জন্য তিনি সমগ্র জগতের বিপক্ষেও দণ্ডায়মান হইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না।"

পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"কি অপূর্ব্ব সাধুতা! * * দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় সাধুতাতে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী লোক আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের অনেক গুণ তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। আত্মীয়স্বজন পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, এ সকল যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এই সকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি স্বদেশ-হিতৈষী, স্বজাতিপ্রেমিক মহাজনগণের বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বিষয় বলিতে সুখ হয়, ভাবিলেও মন উন্নত হয়।"

কার্ত্তিক বাবু কেবল যে নীরব কর্ম্মীই ছিলেন তাহা নহে, দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন, এবং টাউনহলের সভা-সমিতিতেও মধ্যে-মধ্যে যোগদান করিতেন।

আংশিক ও সংযতভাবে তিনি সমাজ-সংস্কারের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার মন অত্যন্ত সম্ভ্রমশীল ও উদার ছিল। প্রকৃতই তাঁহার "বিষয় বলিতে সুখ হয়, ভাবিলেও মন উন্নত হয়।" এই দেবতুল্য, মহাজন আবার শান্তিপুরের প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের বংশের একটি গুণময়ী কন্যার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মণি-কাঞ্চন সংযোগ হইল,—যথার্থই এ যেন গঙ্গা-যমুনার সম্মেলন!

এমন জনক-জননীর পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছিলেন। পারিপার্শ্বিক ঘটনা বা অবস্থার প্রভাব অপেক্ষা, এই কারণে, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে স্বাভাবিক প্রকৃতির প্রভাবই

অধিকতর পরিলক্ষিত হইত। উত্তরাধিকারস্বত্বে দ্বিজেন্দ্রলাল তদীয় দেবোপম পিতার সততা, সত্যনিষ্ঠা, আত্ম-সম্ভ্রম, তেজস্বিতা, সাহিত্যানুরাগ, সঙ্গীতশক্তি, বন্ধুবাৎসল্য, জিতেন্দ্রিয়তা ও অপূর্ব্ব উদারতার অধিকারী হইয়াছিলেন। তবে, সেই যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা—সে তাঁহার সম্পূর্ণই নিজস্ব সম্পত্তি, তাহা এক বিধাতা ব্যতীত তিনি আর কাহারও নিকট হইতে প্রাপ্ত হন নাই। এইজন্য, স্বয়ং কার্ত্তিকেয়চন্দ্রও শৈশবেই দ্বিজেন্দ্রলালের এই অসামান্য শক্তি ও অলৌকিক প্রতিভা লক্ষ্য করিতে পারিয়া, একদিন তাঁহার স্বজনগণের সমক্ষে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—"দ্বিজু Genius, (প্রতিভা)—আমি তাহা নহি।"

৩

মাতৃদেবী

দেবী প্রসন্নময়ী।

দ্বিজেন্দ্রলালের মাতামহকুল পুণ্যপীঠ শান্তিপুরের শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের বংশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মা'র নাম—প্রসন্নময়ী দেবী। দেবী প্রসন্নময়ীর সহোদর—৺কালাচাঁদ গোস্বামী মহাশয় অদ্বৈতপ্রভুর অধস্তন নবম বা দশম পুরুষে অবস্থিত।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় কুবের-পুত্র শ্রীমদদ্বৈত গোঁসাই বঙ্গদেশের প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। তাঁহার পবিত্র জীবন-কথা সাধারণতঃ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সুবিদিত হইলেও, এ গ্রন্থে তাঁহার কথা সংক্ষেপে আলোচিত হওয়া অনাবশ্যক নহে। বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র ও প্রতিভা সম্যক্ বুঝিতে হইলে, এই পুণ্যশ্লোক মহাত্মার কথা এস্থলে কিঞ্চিৎ বলিয়া রাখা, সম্পূর্ণ সঙ্গত ও প্রাসঙ্গিক বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

পতিতপাবন, প্রেমাবতার শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পরমারাধ্য শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একদিকে যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও মহাজ্ঞানী ছিলেন অন্য দিকে আবার তেমনই মহাপ্রাণ, ভক্তচূড়ামণি ছিলেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রাক্কালে, শ্রীধাম নবদ্বীপ বিবিধ শাস্ত্র-চর্চ্চায় সমগ্র ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরনিবাসী। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া নবদ্বীপ যেরূপ ভক্ত হিন্দুমাত্রেরই নিকটে পরম পীঠস্থান মধ্যে পরিগণিত, শান্তিপুরও তদ্রূপ অদ্বৈতাচার্য্যকে বক্ষে ধারণ করিয়া পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য হইয়াছে।

'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' প্রভৃতি ভক্তি-শাস্ত্র পাঠ করিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, কলুষহরণ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ব্বে, বঙ্গদেশের মুকুট-মণি, এই দুই পুণ্যধাম কেবলমাত্র বিরস-কঠোর বিদ্যা ও জ্ঞান-চর্চ্চায় নিতান্ত প্রাণহীন ও অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল; এবং তৎকালে এদেশবাসী অতি অসহায়ভাবে যথেচ্ছাচারের পঙ্কিল প্রবাহে আপনাদিগকে যেন একেবারেই ভাসাইয়া দিয়াছিল। এই সময়ে, সর্ব্বপ্রথমে মহাপ্রাণ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যই সম্যক্ অনুভব করিলেন যে, এই বিষয়-বিষে জর্জ্জর, মোহান্ধ দেশবাসীর উদ্ধার-সাধন করিতে হইলে, অর্থাৎ—এই ভয়াবহ ভব-রোগ বিদূরিত করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি লাভ করিতে হইলে, একমাত্র সেই অনন্যগতি, দীন-বন্ধু শ্রীভগবানের চরণ-শরণ গ্রহণ করা ভিন্ন,—এক কথায়, পরা-প্রেম বা কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করা ব্যতীত—আর কোনই উপায়ান্তর নাই। এই দিব্যজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া, মহাজ্ঞানী ও ভক্ত-শিরোমণি অদ্বৈতপ্রভু জীব-কল্যাণকল্পে মহা-তপস্যায় ব্রতী হইলেন; এবং বস্তুতঃ তাঁহার একাগ্র, সাগ্রহ আহ্বানে ও 'সঘন হুঙ্কারে'ই "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু 'কলি-কলুষ-নাশার্থ' শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন!

শ্রীচৈতন্যদেব চিরকালই অদ্বৈতাচার্য্যকে বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় ভক্ত বলিয়া প্রগাঢ় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। এমন কি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ 'অদ্বৈত আচার্য্য গোঁসাই সাক্ষাৎ ঈশ্বর' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আজীবন অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্য-মহাপ্রভুর ভক্তি ও প্রেমে তন্ময় হইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ গণ্য হইয়াছেন। যদিও শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় স্বভাব-সিদ্ধ বিনয়-বাহুল্যে শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যকে গুরুজ্ঞানে সম্মান করিতেন তবু অদ্বৈতপ্রভু শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর দাস-অভিমানেই আমরণ নিজেকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"চৈতন্য-গোঁসাই মোরে করে গুরুজ্ঞান,
তথাপি আমার হয় দাস-অভিমান !"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অতএব, একথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, অদ্বৈতাচার্য্যের মহিমা ও প্রভাবেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ; এবং তাঁহারই ইচ্ছা ও চেষ্টার ফলে, ভব-রোগ প্রতিকারতরে এই প্রাণোন্মাদী কীর্ত্তন-প্রচার।

"অদ্বৈতাচার্য্য গোসাঞী মহিমা অপার।
যাঁহার হুঙ্কারে হৈল চৈতন্যাবতার ॥
কীর্ত্তন প্রচারি' কৈল জগত-তারণ।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক পাইল প্রেম-ধন ॥"
(আদি লীলা,—ঐ গ্রন্থ।)

অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্রগণের মধ্যে অচ্যুত, জগদীশ ও গোপাল চিরকুমার বা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী ছিলেন ; বলরাম ও কৃষ্ণমিশ্র সংসারাশ্রমী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণমিশ্র-সুত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী-গোস্বামী ও দোলগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী-গোস্বামী। উক্ত রঘুনাথের পুত্র হইতেই মদনমোহন গোস্বামীবর্গ। এই মদনমোহন গোস্বামীই দ্বিজেন্দ্রলালের মাতুল-বংশের আদিপুরুষ। দ্বিজেন্দ্রলালের মাতুল-বংশ শান্তিপুরের মদনমোহনপাড়ার অধিবাসী।

দ্বিজেন্দ্রলালের মাতুল শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ গোস্বামী মহাশয় শান্তিপুরের ঐ মদনমোহনপাড়াতেই বসবাস করিতেন। তাঁহার শিষ্য-সেবক ছিল, এবং তিনি নিজে বিদ্যালয়ে পণ্ডিতি করিতেন। কালাচাঁদ পণ্ডিত মহাশয় অতি সবল-কায়, সরল-প্রকৃতি ও সুরসিক লোক ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এবং তাঁহার সোদরবর্গ সকলেই তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের জননী, পুণ্যময়ী প্রসন্নময়ী দেবী অতিশয় সরল-প্রকৃতি, স্নেহশীলা ও কোমল-হৃদয়া ছিলেন। অনুগত, আশ্রিত ও

অতিথি-সজ্জনের প্রতি তিনি সততই সেবাপরায়ণা ও মমতাময়ী ছিলেন। প্রভাব-প্রতাপান্বিত দেওয়ান-পরিবারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াও, তিনি ভ্রমক্রমে কাহারও প্রতি কোনদিন কোনরূপ কটু বা রূঢ় বাক্য ব্যবহার করিতে পারিতেন না। স্বীয় পুত্র-পরিজন হইতে আরম্ভ করিয়া তুচ্ছতম ভৃত্যটি পর্য্যন্ত তাঁহার নির্ব্বিশেষ সেবা ও যত্নে নিয়ত কৃতার্থ ও উপকৃত হইত। বস্তুতঃ, তাঁহাকে যাঁহারা জানিতেন অথবা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, তাঁহার ন্যায় কোমল-হৃদয়া মহিলা হিন্দু-ললনাকুলেও নিতান্ত দুর্লভ।

অদ্বৈত-প্রভুর বংশে জন্মিয়া, এই পুণ্যময়ী জীবনে কখনও পরনিন্দা বা পর-কুৎসা করিতে জানিতেন না। দেবোপম পূজ্য বংশে জন্মিয়া এবং কৃষ্ণনগরের সর্ব্বজন-মান্য দেওয়ান-পরিবারের একমাত্র কর্ত্রী হইয়াও, তাঁহার সরল, শুদ্ধ, অম্লান জীবনে অহঙ্কারের নাম-গন্ধও ছিল না। বাস্তবিক এই অভিমান-পরিশূন্যতা বা নিরহঙ্কারই তাঁহাকে পরের দোষ-দর্শনে বা পর-ছিদ্রান্বেষণে সম্পূর্ণ অসমর্থ করিয়া রাখিয়াছিল। দেওয়ানজী কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের পারিবারিক বন্ধু স্বর্গীয় দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের সাধ্বী পত্নী, বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের রত্নগর্ভা জননী, দ্বিজেন্দ্রলালের মাতৃদেবীর প্রসঙ্গে, তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিতেন,—"হিন্দু-স্ত্রীলোকদের মধ্যে কিছু কাল কথাবার্ত্তা হইলে, বিশেষ ভাবে পরের কুৎসা ও নিন্দাটাই প্রাধান্য লাভ করে; কিন্তু প্রসন্নময়ী অন্যের শত দোষ থাকিলেও সে সম্বন্ধে কখনও কোন উল্লেখ করেন নাই।" ইহাঁর চিন্তা ও চরিত্র এত পবিত্র ও মধুময় ছিল যে, কাহাকেও তিনি মন্দ দেখিতেন না। 'তৃণাদপি সুনীচ' হইয়া, অমানী ব্যক্তিকেও মান্য করিতে যে ধর্ম্মে অতি কঠিন ভাবে পুনঃ পুনঃই আদেশ করে সেই ধর্ম্মের প্রধান প্রবর্ত্তক শ্রীমদদ্বৈতা-চার্য্যের বংশে জন্মিয়া, শ্রীমতী প্রসন্নময়ীর পক্ষে কাহাকেও অমান্য

করা, স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী হওয়ায়, তৎকালে কৃষ্ণনগরে তাঁহার তুল্য সম্মান একমাত্র মহারাণী ব্যতীত আর কোন মহিলারই ছিল না। তবু তাঁহার স্বভাবে ও ব্যবহারে গর্ব্ব বা অহংকারের লেশ চিহ্নও কেহ কখনও দেখে নাই। এমন কি, একবার শুনিয়াছি—লোকে তাঁহাকে নিরহঙ্কার বলিয়া প্রশংসা করিলে তিনি তাঁহার পুত্রগণকে সত্য-সত্যই একদিন সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"হ্যাঁরে অহঙ্কার কাকে বলে?" কথাটা শুনিলে অবাক্ হইতে হয় বটে; কিন্তু, তাঁহার তৃতীয় তনয়, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, প্রবীণ লেখক স্বয়ং শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-লাল রায় মহাশয়ই যখন এ সংবাদটি আমাকে জানাইয়াছেন তখন আর এ সম্পর্কে অণুমাত্রও সন্দেহ করার অবকাশ নাই। বস্তুতঃ, দেবী প্রসন্নময়ী এমনই সরলা ও অমায়িকপ্রকৃতিই ছিলেন বটে। আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব,—জননীর এই অতীব দুর্লভ গুণটি তদীয় সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে আংশিকভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রসন্নময়ীকে দেখিলে বোধ হইত,—যেন তিনি আদর্শ হিন্দু-গৃহিণীর ন্যায় স্বামী-পুত্র-পরিজন ও আশ্রিত-অভ্যাগতগণের সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পাদনকল্লেই জীবন ধারণ করিয়া আছেন। স্বামী-সেবা, পুত্র-কলত্র ও পরিজনগণের পর্য্যবেক্ষণ, অতিথি-সৎকার, নিয়মিত পূজাহ্নিক-ব্রত-নিয়মাদি পালন—এই সবই তাঁহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ও ব্রত ছিল। তাঁহার বাৎসল্যভাব যে কিরূপ ছিল তাহা জানাইবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে, এ স্থলে, দ্বিজেন্দ্রলালের অগ্রজ, ভূতপূর্ব্ব 'নবপ্রভা'-নাম্নী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, শ্রদ্ধেয় 'রাঙ্গাদাদা' শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের একখানি পত্রের একাংশ হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।—

"আমাদের মাতৃদেবীর নিদ্রা বড়ই সজাগ ছিল। তিনি প্রথম রাত্রিতে

সামান্য একটু বিশ্রাম করিতেন। তাহার পরই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সময়ে নিজে উপস্থিত থাকিতেন এবং আমাদের ঘুমাইবার সময়ে সর্ব্বদাই আমাদের মাথার কাছে আসিয়া বসিতেন। আমি তখন বি-এ কি বি-এল্ পড়িতেছি,—সে সময়েও তিনি আমার খাটের কাছে দাঁড়াইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেন ও কতই না গল্প করিতেন! যদি বলিতাম, "মা, অনেক রাত্রি হইল, ঘুমাও গে যাও," তবু তিনি সেই খাটের পাশে দাঁড়াইয়া কখনও বা বাতাস করিতেন, কখনও বা তাঁহার হস্তের স্নেহময় কোমলস্পর্শে ঘুম পাড়াইতে চেষ্টা করিতেন। সকালবেলা উপরকার ঘরে পড়িতেছি, (পরীক্ষার জন্য দ্বার রুদ্ধ করিয়া)—বহু চাকর-চাকরাণীসত্ত্বেও, মা নিজে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আসিয়া খাবার খাওয়াইয়া গেলেন। কলিকাতায় পড়িবার জন্য রওনা হইবার সময়ে বাহিরের দরজায় আসিয়া সজল নয়নে দাঁড়াইতেন, আবার যখন ছুটির সময়ে বাড়ী ফিরিতাম তখন আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন। আমাদের বাড়ীর নিয়ম ছিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালেই—অর্থাৎ অন্ধকার হইবার পূর্ব্বেই বাড়ী ফেরা; যদি কোন কারণে আমাদের বাটী প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইত তাহা হইলে মাতৃদেবী বড়ই চিন্তাকুলিতা হইতেন;—দ্বিজেন্দ্র বাড়ী ফিরিয়া আসিল, আমার হয়ত ফিরিতে সামান্য বিলম্ব হইল, দ্বিজেন্দ্রকে মাতৃদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, হরু কৈ? এখনও এল না যে?" দ্বিজেন্দ্র যদিও জানেন আমি কোথায়, এবং আমার কোনই বিপদের সম্ভাবনা নাই, তথাপি মা'কে আরও একটু উতলা করিবার জন্য, যেন মাতৃস্নেহের মহিমা—তীব্র ব্যাকুলতা দেখিবার জন্য বলিতেন,—"কি জানি! রাঙ্গাদা যে কোথায়—তাঁহার তো কোন নিদর্শনই পাইতেছি না।" এই কথাতেই মা অস্থির হইয়া পড়িতেন। আমি কিঞ্চিৎ পরেই ফিরিয়া আসিলে মা আশ্বস্ত ও স্থির হইতেন, এবং তখন তিন জনের হাস্য-পরিহাস হইত। আমিও যে মাতৃদেবীকে এইভাবে উত্যক্ত করিতাম না তাহা নহে।"

হরেন্দ্রবাবু তদীয় জননীর পরিচয়-প্রসঙ্গে উক্ত পত্রেরই আর একস্থলে আমায় লিখিতেছেন,—

"অনেক মা জীবনে দেখিয়াছি, কিন্তু আমাদের মা'র মতন অমন স্নেহভরা, অমন কোমলা, সরলা, অমন সদা 'হারাই-হারাই'-ভাব আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত মাতৃদেবী—রন্ধনাদি সমস্ত কার্য্য হইতে

ছেলেদের স্কুলে যাইবার জন্য কাপড়াদি সমস্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত—কষ্ট-সাধ্য কাজ সবই করিতেন। লেখাপড়াও যে শেখেন নাই তাহা নহে। তাঁহার মাতৃভাবের বিশেষত্বই ছিল—অপরিসীম ও অপরিমেয় স্নেহ ও কোমলতা, কঠোর ব্যবহার-পরিশূন্যতা"।

প্রীতি, করুণা, সরলতা ও অমায়িকতার প্রতিমূর্ত্তি হইলেও দেবী প্রসন্নময়ীর চরিত্রে তেজস্বিতার অভাব ছিল না। পালয়িত্রী স্বয়ং মহারাণীকেও তিনি কোন দিন কোন কারণে তিলার্দ্ধ স্তুতিবাক্যে তুষ্ট করেন নাই। মাতৃদেবীর নিকট হইতে উত্তরাধিকারীসূত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল এই মর্য্যাদা-বুদ্ধি বা আত্ম-সম্ভ্রম-জ্ঞান স্বভাবতঃই লাভ করিয়াছিলেন।

এস্থলে দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাঙ্গা বউদিদি', শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সুশিক্ষিতা ভার্য্যা, শ্রীমতী মোহিনী দেবী (১৩২১ সনের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যক 'সাধক'-পত্রে) অতি সংক্ষেপে তাঁহার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীর সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথা লিখিয়াছেন তাহা মুদ্রিত করার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। বিবাহের অব্যবহিত পরে, কৃষ্ণনগরে গিয়া, শ্রীমতী মোহিনী দেবী বলেন,—

"এই দ্বিজেন্দ্রলালের আনন্দ-ভবনে যখন আমি তাঁহার সেই স্নেহময়ী জননীর কোলে বসিলাম, যখনই সেই শীতল কর-কমলের স্পর্শ-সুখ অনুভব করিলাম তখন আমার মনে হইয়াছিল—এ কি স্পর্শ! এ তো মানুষের দেহ নয়, এ কোন দেবীর স্পর্শ হইবে। সেই আনন্দরূপিণী মায়ের মুখ-নিঃসৃত অমৃতোপম মধুর কাহিনী, আজ ২৮ বৎসর শেষ হইয়া গিয়াছে, তবু মনে হয় যেন কাল শুনিয়াছি। মা সাদরে আমার মুখ তুলিয়া বলিলেন—"কেন, আমার বউমাকে কে বলেছে ফরসা নয়? আমি এমন যত্ন করব যে, তিন দিনে ফর্সা হ'য়ে যাবে। হিন্দুস্থানী খোট্টা মা ছেলেমেয়ের কি করে যত্ন কর্‌তে হয়, তা তো জানে না, তাই এমন সব ছেলেমেয়ের রং পুড়ে গেছে।" আমি ১৫ দিন তাঁর কাছে ছিলাম, নিত্য তাঁর খাওয়ানর জ্বালায় অস্থির হইয়াছিলাম।

এখনকার দিনে সাবানের শ্রাদ্ধ না করিলে লোকে ফর্সা হয় না; আমার কৃষ্ণনগরের মা কিন্তু আমায় হলুদ, সর-ময়দা ও সরষের তেল—এই চারটি জিনিষেই ফর্সা করেছিলেন।" শ্রদ্ধেয়া মোহিনী দেবী আর এক স্থলে লিখিয়াছেন,—"একদিন আমি নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগরের নানাবিধ গল্প শুনিতেছি এমন সময়ে আমার বড় ভাশুরের প্রথম ছেলে ৺সুখেন্দ্রলাল্ রায় দ্বিজেন্দ্রলালের পত্রাদি লইয়া পিতামহীর নিকট উপস্থিত, আর বাঙ্গালা সংবাদপত্রও তাহার হাতে রহিয়াছে। আমার শ্বশুরবাড়ীতে নিয়ম ছিল, বড় ছেলে সংবাদপত্র পাঠ করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে শুনাইবেন। সেই নিয়মানুসারেই আজ সংবাদপত্রও পাঠের জন্য আসিয়াছে। সুখেন্দ্র ছোট-কাকার পত্র পড়িয়া পিতামহীকে শুনাইতে লাগিলেন। প্রবাসী পুত্রের হস্তাক্ষর দেখিয়া মাতৃহৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, মা বলিলেন—"দেখি, দেখি,—আমার দ্বিজুর হাতের লেখা চিঠি আমার হাতে দে; আহা, তাঁর সঙ্গেও দ্বিজুর দেখা হ'ল না, আমার সঙ্গেও বোধ হয় হবে না।" আমি এই কথা শুনিয়া অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিলাম না। মা আমার নিকটে উঠিয়া আসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"কেন মা? ও কি, কান্না কেন? আমি কি আজই মর্‌ছি? তোমার শ্বশুর দেবতা ছিলেন, আজ যদি তিনি বেঁচে থাক্‌তেন তাহ'লে তোমার কতই না আদর হ'ত!" * * আমি শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার চরণ-ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম।"

'রাঙাদা' হরেন্দ্রবাবু বলিলেন—

"একদিন দ্বিজেন্দ্র আমার এই ভাগলপুরের বাস-ভবনে সস্ত্রীক বসিয়া আছেন, আমার স্ত্রীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহাদের উভয়ের সম্মুখেই দ্বিজুকে বলিলাম—"দ্বিজু, আমাদের মা'র সঙ্গে এখনকার মা'র তুলনা হয় কি?" দ্বিজু অমনি সতেজে, সগৌরবে, আরক্তিম বদনে উত্তেজিত হইয়া, বলিয়া উঠিলেন—"না, কখনই না।"

দেবী প্রসন্নময়ীর জীবনের শেষ অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় আমাকে একখানি পত্রে লিখিতেছেন,—

"সন্তানদিগের উপর তাঁহার স্নেহ-মমতা অত্যন্ত অধিক ছিল, রোগ একটু

কঠিন হইলে তিনি প্রতি রজনীতে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন ; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার চিত্তের প্রশান্ত ভাব ও অপূর্ব্ব দৃঢ়তা দেখিয়াছিলাম। দ্বিজেন্দ্রের যে রোগে মৃত্যু হয় তাঁহার জননীরও সেই রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। প্রথম দিন মূর্চ্ছার পর তাঁহার একবার বেশ সহজ ও প্রশান্ত ভাব ছিল। তখন তিনি বলিলেন—"তোমরা যতই আশ্বাস দাও না কেন, আমি বেশ বুঝিয়াছি, আমার এবার সারিবার কোন সম্ভাবনা নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার দ্বিজুকে ও মালতীকে (সর্ব্বকনিষ্ঠা একমাত্র কন্যা) দেখিবার ইচ্ছা ছিল। দ্বিজু বিলাতে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না ; মালতীকে যদিও তার করিয়াছ কিন্তু মরার আগে সে যে এখানে পঁহুছিবে এ আশা হয় না। বৃথা দুঃখ করিয়া আর কি করিব ? তোমাদিগকে এখন আর কিছু অনুরোধ করি না, কেবল এই বলি—আমার দেহের প্রতি মমতা করিয়া আমার জীবিতাবস্থায় ৺গঙ্গালাভের বিঘ্ন করিও না"। তার পরদিন তাঁহার পুনরায় মূর্চ্ছা হইল, আর ভাল জ্ঞান হয় নাই ; আর মাত্র দুটি দিন জীবিতা ছিলেন। তিনি পুত্রাদি আত্মীয়গণে পরিবেষ্টিতা হইয়া নবদ্বীপধামে জীবিতাবস্থায় নীত হইয়াছিলেন, এবং সেই ভরা ভাদ্রের কূলপ্লাবী পবিত্র সলিলে যখন তাঁহার দেহ আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইল, এবং "ওঁ গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম"—এই মন্ত্র তাঁহার কর্ণকুহরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল, তখন তিনি স্বর্গারোহণ করিলেন। দীর্ঘকাল-অর্চ্চিত সেই দিব্য প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। তিনি পিতৃদেবের দেহ-ত্যাগের পরে কেবলই আমাদিগকে বলিতেন—'তোরা দেখিস্, আমি এক বছরের মধ্যেই তোদের পিতার অনুগমন করিব'।"—ইত্যাদি।

পুণ্যময়ী, স্নেহময়ী, কল্যাণময়ী সাধ্বীর নিজ মুখের সে ঐকান্তিক কামনা বাঞ্ছা-কল্পতরু বিধাতা অপূর্ণ রাখিলেন না,—প্রত্যুতঃ তাহাই ঘটিল।

তাঁহার শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বীয় জননীর এই চরম কামনার কথা স্মরণ করিয়া, হিন্দু-সন্তানের পরমারাধ্য-চিরবাঞ্ছিতা, সর্ব্বকলুষ-সংহারিণী, সেই 'শ্যাম-বিটপী-ঘন, তট-বিপ্লাবিনী', 'ধূসর-তরঙ্গ-ভঙ্গা', 'ভাগীরথী, সুরধুনী গঙ্গা'র অপার মহিমার যে অতুল

স্তব-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, অতি-বড় পাষাণ প্রাণও তাহা শুনিলে অকৃত্রিম আনন্দে, গৌরবে ও ভক্তিতে যথার্থই বিগলিত হইয়া যায়!

৪

অঙ্কুর

শৈশব ও বাল্যকাল।

কৃষ্ণনগরে ভূমিষ্ঠ হইয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল শৈশব ও বাল্যকাল সেইখানেই অতিবাহিত করেন। স্বপ্ন-সুখময় শৈশবে দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকবার আসন্ন মৃত্যুর কবল হইতে অতি আশ্চর্য্যরূপে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। উপর্য্যুপরি তাঁহার জীবন যেরূপে রক্ষা পাইয়াছিল তাহাতে অদৃষ্টবাদী হিন্দু-সন্তানের মনে স্বতঃই এ বিশ্বাস জন্মে যে, মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহাকে যে মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য এ মর-সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা সম্যক্ সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত মহাকালেরও বুঝিবা তাঁহার সে জীবনের উপরে অণুমাত্রও অধিকার ছিল না। মরণ বারংবার গ্রাসিষ্ণু হইয়াও তাঁহাকে কোনক্রমে হরণ করিয়া লইতে পারে নাই। প্রেমময় ঈশ্বরের ইচ্ছাই তাঁহাকে অমোঘ আশীর্ব্বাদের মত, সশঙ্ক স্নেহে আজীবন 'আগুলিয়া' রক্ষা করিয়াছিল।

বিপদুদ্ধার।

শৈশবে একদিন—যখন মাত্র ছয় মাসের অপোগণ্ড শিশু—পালয়িত্রী ধাত্রীর ক্রোড় হইতে অতি ভয়ানকভাবে পড়িয়া-গিয়া তিনি মারাত্মকরূপে অত্যন্ত আহত হন। সেবারে তাঁহার প্রাণটা কোনপ্রকারে রক্ষা পাইল বটে; কিন্তু সেই উপলক্ষে তাঁহার মুখখানা চিরদিনের জন্য বাঁকিয়া গেল। শেষ বয়সে মুখের সে বক্রতা সহজ দৃষ্টিতে, সহসা বুঝা যাইত না; কিন্তু, তখনও একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে তাহা স্পষ্টই ধরা পড়িত। উত্তেজিত হইয়া যখন তিনি তর্ক-বিতর্ক অথবা বাক্যালাপ করিতেন,

এবং সাধারণতঃ যখন তিনি গান গাহিতেন তখন বিশেষরূপে তদীয় নিম্নোষ্ঠের বামাংশ অপেক্ষাকৃত বাঁকিয়া ও ঝুলিয়া পড়িত। সম্ভবতঃ অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

আর একবার ঢেঁকীর উপর হইতে পড়িয়া-গিয়া, একখানা হাত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। বলা বাহুল্য—কালক্রমে শিশুর এই ভাঙ্গা হাত বেশ জোড়া লাগিয়া গিয়াছিল।

খুব ছেলেবেলা হইতে তিনি দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া বহু বৎসর যাবৎ ক্রমাগত দুরন্ত যাতনা ভোগ করিতে থাকেন। যখন তাঁহার বয়স মোটে পাঁচ বছর তখন তিনি ম্যালেরিয়ায় মরণাপন্ন অবস্থায়, বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ শান্তিপুরে মাতুলালয়ে গমন করেন। ১২৭৪ সালের কার্ত্তিক মাসে,—সেই যেবারে ভয়ঙ্কর ঝড় হয় সে সময়ে—তিনি তাঁহার মাতুলালয়ে। যে কক্ষে তাঁহারা সেখানে বাস করিতেন তাহার অবস্থা আশঙ্কাকর মনে হওয়ায়, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরা মালতী ও তাঁহাকে লইয়া, তদীয় মাতৃদেবী একখানি পাল্কীতে চড়িয়া, স্থানীয় ডাক-ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলেন। পাল্কীখানি তাঁহার মাতুলালয়ে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। পাল্কীতে উঠিয়া তাঁহারা কিয়দ্দূর মাত্র অগ্রসর হইয়াছেন এমন সময়ে তাঁহারা যে বাড়ীতে এতক্ষণ ছিলেন তাহা হঠাৎ একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়া গেল। যাহাহৌক্, এদিকে তাঁহারা ডাক-ঘরে পৌঁছিয়া পাল্কী হইতে অবতরণ করিলেন। কিন্তু কি ভয়ঙ্কর! পাল্কী হইতে যেই সকলে নামিয়াছেন অমনি দেখা গেল,—তন্মধ্যে একটা ভীষণ 'গোক্ষুরা' সাপ কুণ্ডলীবদ্ধভাবে এক কোণে বেশ আরামে শুইয়া আছে! এই সঙ্কীর্ণ পাল্কীটির মধ্যে তিন-তিনটি প্রাণীর একত্র ও আকস্মিক সমাগম সত্ত্বেও, কেন যে এই জীবন্ত কালসর্পটি একটুও উত্যক্ত বা বিরক্ত হইয়া উঠিল না তাহা একমাত্র বিধাতাই জানেন!

গৃহ-পাত ও সম্ভাবিত সর্পাঘাতের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন বটে; কিন্তু, প্রাণান্তকর ম্যালেরিয়া তাঁহাকে কোনমতে মুক্তি দিল না। নানাবিধ চিকিৎসা চলিতে লাগিল; নিরুপায় হইয়া, অপরিহার্য্যরূপে ক্রমাগত কেবল রাশি-রাশি কুইনিন্ সেবন করিলেন; কিন্তু, কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। বালক ক্রমে জীর্ণ-শীর্ণ, কঙ্কালাবশেষ হইয়া গেলেন; নাসাপথে অজস্র শোণিত-স্রাব হইতে লাগিল; প্লীহা ও যকৃতে কুক্ষি-কণ্ঠা এক হইয়া পড়িল, এবং মুখমধ্যে ও কণ্ঠ-তালুতে ক্ষত দেখা দিল। বালকের অবস্থা দেখিয়া তখন কালীবাবু (ডাক্তার)—"কোন আশা নাই" বলিয়া 'সাফ্' জবাব দিলেন; এবং তাঁহার জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইয়া আত্মীয়-স্বজনগণ নীরবে অশ্রু-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রোগ-বৃদ্ধির আশঙ্কায় বালককে এতকাল কিছু খাইতে দেওয়া হইত না; কিন্তু, এখন বাঁচিবার কোন আশা নাই বুঝিয়া, আহারাদি সম্পর্কে তাঁহার অভিভাবকগণ আর কোনরূপ 'বাছ-বিচার' বা 'বাঁধা-বাঁধি' রাখিলেন না। "যে কয়দিন বাঁচিয়া আছে, মনের সাধ মিটাইয়া খাইয়া নিক্,"—সকলেরই তখন এই মত হইল। বালক তৎকালে পেট-জোড়া, সেই প্রকাণ্ড প্লীহার প্রভাবে সতত ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির। অভিভাবকগণের উক্তবিধ আকস্মিক উদারতায় প্রকৃতই যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন, এবং মনের সাধে তখন তিনি তক্র ও দধি সহযোগে পেট পূরিয়া অন্ন পথ্য করিলেন। কি আশ্চর্য্য! এতকাল এত 'কড়াক্কর' নিয়ম পালন, এত বাঁধাবাঁধি, এত ঔষধ-সেবনেও যে রোগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই,—বিধাতার অনুগ্রহে, আজ এই অবৈধ, অনিয়মিত ও অপরিমিত অন্নাহারে ও দধি-ভক্ষণের গুণে সে ব্যাধিও অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল! কলিকাতায় কিয়দ্দিন পূর্ব্বে যখন ডাক্তারের দল—ডাক্তার ল্যুকিস্ ও নীলরতন সরকার মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া,—তক্র ও দধিকে

সর্ব্বব্যাধি-মহৌষধিরূপে ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কথা-প্রসঙ্গে, একদা তখন স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালই স্বীয় জীবনের এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতাটি সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সুমধুর শৈশব কিরূপ পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার অপূর্ব্ব ও অসাধারণ প্রতিভা কোন্ অনুকূল অবস্থায় পড়িয়া, কি ভাবে, অবশেষে এতদূর স্ফূর্ত্তিলাভ করিল, সর্ব্বাগ্রে তাহারই অনুসন্ধান লওয়া আমাদের পক্ষে প্রধান প্রয়োজন। সত্য বটে—হিন্দু-সন্তানের চক্ষে এবংবিধ অসামান্য শক্তি পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সুকৃতির পরিণাম ব্যতীত আর কিছুই নহে; এবং বস্তুতঃ যদিচ এ শক্তি ও প্রতিভা বিধাতারই পরম দিব্য ও অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ তথাপি, সহজ বুদ্ধিতে ও সাধারণভাবে,—প্রথম বয়সে দ্বিজেন্দ্রলাল কোন্ কোন্ আবেষ্টন ও অবস্থার প্রভাব স্বীয় জীবনে বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন তাহা একবার এ ক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনা পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সেঝ্‌দা,' পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় (১৩২০ শালের আষাঢ়-সংখ্যক 'নব্য-ভারত'-পত্রে) লিখিতেছেন,—

"কৃষ্ণনগরে আমাদের সেই নগর-প্রান্তস্থিত উদ্যান।—অস্তগামী সূর্য্যের রাঙ্গা আভায় গাছের পাতা রাঙ্গা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী ক্ষুদ্র গাছে জমিয়া কলরব করিয়া পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছে। একটি বালক কখন বা ফল তুলিতে দুলিয়া দুলিয়া দৌড়িতেছে, কখন বা পাখীর পিছনে ছুটিতেছে। এই ক্ষুদ্র বালক আমাদের দ্বিজেন্দ্র। * * এখানে দ্বিজেন্দ্রকে দেখুন—সৌন্দর্য্য-পরিবেষ্টিত। সুন্দর ক্ষুদ্র বিহঙ্গগুলি পুষ্পবৃক্ষের উপর বসিয়া যেমন পুষ্পের মধু-পান করিত তেমনই বালক দ্বিজেন্দ্র এই উদ্যান-সৌন্দর্য্যের মধু পান করিত।" আবার, "অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রের পিতৃদেব সঙ্গীত-বিশারদ ছিলেন। * * ক্ষুদ্র বালকের সঙ্গীত-প্রিয় হৃদয় এই সঙ্গীতের উচ্ছ্বাসে স্বর্গসুখ অনুভব করিত। ইহার

উপর পিতৃদেব স্বয়ং পবিত্র মূর্ত্তিমান সৌন্দর্য্য! আকৃতি ও প্রকৃতিতে বস্তুতঃ তাঁহাকে দেবোপম না বলিলে তাঁহার প্রকৃত বর্ণনা হয় না। * * চরিত্রের পবিত্রতা অন্তর্জ্জগতের সৌন্দর্য্য। একদিকে দ্বিজেন্দ্র অন্তর্জ্জগতের ও বহির্জ্জগতের সৌন্দর্য্যের ক্রোড়ে লালিত; অপরদিকে মনুষ্য-কণ্ঠের, বাদ্য-যন্ত্রের ও বিহঙ্গের ত্রিবিধ সম্মিলিত সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা উদ্বোধিত হইয়াছিল।"

সুমধুর সঙ্গীত, ললিত সৌন্দর্য্য, পবিত্র চরিত্র,—প্রকৃতপক্ষে স্বর্গের তবে আর বাকী রহিল কি? বিধিবরে আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যকাল এমনই অপূর্ব্ব স্বর্গ-রাজ্যে লালিত ও পালিত হইয়াছিল।

কবিত্ব-শক্তি

স্বভাব-কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বাল্যকালে, ধীরে-ধীরে, যখন মাতৃ-ভাষার চর্চ্চা করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে তখনই তাঁহার ঐ সুধা-স্বপ্নপূর্ণ, ভাবময় হৃদয় হইতে সঙ্গীত-প্রবাহ যেন স্বতঃই দুর্ব্বার বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ইংরাজী ভাষায় একটা কথা আছে—"Poets are born, not made." * দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনখানি যথার্থই এ কথার যাথার্থ্য অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপন্ন করিয়াছে। বালকের অমিয়বর্ষী, কোমল কণ্ঠ তৎকালে স্ব-রচিত সঙ্গীত-ধারায় সেই স্নিগ্ধ-শান্ত, সুরম্য কানন-গৃহখানিকে সুধা-সিক্ত করিয়া-দিয়া, পত্রান্তরালবর্ত্তী, গীয়মান বিহঙ্গমকুলকে মুহুর্ম্মুহুঃ মূক ও বিস্ময়-স্তম্ভিত করিয়া তুলিত। বিমুগ্ধ, শিশু-কবি কখন শশধরকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন,—

"গগন-ভূষণ তুমি, জনগণ-মনোহারী,
কোথা যাও নিশানাথ, হে নীল নভোবিহারী"?

কভুবা, তারকার রূপে তন্ময় হইয়া গাহিলেন,

"কে বল সৃজিল তোমারে,—
কে বল সৃজিয়া, দিলরে রাখিয়া
সুদূর অম্বরে?

* "কবিরা জন্মান,—তৈয়ারি হন না"।

নিশীথে নীরবে ঝরে যে নীহার,
পবিত্র সলিলে ভিজায় সংসার ;
তুমি কি তারকে কাঁদ অনিবার
ভাসিয়া নেত্রাসারে ?"

*

* *

এই সময়ে, আট-নয় বৎসরের বালক দ্বিজেন্দ্রের অন্তর্জগতে স্বপ্ন ও সঙ্গীতের ছন্দ-স্রোত যেন বিচিত্র বীচি-বিভঙ্গে নাচিয়া-নাচিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও স্বজনবর্গের মুখে আমরা এই-সব বৃত্তান্তের সঙ্গে ইহাও শুনিতে পাই যে, এই অল্প বয়সে তিনি যখন-তখন যে-কোন বিষয়ের উপরে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন! তাঁহার তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্র বাবু একদিন বলিলেন,—"দ্বিজু, নক্ষত্রের বিষয় একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া, আমাকে গাহিয়া শোনাও।" বালক 'দ্বিজু' অমনি "মধুর ছন্দে মধুর ভাবাত্মক সঙ্গীত রচনা করিয়া, করুণ স্বরে" গাইয়া উঠিলেন,—যেন অনন্ত আকাশের আনন্দময় বিহঙ্গ! গানটি এই,—

"গভীর নিশীথ কালে নিরজনে বসিয়া,—
কে তোমরা প্রতি নিশি রহ নভ শোভিয়া ?
তপন নির্ব্বাণ হ'লে ভাসায়ে গগনতলে
নিশীথ-আঁধারে তব শোভারাশি ঢালিয়া,
কাঁদ রে আঁধারে বসি' কেন নিরজনে আসি ?
প্রভাত না হ'তে নিশি কোথা যাও চলিয়া ?
আঁধারে ও শোভারাশি সখে বড় ভালবাসি,
তাই যাই প্রতি নিশি তব সনে কাঁদিয়া।
তোমার নয়ন'পরে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে,
অবারিত চোখে মোর যায় অশ্রু ভাসিয়া।"

শৈশব হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাবও যেন একটু বিশেষভাবেই

স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছিল। সাধারণ বালকবৃন্দের মত তিনি চঞ্চল-প্রকৃতি বা চপল-মতি ছিলেন না। পল্লীজননীর সেই শ্যাম-স্নিগ্ধ, নিভৃত-নির্জ্জন ক্রোড়ে তখনই বুঝি মোহিনী প্রকৃতির সহিত তাঁহার গোপনে অন্তরের নীরব ভাব-বিনিময় চলিত। তাই, সমবয়স্ক বাল্যসঙ্গিগণ যখন বিবিধ ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া, উল্লাসে ও আস্ফালনে পাড়াটি মাতাইয়া-ফিরিত তখন বালক দ্বিজেন্দ্র জন্মভূমির তৃণাস্তীর্ণ, শ্যামাঞ্চলতলে অঙ্গ এলাইয়া, অথবা 'বিটপী-নিবিড়', ছায়াচ্ছন্ন কুঞ্জ-পাদপ-মূলে উপবেশন করিয়া, অগাধ-গভীর, প্রশান্ত অম্বরের ঐ স্বচ্ছ নীলিমা বিস্ফারিত নয়ন ছু'টি মেলিয়া পান করিতেন, কিংবা একাগ্রমনে আত্মস্থ হইয়া কবিতা লিখিতে থাকিতেন। ইংরাজ কবি Wordsworth ও Shelley (হুবার্ড্‌স্‌হুবার্থ ও শেলী) প্রভৃতি কবিকুলের শৈশব-জীবনে যে বিষাদ-ম্লান, চিন্তান্বিত প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাইত, আমাদের দ্বিজেন্দ্র-লালের বাল্য-জীবনও কতকটা সেই ধরণের ছিল। এই স্বভাব-কবি বাল্যকালে অত্যন্ত অল্পভাষী ও গম্ভীর ছিলেন।—অন্যমনে ও বিষণ্ণ ভাবে তিনি নিয়ত যেন আপনাতে আপনি নিমগ্ন থাকিতেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত—তিনি যেন কোন্ এক অজ্ঞাত লোকের অধিবাসী ; দৈবাৎ, ভ্রমক্রমে এই কোলাহল-ক্ষুব্ধ মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া পড়িয়াছেন ;—এখানে যেন কোন-কিছুরই সঙ্গে তাঁহার মনের ঠিক মিল হইতেছে না! এই হেতু, তাঁহার সেই বাল্য-রচিত সঙ্গীতসমূহের সুর বড়ই করুণ ও বিষাদমাখা। একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত, পুণ্যশ্লোক, স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

নির্জ্জনতা-প্রীতি ও বিষাদ

"এই অল্প বয়সে তোমার হৃদয়ে এমন কি বিষাদ বা দুঃখ থাকিতে পারে যাহাতে তোমার প্রায় প্রত্যেক গানেরই সুরে এমন বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়ে?"

এই সময়ে, প্রাতঃস্মরণীয় ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়, সাহিত্য-সম্রাট্ ৺বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্য-গুরু ৺দীনবন্ধু মিত্র, কবিবর ৺নবীনচন্দ্র প্রমুখ বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যরথিগণ প্রায়ই 'কার্ত্তিক-ভবনে' শুভাগমন করিতেন, এবং প্রতিবারেই বালক দ্বিজেন্দ্রের সুকণ্ঠ-সঙ্গীতে পরিতৃপ্ত ও অভিনন্দিত হইয়া ফিরিতেন।

ঔদাস্য ও ঔদাসীন্য।

শেষ জীবনে—পরিণত বয়সে যে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা যথার্থই 'ভোলানাথে'র মত বৈরাগীর মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই, এই সময় হইতেই তাঁহার জীবনে সে পরিণতির বীজ সঙ্গোপনে উপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাঁহার জনৈক পূজ্য পরমাত্মীয় বলেন,—

"শৈশব হইতে সে যেন যোগীর মত উদাসীন ছিল,—যেন কতই চিন্তানিমগ্ন!"

বিধি-বিধানে যে দিব্য, দুর্লভ প্রতিভা কোন-এক অজ্ঞাত, মহান্ উদ্দেশ্য (mission) লইয়া এ সংসারে সমুদিত, তাঁহার পক্ষে স্বীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ অনুভূতিতে তন্ময় হইয়া, নীরস, নশ্বর, এ পার্থিব ব্যাপারের প্রতি এবংবিধ উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি? নিজের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি,—এমন কি,—আপনার দেহের প্রতিও তাঁহার স্বভাবতঃ চিরদিনই একটা অযত্ন ও অবহেলার ভাব ছিল। কোথায়, কোন্ দ্রব্য কি ভাবে পড়িয়া-রহিল বা হারাইয়া-গেল সে সম্বন্ধেও যেমন তাঁহার কোন দৃষ্টি ছিল না, নিজের বেশ-ভূষা,—এমন কি, নিত্যকর্ম্ম—স্নানাহার সম্পর্কেও তিনি তেমনই লক্ষ্যহীন ও অমনোযোগী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্য-বন্ধু কলিকাতা-হাইকোর্টের সর্ব্বজন-প্রিয়, মাননীয় বিচার-পতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্য-জীবনের কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিলেন,—

"সে ছেলেবেলা থেকেই কেমন যেন একটু 'উদোমাদা', 'পাগ্‌লাটে' ধরণের ছিল। নিজের শরীর কিংবা বেশ-বিন্যাস প্রভৃতিতে তা'র আদপে কোনই খেয়াল ছিল না। কথায় যাকে 'কাছা খোলা' লোক বলে সে একেবারেই ঠিক তাই ;—হয়ত সারাটা পথ হেঁটে আমাদের বাড়িতে এসেছে, অথচ ওদিকে যে কাছাটা খুলে গিয়ে সমানে সেটা ধূলো-কাদায় লুটোচ্ছে সেদিকে দৃক্‌পাতও নেই! চুল-আঁচড়ানো একটা ব্যাপার,—সে জান্‌তই না। আমার বাবা আবার ওরকম অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতা একটুও দেখ্‌তে পার্‌তেন না ; সুতরাং যখনই তিনি দ্বিজুর সেই একমাথা, উস্কোখুস্কো, লম্বা চুল দেখ্‌তেন—অমনি বল্‌তেন "যাও, এক্ষণি গিয়ে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচ্‌ড়ে এস!" দ্বিজু চুল আঁচ্‌ড়িয়ে পরিষ্কার হ'য়ে এলে তবে তিনি তা'কে নিষ্কৃতি দিতেন। শুধু সেই ছেলে-বয়সেই যে তা'র এমনধারা স্বভাব ছিল তা নয়,—বহু বছর পরে এখানে এম্-এ পাশ করে' সে যখন বিলেতে গেল তখনো তা'র বিশেষ কোনই পরিবর্ত্তন হয়নি"।

এই ঔদাসীন্য তদীয় স্বাভাবিক সরলতারই পরিচায়ক।

দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্টনগরের 'য়্যাংলো ভার্ণাক্যুলার স্কুলে' প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পার্থিব সর্ব্ব বিষয়ে তিনি অন্যমনা ও উদাসীন হইলেও, এসময়ে তাঁহার স্মরণ-শক্তি ও মেধা অসাধারণ প্রখর ছিল। তাঁহার যখন সাত কি আট বৎসর বয়স তখন প্রায়ই তিনি পাঠ্য পুস্তকাদি হারাইয়া ও নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। একদিন তাঁহার পিতৃদেব কিছু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—

স্মরণশক্তি ও মেধা।

"দ্বিজু, বই না থাকিলে ইস্কুলে তোমাদের সাজা পাইতে হয় না?" দ্বিজু বলিলেন,—"হ্যাঁ, হয় ;—ক্লাশে সকলের (Last) নীচে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়।" শুনিয়া কার্ত্তিকেয়চন্দ্র কহিলেন,—"বেশ, তবে তাই হোক। দু'চারদিন এইরূপ দণ্ড ভোগ করিলে হয়ত তোমার চেতনা হইবে, এবং তুমি সাবধান হইতে শিখিবে।"

বালক এ কথায় যেন কিছুমাত্র চিন্তিত বা দুঃখিত না হইয়া,

তারপরেও নিয়মিত ইস্কুলে গতায়াত করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে, একদিন কার্ত্তিকেয়বাবুর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের ইস্কুল-মাষ্টারের সাক্ষাৎ হওয়ায়, চন্দ্রবাবু (মাষ্টার) নিজ হইতেই বলিলেন,—

"মহাশয়, আপনার ছোট ছেলে দ্বিজুর কি অদ্ভুত ক্ষমতা!—একদিন তা'র বই না থাকায় সে নিয়মিত Last ছিল। যখন প্রথম হইতে একে একে কয়েক ছেলের পড়া লওয়া হইল তখন আমি দ্বিজুকে বলিলাম,—"তোমার তো বই-ই নাই, তুমি আর কি ব'ল্‌বে!" দ্বিজু তদুত্তরে একটু মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, "Sir, আমার পড়া হইয়াছে।" আমি বলিলাম—"অতখানি পড়া ইহারই মধ্যে তোমার সবটা শেখা হইল? আচ্ছা, কই বল তো?" দ্বিজু অনর্গল চমৎকার মুখস্থ বলিয়া গেল। অবাক্ হইয়া গেলাম মহাশয়! এছেলেকেও আপনি বই দিতে কৃপণতা করেন!"

বলা বাহুল্য—অতঃপর আর দ্বিজেন্দ্রলালের কোনদিন পাঠ্য পুস্তকের অভাব ঘটে নাই।

শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রবাবুর ('ন্‌ব্যভারতে') প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে আমরা ঐ বিষয়ে আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনা অবগত হইয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন বোধ হয়—ইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণীতে পড়েন। একদিন তিনি আদৌ পাঠে মনোযোগ না দিয়া, আপন মনে কেবলই খেলিয়া বেড়াইতেছেন দেখিয়া, জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁহাকে ডাকিয়া, একটু তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"এখনি আমার কাছে বসিয়া তুমি ইতিহাসের এই এতখানি পড়া মুখস্থ করিয়া বলিবে।" জ্ঞানেন্দ্রবাবু জানিতেন,—সেই পাঠ অভ্যাস করিয়া আবৃত্তি করিতে অন্ততঃ তাঁহার ঘণ্টা দু'এক সময় লাগিবে। কিন্তু, ১৫।২০ মিনিট যাইতে না যাইতেই দেখেন,—'দ্বিজু' বেশ পুস্তক বন্ধ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু ইহা দেখিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন—"একি! তুমি পাঠ কণ্ঠস্থ না করিয়া, বড়

যে বসিয়া আছ ?" দ্বিজেন্দ্র অম্লান মুখে বলিলেন,—"পড়া তো হইয়া গিয়াছে !" জ্ঞানেন্দ্রবাবু তখন অবাক্ হইয়া ইতিহাসখানি হাতে লইয়া, তাঁহাকে আবৃত্তি করিতে বলিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ঠিক যেন সম্মুখে বই রাখিয়া, দেখিয়া-দেখিয়া পড়িয়া যাইতেছেন,—এমনই অনর্গল কণ্ঠস্থ বলিয়া গেলেন !

তখন বঙ্গদেশে সবে মাত্র হার্ম্মনিয়াম বাদ্য-যন্ত্রের আম্‌দানি আরম্ভ হইয়াছে। শুনা যায়—প্রথম এই যন্ত্রটি নাকি সর্ব্বাগ্রে জোড়াশাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে পদার্পণ করে। সত্য-মিথ্যা যা' হৌক্, এ কথা কিন্তু খুবই ঠিক যে, তখন তাঁহাদের মতই গণ্য-মান্য, ধনবান্ ব্যক্তিদের দু'দশ জন মাত্র এই দুর্লভ বাদ্য-যন্ত্রটির অধিকার লাভে গৌরবান্বিত হইবার সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই ভাগ্যবান্ ভদ্রলোকদের মধ্যে কৃষ্ণনগরের নেতৃস্থানীয়, সঙ্গীত-বিশারদ, আমাদের কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় অন্যতম। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন ৬।৭ বৎসরের শিশু। একদিন পিতার পাশে শয়ন করিয়া আছেন ; পিতা হার্ম্মনিয়াম বাজাইয়া, "ক্যায়সে কাট্‌টে পেয়ালা মের্ নাগরী" ইত্যাদি একটা খেয়াল গান করিতেছিলেন। দ্বিজেন্দ্র শুইয়া-শুইয়া, সেই সুরটির সঙ্গে-সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রটির উপরে জনকের অঙ্গুলি-সঞ্চালন অতি মনঃসংযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতেছিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে, কি কারণে যেন, রায় মহাশয় একবার উঠিয়া বাহিরে যান। সেই অবসরে শিশু দ্বিজেন্দ্রলাল যন্ত্রটিকে হস্তগত করিয়া, পিতার অনুকরণে, তাহার ঘাটে-ঘাটে আঙ্গুল টিপিয়া-টিপিয়া, সুর বাহির করিতে লাগিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল একমনে সেই কর্ম্মে রত আছেন এমন সময়ে, ধীর পদক্ষেপে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র সে কক্ষে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন,—'দুধের ছেলে' ঠিক সেই গানটাই আয়ত্ত করিতে চেষ্টা পাইতেছে। তিনি তখন বালককে আদর করিয়া, তাহাকে তাঁহার সম্মুখে সে গানটি আদ্যন্ত বাজাইতে আদেশ করিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুর্লভ অধিকার-লাভে উৎসাহিত হইয়া, ধীরে-ধীরে, কতকটা সেই সুরই চলনসহি ধরণে বেশ বাজাইতে সমর্থ হইলেন। বলা বাহুল্য—তনয়ের এই অদ্ভুত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া কার্ত্তিকেয়চন্দ্র হৃষ্টমনে আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ ভাবিয়াছিলেন।

আত্ম-নির্ভর ও বিবিধ।

তৎকালে কৃষ্ণনগরে একটা ছোট আদালত (Small-Cause Court) ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের বড়দাদা ৺রাজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় উক্ত আদালতের পেস্কার ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বয়স তখন ৬।৭ বৎসর। ইস্কুলের ছুটি উপলক্ষে তিনি একবার তাঁহার বড়দাদার নিকটে মেহেরপুরে গিয়াছিলেন। বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিতা, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী (দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাঁকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিতেন,) এই সময়ের কথা আমাকে লিখিতেছেন,—

"দ্বিজু ৬।৭ বছর বয়সে একবার বড়দাদা রাজেন্দ্রবাবুর কাছে মেহেরপুরে গিয়েছিল। একদিন বিকালে খুব ঝড়-বৃষ্টি হওয়ায় তাহা দেখিয়া, ছাদের উপর উঠিয়া, দ্বিজু চীৎকার করিয়া, বিবিধ ভঙ্গীসহকারে, মস্ত বড় বক্তার মত বলিতে থাকে,—"দেখ দেখ,—জল পড়িতেছে, ঝড় বহিতেছে, পাখী উড়িতেছে" ইত্যাদি। তাহার দাদা শিশুর এই অদ্ভুত বক্তৃতায় বড় মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন,—"দেখিও, এ বাঁচিয়া থাকিলে কালে নিশ্চয়ই একটা মানুষ হইবে।"

আর একদিন কোথায় যেন কা'র বক্তৃতা শুনিয়া-আসিয়া, গৃহের অনুচ্চ প্রাচীরের উপর চড়িয়া, আত্ম-শক্তিতে আস্থাবান্, এই ক্ষুদ্র বালক গৃহের ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া-আনিয়া, তাহাদের সমক্ষে বক্তৃতা দিতে প্রবৃত্ত হন। তখনও তাঁহার বয়স সাত বৎসরের অধিক নহে। সেদিন কার্ত্তিকেয় বাবুর গৃহে তদীয় বন্ধু দীন-বন্ধু ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিথিভাবে অবস্থান করিতেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের অলক্ষিতে, গৃহ-স্বামীর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় পশ্চাদ্দেশ হইতে বালকের সে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সোৎসাহে বলিয়াছিলেন,—"আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ বালক একদিন বড় লোক হইবে"। বলা বাহুল্য—ডিপুটিত্ব-নিগড়ে দায়-বদ্ধ হইয়া, পরিণত বয়সে বক্তৃতার সুযোগ না ঘটিলেও, এ ছেলে একদিন বাস্তবিকই 'বড় লোক' হইয়াছিলেন। মহাপুরুষের ভবিষ্যবাণী ব্যর্থ হইবার নহে।

লোকালয় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে, কৃষ্ণনগর শহরের এক প্রান্তে দ্বিজেন্দ্রলালদের বাস-গৃহ—'কার্ত্তিক ভবন' অবস্থিত। কার্ত্তিক বাবুর আদেশ ছিল—তাঁহার বাটীর কোন বালক বাড়ির সীমানা অতিক্রম করিয়া, বিনা আদেশে, যখন-তখন বাহিরে যাইতে পারিবে না। কিন্তু, একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের কি মনে হইল—তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী মালতীকে লইয়া, তিনি সোজা একেবারে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। লোকালয়ে গমন করিয়া, পরিশ্রান্তদেহে তাঁহারা গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন ; কিন্তু, সেই অপরিচিত স্থানে ফিরিবার পথ তাঁহার জানা না থাকায়, পথের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসরেরও কম। পথ-প্রান্তে দুইটি ক্ষুদ্র বালক-বালিকাকে ঐরূপ অসহায় অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, সেখানে অল্পক্ষণের মধ্যে বহু লোক একত্র হইল ; এবং অনেকেই তাঁহাদের পিতৃনাম, পরিচয় ও বাড়ি কোথায়, জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ দ্বিজেন্দ্রকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কিন্তু, পাছে পথ হারাইয়াছেন বলিলে ছোট বোনের কাছে অপদস্থ হইতে হয়—এই আশঙ্কায় সে সকল প্রশ্নের কিছুমাত্র উত্তর না দিয়া, তিনি ছোট বোনটির হাত ধরিয়া, দিব্য সপ্রতিভভাবে ও দর্পিত পদ-ক্ষেপে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, লোকের কাছে আপন অক্ষমতার পরিচয় দিতে অসম্মত হইলেও,

পথ আসিয়া যখন কিছুতেই তাঁহার নিকটে ধরা দিল না তখন মনে-মনে প্রমাদ গণিয়া, ছোট বোনটিকে নিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল ক্রমাগত সেই জনাকীর্ণ নগরে বৃথাই কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ তাঁহার পরিশ্রমের একশেষ হইলে, সৌভাগ্যক্রমে, কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁহাদিগকে দেওয়ানজীর পুত্র-কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিয়া, নিজেরা সঙ্গে করিয়া তাঁহাদিগকে 'কার্ত্তিক ভবনে' আনিয়া, পহুঁছাইয়া দিয়া গেলেন ; এবং সেবারের মত ছোট বোনের কাছে দ্বিজেন্দ্রলালের আত্ম-সম্মান এইরূপে অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। বাল্য হইতেই দ্বিজেন্দ্রলালের মনে আত্ম-মর্য্যাদার ভাবটি যে স্বতঃই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছিল তাহা এই সামান্য ঘটনাদ্বারাও বুঝিতে পারা যায়।

এই উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটা হাস্যকর আচরণের কথা মনে পড়িতেছে। কৃষ্ণনগর-রাজবাড়ীতে বারদোলের সময়ে যথেষ্ট ধূমধাম হইত। এক বৎসর তদীয় পঞ্চম সহোদর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্র এই উৎসব দেখিতে যান। সুরেন্দ্রবাবু তখন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পথে যাইতে-যাইতে রঘু ও ভট্টি কাব্যের শ্লোক আবৃত্তি করিতেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ভ্রাতাকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিতে শুনিয়া, নিজে নীরব থাকিতে অসম্মান বোধ করিলেন। একটা কিছু সংস্কৃত আলাপ করা চাই-ই,—এই ভাবিয়া, অগত্যা তিনিও সাগ্রহে ব্যাকরণের শব্দরূপ ও ধাতুরূপ আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলেন!

যে আত্ম-মর্য্যাদা না থাকিলে মানুষ প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য-পদবাচ্য হইতে পারে না, যে আত্ম-সম্ভ্রম প্রধানতঃ মানব-জীবনের যাবতীয় সদ্‌গুণরাশির শ্রেষ্ঠ আধার বা দুর্ভেদ্য দুর্গস্বরূপ, যে দিব্য চেতনা আছে বলিয়া, অসংখ্য ত্রুটি-প্রমাদ সত্ত্বেও, মানুষকে এ সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে,—অমৃতের তনয় বলিয়া,—আজিও চিনিয়া-লওয়া

সম্ভব হইতেছে, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে অতি শৈশবকাল হইতেই সহজাত সংস্কারের মত সে গুণটি আপনা-আপনি অতি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া উঠিল।

মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী-মহাশয় এই সময়ের উল্লেখ করিয়া, সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

"বহুদিন ধরিয়া দ্বিজু ও আমরা যেন এক পরিবারভুক্ত ছিলাম বলিয়াই দ্বিজুকে ছোট ভাই ভিন্ন অন্য কোন ভাবে দেখিবার অবসর পাই নাই। চিরদিনই তাহার সরল-সুন্দর চরিত্র ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার তাহাকে আমাদের আপনার করিয়া রাখিয়াছিল। দ্বিজুর কথায় মনে পড়ে—প্রথম তাহার গান। তখন দ্বিজু বালক মাত্র। সে গান এখনও কানে লাগিয়া আছে। দ্বিজু ও তাহার ভাই হরু দু'জনে মিলিয়া তখন গান গাহিত। প্রথম গানটি শুনি—"কর তাঁর নাম গান, যত দিন দেহে রহে প্রাণ"। গানটি তখন কি সুন্দরই লাগিয়াছিল! যদিও সদাসর্ব্বদা একত্র থাকিতাম, বিলাত যাওয়া পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু মনে পড়ে না। তাহার বিশেষত্বের মধ্যে প্রধানতঃ মনে পড়ে যে, সে কাপড়-চোপড় পরা সম্বন্ধে বড়ই অসাবধান ছিল। খাওয়া-দাওয়ার দিকে লক্ষ্য ছিল না। সময়-অসময়ের জ্ঞান ছিল না। মধ্যে মধ্যে রাতকে দিন করিয়া তুলিত। সারারাত গল্প করিবে, গান শুনাইবে, কবিতা পড়িবে,—অনেক কষ্টে থামাইতে হইত।"

বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুবাবুর দিদি, শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী আমায় আরও বলিলেন,—

"দ্বিজুদের ও আমাদের পরিবার যেন এক ও অভিন্ন ছিল। ছেলেবেলা সে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে একত্র বাস করিতে বড় ভালবাসিত। আমার ভাইদের সঙ্গে সর্ব্বদাই গাল-গল্প, খেলা-ধূলা করিত, এমন কি—কোন কোনদিন এক থালায় বসিয়া আহার পর্য্যন্তও করিত। কোন কোন দিন রাত্রে আর বাড়ি না গিয়া, সে আমার মায়ের কাছেই শুইয়া ঘুমাইত। * * বালককাল হইতে সে সত্যের প্রতি স্বভাবতঃই অত্যন্ত অনুরাগী ছিল। একটা ঘটনার কথা আমার মনে

সত্যনিষ্ঠা।

আছে, বলিতেছি।—দেখিবে যে, সে কতদূর সৎ ছিল;—এ ঘটনায় তাঁহার ভালবাসায় ভরা প্রকৃতিরও পরিচয় আছে। একদিন মেহেরপুর—গোবিন্দসড়ক-ইস্কুলের পারিতোষিক বিতরণের এক সভায়, তাহার হাত হইতে পড়িয়া গিয়া, আমাদের বাড়ির একটা শামাদান (বর্ত্তিকাধার) ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাতে তাহার ন' দাদা নরেনবাবু বলিয়াছিলেন,—"পরের জিনিষটা ভেঙ্গে ফেল্লে! যাক, যা করেছ, করেছ;—কারুর কাছে আবার একথা যেন প্রকাশ কোরো না।" তাহাতে দ্বিজেন্দ্র মনে বড় ব্যথা পাইয়া বলিলেন,—"যাঁদের আপন বাপ-মা'র মত মনে করি, এ তাঁদেরই তো জিনিষ ভেঙ্গেছি! এতে আর পরের কিসে হ'ল?" বাল্যকাল হইতেই তিনি গুরুজনের কথার বড় বাধ্য ছিলেন। সুতরাং ন'দার আদেশ মত তিনি এ ঘটনার কথা তখন আর কাহারও কাছে ব্যক্ত করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁর ন'দার এই নিষেধে ও আমাদিগকে 'পর' বলায় তাঁহার মনে এতই দুঃখ হইয়াছিল যে, তিনি আর সে সভাস্থলে একদণ্ডও অপেক্ষা না করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে চলিয়া আসেন, এবং বাড়ি আসিয়া ক্রন্দনের কারণ কি বারংবার জিজ্ঞাসিত হওয়া সত্বেও, কাহারও কাছে কিছু না বলিয়া, অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমাইয়া পড়েন।"

সত্য গোপন করিতে হইবে বলিয়া এতটুকু বালকের এই যে আন্তরিক দুঃখ—এ যে কতদূর বিস্ময়জনক ও অসাধারণ তাহা ভাবিতে গেলেও আমরা অবাক্ হইয়া যাই।

বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক লর্ড লীটন্ এক স্থানে বলিয়াছেন—"It is in trifles that the mind betrays itself." (অর্থাৎ, "ক্ষুদ্র-তুচ্ছ ঘটনাবলীর ভিতরেই আত্ম-বঞ্চনা দ্বারা মন আপনাকে আপনি ধরাইয়া দেয়"।) তুচ্ছ ও নগণ্য কাজের মধ্য দিয়া যেমন ভাবে মানুষের যথার্থ স্বরূপটি প্রকাশিত হইয়া পড়ে এমন আর কিছুতেই নহে। এই হেতু, আরও যেন কে কোথায় বলিয়াছিলেন যে, "ভদ্র সমাজের মধ্যে কে কেমন লোক যদি ঠিক জানিতে চাও ত' তাঁহার ভৃত্যের কাছে গোপনে অনুসন্ধান লও"। আমরা এই পরিচ্ছেদে দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্য-জীবনের যে সকল সামান্য-সামান্য

ঘটনার উল্লেখ করিলাম তদ্দারাই আমরা তাঁহার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় কিছু-কিছু প্রাপ্ত হইয়াছি।

অন্যান্য গুণের মধ্যে আমরা দেখিয়াছি যে, এই বালকের স্মরণ-শক্তি অত্যন্ত স্থায়ী ও প্রখর ছিল। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা বোঁধগম্য হয় যে, স্মরণ-শক্তিই প্রধানতঃ মানুষের অপরাপর স্বাভাবিক শক্তিসমূহের মূল ভিত্তি বা মুখ্য আধারস্বরূপ। কি বক্তৃতা-শক্তি, কি সঙ্গীত-শক্তি, কি কবিত্ব-শক্তি, কি অন্যবিধ উদ্ভাবনী-শক্তি,—এক স্মরণ-শক্তি ব্যতীত ইহাদের অস্তিত্ব একরূপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। মনস্বী ডাক্তার জন্‌সন এইজন্য মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—"Memory is the primary and fundamental power, without which there could be no other intellectual operation."* তাই বলিতেছিলাম—এই স্মৃতিই মানবের যাবতীয় স্বাভাবিক শক্তির অপরিহার্য্য নির্ভর-দণ্ড। বালক দ্বিজেন্দ্রলাল এই স্মরণ-শক্তিতে সবিশেষ সমৃদ্ধ ছিলেন।

স্মৃতিশক্তির আবার আমরা দুই রূপ দেখিতে পাই। এক রকম স্মৃতি আছে যাহা বড়ই নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন ও স্থবির; আর, আর-এক রকম স্মরণ-শক্তি আছে যাহা সম্পন্ন, স্বাধীন ও সচল;—ইচ্ছামত কখনও নিজেকে নিঃসহায় ও একান্ত করিয়া ফেলে, কখনও বা স্বজন-সুহৃদ্‌বৃন্দে পরিবৃত হইয়া, নানাবিধ দুর্লভ আভরণে আপনাকে অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত করিয়া তুলিতে পারে। প্রথমোক্ত স্মৃতি শুধু দৃষ্টি ও শ্রুতির অনুগমন করে,—তাহার না আছে চলিবার ক্ষমতা, না আছে উড়িবার শক্তি;—সে কেবল একাকিনী, অতি অসহায় অবস্থায়, আপনাতে আপনি আবদ্ধ হইয়া রহে। কিন্তু, আর-এক রকম যে স্মৃতির কথা বলিতেছি—সে আপন প্রত্যক্ষ

* অর্থাৎ, "স্মৃতিই সেই আদি-ভূত আদ্য-শক্তি যাহার অভাবে অন্য কোনরূপ মানসিক ক্রিয়া অসম্ভব।"

সত্তাকে সহজেই অতিক্রম করিয়া, প্রয়োজন ও ইচ্ছানুসারে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অভিব্যক্ত ও অনুভব-সিদ্ধ অনন্ত ভাণ্ডার হইতে মনোজ্ঞ ও সাদৃশ্যের সন্ধান করিয়া-লইয়া, আপনাকে নানাভাবে সম্পন্ন ও সজ্জিত করিয়া তোলে ; আবার, কভুবা নিতান্তই নিরালায় আপনাকে ছিন্ন-ভিন্ন ও বিভক্ত করিয়া-ফেলিয়া, আপনাতেই আপঁনি নিমগ্ন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোক্ত পরাধীনা স্মরণ-শক্তির সহিত আমাদের কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু, এই যে স্বাধীনতা স্মৃতি, যাহা স্বেচ্ছামত আপনাকে বিয়োগ-সংযোগের দ্বারা সতত নিঃস্ব ও সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ, ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায়—যেন ইহাই অতুল প্রভাবান্বিতা কল্পনা-কুমারীর গর্ভধারিণী জননী।

এই কল্পনা প্রতিভার প্রধান অবলম্বন। কল্পনারও আবার দুইটি প্রকৃতি। যদিও রূপই এই দ্বিবিধ কল্পনার প্রাণ তথাপি একরূপ কল্পনা আছে—যাহা ভাব ও সৌন্দর্য্য বা সঙ্গীতের দ্বারা অনুপ্রাণিত, আর এক প্রকার কল্পনা আছে—যাহা বস্তু ও বুদ্ধির দ্বারা নিয়ত নিয়ন্ত্রিত। ভাব-প্রবণ ও সৌন্দর্য্যময়ী কল্পনার বলে মানুষ এ নিখিল বিশ্ব-চরাচরে অতি অবাধেই গতায়াত করে, এবং তাহারই ফলে কালিদাস ও মাইকেল প্রমুখ কবিকুলের উদ্ভব ; আর, বস্তুগত ও যুক্তিময় কল্পনা-প্রভাবে মানুষ এই পার্থিব অসংখ্যবিধ ব্যাপারেই বিজ্ঞানানুশীলনে ব্যাপৃত রহে, এবং তাহারই ফলে নিউটান, বেকন, ডার্‌হ্বিন্‌, এডিসান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকবৃন্দের অভ্যুদয়।

অতএব, দেখা যাইতেছে—এই সংযোগ-বিয়োগ-শক্তিমতী স্মৃতি হইতে সঞ্জাত যে উদ্ভাবনী কল্পনা, তাহার সহিত ভাব ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতি থাকিলে, সে কল্পনা কবিত্বে পরিণতি লাভ করে, এবং তদ্রূপ অনুভূতি যেখানে নাই সে কল্পনা হইতে অবশ্যম্ভাবীরূপে বিজ্ঞান-প্রসূত হয়। তাই, দেখিতে পাই—এই বিজ্ঞান-গতি কল্পনার ফলে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র অভিনব, বিবিধ তত্ত্ব-সম্পদে এই পৃথিবীকে

প্রকৃতই সম্পন্ন ওসার্থক করিলেন; এবং ভাব-সৌন্দর্য্যশালিনী কল্পনাবলে, ক্ষণজন্মা মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল অপূর্ব্ব ও বিচিত্র কবিত্ব-প্রভায় এ মরসংসার ধন্য, সার্থক ও সমুদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন।

বহু বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক ক্ষুদ্র-তুচ্ছ ঘটনাবলীর ভিতর হইতে দুই চারিটি মাত্র সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে বিবৃত ও নিবেদিত হইল। এতদ্দ্বারা পাঠকবর্গ এই ক্ষণ-জন্মা কবির ভাবী জীবনের সার্থক পরিণতির একটা সুস্পষ্ট আভাস অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন, আশা করি।

অঙ্কুরেই বনস্পতির গুণরাশি নিহিত ও গুপ্ত হইয়া রহে। কবিচূড়ামণি হ্বার্ডস্হ্বার্থ'ও (Wordsworth'ও) বলেন—"The child is father of the man."* স্থূলভাবে যে কয়েকটি ঘটনা এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতেই সহৃদয় মনস্বী, চরিত্রবান্ ও কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা নীহারিকার আকারে অস্ফুট ও প্রচ্ছন্নরূপে চিনিতে পারিতেছি। সেই সারল্য, বৈরাগ্য, সত্য-নিষ্ঠা, উদারতা, আত্ম-নির্ভর, তেজস্বিতা, কবিত্ব ও স্বদেশ-প্রেম—আমরা এই বাল্য বয়সেই তদীয় জীবনে স্ফুটনোন্মুখ কোরকের কোমল লাবণ্য ও পেলব মাধুর্য্যে বিমণ্ডিত দেখিতে পাইতেছি।

---

* "শিশুই সেই পরিণত মানবের জনক!"

দ্বিতীয় পর্য্যায়

উদ্গম

বিদ্যাশিক্ষা ও ছাত্র-জীবন।

ইংরাজী ১৮৭৮ সনে (বাঙ্গলা ১২৮৫ শালে) কৃষ্ণনগর-'কলেজিয়েট্-স্কুল' হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া রোগে জীর্ণ-শীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, দশ টাকার একটি বৃত্তি লাভ করিলেন। তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজী সাহিত্যের শিক্ষক ছিলেন। সে বৎসর উক্ত বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থিগণের 'টেষ্ট্' (Test) বা 'বাছাই' পরীক্ষায় বিখ্যাত অধ্যাপক রো সাহেব ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষক নিযুক্ত হ'ন। যথাকালে পরীক্ষার্থিগণের কাগজগুলি দেখা শেষ হইলে, রো সাহেব জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে বলিলেন,—"এ ক্লাশে দ্বিজেন্দ্রলাল কোন্ ছাত্রটির নাম, আমাকে একবার দেখাইয়া দিন"। জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁহার ভ্রাতাকে দেখাইয়া দিলে, রো সাহেব দ্বিজেন্দ্রলালের সমক্ষেই বলিলেন,—"আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সঙ্গে জানাইতেছি যে, দ্বিজেন্দ্রলাল এবার যেরূপ পরীক্ষা দিয়াছেন তাহা যে-কোনও ইংরাজ ছাত্রের পক্ষেও পরম গৌরবের বিষয় হইত।"

কিন্তু, প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ইংরাজী সাহিত্য-জ্ঞান সম্পর্কে রো সাহেব এতটা উচ্চ অভিমত ব্যক্ত করিলেও, আশ্চর্য্য এই যে, কিছুকাল পূর্ব্বে অপরাপর তিনটি বিষয় অপেক্ষা ঐ ইংরাজীতেই তিনি অত্যন্ত অপরিপক্ক বা 'কাঁচা' ছিলেন। জীবদ্দশায় দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে এ কথা বহুবার আমাদের নিকটে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, আর তিনটি বিষয় অপেক্ষা এই

ইংরাজীতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা কম দখল ছিল বলিয়া, তাঁহার শিক্ষকবৃন্দের সর্ব্বদাই বিশেষ দৃষ্টি ছিল—যাহাতে তাঁহার এ অভাবটি সত্বর বিদূরিত হয়। সে সময়ে তাঁহার বড়দাদা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল রায় মহাশয় মেহেরপুর কোর্টের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। একবার এক অবকাশ উপলক্ষে তিনি তাঁহার বড়দাদার নিকটে গিয়া, কিছুকাল একত্র অবস্থান করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন,—"তিনি এই অতি অল্পকালের মধ্যে আমাকে এমনি আশ্চর্য্য কৌশলে ও বিচিত্র নৈপুণ্য সহকারে ইংরাজী ভাষায় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ করিয়া তুলিলেন যে, সেই গোড়ার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই আমি অতি অনায়াসে, নিতান্ত অস্থির শরীর লইয়া এবং তেমন মনোযোগের সহিত বেশি দিন অধ্যয়ন করিতে না পারিয়াও, পরে, এম্-এ পরীক্ষায় তবু যাহৌক একটু সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।" কেবল যে তিনি কৃতিত্বের সহিত এম্-এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা নহে,—সেই বৈদেশিক বিজাতীয় সাহিত্যে তিনি শুধুই আপন অধ্যবসায় গুণে, পরিণামে যে কতদূর পারদর্শী হইয়াছিলেন তাহা উত্তরকালে তদ্রচিত 'Lyrics of Ind' নামক খণ্ড কাব্যখানি যাঁহারা একবার পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তিনি বলিতেন,—"বড়দাদা ও সেঝ্‌দাদা (জ্ঞানেন্দ্রবাবু) আমাকে ইংরাজী সাহিত্যের অভিজ্ঞতা-অর্জ্জনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।" কিন্তু, আসল কথা, তিনি শুধু সৎশিক্ষকের গুণে ও চেষ্টায় এতটা কৃতিত্ব লাভ করেন নাই,—জীবনে জ্ঞানার্জ্জন বা উন্নতি লাভ করিবার জন্য তাঁহার নিজেরই আমরণ অচপল নিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ণ, অসীম অধ্যবসায় ছিল। শেষ জীবনে যখন তাঁহার প্রভূত প্রতিষ্ঠা ও অম্লানোজ্জ্বল যশোরাশি সমগ্র

অধ্যবসায়।

বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল তখনও যদি কোন নূতন ও অপঠিত সদ্‌গ্রন্থাদির সংবাদ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইত অমনই তাহা, যেভাবেই হোক্ হস্তগত করিয়া, অনতিবিলম্বে পড়িয়া-ফেলিয়া তবে যেন তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। অভিনব ও অনধিগত জ্ঞানার্জ্জনের জন্য প্রৌঢ় দ্বিজেন্দ্রলালের যে অদম্য আগ্রহ ও অতুল উৎসাহ দেখিয়াছি তাহা বস্তুতঃ বিস্ময়াবহ। তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত অথবা অনুরক্ত কোন বন্ধু কখনও তাঁহকে Genius (প্রতিভাশালী) আখ্যায় ভূষিত করিলে, অমনি তিনি সেই স্বভাব-সুলভ উচ্চ হাস্য করিয়া বলিতেন,—"It is another name for taking infinite pains." (অর্থাৎ,—"অন্য কথায় যাহাকে বলে, অশেষ শ্রমশীলতা বা প্রগাঢ় অধ্যবসায় !")

শৈশব হইতে ভীষণ ম্যালেরিয়া-রোগে আক্রান্ত হইয়া, ছাত্র-জীবনে তিনি একেবারে কঙ্কালাবশেষ, অস্থি-চর্ম্মসার হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই কারণে, অসাধারণ মেধা ও বঙ্গ-বিজয়িনী, মহীয়সী প্রতিভার অধিকারী হইয়াও, তিনি বি-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত আশানুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হন নাই। কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ্-এ পাশ করিয়া, তিনি বি-এ পড়িবার জন্য হুগলী-কলেজে প্রবেশ করেন। এ পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া ভিন্ন আর কোনরূপ যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে তদীয় তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রবাবু জানাইতেছেন,—

"বাল্যকাল হইতে বিলাত যাওয়া পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া জ্বরে সে ক্রমাগত ভয়ানক ভুগিয়াছিল,—কখন কখন প্রাণ-সংশয় পর্য্যন্ত হইত। তাহা না হইলে সে নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম বা দ্বিতীয় হইতে পারিত। ম্যালেরিয়া জ্বরে অত ভুগিলেও দ্বিজুর এমন মেধা ছিল যে, অতি অল্প—নাম-মাত্র শ্রম করিয়াই সে স্কুলের প্রতি পরীক্ষাতে 'ফার্ষ্ট' (প্রথম) হইয়া Prize

(পারিতোষিক) পাইত ; আর এণ্ট্রান্স, এফ্-এ, বি-এ ও এম্-এ অবলীলাক্রমে, —যেন ঠিক যাদু মন্ত্রে পাশ করিয়া ফেলিল।"

বি-এ পাশ করার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। কৃষ্ণনগর ও হুগ্‌লী প্রভৃতি ম্যালেরিয়াজীর্ণ, অস্বাস্থ্যকর স্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসায়, প্রথমতঃ কয়েকদিন একটু যেন সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু, আবার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে সেই আগেরই মত পুনঃ পুনঃ নিতান্ত নির্য্যাতিত করিয়া-তুলিল। এই ভাবে, অবিশ্রাম ভুগিয়া-ভুগিয়া, অবশেষে যখন তাঁহার জীবন একেবারে অকর্ম্মণ্য হইবারই উপক্রম করিল তখন লেখাপড়ার আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক, তিনি অগত্যা তাঁহার পিতৃদেবের আদেশে, কয়েক মাসের জন্য বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ দেওঘরে গমন করিলেন।

এই সময়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলিতে-গিয়া শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী আমায় লিখিয়াছেন,—

"দুরন্ত ম্যালেরিয়া-রোগে দারুণ কষ্ট পাইতেছিল। তা'র বাবা বলিলেন,— "দুর্গাদাস বাবুর মেয়ে—তোমার দিদির সঙ্গে তুমিও দেওঘরে যাও।" আমি, আমার মাসিমা এবং দ্বিজু,—এই তিন জনে এক সঙ্গে গিয়াছিলাম। সেইবার দ্বিজু এম্-এ পরীক্ষা দিতেছে। এমন সরল ও শিশুর মত স্বভাব ছিল যে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্রও সঙ্কোচ করিতে জানিত না,—ঠিক যেন ছোট ভাইটি! দ্বিজু রোজ প্রাতে উঠিয়াই আমার মাসিমাকে 'ঢীপ্,' করিয়া এক প্রণাম করিত, বলিত—"মাসিমাগো, আপনি বড় মহৎ! রোজ রোজ কি খাওয়ানোটাই খাওয়াচ্ছেন!"

"দেবগৃহে গমন; মাতৃভূমি ও মাতৃভক্তি ; রাজনারায়ণ বসু-মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা।

"আমরা প্রত্যহ পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতাম ; আর, সে কোন একটা পাহাড়ের উপর উঠিয়া, বসিয়া বসিয়া গাইত,—"জানিনা জননী, কেন এত ভালবাসি তোরে"! এ জননী—তাহার সেই স্নেহময়ী মাতা ও জন্মভূমি।

"এই সময়ে পূজ্যপাদ রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে তাহার প্রথম আলাপ।

বসুজা আমাকে 'মা' বলিতেন।—তাঁহার ছোট ছোট নাতি-নাতিনীরা অবাক্ হইত যে, অত বুড়া কিরূপে আমার পুত্র হইলেন! যাহা হৌক্, আমিই সেখানে দ্বিজুকে তাঁহার সঙ্গে প্রথম আলাপ করাইয়া দিই। তাহার পর তিনি সতত দ্বিজুর কাছে আসিতেন, গান-গল্প-আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত, স্নানাহার মনে থাকিত না। তাহাতে রাজনারায়ণবাবুর শ্রদ্ধেয়া পত্নী তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন,—"তোমার এখন মালা-জপ করিবার সময়; এখন কিনা ঐ সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কেবলি গাল-গল্প-গান করে, সময় কাটানো হচ্ছে"! বসুজা মহাশয় সে কথা শুনিয়া, তখনই আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন,—"সুন্দর মানুষ, সুন্দর গান ও এই সুন্দর প্রকৃতি—আমার কাছে ঈশ্বরের প্রধান দান বলে' মনে হয়"। দ্বিজু প্রিয়-দর্শন ও গৌরবর্ণ ছিল, গানে সুকণ্ঠ এবং সেই গান আবার নিজেই রচনা করিত। কাজেই রাজনারায়ণ বাবু তাহার নিজগুণে তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আমরা তখন দুই ভাই-বোনে মিলিয়া, এক সঙ্গে বসিয়া ইংরাজী কবিতা পড়িতাম, আর শেলী, বায়রণ, কীট্‌স্ হইতে অনুবাদ করিতাম। * * *"

যাহাহৌক্, ক্রমে বায়ুপরিবর্ত্তনে কথঞ্চিৎ স্বাস্থ্য-সঞ্চয় করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল পরীক্ষার মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতারা ২৬ নং সুকীয়া ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। এতকাল দুরন্ত রোগের নিষ্ঠুর তাড়নায় ও বিদেশে বাস করার দরুণ তিনি পরীক্ষার জন্য একটুও প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। এখন পরীক্ষার মাত্র এই দুই মাস বাকী থাকিতে যথাসাধ্য অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু, এম্-এ পরীক্ষার সেই রাশীকৃত পুস্তক এত অল্পকালের মধ্যে আয়ত্ত করা অসম্ভব দেখিয়া, পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্ব্বে হতাশ হইয়া তিনি জ্ঞানেন্দ্রবাবুকে বলিলেন যে, এমন অপ্রস্তুতভাবে পরীক্ষা দিলে তিনি কোন মতেই সেবারে পাশ করিতে পারিবেন না। জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁহার এই নৈরাশ্য ও অবসাদ লক্ষ্য করিয়া তদুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন,—

"সে কি দ্বিজু! তুমি 'ফেল' হ'বে কি! তা সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত

থাকতে পার, 'ফেল' তুমি কিছুতেই হবে না। তবে, হয়ত আমাদের আশানুরূপ তুমি এবারেও প্রথম বা দ্বিতীয় হ'তে পারবে না।"

জ্ঞানেন্দ্রবাবুর এই কথায় কতকটা আশ্বস্ত হইয়া তিনি সেই-বারেই এম্-এ পরীক্ষা দিলেন; এবং পরীক্ষার ফল যখন বাহির হইল তখন দেখা গেল,—দ্বিজেন্দ্রলাল সমগ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন! দ্বিজেন্দ্রলাল ইংরাজী সাহিত্যে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে একখানা (Honour'এর) সম্মানের 'সার্টিফিকেট্' (সনন্দ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শৈশবে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা যে বক্তৃতার অভিনয় করিতে দেখিয়াছি, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে, তদীয় ছাত্র-জীবনে তাহা প্রকৃতপক্ষে কয়েকবার কার্য্যেই পরিণত হইয়াছিল। যখন তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া, পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন সেই সময়ে একবার তাঁহার 'বড়্দা' রাজেন্দ্রবাবু মেহেরপুর ইস্কুলে তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে বলেন। দ্বিজেন্দ্র-লাল তাঁহার অনুরোধে বাঙ্গালায় দুইটি ও সংস্কৃতে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার প্রদত্ত সংস্কৃত বক্তৃতাটি শুনিয়া সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই—বিশেষতঃ সেই স্কুলের 'হেড্' পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ভাষা-জ্ঞান ও বক্তৃতা-শক্তি।

সংস্কৃত-সাহিত্যে এই অল্প বয়সে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি দৃষ্ট হইত। এখন ইস্কুল-কলেজের ছাত্রবৃন্দ সামান্য পাঠ্য পুস্তকে যেটুকু সংস্কৃত বাধ্য হইয়া পড়িতে হয় তাহারই নামে সাধারণতঃ আতঙ্ক প্রকাশ করেন; কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলাল এই বয়সেই পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত অনেক-বেশি সংস্কৃত সাহিত্য পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে, তাঁহার শৈশব-সখা, প্রবীণ সাহিত্যিক ও কবি, মদীয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাকে অতি-সংক্ষিপ্ত যে সংবাদটুকু জানাইয়াছেন, সাধারণের এবং বিশেষভাবে ছাত্রগণের

অবগতির নিমিত্ত তাহা আমি এস্থলে লিপি-বদ্ধ করিয়া দিতেছি।—

"১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, যখন তিনি এণ্ট্রেন্স ক্লাশে পড়িতেন তখন তিনি ক্লাশের পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক ভাল-ভাল পুস্তক পাঠ করিয়া, এই দুই ভাষাতেই খুব পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এণ্ট্রেন্স ক্লাশে পড়িবার সময়েই তিনি ভবভূতির 'উত্তররাম-চরিত', বাল্মীকির 'রামায়ণ' প্রভৃতি আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই বছর পণ্ডিতা রমাবাই বাঙ্গলাদেশে আসেন—এবং কলিকাতার সভা-সমিতিতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া কৃষ্ণনগরে যান। দ্বিজেন্দ্র নিজে চারি চরণের একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া, পাদ-পূরণার্থ শেষ চরণটি পণ্ডিতা রমাবাইকে দেন। রমাবাই সে কবিতাটুকুর যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।"

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়ে একবার কৃষ্ণনগরে তাঁহার 'সেঝ্‌দা,' প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবুর অনুরোধে বাঙ্গলায় একটি বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে কৃষ্ণনগরের পদস্থ গণ্যমান্য অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি—হাকীম, উকীল, শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন, এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ উকীল ও বক্তা ৺তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন সভাস্থলে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন;—সমাগত সকলেই তাঁহার সে অনর্গল বক্তৃতার প্রচুর প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে কৃষ্ণনগর অঞ্চলে সুবক্তা বলিয়া তাঁহার বেশ একটু প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল।

বক্তৃতা দেওয়া সম্বন্ধে এই সময়ে যে তাঁহার বেশ সুনাম হইয়াছিল তাহা নিম্ন-কথিত বৃত্তান্ত হইতেও কতকটা অনুমান করা যাইবে।—উল্লিখিত কৃষ্ণনগরে প্রদত্ত বক্তৃতার কয়েক বৎসর পরে, (অর্থাৎ—তাঁহার বিলাত-যাত্রার ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে,) যখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বা উনবিংশ, একবার অনুরুদ্ধ হইয়া, তিনি

শ্রীরামপুরে একটা বক্তৃতা দিয়া আসেন। সেবারেও বক্তৃতা শুনিয়া সকলে তাঁহার সে শক্তির সুখ্যাতিই করিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত, আমাদের সরকারী 'দাদামহাশয়' শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী বলেন,—

"দ্বিজুর সহিত আমার প্রথম আলাপ ও সাক্ষাৎ আমার বাড়িতে, দ্বিজুর বিলাত গমনের পূর্ব্বে। হেরম্ববাবুর শ্রীরামপুরে একটি বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল, তজ্জন্য আমার গৃহে বক্তৃতার স্থান স্থির করা হয়। যথাসময়ে হেরম্ববাবুর পরিবর্ত্তে এক বালক আসিয়া হাজির হইল। প্রথমে বোধ হয় কেহ চিনিতে পারে নাই, পরে কে একজন বলিল—"কৃষ্ণনগরের কাত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র,—বেশ বলে"। যাহা হউক, বক্তৃতা হইয়া গেল,—ভালই হইল। আমারই বাড়িতে বক্তৃতা হইয়াছে, সুতরাং আমার সহিত পরিচয়ও হইল। কিন্তু বালকের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় আমি আপনাকে তখন বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিতে পারিলাম না। তখন কেই বা জানিত যে, এই বালকই শেষ জীবনে আমার প্রধান সহচর হইবে এবং শেষে আমাকে এমন করিয়াই কাঁদাইয়া চলিয়া যাইবে!"

ইহার পর, সম্ভবতঃ অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকায় ও ম্যালেরিয়া কর্ত্তৃক ক্রমাগত নির্য্যাতিত হওয়ায়, এ শক্তিটির আর তিনি মোটে চর্চ্চা করেন নাই; এবং বিলাত হইতে ফিরিয়া, সরকারী (Government' এর) চাকুরী গ্রহণ করার ফলে, পরিণামে, পরে তিনি আর আদৌ বক্তৃতাই দিতে পারিতেন না। চর্চ্চা ও সাধনার অভাবে মানুষের সকল শক্তিই বিলুপ্ত বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়,—সঙ্গীত ও বক্তৃতা-শক্তির তো কথাই নাই। ইহার পরে, যতদূর জানা যায়—আর একবার মাত্র গাভর্ণমেণ্টের কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর স্বেচ্ছাচারিতা, অবিচার ও দুর্ব্যবহারের দরুণ অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া, 'Honesty is not the best policy'—'সততা সাংসারিক স্বার্থ-সাধক নহে,' * —এই বিষয়ে একটা প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদান করেন।

* শ্রদ্ধেয় জ্ঞানেন্দ্রবাবুর উক্তি হইতে সংগৃহীত।

এই বক্তৃতাটি ব্যতীত পরিণত বয়সে তিনি আর কখনও কোনও বক্তৃতা করিয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। বরং, শেষ জীবনে কোথাও যদি কখনও অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে হইত তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার যাহা-কিছু বক্তব্য তাহা তিনি লিখিয়া লইয়া-গিয়া, যথা-স্থলে প্রয়োজনমত তাহা পাঠ করিয়া-দিয়া আসিতেন।

লাজুকতা বা Shyness.

তিনি নিজে অনেক সময়ে আমাকে বলিয়াছেন যে, বাল্যকাল হইতেই তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় গম্ভীর ও লাজুক ছিলেন। এমন কি,—যখন ইস্কুলে পড়িতেন তখনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও কোনও সহপাঠী ছাত্রের সংঙ্গে পর্য্যন্ত তিনি মিশিতে বা আলাপ করিতে পারিতেন না। ইস্কুলে আসিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে আপন ক্লাসের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং আপন মনে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাইতেন ; কাহারও সঙ্গে গল্প-গুজোব, হাসি-তামাসা বা আমোদ-আহ্লাদ করিতেন না, অর্থাৎ—করিতে পারিতেন না। যদিচ ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল বলিয়া, সেই শৈশবসুলভ খেয়ালের বশে, তিনি অবশ্য বক্তৃতা দিতে যত্নবান্ হইয়া কার্য্যতঃ নিতান্ত বিফলও হন নাই তথাপি, অবকাশের অভাবে ও তদীয় জন্ম-জাত লাজুকতার (shyness'এর) ফলে, উত্তরকালে—অর্থাৎ, পরিণত বয়সে তাঁহার এই বক্তৃতা দেওয়ার শক্তি ও প্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপেই লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছিল। শেষ জীবনে, মাঝে-মাঝে, আমাদের নিকটে বাহাদুরী দেখাইবার জন্য, তাঁহার বাড়ীর বৈঠকী মজ্‌লিশে, এক-এক দিন বিশেষ গাম্ভীর্য্য ও আড়ম্বর সহকারে, কোন-একটা কল্পিত বিষয়ে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া, দু'চার ছত্র 'বাঁধি বুলি' বলিতে-না-বলিতে ভাষা ও ভাবের দৈন্যে রুদ্ধবাক্ হইয়া-গিয়া, তিনি আমাদের সমবেত উচ্চহাস্য ও বিদ্রূপের মধ্যে,

নিজেও হাসিতে-হাসিতে, অবশেষে নিরুপায় হইয়া, বসিয়া-পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন! অনেকের সাক্ষাতে তাঁহার এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া একদিন বলিলাম,—"যা পারেন না, শক্তিতে কুলায় না তা' লইয়া এমন ব্যর্থ আড়ম্বর করিতে যানই বা কেন?" তিনি সে কথার উত্তরে হাসিতে-হাসিতে বলিলেন,—"তোমরা হয়ত এখন বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌বে না, কিন্তু এক সময়ে আমিও বক্তৃতা দিতে পার্‌তাম হে!"—এই বলিতে-বলিতেই তিনি দাঁড়াইয়া-উঠিয়া, হাত-মুখ নাড়িয়া তখনই গান ধরিলেন,—

"দেখ, হ'তে পার্ত্তাম আমি নিশ্চয় বক্তাও অন্ততঃ—
কিন্তু, দাঁড়াইলেই হয় স্মরণ-শক্তি অবাধ্য স্ত্রীর মত।
আর মুখস্থ সব বুলি এ, এমন বেজায় যায় সব ঘুলিয়ে;
আর সুযোগ পেয়ে রুখে দাঁড়ায় বিদ্রোহী ভাবগুলি হে,—
তা হাজার কাশি, আদর করি দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে;
তাই রইলাম বৈঠকখানা-বক্তা আমি চটে' মোটেই তো!
তা নইলে, খুব এক ভারি—
(কোরাস্) হাঁ তা বটেই তো তা বটেই তো!"
দেখ ক্ষমতাটা ছিল নাক সামান্য বিশেষ
কেবল প্রথম একটি ধাক্কা পেলেই চলে যেতাম বেশ।
হতাম পেলে সুযোগেও বুঝি একটা যেও-সেও—
ওই কেষ্ট-বিষ্টুর মধ্যে একটা হ'তাম নিঃসন্দেহ;
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটাই আমায় দিল নাক কেহ;
তাই যা ছিলাম তাই রয়ে গেলাম আমি চটে' মোটেই তো!
তা নইলে বুঝ্‌লে কিনা—
(কোরাস্) হাঁ তা বটেই তো তা বটেই তো!"

কৃষ্ণনগরে যখন তিনি ইস্কুলের উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন সেই সময়ে, তাঁহার সতীর্থ ও ছাত্র-সহচরগণের সহযোগে, তিনি একটি 'চাদর-নিবারিণী সভা' স্থাপন করেন;

'চাদর-নিবারিণী সভা।'

এবং এই দরিদ্র দেশে, অনাবশ্যক-ভাবে যাহাতে আর কেহ অর্থ-ব্যয় করিয়া চাদর ব্যবহার না করে তজ্জন্য সবান্ধব বিশেষ যত্নপর হন। এই বালকবৃন্দের সভায় দ্বিজেন্দ্রলাল সতেজে ও আগ্রহসহকারে প্রায়ই দেশের নানাবিধ দুর্গতি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সুদীর্ঘ বক্তৃতাদি প্রদান করিতেন ; ফলে, এই ভাবে তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা ও যুক্তিপ্রভাবে, বালক-সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে অচিরে চাদর ব্যবহার একরূপ উঠিয়া গেল। ছেলেদের এই বিচিত্র আচরণে প্রথম-প্রথম বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিলেন,—কেহ-কেহ আবার বিশেষ বিরক্তও হইলেন ; কিন্তু, ক্রমে, কিছুকাল পরে যখন এ ব্যাপারের যৌক্তিকতা সকলের বোধগম্য হইল তখন অনেকে আবার তাঁহাদের পন্থানুবর্ত্তী হইয়া, চাদর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রকাশ্যে বালক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত এই সভার সদস্য-পদ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন। পরে একদিন এই দ্বিজেন্দ্রলালই তাঁহার 'নূতন কিছু কর' নামক প্রসিদ্ধ হাসির গানে—

> "ডাল-ভাতের দফা কর সবাই রফা,
> কর শীগ্‌গীর ধুতি-চাদর-নিবারিণী সভা"—

বলিয়া, এই কাণ্ডটাকে নিজেই যথেষ্ট বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু, বলা বাহুল্য—এ ব্যাপারের মূলে স্বয়ং তিনিই ইহার প্রধান প্রবর্ত্তক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

পিশাচ-দলন।

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন কলিকাতা-প্রেসিডেন্সী কলেজে এম্ এ ক্লাশে অধ্যয়ন করিতেন তখন একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা ঘটে—যাহা এই পরাধীন ও কাপুরুষ বাঙ্গালী জাতির অন্তরে চির কাল স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকার উপযুক্ত। আমরণ অকলঙ্ক-চরিত্র ও মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরে আত্ম-সম্ভ্রম বা মর্য্যাদা-জ্ঞান যে কতদূর প্রবল ও আলোপ্যরূপেই জাগরূক ছিল, এবং

তিনি নারীজাতিকে যে যথার্থ মাতৃভাবে কায়-মনোবাক্যে আজীবন প্রকৃতপক্ষে পূজাই করিয়া গিয়াছেন,—এই একটিমাত্র ঘটনা দ্বারাও তাহা আমরা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব। সেবারে চৌরঙ্গীতে,—যাদুঘরের চারিদিক্ ব্যাপিয়া, বিস্তৃত গড়ের মাঠে, সেই প্রথম 'কলিকাতা সর্ব্বজাতীয়-প্রদর্শনীর' (Calcutta International Exhibition'এর) এক বিরাট্ অনুষ্ঠান হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল এক শনিবারে, সকাল-সকাল কলেজ-ছুটির পরে, তাঁহার আর ক' একটি সহাধ্যায়ী ছাত্র-বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া, এই প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, চারিদিকে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া তাঁহারা সর্ব্বত্র দেখিয়া-বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে দেখেন—ক'একটি ভদ্রঘরের সম্রান্ত মহিলা শুদ্ধমাত্র কয়েকজন দাসীকে লইয়া প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছেন;—তাঁহাদের সঙ্গে একজনও পুরুষ অভিভাবক নাই। তাঁহাদের এই অসহায় অবস্থায় সুযোগ পাইয়া, কতকগুলা অসভ্য ও দুরাচার ফিরিঙ্গী যুবক তাঁহাদের পশ্চাৎ-পশ্চাৎ নানারূপ জঘন্য ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে-করিতে চলিয়াছে; কিন্তু, নিরুপায় মহিলাগণ তাহাদের সেই পিশাচবৎ, অভদ্র আচরণে একান্ত উত্যক্ত ও লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও,—ভয়ে, লজ্জায় ও সঙ্কোচে কিছুই বলিতে বা করিতে পারিতেছেন না। সে দৃশ্য নয়ন-পথে পতিত হইবামাত্র রমণীকুলের ভক্ত উপাসক, অসীম সাহসী দ্বিজেন্দ্রলাল ক্রোধে, ঘৃণায় ও অপমানে একেবারেই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন; এবং অগ্র-পশ্চাৎ কিছুমাত্র চিন্তা বা বিবেচনা না করিয়া, সহসা সেই স্পর্দ্ধিত কুক্কুরের দলকে একাই সমুচিত শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন। ফিরিঙ্গী যুবকেরা এই 'ভেতো' বাঙ্গালী বালকের এতদূর ঔদ্ধত্য ও আস্পর্দ্ধা দেখিয়া, তাঁহাকে প্রথমে অতি কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল; কিন্তু, তবু তাঁহাকে পশ্চাৎপদ হইতে না দেখিয়া, তখন তাহারা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে তাঁহাকে প্রহার

করিতে প্রস্তুত হইল। ব্যাপারটা এইভাবে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় গড়াইল দেখিয়া, দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গিগণ তাঁহাকে নিরস্ত করার জন্য যথাসাধ্য যত্ন-চেষ্টা করিয়াও যখন সফলকাম হইলেন না তখন, পাছে প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের ভিতরেই একটা মারামারি বা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধিলে তিনি বিপদে পড়েন—এই ভাবিয়া, তাঁহাকে লইয়া, তাঁহারা সকলে কোনমতে প্রদর্শনী-সীমানার বাহিরে চলিয়া আসিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বাহিরে আসিয়া, সর্ব্বাগ্রে গৃহে যাইবার জন্য সেই মহিলাদিগকে গাড়িতে তুলিয়া-দিয়া, প্রদর্শনীর সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া দেখিলেন,—ফিরিঙ্গী-পুরুষেরা তখন সেখানে দলে আরও 'ভারি' হইয়া, তাঁহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। 'বেগতিক' বুঝিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের সেই সব তথা-কথিত বন্ধুরা তখন আপনাপন হিত-চিন্তা করিতে তৎপর হইয়া পড়িলেন ; এবং দ্বিজেন্দ্রলালকে যুক্তি-তর্কের দ্বারা নিবৃত্ত করিতে অক্ষম হইয়া, ঝটিতি নিজ নিজ পথ দেখিয়া লইলেন! তখন শরাহত শার্দ্দূলের দুর্দ্দম বিক্রমে, দলিত ভুজঙ্গমের মত, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই 'শূকর-গো-মৃগ-মাংসে পুষ্ট', আট দশজন ফিরিঙ্গী-নন্দনের উপরে মুষ্টিযোগ প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে, তাঁহার একটি মুষ্ট্যাঘাতে উহাদের দলপতির অন্তর্নিহিত দর্পের সহিত নাসিকা বিদলিত হইয়া, সহসা প্রবল বেগে রক্ত-স্রোত বহিল ; এবং তিনি তাহারই বেগে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিতে-করিতে তখনই সর্ব্ব-দুঃখহরা ধরিত্রীর মাতৃবক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। অচিন্তিতরূপে স্বয়ং দলপতির এই আকস্মিক দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া, তখন ক্রোধোন্মত্ত সেই কাপুরুষ ফিরিঙ্গীর দল সকলে মিলিয়া, একযোগে চারিদিক্ হইতে একা ও অসহায় দ্বিজেন্দ্রলালকে আক্রমণ করিল : কিন্তু, অসীম-সাহসী ন্যায়-বীর বালক তথাপি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না;—অত জনের অবিশ্রাম, প্রচণ্ড প্রহার নীরবে সর্ব্বাঙ্গ পাতিয়াই লইতে লাগিলেন, আর নিজেও ক্রমাগত প্রাণপণ বিক্রমে

ঘুষির পর ঘুষি চালাইলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই অদম্য পরাক্রম ও অপূর্ব্ব বীরত্ব লক্ষ্য করিয়া, বহুসংখ্যক বাঙ্গালী যুবা (যাহারা এতক্ষণ ধরিয়া নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার অসীম শৌর্য্য দেখিতেছিলেন) তখন তাঁহার পক্ষে আসিয়া যোগদান করিলেন, এবং অপ্রত্যাশিতভাবে এতগুলি যুবকের দ্বারা আপনাদিগকে বেষ্টিত হইতে দেখিয়া, সেই নির্ল্লজ্জ হতভাগ্যেরা তখন নিমেষমধ্যে রণে ভঙ্গ দিয়া, যে যেদিকে পারিল, 'পৈতৃক প্রাণ' লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। বলা বাহুল্য—বালক দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বাঙ্গ তখন ক্ষত-বিক্ষত, এবং তদীয় ছিন্ন-ভিন্ন জামা ও কাপড় রক্তে ভিজিয়া গিয়া, 'লালে লাল' হইয়া উঠিয়াছে! বিধাতার ইচ্ছায় তৎকালেও যদি এই সকল যুবকেরা তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর না হইতেন ত' কে বলিতে পারে—হয়ত সেই দিনই আমরা এসংসার হইতে দ্বিজেন্দ্রলালকে চির-বিদায় দিতে বাধ্য হইতাম! যাহাহৌক, অতঃপর তিনি সেই ধূলি-ম্লান, শোণিত-সিক্ত, ক্ষত-বিক্ষত শরীরে, ধীরে-ধীরে, গৃহাভিমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন এমন সময়ে দেখিলেন,—সেই দলিত-নাসা ফিরিঙ্গী-দলপতি তাঁহাকে আবার একস্থান হইতে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিতেছেন। পরিশ্রান্ত ও আহত দ্বিজেন্দ্রলাল পুনরাহূত হইয়া, আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, অবধারিত নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য মনে-মনে প্রস্তুত হইয়া, তদবস্থাতেও আবার যুদ্ধ করিতে তাহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। কিন্তু, বলিতে আনন্দ হয়—তাঁহাকে কাছে পাইয়া, সেই ফিরিঙ্গী-দলপতি সহসা সসম্ভ্রমে হস্ত-প্রসারণ-পূর্ব্বক বিনীত অভিবাদনের সহিত তাঁহার কর-মর্দ্দন করিলেন; এবং আপনাদের লজ্জাকর, ঘৃণিত আচরণের জন্য বারংবার তাঁহার কাছে সানুনয়ে ক্ষমা-ভিক্ষা করিয়া, তাঁহার অসাধারণ তেজস্বিতা, সৎসাহস ও আদর্শ নৈতিক বলের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে সম্মানের সহিত বিদায় দিল। ক্ষণজন্মা দ্বিজেন্দ্রলালের অমূল্য জীবন কি যে

অপূর্ব্ব ও দুর্লভ উপাদানে গঠিত ছিল,—তিনি যে মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া,—এই বাঙ্গালীজাতির মধ্যে জন্মিয়াও, প্রকৃত দেব-পদবাচ্য ছিলেন তাহা তদীয় জীবন-প্রভাতের এই-সব অপার্থিব, দিব্য দ্যুতিচ্ছটা দেখিয়া কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়।

"আর একবার তাঁহার একটি সমবয়স্ক সুহৃদের সঙ্গে তিনি ট্রামে করিয়া 'ইডেন' উদ্যানে বেড়াইতে যাইতেছিলেন। সে সময়ে কলিকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রামের প্রচলন হয় নাই,—অশ্বের দ্বারাই ট্রাম চালিত হইত। ট্রামে উঠিয়া তাঁহারা দুইজনে পাশাপাশি যে বেঞ্চিতে বসিলেন, ঠিক তাহারই সম্মুখের বেঞ্চিতে একজন সাহেব বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে, তাঁহারা উভয় বন্ধুতে অন্যমনস্কভাবে কথা-বার্ত্তা বলিতেছেন এমন সময়ে, সেই শ্বেত-চর্ম্ম ব্যক্তি—কি ভাবিয়া জানিনা—তাহার সেই কর্দ্দমাক্ত বুট-মণ্ডিত, দক্ষিণ পদটি দ্বিজেন্দ্র ও তদীয় বন্ধুর মধ্যে যে অতি অল্পমাত্র ব্যবধানটুকু ছিল তাহারি উপরে উঠাইয়া-দিয়া, একান্ত অবজ্ঞাভরে, দশন-নিপিষ্ট 'সিগারে'র ধূমোদগীরণে মনোনিবেশ করিলেন। সাহেবের এই 'বে-আদপী' ও স্পর্দ্ধা দেখিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমতঃ তাঁহাকে সে স্থান হইতে পা'খানা সরাইয়া-লইতে ও নামাইয়া-রাখিতে বারদ্বয় অনুরোধ করিলেন; কিন্তু, তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করা দূরে থাকুক, সাহেব যখন অত্যন্ত ঘৃণা ও তাচ্ছীল্য প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে অতি মধুর কণ্ঠে 'নিগার' আখ্যায় অভিহিত করিল তখন স্বাধীনচেতা দ্বিজেন্দ্রলাল আর সহ্য করিতে না পারিয়া, তড়িৎবেগে দণ্ডায়মান হইয়া, সাহেবের চরণখানি এক পদাঘাতে বেঞ্চী হইতে নীচে নামাইয়া-দিলেন, এবং সদর্পে তাঁহাকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সাহেব সম্ভবতঃ এই প্রকৃতির 'নিগারে'র ইতিপূর্ব্বে আর কখনও পরিচয় পান নাই। সুতরাং, তিনি আর এক্ষেত্রে কোনরূপ বাহুল্য ব্যবহার বা 'বাড়াবাড়ি' করা নিতান্ত অবিধেয় বিবেচনা করিয়া,

ট্রামের আশ্রয় নীরবে বর্জ্জন পূর্ব্বক, চরণ-শকটের শরণাপন্ন হওয়াই সর্ব্বথা শোভন, নিরাপদ্ ও সঙ্গত স্থির করিলেন। আপন বাহাদুরি কাহারও নিকটে জারি করা সম্পূর্ণরূপে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল ; এইজন্য, এই কৌতুককর ঘটনাটিও বহু বৎসর যাবৎ কেহ জানিতে পারে নাই। কিন্তু শেষে, এই ব্যাপারের বোধ হয় প্রায় বিশ বৎসর বাদে, একদিন শ্যামবাজারের এক ট্রাম-গাড়িতে, 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা যতীশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় কি-এক বিশেষ কারণ বশতঃ, একজন সাহেবকে খুব 'উত্তম-মধ্যম, প্রদান করেন ; এবং সেই কথা দ্বিজেন্দ্রলালের কর্ণ-গোচর হইলে তিনি কথা-প্রসঙ্গে এই ঘটনাটির বিষয় আমাদের নিকটে সেদিন নিজেই ব্যক্ত করিয়া, যতীশবাবুর সৎসাহসের প্রচুর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাব-কবি ছিলেন। নিতান্ত শৈশব কাল হইতেই তদীয় কবিত্ব-শক্তি অতি আশ্চর্য্যরূপে উন্মেষিত হইয়া উঠিয়াছিল। কৃষ্ণনগর ইস্কুলে যখন তিনি তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র,—বয়স দ্বাদশ বর্ষের বেশি নহে,—সেই সময় হইতেই তিনি নিয়মিত কবিতা ও গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে বলিতেছেন,—"১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি গান রচনা করিতাম। ১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্য্যগাথা' নামকএকখানি গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়।" বাল্যকাল হইতে তাঁহার স্বভাবে যে একটা স্বাবলম্বনের ভাব, একটা স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ববোধ—আপনা হইতে স্বতঃই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল তাহা তদ্রচিত এই সকল কবিতা ও সঙ্গীতের ভাবের প্রতি একটু মনোযোগ দিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। যে সময়ের ও যে দেশের কবিতায় ও সঙ্গীতে সর্ব্বাপেক্ষা

'আর্য্যগাথা,—১ম ভাগ'—প্রচার ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার্জ্জন।

প্রেমেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়, তৎকালে সেই দেশের 'আব্-হাওয়ায়' জন্মিয়া ও বর্দ্ধিত হইয়া, এই বালক-কবি তদীয় কবিতায় ও গানে সর্ব্বথা একটা অভিনব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তদীয় বাল্যকালে রচিত এই সকল সঙ্গীত 'আর্য্যগাথা' (১ম ভাগ) পুস্তকে প্রকাশিত করিবার সময়ে, উহার ভূমিকায় লিখিতেছেন,—"যাঁহারা একমাত্র মনুষ্যপ্রেমগীতকেই গীত মনে করেন, 'আর্য্যগাথা' তাঁহাদিগের জন্য রচিত হয় নাই এবং তাঁহাদের আদর প্রত্যাশা করে না।" এই সঙ্গীতগুলি পাঠ কিংবা শ্রবণ করিলে, এই শিশু-কবির অন্তরে,—সেই জীবন-প্রভাতে, —স্বদেশ-প্রেম যে কতদূর স্বাভাবিক ও স্পষ্টভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া, বাস্তবিক বিস্মিত হইতে হয়। একদিন যাঁহার দেশাত্ম-বোধের মহামন্ত্রে সমগ্র বঙ্গদেশ উন্মত্ত, উদ্বুদ্ধ ও আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছিল,—এই বাল্য বয়সেই তাঁহার প্রাণে সেই দিব্য সঞ্জীবনের অঙ্কুর অল্পে-অল্পে উদ্গত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। 'আর্য্য-গাথা'য় 'আর্য্যবীণা'র দ্বিতীয় গানে মাতৃপূজার মহাপুরোহিত দ্বিজেন্দ্রলাল মর্ম্মন্তুদ বেদনায় বলিয়াছিলেন,—"যতদিন না দুঃখিনী মাতৃভূমির এই দুঃখ, দৈন্য ও হীনতা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় ততদিন ভারতবাসীর মুখে প্রেম-সঙ্গীত ভাল দেখায় না।" কি বজ্রগর্ভ, মর্ম্মান্তিক ধিক্কার! এ বইখানির বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য-বিবৃতির এ স্থান নহে,—স্থানান্তরে যথাকালে আমরা সে সম্পর্কে কর্ত্তব্য-পালনে প্রয়াস পাইব। এক্ষণে, এস্থলে শুধু এইটুকুই বলা আবশ্যক যে, যে বৎসর দ্বিজেন্দ্রলাল হুগলী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন সেই বৎসরে,—অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৮২ সনে,—এই-সব সদ্ভাবপূর্ণ, প্রাণোন্মাদী ও সুমধুর সঙ্গীত-সমষ্টি 'আর্য্য-গাথা,' 'প্রথম ভাগ' নামে তিনি মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া তৎকালীন সাহিত্য-সমাজে বিশেষভাবে প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন।

অণুমাত্রও অত্যুক্তি না করিয়া, এ কথা আজ মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করা যাইতে পারে যে, গীতি-কাব্য হিসাবে এই পুস্তিকাখানি তৎকালে বঙ্গসাহিত্যে যে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, অদ্যাপি বঙ্গীয় কোন কবির প্রাথমিক বাল্য-রচনা তদ্রূপ সমাদর ও সম্মান লাভ করিতে পারে নাই। 'আর্য্য-গাথা'-প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে, সে সময়ে এ দেশের যাবতীয় প্রধান-প্রধান সমালোচক ও সংবাদপত্রসমূহ সমস্বরে এই নবীন কবিকে সাদর-সম্মানে অভ্যর্থিত ও অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

এই সময়ে 'নব্যভারত', 'আর্য্য-দর্শন', 'বান্ধব' প্রভৃতি এ দেশের শ্রেষ্ঠ ও সভ্যজন-প্রিয় মাসিক পত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল মধ্যে-মধ্যে প্রবন্ধ ও কবিতাদি লিখিতেন।

কিন্তু, ইহার পরে, এম্-এ পাশ করিয়া, বোধ হয়—প্রায় দশ বৎসরকাল যাবৎ সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমরা আর তাঁহার কোন সন্ধান পাই না। সম্ভবতঃ এই সুদীর্ঘ দশ বৎসর কাল তিনি প্রথমতঃ শারীরিক অস্বাস্থ্যবশতঃ ও দ্বিতীয়তঃ অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকার দরুণ, প্রকাশ্যে আর বঙ্গভাষায় কোন গ্রন্থাদি রচনা বা প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই।

যাই হৌক্, ইংরাজী ১৮৮৪ শালে দ্বিজেন্দ্রলাল এম্-এ পাশ করিয়া, পুনরায় সেই প্রাণান্তকর ম্যালেরিয়ায় যৎপরোনাস্তি যাতনা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল রায় মহাশয় মধ্য-প্রদেশে ছাপ্‌রা জেলার র‍্যাভেলগঞ্জ নামক স্থানে হেড্‌ মাষ্টারী করিতেন। আশৈশব রোগ-জীর্ণ, অবসাদ-নির্জ্জীব দেহখানি এতদিনেও কিছুমাত্র সুস্থ ও সবল না হওয়ায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন সেই র‍্যাভেলগঞ্জ-ইস্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া, কিছুকাল সেখানে গিয়া তাঁহার দাদার সহিত একত্র অবস্থিতি করেন। কিন্তু, শিক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ায়, অতি

কৃষিবিদ্যা-শিক্ষার্থ সরকারী বৃত্তি-লাভ।

অল্পকাল—অর্থাৎ ঠিক দুই মাস পরে—গাভর্ণমেন্ট্ তাঁহাকে জানাইলেন যে সে বৎসর এম্-এ পরীক্ষায় যিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন তিনি সরকারী বৃত্তি লইয়া কৃষি-বিদ্যা-শিক্ষার্থ বিলাত যাইতে প্রস্তুত নহেন ; অতএব, যদি এ বিষয়ে ইচ্ছুক হ'ন ত' সরকার বাঁহাদুর তাঁহাকেই ব্যয় দিয়া বিলাতে পাঠাইতে সম্মত আছেন। এ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, পিতা-মাতার পরম ভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের অনুমতি-প্রাপ্তির আশায়, র‍্যাভেলগঞ্জ-ইস্কুলের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে কিছুকালের ছুটি লইয়া, কৃষ্ণনগরে তদীয় জনক-জননীর চরণোপান্তে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল গাভর্ণমেন্টের এই অনুরোধ-লিপি পাওয়া অবধি বিলাত-যাত্রার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন ; কিন্তু, কি উপায়ে পিতামাতার সম্মতি সংগ্রহ করিবেন, সর্ব্বাগ্রে তখন তাঁহার মনে সেই সমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী হইয়া-উঠিল। অতঃপর, এইভাবে কিছুকাল ইতস্ততঃ করার পর, একদিন তিনি তাঁহার পিতার নিকটে গিয়া, সাহসে ভর করিয়া, গাভর্ণমেন্টের প্রস্তাব ও নিজের মনোগত আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। উদারমতি কার্ত্তিকেয়চন্দ্র কিয়ৎকাল গম্ভীর মুখে কি-যেন চিন্তা করিয়া, পরে পুত্রকে বিলাত-গমনের সুবিধা ও অসুবিধার সকল কথাই স্পষ্টতঃ বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন। বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া-আসিলে, তাঁহাকে যে সকল সামাজিক ক্ষতি ও অসুবিধা অনিবার্য্যরূপে ভোগ করিতে হইবে তাহা সরলভাবে জানাইয়া-দিয়া, অবশেষে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিলাত-যাত্রায় তাঁহার নিজের যে কোন অমত নাই তাহাও বলিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ভাবে, অতি সহজে জনকের আদেশ লাভ করিয়া আনন্দোৎফুল্ল হইলেন বটে ; কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁহার সেই স্নেহময়ী জননীর নিকটে তাঁহার কিংবা ভ্রাতৃগণের কোনরূপ প্রলোভন বা যুক্তি কিছুমাত্র কার্য্যকর হইল না ; —তিনি

তাঁহার এই বড়-আদরের, 'কোল-পোঁছা' ছেলেকে সেই 'সাত সমুদ্র তের নদীর পারে', অসহায়ভাবে—একাকী পাঠাইতে কোন মতে, কিছুতেই রাজি হইলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন আর কি করেন? উপায়ান্তর না দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যে মায়াময়ীর মন এতক্ষণ কোন যুক্তিতে বিন্দুমাত্রও প্রবোধ মানে নাই, তিনি যখন তাঁহার অপর পুত্রগণের মুখে শুনিলেন যে, সেই স্বাস্থ্যকর, 'সুসভ্য' দেশে কিছু দীর্ঘকাল থাকিলে, তাঁহার দ্বিজু অচিরে সকল দুর্ভোগ কাটাইয়া, সেই ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার কবল হইতে একেবারেই অব্যাহতি লাভ করিবেন তখন সেই একটি-মাত্র কথায়ই আশ্বস্ত হইয়া, পুত্র-গতপ্রাণা জননী তাঁহাকে বিদায় দিতে স্বীকৃত হইলেন; এবং বলিলেন—"তা, যাক্,—না হয় একবার বেড়িয়ে আসুক।" মত দিলেন বটে; কিন্তু, তখনই আবার, কে জানে কোন্ অজ্ঞাত ইঙ্গিতে শঙ্কিত ও বিহ্বল হইয়া, বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে, তোরা বল্‌ছিস্ বটে; কিন্তু, বিলেত গেলে, এ জীবনে আর যে আমি ওকে দেখ্‌তে পাব, আমার মন তা বলে না!" সকলে তখন ভাবিয়াছিলেন যে, 'সদা-শঙ্কী' স্নেহের আধিক্যেই বুঝি—মা আজ এম্‌নই-সব বাজে কথা কহিতেছেন। কিন্তু, দুইটি ক্ষুদ্র বর্ষ অতীত হইতে-না-হইতে সকলে দেখিলেন,—সতীর অন্তরের এই আকস্মিক আকুলতা একটুও অমূলক বা নিরর্থক নহে। আহা,—ফিরিয়া আসিয়া, ইহলোকে সত্যই তাঁহার সঙ্গে মাতৃভক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের আর একটি বারের তরেও চাক্ষুষ সাক্ষাৎ ঘটিল না!

জ্ঞানেন্দ্রবাবু ভ্রাতার বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

বিলাত-যাত্রা।

"বিদায়-রাত্রিতে জননী দেবী দ্বিজুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে সমুদায় রাত্রি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দ্বিজু শেষ রাত্রিতে অন্তঃপুরে জননীর চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া

বিদায় হইলেন। তখন জননীদেবী আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। দ্বিজু বাহিরে আসিলেন। সেখানে পিতৃদেব গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। দ্বিজুর দ্রব্যাদি বাঁধাইয়া দিতেছেন। অন্তঃপুরে জননী কাঁদিতেছেন। পিতৃদেব দুঃখে বা শোকে কখন অধীর হইতেন না, কেবলমাত্র সংযত গম্ভীর ভাব ধারণ করিতেন! সেই রজনীতে স্তিমিত দীপালোকে আমরা সকলে দ্বিজুকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম। দ্বিজুর দ্রব্যাদি বাঁধা হইয়া গেল। দ্বিজেন্দ্র পিতৃদেব-চরণে তাঁহার মস্তক অবনত করিয়া তাঁহার চরণধূলি লইয়া বিদায় হইলেন। পিতা পুত্র-বিদায়ের সময়ে একটিও কথা বলিতে পারিলেন না। পিতার বুঝি কেমন মনে হইয়াছিল যে, দ্বিজুর সহিত এই শেষ দেখা! তাঁহার এখন একে অধিক বয়স, তাহার উপর তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল।"

"আমি সেই শেষ রাত্রির পরিম্লান চন্দ্রের অস্ফুট জ্যোৎস্নায়, দ্বিজুকে লইয়া বগুলা ষ্টেশনে যাইবার জন্য শকটে উঠিলাম। কলিকাতায় আসিয়া দ্বিজু যে জাহাজে যাইবেন, তাহাতে কোন বাঙ্গালী যাইতে পারেন কিনা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। ৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন—"আমি অন্য জাহাজে যাইব।" তাহার পর বিলাতে দ্বিজুর জন্য পরিচয়-পত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলাম। মাননীয় রো সাহেব দ্বিজু ও আমাকে বেশ জানিতেন। তাঁহার নিকট যাইয়া, দ্বিজুর জন্য বিলাতে পরিচয়-পত্র ও উপদেশ লইলাম। তিনি কি বলিয়াছিলেন তাহা আমার ঠিক মনে নাই। কেবল মনে আছে যে, তিনি বলিলেন, "ইংলণ্ডে বিদেশীর পক্ষে হোটেল ইত্যাদি স্থানে 'harpies' আছে। দ্বিজেন্দ্র তাহাদের হস্তে যাহাতে না পড়েন তাহার জন্য বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। দ্বিজেন্দ্রকে ইংলণ্ডে তত্ত্বাবধান করিবার জন্য আমার এক সহোদরকে পত্র দিতেছি",—এই বলিয়া একখানি পত্র দিলেন এবং তাঁহার ভগিনীর কথাও বলিলেন। জাহাজ ছাড়িবার দিবস আমি, ভগিনী মালতীদেবী, আমার অগ্রজ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রলাল রায় মহাশয় এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রভৃতি দ্বিজেন্দ্রকে জাহাজে উঠাইয়া দিবার জন্য গঙ্গাতটে যাইলাম। দ্বিজু জাহাজে উঠিল, জাহাজ ছাড়িল। দ্বিজু তীরের দিকে, আমরা জাহাজের দিকে তাকাইয়া থাকিলাম। ক্রমে জাহাজ অদৃশ্য হইল।"

দ্বিজেন্দ্রলালের গুণ-মুগ্ধ বন্ধু, প্রভূত বিদ্বান্ ৺লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই-সি-এস্, মহাশয় আমাকে লিখিয়াছিলেন,—

"কথা হ'তে হ'তে একদিন দ্বিজু বলিলেন,—যদিও তাঁর বিলাত যাবার জন্য আন্তরিক আগ্রহ ও Determination (সঙ্কল্প) ছিল, তবু বাড়ি থেকে রওনা হবার দিন, অকারণ তাঁর মন হঠাৎ কেন যেন বেঁকে বস্‌ল,—কিছুতেই আর যেতে চায় না। বাড়ির সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার বেলা এমনি হ'ল যে, যদি কোন Unforeseen circumstances'এ করে' (অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ঘটনাচক্রে) তাঁর তখন যাওয়া না হয়, যেন তিনি উদ্ধার পান। তিনি বল্‌লেন, প্রবল ইচ্ছার এমন নির্জ্জীব স্থবিরতা-প্রাপ্তি তাঁর জীবনে আর কখনও হয়নি। যাই হোক, 'হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে' যায়!' তাঁরও বিলাত যেতে হ'ল, এবং ২।৩ বছর যেতে না যেতে সেখানে তাঁর পিতা-মাতার মৃত্যু-সংবাদ শুন্‌লেন। এই ব্যাপারটা তাঁর মনে এতই strike (আঘাত) করেছিল যে, তিনি শেষ বয়স পর্য্যন্ত সত্যি সত্যি বিশ্বাস কর্‌তেন যে, মানুষের মনের উপরে সময়ে সময়ে—অবস্থাবিশেষে ভাবী অমঙ্গলের ছায়াপাত হ'য়ে থাকে। দেখুন,—তাঁর মত উচ্চ-শিক্ষিত strong-minded ও cultured (দৃঢ়-মনা ও সুসংস্কৃত বা সুসভ্য) লোকও কুসংস্কারের মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি।"

যাহাহৌক, অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল সরকারী বৃত্তি লইয়া সেই বৎসরেই ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন; এবং যে মুহূর্ত্তে এই অজ্ঞাত ভবিষ্য-জলধির বক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-তরণী নবোৎসাহে, বিচিত্র নর্ত্তন-কল্লোলে ভাসমান হইল সেই শুভক্ষণে, অলক্ষ্যে রহিয়া, ত্রিদিব হইতে দেবতাবৃন্দ তাঁহার মস্তকে স্নেহাশীষ-পুষ্পরাশি বারবার বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐহিক স্বাধীনতার জন্মভূমি, পাশ্চাত্য সভ্যতার লীলাস্থল, বিবিধ জ্ঞান ও কর্ম্মের বিহার-কেন্দ্র ইংলণ্ডে অবস্থান করার ফলে, জীবনে তাঁহার যে বিচিত্র ও অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল, বলা বাহুল্য—তাহারই সার্থক পরিণাম আজ এ বঙ্গদেশকে বিবিধ প্রকারে উন্নত ও উপকৃত করিয়া তুলিয়াছে। যথাস্থলে প্রসঙ্গতঃ এ সম্বন্ধে সবিস্তার বিবরণসমূহ এই গ্রন্থেই ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইবে।

২

বিলাত-যাত্রা ও প্রবাসে শিক্ষা-লাভ

একখানি জাহাজে একাকী তিনি সেই অজানা দেশের উদ্দেশে অকূল পাথারে ভাসিয়া চলিলেন। তিনি ছাড়া সে জাহাজে আর একজনও বাঙ্গালী ছিল না। একাকী এই ভাবে, ষ্টীমারে যাইবার সময়ে, মধ্যে-মধ্যে, তিনি সহানুভূতিশূন্য, বিদেশী সাহেবগণের দ্বারা যে বিরক্ত ও উত্যক্ত হইতে বাধ্য হন নাই, এমন নহে। বিলাত-যাত্রা ও পরে বিলাতে অবস্থান সম্পর্কে তিনি তৎকালে যে সকল পত্র নিজে লিখিয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষ পাঠকবর্গের কৌতূহল-নিবৃত্তির নিমিত্ত আমরা এস্থলে মুদ্রিত করিয়া দিলাম। পাঠক ইহা হইতে তাঁহার বিলাত-প্রবাসের বহুবিধ সংবাদ অবগত হইতে পারিবেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সেঝ্‌দা' জ্ঞানেন্দ্রবাবু ও 'রাঙ্গাদা' হরেন্দ্রবাবু উভয়ে একযোগে এই সময়ে কলিকাতা হইতে 'পতাকা' নামে একখানি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক-পত্র প্রচারিত করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের লিখিত এই পত্রগুলির অধিকাংশ 'পতাকায়'—'বিলাত প্রবাসী' নামে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে পাঠকবর্গ দ্বিজেন্দ্রলালের তৎকালীন গদ্য-রচনা-প্রণালী, স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম, তেজস্বিতা, স্পষ্টবাদিতা, বহুবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক মতামত, এবং বিলাতের নানা স্থানের ও অধিবাসিবৃন্দের বিবিধ বর্ণনাদি জ্ঞাত হইবার অবকাশ পাইবেন। বলা বাহুল্য—তল্লিখিত এ সকল পত্র আধুনিক সাহিত্যামোদী ব্যক্তিগণের নিকটে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অভিনব বলিয়া বিবেচিত হইবে।

বিলাতের পত্র

(ক)

২রা কার্ত্তিক, ১২৯২।

যাত্রা।

"জাহাজ ছাড়িল। যতক্ষণ তোমাদিগকে তীরে দেখা গেল, ডেকে দাঁড়াইয়া তোমাদের দিকে নিস্পন্দ নয়নে চাহিয়া রহিলাম। যখন আর তোমাদিগকে দেখা গেল না, তখন ডেকের মাঝখানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। প্রিয় মাতৃভূমি, প্রিয়তর বন্ধুবর্গ, প্রিয়তম পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী ত্যাগ করিয়া, একাকী অসহায় অবস্থায় কোথায় যাইতেছি?—মনে করিয়া হৃদয় চঞ্চল হইতে আরম্ভ হইল, উচ্ছ্বাসময়ী চিন্তায় প্রাণ উদ্বেলিত হইতে লাগিল। অতীতের সুখময়ী স্মৃতি, বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ ঘটনা, ভবিষ্যতের আঁধারময়ী আশা ও অনিশ্চিততায় মন দোলায়িত হইতে লাগিল। উদ্বেগ-সন্তাড়িত হৃদয়ে, বিষাদ-প্লাবিত অন্তরে, কখন বা শূন্যমনে, লক্ষ্যহীন নয়নে গঙ্গাতীরস্থ হর্ম্ম্য, তরুবিস্তীর্ণ শ্যামলক্ষেত্র ও গঙ্গার নীলজল—ইহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

"দেশ ছাড়িতে কাহার না মায়া হয়? যাহাদের স্বদেশে নিরাশার অন্ধকার, বিদেশেই আলোক; স্বদেশে বিতৃষ্ণা, বিদেশেই অনুরাগ; যাহাদের স্বদেশে স্নেহ-বন্ধন পরিবার নাই বা শান্তির আধার স্বপ্নময়, সুখস্মৃতিময় বাস-নিকেতন নাই; যাহাদের হৃদয় অস্থির বা চির-বিষন্ন; তাহাদের দেশ ছাড়িতে মন অবসন্ন না হইতে পারে, অশ্রুজলে চক্ষু না ভিজিতে পারে। সুখের বিষয়—এ জগতে সেরূপ লোক অতি বিরল। টাইমনের ন্যায়, ডাইয়োজিনিশের ন্যায়, বাইরণের ন্যায়, সকলেই সংসারের প্রতি, মানবের প্রতি বিদ্বিষ্ট নয়। সুখের বিষয়, অনেকের স্নেহের কেন্দ্র, শান্তির নির্ঝরিণী, প্রীতির মূলাধার প্রিয় পরিবার আছে, অতীত স্মৃতি-বিজড়িত বাসস্থান আছে। সুখের বিষয়, সকলেই জাতির প্রতি নির্ম্মম নয়, স্বদেশের প্রতি নিরনুরাগ নয়।

"জাহাজ চলিতে লাগিল। বাড়ি, মাঠ, বন, উপবন, জলাশয়, একে একে সব অদৃশ্য হইল, প্রথম দিন 'হীরা'-বন্দরে (Diamond Harbour' এ)

জাহাজ নঙ্গর করিল। পরদিন সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভারত অদৃশ্য হইল, হৃদয় আরও উদ্বেলিত হইল। সমস্তদিন জাহাজ চলিল—হর্ষ-বীরদর্পে সমুদ্র-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চলিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বিজয়া-দশমীর অপরাহ্নে পবিত্র-প্রতিভা-প্রতিভাসিত, দুঃখ-ভারাবনত প্রতিমার ন্যায়, হর্ষ-বিষাদ-জড়িত, সুন্দর মধুর সায়াহ্ন-সূর্য্য সাগর-সীমায় ঢলিয়া পড়িয়া, বিলীন হইয়া গেল।—আমি বাহিরে অন্ধকার দেখিলাম, মনের ভিতরেও যেন একখানি কাল মেঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। কাতর হৃদয়ে, সজলনয়নে প্রেম-প্লাবিত অন্তরে, যেদিকে ভারত অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, সেদিকে চাহিয়া আমার জীবনের ধাত্রী, শৈশবের দোলা, ভালবাসার চির-পাত্রী ভারত-জননীর নিকট বিদায় লইলাম।

"জাহাজ চলিল। রাত্রে ছাদে, অর্থাৎ—'ডেকে' শুইয়াছিলাম; মধ্যরাত্রে বাতাস একটু প্রবল হওয়ায় সমুদ্র শীঘ্রই তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে জল কখন কখন 'ডেকে' উঠিতে লাগিল। আমি ঘুমাইয়াছিলাম; সমুদ্রের মধুর-গম্ভীর গর্জ্জনে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাহাজের কলের শব্দ সমুদ্র-গর্জ্জনের সহিত মিশিয়া সেই মধ্যরাত্রে, সেই নির্জ্জন প্রদেশে যে কিরূপ ধ্বনিত হইতেছিল তাহা বর্ণনীয় নহে। আমি সম্পূর্ণ জাগি নাই, সকলই স্বপ্ন-শ্রুতবৎ বোধ হইতে লাগিল। সে তরঙ্গোচ্ছ্বাস-শব্দটি বড় সুন্দর, বড় গম্ভীর, বড় কবিত্বময়; না শুনিলে অনুভব করা যায় না;—আর শুনিতে শুনিতে সেই অর্দ্ধ-ঘুমন্ত অবস্থা!

"তাই, মানবের কৌশলকে ধন্যবাদ দিলাম—যাহাদ্বারা মনুষ্য নিশীথের অন্ধকারে, জলহীন প্রদেশে, তরঙ্গময় সাগরের মধ্য দিয়া, একাকী নিঃসহায়ে অথচ নির্ভয়ে সাগর-হৃদয় বিদলিত করিয়া, দেশ হইতে দেশান্তরে চলিয়া যাইতেছে। মনে অহঙ্কার হইল যে, আমি দীন, হীন, পরাধীন বাঙ্গালী হইলেও মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারি।

"জাহাজ ছয় দিন অশ্রান্ত চলিল। সপ্তম দিনে লঙ্কা-দ্বীপে, 'গল' বন্দরে (Galle) নঙ্গর করিল। বৈকালে তীরে গেলাম; একখানি গাড়ী করিয়া নগরের মধ্যে বেড়াইয়া আসিলাম। 'গল' নগরটি বড় সুন্দর। একটি 'ক্যাথলিক' গির্জ্জা আছে, একটি দুর্জ্জেয়

কনক লঙ্কা।

দুর্গ সমুদ্রমুখী হইয়া রহিয়াছে। বীরদর্পে, শত্রুর পরাক্রমকে তুচ্ছ করিয়া বিরাজ করিতেছে! কতকগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ি আছে; অধিকাংশ বাড়িই ছোট, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। নগরটি শৈলময়। গণ্ড শৈলের কোলে অনেকগুলি বাড়ী আছে। সেই শৈলের শিখরদেশ লঙ্কাজাত তরুলতা-সুশোভিত। গাছের মধ্যে '—'* নারিকেল জাতীয় গাছ, দারুচিনির গাছই প্রধান। অন্যান্য গাছও আছে, যেমন—লবঙ্গগাছ, সুপারীগাছ। তরুলতা-সমাবৃত শৈলরাজিই 'গলের' অতুল ভূষণ। সমুদ্রের তীরে, সেই শৈলময় স্থানে কুটীর রচনা করিয়া বাস করিতে পারিলে হয়তো ইহলোকে শান্তি পাওয়া যাইতে পারে। সেখানকার গুটিকতক স্ত্রীলোক দেখিলাম। তাহাদের বেশ বাঙ্গালী রমণীদের অপেক্ষা অনেক সভ্য ও সুন্দর। তাহারা দেখিতেও বেশ। গাড়ী চড়িয়া যাইবার সময়ে তাহারা দ্বার রুদ্ধ করে না। পথে সুবেশা রমণী একাকী চলিয়া যাইতেও শঙ্কিত হয় না। ইহাতে বোধ হইল যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা বঙ্গদেশ অপেক্ষা এখানে অনেক বেশি। পুরুষ মানুষ দেখিলে একহাত ঘোম্‌টা টানিয়া, রাস্তার ধারে গিয়া, পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায় না, এবং রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া পুরুষের দিকে 'উঁকি ঝুঁকি' ও মারে না। সবাই বেশ স্বাধীন, নির্ভয়, সানন্দ। স্বামী-স্ত্রী পথে একসঙ্গে কথা কহিতে কহিতে চলিয়া যায়। য়ুরোপীয় সভ্যতা এখানে বোধ হয় অধিক প্রবল। কারণ, অনুসন্ধানে জানিলাম যে, এখানে অনেক লোক খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী। ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক এখানে প্রবেশ করে নাই। হিন্দুধর্ম্মের পৌরাণিকী কথা তাহারা বড় জানে না। এমন কি, অনেকে বিশ্বাসই করে না যে, লঙ্কাদ্বীপে একদিন রাবণ নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিল। তাহাদের অনেকের বিশ্বাস যে, তাহারা চিরকালই বৌদ্ধ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের পতাকা একদিন এখানে উড়িয়াছিল। এখনও অধিকাংশ লঙ্কাবাসী বৌদ্ধ।

"এখানকার ছোটলোক বড় প্রতারক! একজন জাহাজে আসিয়া তাহার কথিত একটি মুক্তার দাম একশত টাকা বলিল। আমাদের জাহাজের একজন সাহেব বলিলেন যে, এক টাকা হইলে তিনি উহা লইতে পারেন। তাহাতে বিক্রেতা অনেকক্ষণ পরে দুই টাকাতে

স্পষ্টবাদিতা।

* অস্পষ্ট

নামিল। সাহেব আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—'These are worse than the Calcutta-shop-keepers. They (Calcutta-shop-keepers) come down only from Rs. 50/- to Rs. 3/- and not from Rs. 100/- to Rs. 2/-' আমি তাহাতে উত্তর দিলাম,—'But they are better than the English shop-keepers, for they would ask for Rs. 100/- and would stick to it, though the real price were Rs. 2/-' তাহাতে বোধ হইল যে, সাহেবরা খুব আমোদ উপভোগ করেন নাই; কারণ, তাঁহারা কেহই আর উচ্চ-বাচ্য করিলেন না!

'স্বর্ণ-কিরীটিনী' লঙ্কা আজিও স্বর্ণ-কিরিটিণী। ভারতেরই মত শোভাময়ী, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যশালিনী; কিন্তু দুইজনেই আজ পরের পদানত, আহারের জন্য পরের দ্বারে ভিখারিণী।

"জাহাজ লঙ্কাদ্বীপ ছাড়িল। আবার সমুদ্র-হৃদয় বিদারণ করিয়া সাহঙ্কারে সগর্ব্বে, সানন্দে চলিল। অনন্ত জলধির মধ্যে আমরা একাকী রহিলাম। জাহাজ আবার এক সপ্তাহ অশ্রান্তভাবে চলিল। চারিদিকেই জল ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। উপরে অনন্ত-প্রসারিত নীলাকাশ, পদতলে দিগন্তবিসর্পী ক্রীড়াময় সিন্ধু, দৃশ্যটি বড় সুন্দর বটে! কিন্তু প্রতিদিন এবং সারাদিন এক জিনিষ দেখিতে দেখিতে, মেজাজ বড় ঠিক্ থাকে না। তাই আমারও মেজাজ চটিয়া গেল। ভাবিয়াছিলাম যে, ইঙ্গ-বঙ্গ সাহেবদের সাথে বড় কথা কহিব না; কিন্তু করি কি? একাকী থাকিয়া মন খারাপ হইয়া উঠিল; সাহেবদের সহিত কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম। সাহেব ও বিবিরাও আমার সহিত কথা কহিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না দেখিলাম। তাঁহারা ভারতবর্ষেই দেশীয়বিদ্বেষী, জাহাজে উঠিলে আর সমানভাবে কথা কহিতে লজ্জাবোধ করেন না। ইহা কি মাটিরই গুণ, না, অন্য কোন কারণ আছে?

"সাহেবদের সহিত কথোপকথনের কয়েকটি নমুনা দিব। একদিন একটি সাহেব ব্রাহ্মধর্ম্মটা যে কিছুই না, কেবল গোটাকতক ব্রাহ্মদের ধর্ম্ম—একথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন; তিনি বলিলেন যে,

তেজস্বিতা।

খৃষ্ট-ধর্ম্মই সত্য, কারণ পৃথিবীর সকল সভ্য ও পরাক্রান্ত জাতিই খৃষ্টান। যদি খৃষ্টধর্ম্ম সত্য না হইত, আর ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য হইত তাহা

হইলে সব সভ্যজাতি (অর্থাৎ ইয়ুরোপ) খৃষ্টান না হইয়া ব্রাহ্ম হইত। অথবা ব্রাহ্মরা খুব পরাক্রান্ত হইত। আমি বলিলাম 'গ্রীক-রোমীয় মুসলমান জাতিও এক সময়ে খুব পরাক্রান্ত ছিল, অতএব, তাহাদের সকলের ধর্ম্মই যে আত্যন্ত সত্য ছিল তাহা প্রমাণ হয় না। পার্থিব বাহুবলের সহিত নৈসর্গিক ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। এক ধর্ম্ম অন্য উচ্চতর ধর্ম্মকে স্থান দিবে, কিন্তু তাই বলিয়া বিধর্ম্মাবলম্বী যে পুরাতন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে বাহুবলে পরাক্রান্ত হইবে তাহার কোন অর্থ নাই।' আর একজন সাহেব বলিলেন যে, 'হিন্দুধর্ম্মটা মিথ্যা।' আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিলেন 'ইহারা পৌত্তলিক।' আমি সে বিষয় উত্তর না দিয়া বলিলাম 'খৃষ্টধর্ম্মটা খুব ভুল।' তিনি বলিলেন 'কেন?' আমি হাসিয়া বলিলাম 'পরমেশ্বর ছয় দিনে জগৎ তৈয়ারী করিলেন কেন? এক দিনেই ত পারিতেন। আর করিলেন ত একদিন আবার বিশ্রাম করেন কেন? পৃথিবীটা তৈয়ারী করিতে কি বড় পরিশ্রম হইয়াছিল?' তাঁহারা সকলে চটিয়া, ক্রমে ক্রমে উঠিয়া গেলেন, এবং মনে মনে হয়ত ভাবিলেন, 'বাঙ্গালীরা কি নির্ব্বোধ?' আমার খুব আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, আমরা পরস্পরকে নির্ব্বোধ বিবেচনা করি। সাহেবেরা ভাবেন হিন্দুরা কি বোকা, আর হিন্দুরা ভাবেন খৃষ্টানরা বোকার চূড়ামণি। আর একদিন একজন সাহেব আমায় বিশ্বাস করাইবার জন্য খুব যত্নশীল হইলেন যে, 'ইলবার্ট বিলে হিন্দুরা বড় মূর্খতা ও ধৃষ্টতা করিয়াছে।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেন?' তিনি বলিলেন 'আমরা ইংরেজজাতি বাঙ্গালী হইতে বিভিন্ন। বাঙ্গালীদের কি অধিকার যে আমাদের দোষাদোষ বিচার করে?' আমি বলিলাম, 'ইংরেজের কি অধিকার যে বাঙ্গালীকে জয় করিয়া তাহার উপর প্রভুত্ব করে? পরাক্রান্ত মনুষ্য দুর্ব্বলকে অযথা পীড়ন করিতে না পারে ইহার জন্য যদি আইন-আদালত থাকে তবে পরাক্রান্ত জাতি দুর্ব্বল জাতিকে পীড়ন করিতে না পারে ইহার জন্য কি আরো উচ্চতর আইন ও আদালতে থাকা উচিত নহে?' তিনি বলিলেন, 'তোমরা তিন-চারি বৎসর বিলাতে থাকিয়া আমাদের দেশের রীতি-নীতি কিছুই জানিতে পার না, আমাদের উপর বিচার করিবে কিরূপে?' আমি উত্তর করিলাম,—'আর তোমরা আমাদের রীতিনীতি বোধ হয় বিলাত হইতেই দৈবশক্তিতে জানিতে পার এবং তাহার

জন্মই তোমরা আমাদের বিচার করিতে পার?' তিনি বলিলেন,—'Two blacks make no white.' (অর্থাৎ দুই মন্দতে মন্দ বাড়িতেই পারে, কমিতে পারে না)। আমি বলিলাম—'But two equal forces balance each other. তোমরা যদি জান, আমরা মনে করিলে তোমাদের উপর অবিচার করিতে পারি তাহা হইলে তোমরাও আমাদের উপর অবিচার করিতে সাহসী হইতে না।' আর একজন সাহেব বলিলেন 'তুমি তাহা হইলে patriot?' আমি বলিলাম—'আমি অত উচ্চ নামের যোগ্য নহি।' তিনি বলিলেন, 'আমি ইচ্ছা করি, ইংরেজেরা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যায়, আর অন্য এক জাতি আসিয়া বাঙ্গালীকে ছিন্নভিন্ন করে, তাহারা যেরূপ ইংরাজ-বিদ্বেষী সেইরূপ ফল পায়।' আমি বলিলাম,—'আমিও দেখিতে ইচ্ছা করি যে, ইংরাজেরা একবার ভারত হইতে চলিয়া গেলে * * * সাহেবেরা কিরূপে অনাহারে মরে।' এটি তাঁহার শ্রুতি-সুখকর না হওয়ায় তিনি স্থান-ত্যাগ করিলেন। অবশ্য আমি তাহারই জন্য ইহা বলিয়াছিলাম। আর একদিন এক সাহেব আসিয়া, অমুক রাজার সহিত তাঁহার খুব আলাপ ছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিতে খুব প্রয়াসী হইলেন; আমি সেটা সহজে স্বীকার করাতে কোনও তর্ক বাধিল না। আর একদিন এক সাহেব আমাকে গুপ্তভাবে কাণে কাণে বলিলেন—'কলের জাহাজ অর্থাৎ ষ্টিমার, শুধু পালের জাহাজের চেয়ে দ্রুত যায়।' যেন একথাটি কতই গোপনীয়!

"সাহেবেরা ভাবেন—বাঙ্গালীগুলি কেবল পড়িয়া পড়িয়াই মরে, প্রাকৃত জগতের কোন ধারই ধারে না। একথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য বটে, কিন্তু তাহারা যতদূর ভাবেন, ততদূর নয় বোধ হয়! একদিন এক সাহেব আমাকে বলিলেন 'তুমি যে কেবল পড়ই দেখিতেছি, গল্প কর না কেন?' আমি জাহাজে শেলী (Shelley), কীট্‌স্ (Keats) পড়াতে আমার নাম 'কবি' রাখিলেন, এবং কার্লাইল (Carlyle) পড়াতে আমার নাম 'স্কলার' (Scholar) রাখিলেন। আমি তাহাতে কোন আপত্তি করিতাম না, কারণ নাম দুইটা মন্দ নহে। আমাকে কেহ বিরক্ত করিতে আসিলে আমি সেক্সপীয়র, বায়রণ বা শেলি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিতাম, তাহাতেই সকলে রণে ভঙ্গ দিতেন। একদিন এক সাহেব বলিলেন—'বাঙ্গালীরা এত

ইংরেজ-বিদ্বেষী কেন বলিতে পার?' আমি বলিলাম, 'পারি, ইংরেজেরা বাঙ্গালী-বিদ্বেষী বলিয়া।' তিনি তাহা অস্বীকার করিলেন; বলিলেন যে, তিনি বাঙ্গালীদিগকে খুব ভালবাসেন, এবং অনেক সাহেবই বাঙ্গালীদিগকে ভালবাসে। তবে বাঙ্গালীরা অল্পতেই চটিয়া যায়, কাজেই ইংরেজেরাও চটিয়া যায়। এইরূপ কথোপকথনে আবার প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

আমোদ-প্রমোদ।

"জাহাজে অন্যান্য আমোদও হইত। বোতলের উপর বসিয়া কে এক বোতল হইতে আর এক বোতলে জল ঢালিতে পারে, বাঁ হাত পিঠের দিক্ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া লেবু খাইতে পারে, কে কতদূর লাফাইতে, কে কতবার দোল খাইতে পারে—এইরূপে সময়ের দীর্ঘতা ও ভার কমাইতে চেষ্টা করা যাইত। আবার ইনি অমুক রমণীর সহিত প্রণয়ালাপ (courtship) করিতেছেন; অমুক রমণী অমুককে ভালবাসে,—এরূপ রটাইয়াও যে আমোদ লাভ করিবার চেষ্টা হইত না তাহা বলিতে পারি না।

পীরম।

"ক্রমে আমরা 'পীরমে' আসিয়া পঁহুছিলাম। 'পীরম' স্থানটি দেখিতে বড় অনুর্ব্বর, কিন্তু তথায়ও বৃটেনের পতাকা উড্ডীয়মান। বন্দরের তিন দিক ইটের রংএর পাহাড়-বেষ্টিত। মধ্যের জল ঘোর হরিৎ, বাহিরের জল অবশ্য ঘোর নীল। বোধ হয়, যেন সাগরের জল বন্দী হওয়াতে ম্লান ও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

"এ স্থানটি অধিকার করিবার জন্য ফরাসী জাতির কতগুলি পোত এখানে আসিবার সময়ে 'এডেনে' থামে (halt করে)। এডেনের গভর্ণর তাহাদের একটা ভোজ দেন, এবং সেই সূত্রে তাহাদের উদ্দেশ্য জানিতে পারেন। সেই দিনই গভর্ণর 'পীরমে' রণ-পোত পাঠাইয়া স্থানটি অধিকার করিয়া রাখেন। পরদিন ফরাসীরা সেখানে গিয়া দেখে, 'বৃটিশ পতাকা' উড়িতেছে! তখন উহা অধিকার করিতে গেলে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের বিগ্রহ হয়। এইরূপে * * বৃটেন 'পীরম' অধিকার করে।"

* * *   * * *   * * *

"আমরা লোহিত-সাগরে চলিয়াছি। তুমি বলিবে, ইহার আর আশ্চর্য্যটা কি? কিন্তু কেবল যাহা আশ্চর্য্য তাহাই যে বলিতে হইবে, এমন ত কোন

কথা নাই। জাহাজ ছাড়িবার পর আমরা মাথায় হাত দিয়া দেখি যে, মাথাটা পাথুরিয়া কয়লার খনি হইয়া বসিয়া আছে; নাকে হাত দিয়া দেখি, মণ খানিক কয়লা সেখানে প্রশান্তভাবে বাসা করিয়া আছে। ঘোর বিপদ। কিন্তু এ বিপদ সকলেরই। সকালে স্নান করিলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া আবার জাহাজের গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

লোহিত-সাগর।

"সমুদ্রে চাঁদের উদয় দেখি নাই। একদিন রাত্রে সহযাত্রিকগণ সব আমোদপূর্ণ গল্পে সময় কাটাইতেছিলেন; তাহাতে যোগ দিবার প্রবৃত্তি না থাকায় আমি জাহাজের পিছনে গিয়া বসিলাম। তখন চাঁদ উঠিতেছে,—সমুদ্রের কিনারায় লহরীময়ী নীলিমা-প্রান্তে, স্নিগ্ধ লোহিত গরিমায়, প্রশান্তভাবে চাঁদখানি দেখা দিল। মধুর-স্নিগ্ধজ্যোতি, প্রেমময় চন্দ্রমার উদয়ে, সমুদ্রের শান্ত হৃদয় মৃদুল সমীর-সন্তাড়নে দোলায়িত হইতে লাগিল। প্রেমিকের মধুর আগমনে, প্রণয়ীর মধুরতর সম্ভাষণ-চুম্বনে সিন্ধু চঞ্চল-হৃদয়ে প্রেমপূর্ণ-অন্তরে, চুম্বনের প্রতিদান করিল। এ চুম্বন কি সুন্দর! অপ্সরা-কণ্ঠ-গীতিবৎ, 'ইয়োলিয়' বীণাঝঙ্কারবৎ স্নিগ্ধ ও মধুর! সুন্দর জিনিস সুন্দর, কিন্তু সুন্দর জিনিসের সম্মিলন শতগুণ মধুর! পূর্ণবিকশিত প্রভাত-সমীর-সেবিত গোলাপ লাবণ্যময়, পবিত্র নীহারও অতি রমণীয়; কিন্তু উভয়ের সম্মিলন কি শতগুণ মধুর নহে? আকাশরত্ন চন্দ্রমা বড়ই সুন্দর, প্রশান্ত, গম্ভীর; সমুদ্রও অতি মনোহর। কিন্তু উভয়ের সম্মিলন না হইলে যেন সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় না, মাধুর্য্যের সফলতা হয় না। সম্মিলনের জন্যই সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। এ জগৎ সৌন্দর্য্যের বিবাহস্থান, লাবণ্যের মঙ্গল-মন্দির। লাবণ্যের সমাগম প্রকৃতিরই অভিপ্রায়।—নয়?

সাগরে চন্দ্রোদয়।

"সাহেবেরা সময় কাটাইবার অনেক উপায় উদ্ভাবন করিতেন। তাস, পরস্পরের ঘাড়ের উপর পরস্পরের ব্যায়াম, উদ্দেশ্যহীন হাসি, 'চুরটের ধোঁয়ার চাঁদনির নীচে' গল্প,—এরকম অনেক আমোদ করা হইত বা করিতে চেষ্টা করা হইত। একদিন এক সাহেব বলিলেন,—'এস গান গাওয়া যাউক।' পরে, মিলিত চীৎকারে উর্দ্ধমুখে, মুদ্রিতনেত্রে, মস্তক-আন্দোলনের সহিত করতালি-যোগে

জাহাজে ক্রীড়া-কৌতুক।

'Three blind mice' নামক অর্থশূন্য একটা গান গাইতে লাগিলেন। তাহার অর্থ যদি কিছু থাকে তবে এই—'তিনটি মুষিক; রুটিওয়ালার স্ত্রী ছুরী লইয়া পিছনে পিছনে ছুটিতেছে। এমন মজাকি জীবনে দেখিয়াছ? তিনটি মুষিক!', এই কবিত্বপূর্ণ কারুণ্যময় গানটি যে কি মধুর, তাহা বর্ণনীয় নহে। গর্দ্দভের চীৎকার তাহার কাছে মাধুর্য্যে পরাস্ত হয়! পরে বাঙ্গলা গান শুনিতে তাঁহাদের হঠাৎ ইচ্ছা হওয়াতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম,—'আমি গাইতে জানি, কিন্তু গাইব না। আপনারা বাঙ্গালা বোঝেন না, কেবল হাসিবেন। আমি আমার গান আপনাদের হাস্যের বিষয় করিতে চাহি না।' ইহার পর আর কেহ আমাকে অনুরোধ করিতেন না।

"এইরূপে আমোদে লোহিত-সাগরের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে আরব ও আফ্রিকার মরুময় প্রদেশ দেখিতে পাইলাম। তাহার জন্য লোহিত-সাগর বড় গরম। কিন্তু আমাদের সময়ে বেশ বিপরীত বাতাস বহিতেছিল। একটু বাতাস প্রবল হাওয়াতে সমুদ্র ফেনময় হইল ও জাহাজ দোলাইতে লাগিল। অধিকাংশ রমণীর 'সমুদ্র-পীড়া' হইল, আমারও হইল। ইহা হইতে অবশ্য এরূপ ভাবিবার কোন কারণ নাই যে, আমার ধাতু ও প্রকৃতি রমণীর মত। "সমুদ্র-পীড়াটা' কি প্রকার, জান? বোধ হয় যেন মাথাটা লাটিমের মত ঘুরিতেছে; পা' দুইখানা কখন আকাশের দিকে, কখন নীচের দিকে যাইতেছে; যেন পেটের মধ্যে বোল্‌তা ডাকিতেছে; আর, গলার কাছে যেন ফোয়ারা উঠিবার চেষ্টা হইতেছে। আমি অনেকবার মাথায় হাত দিয়া দেখিতে লাগিলাম—সেটা ঠিক আছে কিনা। এই প্রকারে আমরা ক্রমে সুয়েজবন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সমুদ্র-পীড়া।

"সুয়েজ-খাল দিয়া জাহাজ চলিতে আরম্ভ করিল। জাহাজের গতি অবশ্য খুবই ধীর, সঙ্কুচিত ও শঙ্কাকুল। কারণ অবশ্য বুঝিতে পার;—ঠিক একখানি জাহাজ যাইবার পথ মাত্র আছে। দুইখানি জাহাজ পাশাপাশি হইয়া যাইতে পারে না। অতএব, একখানি জাহাজ আর একখানির পিছনে, সেখানি আর একখানির পিছনে,—এইরূপে জাহাজ চলে। মধ্যে মধ্যে খালটি একটু প্রশস্ত আছে; সেখানটা

সুয়েজ-প্রণালী।

বিপরীতগামী জাহাজদ্বয়ের পাশ কাটাইয়া যাইবার জন্য। দুই জায়গায় হ্রদের ন্যায় খুব প্রশস্ত। মধ্যে মধ্যে ষ্টেশন আছে। খালটি দেখিতে মোটেই ভাল নহে। লোকে এইটিকে ফ্রেঞ্চদের খুব কীর্ত্তি বলিয়া থাকে। ইংরেজেরা এই খাল কাটিবার প্রস্তাব করিয়া কাটিতে পারিল না,—বড় খরচ। ফ্রেঞ্চরা অনেক টাকা খরচ করিয়া শেষে কাটিল। অবশ্য ইহাতে ফ্রেঞ্চ-ইঞ্জিনিয়ারের খুব বাহাদুরী বলিতে হইবে।

"খালটি প্রায় ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ। জাহাজ সমস্ত দিনরাত্রি মন্দ মন্দ চলিল। পরদিন বেলা ৯টার সময়ে সায়েদ-বন্দরে নঙ্গর করিল। তীরে নামিলাম। সাহেবদের সহিত বেড়াইতে ও নগর দেখিতে গেলাম।

সায়েদ-বন্দর।

এস্থান মূর্ত্তিমতী অপবিত্রতা। নগরটা দেখিতেও মোটেই ভাল নয়। ময়লা রাস্তা, শ্রীহীন বাগান, শোভাহীন বাড়ী,—এ নগরের ভূষণ। তবে, খুব দোকান আছে! প্রতি দোকানে সুসজ্জিতা রমণী আছেন; রাস্তায় গাঁট কাটিবার ভয় আছে; এমন কি—রৌপ্যময় একগাছি চেনের অধিকারীর পর্য্যন্ত প্রাণের ভয় আছে; কোলাহল আছে; সৌন্দর্য্যহীন, উল্লাসহীন, গম্ভীরমুখ পুরুষের বহুল সমাগম আছে। সুয়েজ-খালে প্রবেশ করিবার আগে, সুয়েজ-বন্দরের অসীম পাহাড়ময়ী বেষ্টনীর সৌন্দর্য্য আমার ভাল লাগিয়াছিল। সুয়েজে আমি তীরে যাই নাই। আমার একজন সহযাত্রী গিয়াছিলেন। নমুনাস্বরূপ কতকগুলি সুয়েজ-কলঙ্ক ফটোগ্রাফ জাহাজে আনিয়াছিলেন। মানুষের চরিত্র-মলিনতার বিভিষিকাময় চিত্র; পাশব প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অধোগমনের আদর্শ! মানুষে ইহার নিম্নে আর পতিত হইতে পারে না!! আমি যেন কোথায় পড়িয়াছি বোধ হয় যে,—তিনটিতে মানুষের প্রকৃতি জানা যায়; প্রথম—পুস্তক, দ্বিতীয়—সঙ্গী, তৃতীয়—ছবি। মানুষ কি বই পড়ে, কাহার সঙ্গে বেড়ায় ও কি ছবি ঘরে রাখে, ইহা দেখিয়া সে কি প্রকার মানুষ তাহা জানা যায়। যদি ছবি দেখিয়া জাতি ঠিক করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে—সুয়েজবাসী অধঃপতিত অপবিত্রতার সীমান্ত। আর সুয়েজ দেখে ও পোর্ট সায়েদ দেখে যদি আফ্রিকার অবস্থা বিচার করা যায় তাহা হইলে আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে নিকৃষ্টতম, অসভ্যতম, অপবিত্রতম। এই আফ্রিকাতে যে একদিন উর্জ্জস্বল, উন্নত, সভ্য মিসর ছিল,—যেখানে একদিন

গিরিবৎ স্থির ও তুঙ্গ পিরামিড্ নির্ম্মিত হইয়াছিল,—তাহা বোধ হয় না; বোধ হয় না যে, হানিবাল-প্রসবিনী কার্থেজ একদিন এই আফ্রিকার কূলে, গর্ব্বে রোমের সদম্যশক্তিকে তুচ্ছ করিয়া বিরাজ করিত; বোধ হয় না যে, জগতের গৌরব, পণ্ডিতগণের বাসভূমি আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া এই আফ্রিকাতে ফেনময় সিন্ধুর ক্রোড়ে অবস্থিত ছিল। অহো,—কাল! অহো,—অবস্থা!

"সুখী ভারত! তুমি এতদিন পরাধীন থাকিয়াও এতদূর পতিত হও নাই। কারণ আফ্রিকা যথার্থই আজ অসভ্য, অজ্ঞান-তিমিরাবৃত। ভারত! তুমি অত্যাচারের, পীড়নের, অধীনতার ক্রোড়ে পালিত হইয়াও এতদূর অধোগামী হও নাই। এখনও হিন্দুর আশার দিন আছে, উন্নতির উপায় আছে। হিন্দু! তুমি এখনও উন্নতমানা, সেই অকলঙ্কিত চরিত্র; কেবল এখন আর তুমি পূর্ব্বের ন্যায় দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পার না;—তোমার সে অতুলনীয় বীরত্ব আর নাই। পতিতা, অজ্ঞান-তিমিরময়ী অপবিত্রতার লীলাভূমি, বারাঙ্গনা-কলঙ্কিতা আফ্রিকার উপকূল পরিত্যাগ করিয়া আবার জাহাজ চলিল। আনন্দে, পূর্ব্বের গতিতে, মধ্যোপসাগর দলিত করিয়া আবার চলিল।

স্বদেশ-প্রেম।

(খ)

৭ই অগ্রহায়ণ, ১২৯১।

'The Magic-Car moved on'—ঐন্দ্রজালিক বাষ্পজান চলিতে লাগিল। আমরা ভূমধ্যসাগরে;—ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যস্থলে। সায়েদ-বন্দর ছাড়াইবার একটু পরেই একটু একটু শীত বোধ হইতে আরম্ভ হয়; বেশ তরঙ্গোৎক্ষেপী, পোতান্দোলী, শীতবর্ষী বাতাস বহে। জাহাজ চলিতে লাগিল; শরীরটিও মন্দ মন্দ দুলিতে লাগিল; মস্তকও উপায়ান্তর অভাবে শরীরকে অনুকরণ করিল; এবং সমুদ্রজনীন পীড়ার আবির্ভাব হইতে আরম্ভ হইল। এইরূপ ঘটনা সমুদায় যে আমার খুব সুখকর হয় নাই এবং কাহারও হয় না, সেটা বেশ বুঝিতে পারি; যাহা হউক, জাহাজ চলিতে লাগিল। এই ভূমধ্যসাগর ঐতিহাসিক স্মৃতিময় উন্নত জগতের পরাক্রান্ত

ভূমধ্য-সাগর।

সভ্যজাতির বিচরণ-স্থান। রোমরাজ্য, গ্রীস, কার্থেজ এই সাগরের প্রান্তে অবস্থিত। এখান দিয়া রোমীয়, গ্রীসীয়, কার্থেজীয় সমর-পোত যাতায়াত করিত; এই স্থান দিয়া একদিন বাণিজ্যের লীলা-ক্ষেত্র ভেনিস দেশ-দেশান্তরে বানিজ্য-পোত প্রেরণ করিত। রোম, ভেনিস্, কার্থেজ, এথেন্স, স্পার্টা,—আজ সে সব কোথায়?

"Assyria, Greece, Rome, Carthage, where are they?
Thy waters wasted them while they were free
And many a tyrant since……… ………
Not so thou ;—
… … …
Unchangeable, save to thy wild wave's play,
Time writes no wrinkle on thy azure brow :
Such as creation's dawn beheld, thou rollest now,"

"এই ভূমধ্য-সাগরে বাইরণের উপরিলিখিত কতিত্বময়, আবেগময়, ভাবপূর্ণ ছত্র ক'টি মনে পড়িল। কমলার চঞ্চলতা, ক্ষমতার অস্থিরতা, সম্পদের নশ্বরতা, নিয়তির কঠোর বিচার মনে আসিল। ইটালী আবার উঠিতেছে, মৃতপ্রায় জাতি আবার জাগিয়াছে। কিন্তু, আমার * *? যদি সৌভাগ্য চিরদিন না থাকে, এ দুর্ভাগ্যও চিরদিন থাকিবে না।

"আমরা চলিলাম—বামে কার্থেজ ও আলেকজাণ্ড্রিয়া; দক্ষিনে ফ্লোরেন্স ও রোম, পশ্চাতে এথেন্স্ ও স্পার্টা। এক দিকে আফ্রিকা ও অপর এক দিকে ইউরোপ।—পশ্চাতে এসিয়া রাখিয়া, ভূ-মধ্যসাগর দিয়া চলিলাম। অবশেষে জিব্রাল্টার-পোতাশয়ে উপনীত হইলাম।

জিব্রা-ল্টার।

পথিকের দর্শন-পথের এইটি প্রথম ইউরোপীয় নগর। দূর হইতে নগরটি দেখিতে বড় সুন্দর,—যেন একটা ছবি। ঠিক সাগরের উপর নগরটি। থাক্ থাক্ বাড়ীগুলি—পাহাড়ের কোলে। উপরে কামানময় পাহাড়, নীচে নীল সাগর; বড় সুন্দর। জিব্রাল্টার পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় অজেয়তম দুর্গ। চারি বৎসর পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়াও ইহাকে কেহ অধিকার করিতে পারে নাই। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা ইংরেজদের হাতে আছে। ইংরেজরা * * * এই দুর্গ হস্তগত

করিয়াছেন। * *। ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে, এ দুর্গ মূরদের হাতে ছিল। এখানে রোমিয় অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে ; সেই জন্য বোধ হয়, ইহা রোমীয়দের হাতেও কিছুদিন ছিল। ইতিহাসেও ইহার উল্লেখ আছে। ইহার গহ্বরে মানুষের হাড় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে পুরাকালের,—তাহাদিগের বয়স ঠিক হয় নাই। এখানে মর্কট খুব দেখা যায়, যদিও স্পেনের অন্য কোন স্থানে সে জানোয়ার দেখা যায় না। আর অনেক আফ্রিকাজাত জন্তু (যাহা ইউরোপে কখন দেখা যায় না) তাহাও দেখা যায়। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, ইউরোপ ও আফ্রিকা একদিন এই স্থানে যুক্ত ছিল, পরে বিযুক্ত হইয়া গিয়াছে। এ সব আমি দেখি নাই, কিন্তু পড়িয়াছি।

"জিব্রাল্টার জগতে সঙ্কীর্ণতম প্রণালী ; ইহা ইংরাজদের হস্তগত থাকাতে ভূ-মধ্যসাগরে যাতায়াত তাহাদের হস্তে। এক দিকে জিব্রাল্টার, অপর দিকে লোহিত-সাগরের উপকূলস্থ এডেন তাহাদের হস্তে। অতএব ভারতে অন্য জাহাজের যাতায়াত অনেকটা তাহাদের ক্ষমতাধীন। জন্‌বুল্'এ (John Bull'এ) লিখিত হইয়াছে, যে ইংরেজেরা কন্‌স্তান্তিনোপল্‌ও (Constantinople'ও) যে তাহাদের প্রাপ্য এরূপ বিবেচনা করেন। কিন্তু, আমার বোধ হয় যে, ইংরাজেরা Constantinople পাইতে তত উৎসুক নহেন। তবে সেটা রুষজাতির হাতে যাহাতে না যায় তাহার জন্য খুব চিন্তিত। কারণ, রুষীয়েরা যদি Constantinople পায় তাহা হইলে ভয়ানক জাতি হইয়া দাঁড়াইবে। স্থল-যুদ্ধে রুষজাতি ইংরেজদের অপেক্ষা বলবান্ ; এবং ইংরাজ জাতি তাহারই জন্য ইহার আপত্তি করে। জাতিটা বুদ্ধিমান বটে। জান, ইংরাজেরা ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে যোগদান করিয়া ক্রীমীর সমর কেন করে? তাহার কারণ কেহ কেহ খুব গূঢ় মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু সেটা আর তোমার শুনিয়া কাজ নাই।

"জিব্রাল্টার হইতে আমরা আট্‌লান্টিক্ মহাসাগর দিয়া উত্তরে চলিলাম। আফ্রিকার সীমা অতিক্রম করিয়া, পর্টুগালের কূলস্থ পাহাড়, নগর, বন ও উপবন দেখিতে দেখিতে চলিলাম। টেম্‌স্ নদীর সাগর-সঙ্গম দেখিতে পাইলাম। দেখিতে দেখিতে ক্রমে জাহাজ বিস্কে-উপসাগরে উপনীত হইল। বিস্কে নাবিকদের বড় ভয়ের

এট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগর।

স্থান। এখানে অনেক জাহাজ জলমগ্ন হয়; এখানে কত হতভাগ্য নরনারীর সমাধি হইয়াছে, সংখ্যা নাই।

"বিস্কের সেই প্রবল বাতাস বহিল। সাগরের আবার সেই তরঙ্গ, সেই গর্জ্জন, সেই গভীর সৌন্দর্য্য! নাবিকেরা উচ্চতানে তাহাদের সাগরিক গান ধরিল। বাতাসের প্রাবল্যের সহিত তাহাদের উচ্চ তান, উচ্চ হইতে উচ্চতর উঠিতে লাগিল। নাবিকদের সে গানে, কি এক রকম অপার্থিব মাধুর্য্য, স্বপ্নময় স্বাধীন আনন্দ, বৃটন-জাতিসম্ভব পরাক্রম-ভাব জড়িত আছে,—শুনিলেই বড় আনন্দ হয়। রনবাদ্যের মত সে গানে হৃদয় নাচিয়া উঠে। ঢেউয়ের সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে জাহাজ চলিতে লাগিল। 'The magic-car moved on!' হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভয়-জড়িত আনন্দ হইতে লাগিল। বিপদের ছায়া না থাকিলে আনন্দের মহত্ব কোথায়?

বিস্কে।

"ভাবিলাম—আমি আজ ইউরোপের নিকটে,—সভ্যতার রঙ্গভূমি, স্বাধীনতার বিচরণস্থান, বীরত্বের লীলাক্ষেত্র, ইউরোপের কূল-প্রক্ষালী এট্‌ল্যান্টিক্ মহাসাগরে। ইতিহাস-পঠিত স্পেন, পর্টুগাল, ফ্রান্স, বৃটন, আজ আমার দক্ষিণে বা অগ্রে বিস্তৃত। এসিয়ার কথা মনে করিয়া দুঃখ হইল। যে সূর্য্য একদিন ভারতে, চীনে, পারস্যে, আসিরিয়ায়, মিশরে, একে একে উদিত হইয়াছিল, তাহা সেখানে অস্তমিত হইয়াছে; পূর্ব্বের রবি আজ পশ্চিমে,—ইউরোপে আজ দীপ্যমান ও পূর্ণজ্যোতি; পশ্চিমতর আমেরিকাতেও সে সূর্য্যের প্রভাতিক কিরণ পড়িয়াছে। আমার একটা আশ্চর্য্য বোধ হইল,—সভ্যতা-রবি প্রাকৃত রবির গতিরই অনুসরণ করিয়াছে। ইউরোপে দেখ, প্রথমে গ্রীস, পরে রোম, পরে ফ্রান্স, স্পেন, জর্ম্মনী ও বৃটন। মনে হইল, হয়ত এ সূর্য্য যখন ইউরোপে অস্তমিত হবে তখন আমেরিকাতে ইহার পূর্ণ বিকাশ হইবে। আবার হয়ত ঘুরিয়া এসিয়াতেও তাহার প্রভাত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিবে। এসিয়া একদিন সভ্যতার বিহার-ক্ষেত্র ছিল, অদ্য এসিয়া 'বর্ব্বরতার লীলাভূমি'; একদিন সেই আলোকিত এসিয়া,—আজ ভীরুতার, অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিদ্রিত! এসিয়ার অবতার মনু, বুদ্ধ, কন্‌ফিউসিয়স্, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য গিয়া, আজ কোপর্ণিকস, গ্যালিলিও, লাপ্‌লাস্, নিউটন, হিউম, মিল, ডারউইন, গেটে ও সেক্সপিয়র স্থান পাইয়াছে। আজ ধর্ম্মের শুষ্ক

অনুষ্ঠান-গত * রাজত্ব শেষ হইয়া আসিতেছে; বিজ্ঞানের নবীন পতাকা আকাশে উড়িতেছে। ন্যায়, সত্য ও জ্ঞানের নবরাজ্য প্রসারিত হইতেছে। এ সব কথা মনে করিয়া আনন্দ হইল, দুঃখ হইল, আশাও হইল। রাত্রেও এই সব কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

"ইংলিস্-চ্যানেলে (English Channel' এ) উপস্থিত হইলাম। উত্তরে বৃটন, দক্ষিণে ফ্রান্স ও ওয়াইট দ্বীপ দেখিলাম। কাপ্তেন সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভারতের চেয়ে ইহা দেখিতে সুন্দর কিনা। আমি উত্তর করিলাম—ভারতের সৌন্দর্য্যের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। তাহা সত্য কথা। ভারতের পদ-প্রান্তস্থ লঙ্কা দেখিয়াছি; তাহাও দ্বীপ; কিন্তু, কোথায় তাহার পর্বতশৃঙ্গরাজি, কোথায় ইহার শুষ্ক, বৈচিত্রবিহীন, সমভূমি উপবন। কোথায় লঙ্কার নীলাকাশে অস্ত-গামী রবিকর-রঞ্জিত অতুলনীয় মেঘমালা; কোথায় 'ওয়াইটের' কুজ্‌ঝটিকা-সমাবৃত ধূসর আকাশ। সত্যই তুলনা হয় না।

ইংলিস্-চ্যানেল।

"জাহাজ ক্রমে 'টেমস্' নদীতে আসিল। নদী-তীরস্থ তরুরাজী হর্ম্ম্য, বন, দেখিতে দেখিতে চলিলাম। মনে হইল—কোথায় গঙ্গা, কোথায় টেমস্; কোথায় নীল-সলিলা ভাগীরথী, কোথায় কর্দ্দমাঙ্গার-কণাকলুষিত টেমস্ নদী। 'অঙ্গার-কণাকলুষিত' কেন বলিলাম, বোধ হয় বুঝিলে। টেমস্ নদীর দুইধারে যত প্রধান প্রধান কল-কারখানা। ক্রমাগত ধোঁয়া উঠিতেছে ও নদীতে সেই কয়লার কুচো পড়িতেছে। ক্রমে, 'ডকে' আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্রোশ হইতে ক্রোশ বিস্তৃত 'ডকে' কত জাহাজই লাগিয়া রহিয়াছে। ইংরাজের আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। ক্রমে জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া, জাহাজের এক মাসের বন্ধুগণের নিকট দুঃখিত মনে বিদায় লইয়া, লণ্ডনে একটি বন্ধুর † বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।"

লণ্ডন-'ডকে'।

* বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের এ মতের অতি আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।—গ্রন্থকার।

† ইনি আর কেহ নহেন—'বঙ্গবাসী কলেজের' সুযোগ্য অধ্যক্ষ, আমাদের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়।—গ্রন্থকার

(গ)

১৩ই নবেম্বর, ১৮৮৪।

"Hell is a city much like London"—
Shelley

"At length they all to merry London came,
To merry London, my most kindly nurse,"—
Spenser.

"এই মহাপুরী দেখিয়া—আমার ধারণা কি হইল, আনন্দে অধীর হইলাম, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলাম বা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলাম, তাহা তোমাদের জানিতে যে ইচ্ছা হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? তবে দাঁড়াও গোড়া বাঁধিয়া লই।

—কহ হে দেবি অমৃতভাষিণী!
কোন্ কোন্ স্থান দেখি, কি ভাবিলা মনে—
বঙ্গ-সুত বিপ্রবর ভারত-ভরসা,—
লণ্ডনে, সে কোলাহলে মনুজ-পুঙ্গব।

"আমি লণ্ডনে। বৃটেনর রাজধানী;—সমস্ত পৃথিবীব্যাপ্ত ইংরাজের কেন্দ্র, —সভ্যতার, বাণিজ্যের, উন্নতির, বিজ্ঞানের বিলাস-ভূমি;—জগতের হাস্যময়, উল্লাস-ধ্বনিময়, আলোকিত মন্দির; ক্ষমতার, বীরত্বের, সম্পদের, গৌরবের জীবন্ত নিদর্শন; বৃটিশের জাজ্বল্যমান গরিমা—আজ লণ্ডনে আমি। যে লণ্ডনের কথা কত পড়িয়াছি;—নানা জাতির ক্রমান্বয়ে এই স্থানের প্রভুত্ব; সেক্সনের রোমীয়ের জর্ম্মাণের আনুক্রমিক এই স্থানে রাজত্ব; উইলিয়ম হইতে ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত বৃটনেশ্বরের এই স্থানে বাস; যাহা স্পেন্সারাদি কবিকুলের ধাত্রী—সেই লণ্ডনে আমি! কত সব ভূত-কালের ইতিহাস-কথিত কথা মনে আসিল। সত্যই আনন্দ হইল, বিস্ময় হইল, ভক্তি হইল, বর্ত্তমানে প্রায় অবিশ্বাস হইল, ভাবিলাম—আমি সত্যই কি লণ্ডনে?

লাণ্ডান্।

"লণ্ডন বাড়ীর অরণ্য, রাস্তার 'গোলক ধাঁধাঁ'; আমি এখানে আসিয়া দিশেহারা হইয়া গেলাম। বাঙ্গাল (আমি Provincial'এর সকলের নামই 'বাঙ্গাল' দিতেছি,—অবশ্য কৃষ্ণনগর, হুগলি, শ্রীরামপুর বাদ!) কলিকাতায়

প্রথমবার আসিলে যেরূপ দিশেহারা হয়, ট্রামওয়ে থেকে পিছে মুখ করিয়া নামিতে গিয়া আছাড় খায়, গাড়ী চাপা পড়িবার উপক্রম হইলে গাড়োয়ানের নিকট সুমধুর চাবুক খায়, পথহারা হইয়া 'ফ্যাল্ ফ্যাল্' করিয়া চারিদিকে তাকানোতে, চল্‌তি লোকের কাছে রমণীয় ধাক্কা খায়, এবং বহুক্ষণ পরে বাসায় আসিয়া বিলম্বজনিত কাঠিন্য-গুণ-সমাগত ডাল-ভাত খায়, আমার কলিকাতা হইতে লণ্ডনে আসিয়া প্রায় সেইরূপ দুরবস্থা হইল। যে দিকে চাই—অগণ্য বাড়ী, অসংখ্য লোকের সমাগম। প্রতি মুহূর্ত্তে রাস্তা দিয়া অগণ্য গাড়ী যাইতেছে, 'হু হু' করিয়া লোক চলিয়া যাইতেছে; তুমি রাজা বা রাণী হও, তোমার প্রতি দৃষ্টি, বিস্ময়ের চাহনি নেই; তুমি ভিখারী বা ভিখারিণী হও, তোমার প্রতি দয়াপূর্ণ দৃষ্টিপাত নাই। অসংখ্য লোকের ভীড়,—চাকে মৌমাছির ভীড়ের মত অগণ্য; কিম্বা আমি যদি মিল্টন হইতাম তাহা হইলে বলিতাম, যে সে জনতা 'ভ্যালাম্বোজা'র (Vallambrosa'র) ভূ-পতিত তরুপত্ররাশির ন্যায় ঘন ও নিবিড়"।

"বাড়ীগুলোর আবার এক অপূর্ব্ব রকম। দুটো বাড়ীর মধ্যে আকারে রঙ্গে কোন বিভিন্নতা নাই। আবার এক বাড়ীতেই বিভিন্ন অংশের প্রভেদ নাই। এক রকম জানালা, এক রকম দুয়ার, আর যেন সমস্ত বাড়ীখানা নিটোল একখানা পাথরের। সাধারণতঃ ঐ বাড়ীগুলি কলিকাতার বাড়ীর সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনীয় নহে। প্রশস্ত বারান্দা, বিস্তীর্ণ ছাদ, শ্যাম ও বাতায়ন, রমণীয় উদ্যান—এ সব এখানে কিছুই নাই। তাহার কারণ কি? বিলাত যে আমাদের দেশের মত গরম নহে, তাহা বোধ হয় তোমাদের কাছে নূতন আবিষ্কার নয়। এখানে 'সূর্য্য-মাতুল' মহাশয় আমাদের দেশের মত উগ্র স্বভাবাপন্ন নহেন। এখানে তিনি বড় ওঠেনই না। আবার এখানে আমাদের দেশের মত বসন্তের প্রাণস্পর্শী মধুর, স্নিগ্ধ বাতাস বহে না। তবে এখন বুঝিতে পারিতেছ, এখানে জানালার তত আমদানি নাই কেন, আর প্রতি বাড়ীর মাথার উপর একটি করিয়া চিম্‌নি বা ধূমনির্গম-পথশ্রেণী কেন। একটা বাড়ীরও চতুষ্কোণ ছাদ দেখিতে পাইবে না। সব বাড়ী চিমনী-কিরিটিনী ও ধূমময়ী। জানালা সব ছোট ছোট, দুইখানি কাঁচাবরণা, দ্বার চির-রুদ্ধ ও পশ্চাতে ঘণ্টা-সমন্বিত।

"নগরে বড় বড় 'পার্ক' অবশ্য আছে ; —তাহা না হইলে, লণ্ডনের লোক ধোঁয়ার, জনতার ও কোলাহলের জ্বালায় ছুটিয়া পলায়ন করিত। এই উপবনগুলি রম্য, স্নিগ্ধ ও সৌন্দর্য্যময়। স্বভাবের সৌন্দর্য্যই তাহাতে অধিক লক্ষিত হয়। শিল্পের কারিকরি নাই বলিলেও চলে ; তবে বসিবার সুন্দর সুন্দর নিভৃত বা গোল স্থান আছে, প্রস্তর-বেষ্টিত জলাশয় আছে, দুই একটি সুন্দর বাড়ীও আছে। ফুল-টুল বড় নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ ও বিস্তীর্ণ মাঠ,—ইহাই সে উপবনের আভরণ। সন্ধ্যায় যাও, দেখিবে—সহস্র সহস্র পুরুষ-রমণী কেহবা বিচরণ করিতেছেন, কেহবা বেঞ্চে বসিয়া চারিদিকে তাকাইতেছেন ; কেহবা এখানে থাকা কেবল সময়ের অপচয় মাত্র—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, বাড়ীর দিকে নিম্নমুখে চলিয়া আসিতেছেন।

'পার্কগুলি কলিকাতার 'ইডেন-গার্ডেনে'র ন্যায় সৌন্দর্য্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে তুলনীয় নহে। তবে, দুই একটি 'পার্ক' তার চেয়েও অনেক বড়। ইডেন-বাগানের কুসুমের নির্ম্মল সৌরভ, বসন্তের কবিত্বময় সমীরণ, সঙ্গীতের প্রানস্পর্শী উচ্ছ্বাস, অদূরে গঙ্গার স্মৃতিময় কলরব,—এখানে কিছুই পাইবে না। তবে যদি সন্ধ্যার কোলাহল দূরে রাখিতে চাও, চিন্তার ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে চাও, যুবক-যুবতীর সমবেত সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, তবে তুমি গোধুলি সময়ে এ 'পার্কে' আসিও, নিরাশ হইবে না।"

(ঘ)

২০এ নবেম্বর, ১৮৮৪।

"গত পত্রে তোমাকে কেবল লণ্ডন-পুরীর আভাস মাত্র দিয়াছি। তাহার বাড়ীর অগণ্যতা, রাজ-বর্ত্মে লোকারণ্যতা, 'পার্ক' সমূহের স্বাভাবিকী শোভার কথার উল্লেখমাত্র করিয়াছি। এবার তোমাকে বৃটিশ যানের বিষয় কিছু বলিব। যেমন ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত, শিবের বাহন বৃষভ, কার্ত্তিকের বাহন ময়ুর ও গণেশের বাহন মুষিক, ইংরাজের প্রিয়বাহন সেইরূপ 'সর্ব্ববাহী'—Omnibus। বস্তুতঃ, ইংরাজের যান লণ্ডনে ত্রিবিধ—'ব্যস' 'ট্রাম' ও 'রেল'। 'ক্যাব্' (Cab) সাধারণের জন্য নয়, ধনী লোকের নিমিত্ত। এক কথায় 'ক্যাব্' আমাদের দেশের উৎকৃষ্টতর প্রথম শ্রেণীর

ইংরাজের স্থল-যান।

৭

ভাড়াটে গাড়ী। 'ক্যাব' আবার দ্বিবিধ। কিন্তু সে বিষয় এখন আর শুনিয়া কাজ নাই, এখন বৃটনের প্রকৃত যানের কথা শোন।

"১ম, 'ব্যস'—দেখিতে বড় ভাল নহে,—বৃহৎ, বিবিধ বর্ণ-রঞ্জিত, পশ্চাদ্দ্বারী চিররুদ্ধ কাচ-গবাক্ষ, ভ্রাম্যমান ঘর-বিশেষ। 'ব্যসে'র ভিতরে ১৭ টি আসন, ছাদের উপর ১৪ টি আসন। তুমি রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে যদি চল্‌তি 'ব্যসে'র পানে তাকাও, দেখিবে—শকটচালক বা তাহার সহযোগী ভাড়া-সংগ্রাহক তোমার পানে চাহিয়া এক অঙ্গুলী তুলিয়া আছে। তাহার সহজ অর্থ এই—'ব্যসে' চড়িবে তো আইস্‌,—বড় আরাম, বড় সস্তা। যেখানে তুমি যাইতে চাও, 'ব্যস' ঠিক সেইখানে যাইবে, এস লক্ষী আমার"! তুমি যদি যাইতে না চাও, ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া যাও। আর, যদি সে বিলাসময় সুখের আকাঙ্ক্ষী হও ত' 'ব্যসে'র ভিতর যাও; দেখিবে, বিবিধ 'পালকহীন দ্বিপদ জন্তু' বসিয়া, পোষাকের চাকচিক্যদ্বারা আপনাদিগের মনুষ্যত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহার মধ্যে লোমচর্ম্ম, অর্দ্ধ-পলিতকেশ, 'সমাধি পরপারে এক পাদ-লগ্ন' পুরুষ-রমণীই অধিক; দুই একজন সুগোল-কপোলা, উন্নত-গ্রীবা, সুকেশিণী রমণী, বা রক্তিম-কপোল স্থূলকায় পুরুষও দেখিতে পাইবে। ভিতরে প্রতিজনের বসিবার স্থান সঙ্কীর্ণ; শরীরে শরীরে সংঘর্ষণ, নিস্পেষণ ও বিচূর্ণনাদি ব্যাপার দ্বারা ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইবার দারুণ সম্ভাবনা। কিন্তু, তোমাদ্বারা কেহ আহত হইলেও কাতরোক্তি বা তোমার সহিত বচসা করিবে না। ভিতরে গাড়ীর চারিদিকেই কাঁচের জানালা এবং নানাবিধ বিজ্ঞাপনে গাড়ীখানি যেন মোড়া। আর তুমি যদি ভিতরে না যাইতে চাও ও সাহসী পুরুষ হও, তবে গাড়ীর ছাদে যাও, বেশ বাতাস পাইবে; সেখানে স্থবির মানবত্ব দেখিবে না; —সকলেই সুস্থ, যুবা ও সবল। কিন্তু সকলেই নির্ব্বাক্‌,—'নির্ব্বাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্‌'। বৃটিশজাতি পরিচিত না হইলে তোমার সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিবে না। 'Please' আর 'Thank you',—কেবল এই দুইটি কথা তাহারা অকৃপণ-ভাবে সকলকেই বিতরণ করে। প্রায় লণ্ডনের প্রতি রাস্তায়ই 'ব্যস' চলে। 'ব্যসে'র গায়ে গন্তব্যস্থান সমূহের নাম লেখা থাকে। 'ব্যসে'র রঙ্গদ্বারাও তাহার গন্তব্যস্থান নির্ণীত হইয়া থাকে।

"২য় ট্রাম। —বড় রাস্তা সমূহে ট্রাম চলে না। তাহার কারণ বোধ হয়,

ট্রামগাড়ী অন্য গাড়ীর যাতায়াতের ব্যাঘাত করে। ট্রামগুলি বেশ সুন্দর, চারিদিকে আবৃত; আবার আসনময় ছাদবিশিষ্ট। প্রায় সব ট্রাম ঘোড়ায় টানে, কিন্তু কেহ কেহ দুই একটি বাহনে রাজি নন। তাই, বৃটন 'ট্রাম' ও 'ব্যসে' পরিতুষ্ট নয়। তাহার উপর আবার রেল।

"৩য় রেল। —লণ্ডন বৃহৎ পুরী, জগতের বৃহত্তমা নগরী; ইহার পরিসর প্রায় ২০০ বর্গমাইল বা ৫০ বর্গক্রোশ। অথবা ইহার এক সীমা হইতে অপর সীমা প্রায় ৭ ক্রোশ। কলিকাতা হইতে শ্রীরামপুর যতদূর ততদূর প্রায় লণ্ডনের একটি দিক বিস্তৃত। এতদূর হাঁটিতে অনেক সময় পা অবশ্য সম্মত হয় না, টাকার থলিয়াও অনেক সময় 'ব্যসে' অধিক চড়াতে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করে; তাই, যেমন সমুদ্র-মন্থনের সময় সুরাসুরের বিবাদ-ভঞ্জনার্থে শ্রীকৃষ্ণের রমণীবেশ-ধারণ, তেমনি অর্থ-স্থলী (Purse) ও পা-দেবীর কলহ-নিরাকরণার্থে 'ব্যস্' শকটের রেলগাড়ী রূপ-ধারণ! বাস্তবিক রেল 'ব্যস্' অপেক্ষা দ্রুতগামী ও সস্তা, কিন্তু 'ব্যসে'র মত সুখগম্য নয়।

"লণ্ডনে রেল এক আশ্চর্য্য জিনিষ। এ রেলগাড়ী লণ্ডনের রাস্তা দিয়া যায়, না, 'পার্কে'র মধ্য দিয়াও যায় না, ইহা লণ্ডনের মাটির নিম্নে বিচরণ করে। রাস্তার কিনারায় ষ্টেশন আছে; সেখানে যাও, সিঁড়ি দিয়া নীচে নাম, দেখিবে—মাটির নীচে দীপালঙ্কৃত হর্ম্ম্য, সম্মুখে রেল। পূর্ব্বে আরব্য-উপন্যাসে বা উপকথায় মাটির নীচে বাড়ী, উদ্যান প্রভৃতির কথা পড়িয়াছি; এখানে তাহা চক্ষে দেখিলাম এবং যাহা কোথাও পড়ি নাই তাহাও দেখিলাম। প্রতি তিন চারি মিনিট অন্তর গাড়ি আসিতেছে, এক মিনিট অপেক্ষা করিবে মাত্র; তাহাতে ওঠ, গাড়ী হুহু শব্দে চলিয়া যাইবে। নিবিড় দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়া, লণ্ডনস্থ প্রাসাদময় অরণ্যের নীচে দিয়া, নির্ভয়ে, সগর্ব্বে, গম্ভীর শব্দে রেলগাড়ী চলিয়া যাইতেছে।

"রেল বৃটিশের মহিমময়ী কীর্ত্তি, গৌরবময়ী রচনা, শিল্পকৌশলের অহঙ্কারময়ী বিজয়-পতাকা। বিজ্ঞানের অহঙ্কার আজ সার্থক, কল্পনার অদম্যতম গতি আজ সফল। যখনই রেল দেখি, তখনই বৃটিশ কৌশলকে ধন্যবাদ দিই, মানব-কৌশলের নিকট সমস্ত পৃথিবীকে কল্পনায় অবনত-শির দেখি। টেলিগ্রাফ—বৈদ্যুতিক তার ও রেলগাড়ী উভয়ই আশ্চর্য্য; পরস্পরের উপযোগী বিজ্ঞানের যমজ সন্তান।

আবার এই রেলগাড়ীর মৃত্তিকার নিম্নে বিচরণ আরও মহিমময় ও আশ্চর্য্য। যথার্থই কি আমি উপকথার ও কল্পনার রাজ্যে আসিয়াছি? লণ্ডন নগরেই পাঁচ শতের অধিক ষ্টেশন আছে। ম্যাক্স ওরিএল (Max O'Riel) বলেন যে, ক্লাপহাম-যোজন (Clapham Junction) দিয়া প্রতিদিন এক সহস্রাধিক রেল-গাড়ী যায়। লণ্ডনে এই রেল দেখিয়া মনে হইল—'ধন্য কৌশল!' ধন্য বৃটন! আমরা বাঙ্গালী—দীনহীন, মূর্খ, পতিত বঙ্গবাসী, তোমার বীরত্বে ও রাজ-নীতির কৌশলে যে তোমার অধীন রহিয়াছি, তাহার আশ্চর্য্য কি?"

(৬)

২৪এ নবেম্বর, ১৮৮৪।

"এস ভাই। বৃটনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করি। রাস্তার নিবিড় জনতা, পুরীর চিরোত্থিত কোলাহল, বাহিরের কুজ্‌ঝটিকাময় অস্ফুট সূর্য্যালোক, গৃহের বাহ্যবিষণ্ণ চেহারা ছাড়িয়া, এস আলোকময়, হাস্যময়, কোলাহলহীন অন্তঃপুরে যাই। সেখানে ইংরাজ নিজে সর্ব্বপ্রভু, পরিবারের প্রেমময় ভর্ত্তা, শিশু-সন্তানের স্নেহময় পিতা; এস সেইখানে যাই। মনোরম কিছু দেখিব।

"ম্যাক্সওয়েল বলেন,—'লণ্ডনে যখন সূর্য্যদেব ওঠেন, লোকে তাঁহার ছবি তুলিয়া লয়,—পাছে তাঁর রমণীয় চেহারাখানি তাহারা ভুলিয়া যায়"। কথাটা বোধ হয় এতদূর প্রকৃত নয়; কারণ আমি যে বাড়ীতে যাই, কোনও স্থানে সূর্য্যের ফটোগ্রাফ দেখিলাম না, অথচ সকলেই জানে যে সূর্য্য গোলাকার, জ্যোতিঃপূর্ণ; তবে এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, সূর্য্যদেব এখানে বড অলস হইয়া গিয়াছেন, কাজকর্ম্ম বড় একটা করেন না। ছয়মাস ওঠেন আর ছয়মাস কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা যান। আবার বলিলে, চটেন। গ্রীষ্মকালে খুব সকাল সকাল ওঠেন; এমন কি, কখন কখন রাত্রি ৩টার সময়ে,—যখন সব ভদ্রলোকের ঘুমান উচিত, আর সকলেই যখন সত্য সত্য ঘুমায়,—তিনি পূর্ব্বদিকে প্রকাশিত হওয়ার একটু একটু লক্ষণ দেখান, এবং রাত্রি ৪টার সময়ে সম্পূর্ণ আসিয়া হাজির হন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত (যদিও অত্যন্ত অলসভাবে) কাজকর্ম্ম করেন, এমনকি রাত্রি নয়টা ও সময় সময় দশটা পর্য্যন্তও কাজ করেন। কিন্তু সে কয়দিন? শরৎকালেই অলস হইতে

সূর্য্য-'মামা'র আলস্য।

আরম্ভ করেন, শীতকালে ত দেখাই পাইবার যো নাই; আবার বসন্তকালেও সেই রকম (যদিও শীতকালের চেয়ে কম) আলস্য। শীতকালে বৈকাল চারিটার সময়েই কাজ শেষ করেন, আর সকালে প্রায় নয়টার সময়ে কাছারী খোলেন। কিছু বলিলে বলেন, এ সময়ে তাঁহার দক্ষিণ জগতে (Southern Hamisphere'এ) বড় বেশী কাজ। এক কথায়—তিনি লণ্ডনে বা সমস্ত ইংলণ্ডে গড়ে চারি মাস উঠেন, ছয় মাস ওঠেন না, আর দুই মাস ওঠা-না-উঠা লইয়া গোলমাল করেন; অর্থাৎ, উঠিয়া কখন মেঘ কখন কুয়াশা মুড়ি দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাকেন।

এই শীতময় কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন দেশে ইংরাজ সদাসর্ব্বদা দ্বার ঘোরতররূপে রুদ্ধ করিয়া থাকে। রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাও, দেখিবে—সব বাড়ীর দ্বার ও গবাক্ষ বন্ধ;—ঘোর ও বিষম বন্ধ। বাহির হইতে খুলিবার যো নাই। তুমি কোন বাড়ীতে যাইতে চাও, দরজার কাছে গিয়া ঠক্‌ঠক্ কর বা ঘণ্টা বাজাও (Knocking or ringing)। এক মিনিট পরে সুবেশা পরিচারিকা বা সুবেশ ভৃত্য আসিয়া দরজা খুলিয়া দিবে। তুমি তোমার কার্ড (বা নাম) পাঠাইয়া দিলে, দাসী বা চাকর খানিক পরে আসিয়া তোমাকে তাহার প্রভুর ঘর দেখাইয়া দিবে। ঘরে নিঃশঙ্কে প্রবেশ কর। আমাদের দেশের মত নীচে হইতে 'বলি, কালীপ্রসন্ন বাবু বাড়ী আছেন'—বলিয়া, হাঁক ছাড়িতে হয় না। কালীপ্রসন্ন বাবুও জানালা খুলিয়া 'কে হে?—ওঃ নগেন্দ্রবাবু! বলি আস্‌তে আজ্ঞা হোক্' বলিয়া চীৎকার করেন না। এ চেঁচামেচির দেশ নয়।

ইংরাজের অন্তঃপুর।

"ঘরের মধ্যে যাও, দেখিবে, 'মেজে' কার্পেটমোড়া; চারিদিকে কাগজাবৃত দেওয়াল,—চিত্রময়; একখানি টেবিল, অন্ততঃ পাঁচখানি গদিমোড়া চেয়ার, (অবশ্য আমাদের দেশের চেয়ারের মত কুব্জ ও খঞ্জ নয়!) একটি পিয়ানো এবং অপর দুই একটি জিনিস। আর ঘরের এক পার্শ্বে দেখিবে, হয়ত আগুন জ্বলিতেছে। দৃশ্যটি বেশ সুখকর ও আনন্দময় বোধ হইবে। বাহিরের বিষণ্ণতা ও শীতময় বাতাস ছাড়িয়া ঘরের ভিতর যাইলে যথার্থই আরাম হয় ও চক্ষু জুড়ায়। অতি গরীবের বাড়ীর অন্তঃপুরও পরিষ্কার, সজ্জিত ও আরামময়। আমাদের দেশের মত মৌরষী ছেড়া পাটি, ভিজা মাটি, মাকড়সা-জালময়

দেওয়াল কোনস্থানেই দেখিবে না। তুমি ইংলণ্ডে যাও, একটি ঘরভাড়া চাও ; —একটি শয়ন-মন্দির একটি পাঠ-মন্দির পাইবে। ভাড়া অধিক নহে। দুইটি সুসজ্জিত ও মধ্যম রকমের ঘরের ভাড়া—সাপ্তাহিক ১৫ বা১৬ শিলিং অথবা মাসিক ৩৫৲ টাকা। গ্যাস বা বাতির খরচ, আগুনের খরচ, রাঁধুনীর মাহিনা, চাকরাণীর মাহিনা এবং বিছানা, তোয়ালে, আয়না ও বাসনের সবই এই ৩৫৲ বা উর্দ্ধ সংখ্যায় ৪০৲ টাকার মধ্যে। চাকরাণী তোমার সব কাজ করিবে—জুতা-পরিষ্কার হইতে বাসন-মাজা পর্য্যন্ত। চাকরাণী তোমার প্রতি সম্মানপূর্ণা অথচ অভিমানিনী। তাহাকে তোমার কোন কাজের জন্য ধম্‌কাইতে হইবে না। আমাদের দেশে চারি পাঁচটা চাকর-চাকরাণী রাখিয়াও যেন কাজই কুলাইয়া ওঠে না।

'ওরে মধো, মধো, মধো—ও—ও—ও—আরে, শুন্‌তে পাস্‌নি নাকি ?' বলিয়া বাবু চীৎকার করিতেছেন ; ওদিকে মধো যে বাজারে গিয়াছে তাহার হিসাব নাই। উত্তর না পাইয়া আবার 'ও মতে, মতে, রামকৃষ্ণ, বিশে! —এরা সব গেল কোথায় ?' এদিকে মতিরাম গিয়াছেন দোকানে চা'এর চিনি কিনিতে ; রামকৃষ্ণ গিয়াছেন স্নানের জল আনিতে ও সেখানে গল্প জুড়িয়া দিয়াছেন, আর বিশ্বম্ভর দারুন নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছেন। এখানে এসব অসুবিধাকর ও প্রভুর রাগের ঘোর হেতু চাকরের অত্যাচার নাই। এখানকার চাকরাণী নিস্তব্ধে তোমার কাজ করিবে, যদি তাহার উপরও তোমার তাহাকে আবশ্যক হয়, ঘরে একটা সুন্দর দড়ি আছে টানিয়া দাও,—অজানিত স্থানে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে,—সিঁড়িতে জুতার শব্দ পাইবে, আর মুহূর্ত্তের মধ্যে চাকরাণী আসিয়া—'Did you ring me sir ?' বলিয়া তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা! নীরবে, সসম্মানে, সন্তোষকরভাবে সব আজ্ঞা পরিচারিকা বহন করে। এদেশে ঘড়ির কলের মত সব কাজ সম্পন্ন হয়।

"অধিকাংশ পরিচারিকাই সুবেশিনী ও সুকেশিনী। এখানে চাকর বিশেষতঃ চাকরাণীর চেহারা তাহার যোগ্যতার প্রধান অংশ। আছে-কি-না-আছে এমন ক্ষুদ্র চক্ষু, অবাধরূপে দীর্ঘ লম্বিত নাসা, দন্তের শোচনীয় অভাব,—এখানে চাকরাণীর কাজ পাইবার পক্ষে ঘোরতর বিঘ্নস্বরূপ। চেহারা অন্ততঃ প্রভুর বিরক্তির হেতু না হয়, এ বিষয়ে এদেশে বিশেষ লক্ষ্য। খাবার দোকানে

যাও, দেখিবে—সুন্দরী, যুবতী, সুগোল-কপোলা, কুঞ্চিত-কেশ, ভগ্ন-ললাটা (?) সুবেশিনী পরিচারিকা—(Bar-maid) দোকানের সম্মুখের ঘরে, কাজ না করিতে হইলেও, নীরবে ছবিটির মত দাঁড়াইয়া আছে। এরূপ জনশ্রুতি যে, কুরূপা পরিচারিকা অপেক্ষা ইহাদের লোক-আকর্ষণ বিষয়ে অজানিত ক্ষমতা আছে।

"তোমার আপনার ঘরে এখানে তুমি সর্ব্বময় প্রভু। অথচ তোমার ভাবনা-চিন্তা নাই। গৃহ-স্বামীনী (Land-lady) তোমার আহার প্রস্তুত করিয়া আনিবে। তোমার যখন আহার করিতে ইচ্ছা তখনই করিতে পার। পরে সপ্তাহের শেষে, খরচের ফর্দ্দ (Bill) পাইবে। আমাদের দেশের মত খরচের বিষয় লইয়া তাহাদিগের সহিত প্রভুর ঘোর আন্দোলন ও তর্ক করিতে হয় না। বলা বাহুল্য ও পূর্ব্বেই বলিয়াছি—নিস্তব্ধে ও সন্তোষকররূপে এখানে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়।"

(চ)

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৮৪।

"পূর্ব্বপত্রে তোমাদের বিলাতের অন্তঃপুরের বিষয় লিখিয়াছি। এবারও তাহার বিষয় কিছু বলিব।"

"এখানকার প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয়, পরিচ্ছন্নতা। নিতান্ত গরীবের বাড়ী যাও, দেখিবে—বাড়ীর সামান্য প্রাঙ্গণ পরিষ্কার; বাহির হইতে জানালার অভ্যন্তরস্থ লাল বা সবুজ পর্দা দেখা যাইতেছে; জানালার কাছে গুটিকতক ছোট ছোট কুসুমিত ফুল-গাছ দেখিবে। কাপড়-ঢাকা টেবিল, গদি-মোড়া চেয়ার, 'কার্পেটাবৃত' মেজে ও কাগজমোড়া দেওয়াল মধ্যবিত্ত মাত্রেরই বাড়ীতে দেখিবে। বাটীর মধ্যেও চারিদিকে যাহা আছে, তাহা বেশ শৃঙ্খলায় ও সুনিয়মে অবস্থিত। আমাদের দেশে মাসিক ১০,০০০ হাজার টাকা আয়ের ধনী জমিদার যেরূপ থাকেন, এখানে বাৎসরিক ১,০০০ টাকার গরীবও বোধ হয় তাহাপেক্ষা অনেক বেশী স্বচ্ছন্দতায় বাস করে। এখানে জঙ্গলময় মাঠ বা ময়লাময় প্রাঙ্গণ দেখিবে না। বাটীর সম্মুখে যদি একটু স্থান থাকে, তাহা হইলে অতি গরীব গৃহস্বামীও সেখানে গুটিকতক ফুল-গাছ রোপন করিয়াছে দেখিবে। প্রতিদিন সকালে ও

ইংরাজের পরিছন্নতা ও সাংসারিক শৃঋলা।

বৈকালে গৃহস্বামিনী বা তাহার দুহিতা তাহাতে জল দেয়,—তপোবনে মুনিকন্যা শকুন্তলার ন্যায় প্রভু-কন্যা গাছগুলিকে প্রিয় সন্তানের ন্যায় পালন করে।

"ঘরের মধ্যে যাও, আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা দেখিবে। যথাস্থানে টেবিল, চেয়ার, বাসন, পুস্তক সজ্জিত,—দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। গরীব পরিবারের যাহা পরিধেয় বসন আছে, তাহা পরিষ্কার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে এখানকার পরিচারিকা প্রায়ই সুবেশিনী। রাস্তা দিয়া চলিয়া গেলে কেবল পরিচ্ছদ দেখিয়া ভদ্রকন্যা ও পরিচারিকার মধ্যে প্রভেদ বোঝা আগন্তুকের পক্ষে বড়ই কঠিন। তবে মুখ দেখিয়া প্রভেদ বোঝা তত শক্ত নয়;—গরীব লোকের মুখে স্বাভাবিক রুক্ষতা আছে ও তাহাদের কপোলদেশ প্রায়ই আরক্ত। ভদ্র-কন্যার মুখ লজ্জাময় ও তাহারা প্রায়ই পাণ্ডুকপোল। পরিচ্ছদেও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে প্রভেদ কতক বোঝা যায়।

"আমার বিশ্বাস যে, যতদিন আমাদের দেশবাসীর ভাল আবাস-গৃহে আরামে থাকিতে ইচ্ছা না হইবে, ততদিন আমাদের গার্হস্থ্য অবস্থার উন্নতির হইবে না। পরিচ্ছন্নতা ও অন্ততঃ আয়-সাধ্য ভাল অবস্থায় জীবন-ধারণ করা, —আমাদের জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। আগে শৃঙ্খলাময় পরিচ্ছন্ন বাস-গৃহে বাস করিতে তাহাদিগের বলবতী বাসনার উদ্রেক করান আবশ্যক, পরে বাসনা পূর্ণ করিবার প্রয়াস হইবে, অবস্থা উন্নত করিবার ইচ্ছা হইবে। ইচ্ছা বলবতী হইলে ইচ্ছাপূরণ বহুদূরে থাকিবে না। 'Where there is a will, there is a way,' আমাদিগের কৃষকের অবস্থার সঙ্গে এখানকার কৃষকের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে বোঝা যায়, প্রভেদ কত; বোঝা যায়, আমাদের কৃষকেরা কি গরীব, কি দুরবস্থাপন্ন! যে দিন যাহা পায়, প্রায় সেই দিনই তাহা ব্যয় করে। সঞ্চিত অর্থ নাই; আরামময় বাসস্থান নাই; তৃণাবৃত কুটীরে, শতধাছিন্ন বিছানায়, শতগ্রন্থিময় বসনে বহু সন্তানের পিতা সেই কৃষক দীনভাবে কোন প্রকারে জীবন যাপন করে। দুর্ভিক্ষকালে তাহারা—(হতভাগ্য কৃষক!)—সপুত্রপরিবারে অনশনেই প্রাণত্যাগ করে। ইহার কারণ কি? অন্যান্য কারণও আছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, বর্ত্তমানে সন্তোষই ইহার মূল। তাহার অবস্থা

স্বদেশের উন্নতি-চিন্তা।

উত্তম হইতে উত্তমতর হইতে পারে, ইহা তাহার ধারণাই হয় না। পূর্ব্ব-পুরুষ-ব্যবহৃত ভূ-কর্ষী ব্যবহার না করিয়া নূতন প্রকার লাঙ্গল ব্যবহার করিলে যে ভূমি দ্বিগুণ ফলবতী হইতে পারে, ইহা তাহাদিগের বিশ্বাস হয় না। গরীব থাকিলেও নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট; নব-প্রথার উপকারীতায় অবিশ্বাসী। দুর্ভিক্ষ হইলে তাহারা কেবল বিধি-নির্ব্বন্ধের দোষ দেয়, নিজ ভাগ্যকেই অভিশাপ দেয় ও স্বীয় ললাটে করাঘাত করে। আমি বলি, তাহাদের মনে সম্ভোগ-বাসনা ও অসন্তোষ * দেও,—উন্নতির সোপান রচিত হইবে।

"আমি যেন শুনিতেছি, পৃথিবীর ঘটনানভিজ্ঞ ভাব-সর্ব্বস্ব (Sentimental) কেহ এখানে হয়ত কবিত্বময়ী ভাষায় বলিতেছেন—'বিলাসের চিন্তা দূরে রাখ, সম্ভোগ-বাসনা শত যোজন অন্তরে চিরদিন অবস্থান করুক; এই সন্তোষই কৃষকদিগের জীবন, ইহাই তাহাদিগের সুখ-সম্পদ, ইহাই তাহাদিগের দুর্ভাগ্যে ধৈর্য্যের ও সহিষ্ণুতার জননী। বিলাস তাহাদিগের মধ্যে আনিও না; ইহা তাহাদিগের জীবনকে দুঃখময় করিবে; ইহা মধু না আনিয়া তাহাদিগের জীবনে অসন্তোষের হলাহল ঢালিয়া দিবে।' ইহার উত্তরে আমি প্রথমতঃ বলিতে চাই যে,—কবিত্বময়ী ভাষা আমি খুব ভালবাসি, শুনিলে হৃদয় নাচিয়া ওঠে। কিন্তু ভাষা ন্যায় (Logic) নহে, অলঙ্কার যুক্তি নহে। দ্বিতীয়তঃ আমিও জানি, বিলাস মনুষ্যের বা জাতির পতনের মূল। রোমের পতন এই বিলাসে, ভারতেরও অবনতি এই বিলাসে। 'When Rome had by wit and courage subdued the World, it was drowned in that innundation of riches which these brought upon it' † 'Luxury makes a man so soft that it is hard to please him and easy to trouble him. So that his pleasures at last become his burden. Luxury is a nice-master hard to be pleased.' * কিন্তু সম্ভোগ-বাসনা বিলাস নহে। বাসনা কার্য্যময়, বিলাস অকর্ম্মণ্য; বাসনা অসন্তোষ, বিলাস সন্তোষময়।

* উত্তরকালে এ মতেরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। 'আলেখ্য' কাব্যে 'রাখাল বালক' কবিতাটি দ্রষ্টব্য।—গ্রন্থকার।

† Mackenzie's Moral History of Frugality.

* Mackenzie's Moral History of Frugality.

কেহ এক শত টাকাতে বিলাসী হইয়া পড়েন; কেহ আবার এক হাজার টাকাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, অতএব বিলাসীও হইতে পারেন না। অসন্তোষ বিলাসী নহে।

"আমি আরও বলিতে চাই—অসন্তোষই উন্নতির মূল, ইহা কার্য্যকে উত্তেজিত করে, সভ্যতার পথ প্রশস্ত করে। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি পারিবারিক উন্নতি,—সকলের মূলেই এই অসন্তোষ। বক্তা স্থরেন্দ্র বাবু যথার্থই লিখিয়াছেন,—'Our nation have yet to learn the great art of grumbling." অসন্তোষই সভ্যতার মূল। অসন্তোষই ফরাসী বিপ্লব করিয়াছিল; অসন্তোষই বৃটিশ জাতিকে রাজার নিকট হইতে স্বত্ব কাড়িয়া দিয়াছে; অসন্তোষই ইটালীকে স্বাধীন করিয়াছিল; অসন্তোষই আবার ভারতীয়গণকে নূতন জাতি করিতে সক্ষম।" আমাদের জাতির এখন প্রধান-শিক্ষার বিষয় এই অসন্তোষ। এই অসন্তোষ শিক্ষা করিতে শিখিলে জাতীয় উন্নতি দূরে রহিবে না। কি গরীব, কি ধনী, এখন সকলেই অসন্তোষ শিক্ষা করুন। কি ভারতানুরাগী রাজনৈতিক, কি সমাজ-সংস্কারপ্রিয় জাতি-হিতৈষী, কি পরিবার-চিন্তা-সর্ব্বস্ব জন-সাধারণ, সকলেই অসন্তোষ শিক্ষা করুন।"

(ছ)

"আমি পূর্ব্ব পত্রে গরীবদের অবস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহাদের বিষয় ভবিষ্যতে আরও বলিবার বাসনা রহিল। আজ আমি মধ্যবিত্ত-দিগের কথা বলিতেছি।

"আমাদের দেশের ও বিলাতের মধ্যবিত্ত লোকের তুলনা কর। দেখিবে, আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোকেরা কি গরীব, কি অল্পে তুষ্ট। শৃঙ্খলা তাহারা শিক্ষা করে নাই। তাহাদিগের উচ্চ আশা নাই। আমি প্রত্যেক ঘরে শৃঙ্খলা, পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য্য দেখিতে চাই। পরিবারের পরিচ্ছন্ন বেশ, সুস্থ শরীর, আনন্দময় মুখ দেখিতে চাই। তাহাতে পারিবারিক সুখের বৃদ্ধি বৈ ন্যূনতা হইবে না। তুমি বলিবে, 'ভারতবর্ষ বিলাত নহে, বিলাতে কাগজ-মোড়া দেয়াল চাই, গদী-দেওয়া চেয়ার চাই,

স্বদেশের উন্নতি-কামনা।

কার্পেট-ঢাকা 'মেঝে' চাই ; তাহা না হইলে ইংরাজ জাতি শীতে বাঁচিবে কেন'? এ সব স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের দেশের 'মেঝে' কার্পেটাবৃত না হইয়া, পাটী-মোড়া, 'ধপ্‌ধবে' শাদা, বা সিমেণ্ট-করাও ত হইতে পারে ; চেয়ার গদি-মোড়া নাই বা হইল,—তাহার বেত-মোড়া হওয়াতে আপত্তি কি ? দেয়াল কাগজ-মোড়া না হইলেও চূণকাম-করা ও সুন্দর রং-করাও ত হইতে পারে। দেশ বিভিন্ন, জাতি বিভিন্ন, কিন্তু মনুষ্য একই। সুবিধা ও আরাম বুঝিলে, মনুষ্য সর্ব্বস্থানে নিজ নিজ সুবিধা ও আরাম কিসে হয় তাহাও বুঝিয়া লইবে। এখানে যেমন ছোট ঘর, অগ্নি-স্থান (Fire-place) গদী, কুশন, কার্পেট আরামের ; আমাদের দেশেও প্রশস্তোচ্চ প্রকোষ্ঠ, মুক্ত-শ্যাম বাতায়ন, শীতল বাতাসাধিগম্য বাসস্থান, কুসুমিত উপবনও তেম্‌নি আরামের। পরিচ্ছন্নতা সব জায়গায়ই আরামময়, শোভনীয় ও নয়ন-রঞ্জন।

"বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালীর বা খৃষ্টানদিগের বাড়ী দেখিবে, পূর্ব্বপুরুষ-প্রথাবলম্বী বাঙ্গালীদের বাটী অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন, তাহাদের বেশভূষা পরিষ্কার, এবং স্বল্প-বেতনভোগীরও বাসস্থান স্বচ্ছন্দতাময় ও সুশৃঙ্খল। তাহার কারণ, তাহারা ইংরাজের আবাস-প্রথা দেখিয়া নিজেরাও সেই প্রথাবলম্বী হইতে চায়, পূর্ব্বাবস্থায় আর সন্তুষ্ট থাকে না। আরাম বুঝিলে আরামের উপাদান পাইতে বিশেষ বিলম্ব হয় না।"

"এখানে কেহ দেশানুরাগী হয়ত বলিবেন, যে "বাঙ্গালীকে বিলাসিতা শিক্ষা দিও না। যাহাদের সন্ন্যাসীর কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া সুখ-লালসায় জলাঞ্জলি দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাদের লজ্জায় গঙ্গাজলে ডুবিয়া মরা উচিত, তাহাদের আবার সৌখীনতা কেন ? * * * * দেখ, ম্যাট্‌সিনী বিলাস-সম্ভোগ খোঁজেন নাই, আনন্দ-উল্লাস খোঁজেন নাই ; দেশের জন্য * * দেশ হইতে দেশে পলায়ন, রাত্রি জাগরণ ও অসহ্যক্লেশ অম্লান বদনে, উল্লসিত চিত্তে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।" এই কথাটা খুবই উচু স্বীকার করি ; যদি কোন বাঙ্গালী যথার্থই দেশের জন্য বিলাস-লালসা বিসর্জ্জন দিতে পারেন, জীবন-উৎসর্গ করিতে পারেন, তাহা যথার্থই গৌরবময় কার্য্য, জাতির জাগরণের আরম্ভ। নিদ্রিত লক্ষ মানবের গৃহে গগনভেদী তুরীধ্বনি করিব—

"সন্ন্যাসীর ব্রত লও প্রতিজনে,
তবে অমানিশা হবে অবসান।"

"এই জ্বালাময়ী উক্তি আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু সন্ন্যাসী হইতে অধিকাংশ বাঙ্গালী আপাততঃ স্বীকৃত হইবেন না, বোধ হয়; আর গঙ্গাজলে এখন দেহ-বিসর্জ্জন দেওয়ায় অনেকেরই গুরুতর আপত্তি আছে, ইহাও আমার ধারণা। যদি দেশের জন্য কেহ সংসার-সম্ভোগবাসনা তুচ্ছ করিতে পারেন, আমি আমোদ ছাড়িয়া, তাঁহার প্রতি প্রেমভরে, ভক্তিভরে দৃষ্টিপাত করিব; তাহার জন্য, তাঁহার মঙ্গল-কামনায় ঈশ্বরের নিকট আমি কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করিব; —দেবতারা তাঁহার যশোময় পথে পুষ্পবৃষ্টি করুন! কিন্তু আমাদের জাতির—আমাদের কেন, সকল জাতিরই—অধিকাংশ লোকের কোন প্রকারে জীবন-ধারণ করাই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু জাতির সকলেই কিছু স্বার্থত্যাগী ম্যাট্‌সিনী হইতে পারে না; অধিকাংশ লোকই সামান্য ক্ষমতাপন্ন, স্বার্থ চিন্তাময়। ম্যাট্‌সিনীর জীবন তাহাদের নিকট অলৌকিক বোধ হয়। আমার এই পত্র তাহাদিগেরই জন্য। আমি জানি, আবাস-গৃহ পরিচ্ছন্নতর হইলে, আহার পুষ্টিকরতর হইলে, নিদ্রা গাঢ়তর হইলে, দেশের উদ্ধার হয় না; কিন্তু তাহাতে শরীর সুস্থতর হয়, জীবন সুখময়তর হয়, পারিবারিক স্বচ্ছন্দতাও পূর্ণতর হয়। মানুষ লইয়াই পরিবার, পরিবার লইয়াই জাতি। প্রতি মানুষ অধিকতর সুখী হইলে জাতিও অধিকতর সুখী হইবে।

"এখানে কেহ বলিতে পারেন, যে 'যদি অসন্তোষই উন্নতির মূল হইল, অসন্তোষই পারিবারিক শৃঙ্খলার কারণ হইল, সেই অসন্তোষই উন্নতির সোপান বলিয়া জীবনের সঙ্গী হইল, তাহা হইলে সুখ কোথায় রহিল? অসন্তোষও সুখ কিরূপে একত্রে অবস্থান করিবে?' উত্তরে আমি বলিতে চাই, পৃথিবীতে নির্ম্মল সুখ আশা করা বিড়ম্বনা। সুখের কারণ গভীর গুহায় নিহিত। 'কিসে সুখ' ইহাই জীবনের প্রধান সমস্যা। সে সমস্যার উত্তর দেওয়া আমার এ পত্রের উদ্দেশ্য নহে। আমার কখন কখন বিশ্বাস হয়, মানুষ অসভ্যাবস্থায় অধিকতর সুখী ছিল। কখন কখন বোধ হয় মানুষ সব অবস্থায়ই সমান সুখী। ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়—সুখ-দুঃখ নিজেরই উপর নির্ভর করে। মানুষ চেষ্টা করিলে সকল অবস্থায়ই আপনাকে সুখী করিতে পারে। এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি

আপাততঃ প্রস্তুত নই। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বর্ত্তমানে অসন্তোষ যেমন অসুখের কারণ, তেমনি সেই অসন্তোষ-প্রণোদিত কার্য্য-লব্ধ ফল সুখের একটি উপাদান। আমার আরও বিশ্বাস—দুর্ভিক্ষ সময়ে যে খাইতে পায় সে, যে খাইতে পায় না সেই অনাহারী, সপরিবারে অনশনে মৃতপ্রায়, হতভাগ্য কৃষক অপেক্ষা অধিকতর সুখী ; কারণ, তাহার সম্মুখে ধূল্যবলুণ্ঠিত পুত্র-কন্যা কাঁদে না প্রিয় ভার্য্যা সম্মুখে অনশনে প্রাণত্যাগ করে না। আর সুখই যদি মানবের একমাত্র লক্ষ্য হয়, যদি আরও উন্নত অবস্থায় অধিক সুখ না থাকে, তবে মানবের আদিম অবস্থা হইতে সভ্য অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয় বলিতে হইবে। মনুষ্য বর্ত্তমানে সন্তুষ্ট থাকিলে সভ্য হইত না, তাহা হইলে সুরম্য হর্ম্ম্যরাজি ধরণী-পৃষ্ঠ সুশোভিত করিত না ; বাণিজ্য-পোত নির্ম্মিত হইত না ; রেলগাড়ী, বৈদ্যুতিক তার, উদ্ভাসিত হইত না ; ব্যোমযান আকাশে উড়িত না ; তাহা হইলে, সঙ্গীতের প্রাণালোড়ী ঝঙ্কার ; চিত্তের হৃদয়োন্মাদী মাধুর্য্য, ভাস্কর-নির্ম্মিত প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তির কবিত্ব, কবিতার তারাময়ী ভাষা সৃষ্টি হইত না ও মানব জীবন-পথে কুসুম-বৃষ্টি করিত না। অসন্তোষই ইহাদিগের উৎপত্তির স্থান ; অসন্তোষই সভ্যতা-স্রোতস্বিনীর নির্ঝর।

(জ)

সাইরেণসেষ্টার—জানুয়ারী ১৮৮৫।

"আমি গত পত্রে তোমাদের বিলাতী আবাস-গৃহের কথা বলিয়াছি। ইংরাজ জাতি কিরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তাহা বলিয়াছি। এবার তাহাদের আহারের বন্দোবস্তের বিষয় কিছু বলিব।

"আমাদের দেশীয়ের আহার প্রধানতঃ চাউল ও ডাউল। অবশ্য ইহার আনুসঙ্গিক দুধ, ঘি, ব্যঞ্জন, ঝোল ও মৎস্যও বাঙ্গালীর খাদ্য। কিন্তু বড় মানুষেই প্রায় দুধ, ঘি খাইয়া থাকেন। জন-সাধারণ চাউল, ডাউল, ব্যঞ্জন ও আনুবীক্ষণিক মৎস্য-কণা খাইয়াই জীবন-ধারণ করে। ইহাতে অবশ্য সকলেরই পরিপুষ্টি-আহার হয় ; এমন কি, অনেক সময়ে অনেকের উদর আহারের পর বিস্ময়কররূপে প্রলম্বিত হইতে দেখা যায়, এবং বাত্যান্দোলিত সাগরের ন্যায় ধীরে ধীরে তরঙ্গায়িতও

ইংরাজ ও এদেশ-বাসীর আহার্য্য-বিচার ও কর্ত্তব্য-নির্ণয়।

হইতে থাকে। কিন্তু সে তরঙ্গে গর্জ্জন নাই, তাহাতে কোন হতভাগ্য পোত জলমগ্ন হয় না। তাহাতে জোয়ার-ভাটা আছে, সে তরঙ্গ ধীর, প্রশান্ত ও নয়নরঞ্জন। এমন কি, মধ্যে মধ্যে তাহাতে মৎস্যের ক্রীড়াও হইতে শুনা যায়। কারণ স্নান-কালে কাহারো কাহারো বলীত্রয়ের মধ্যে মৎস্যের অভদ্রোচিত প্রবেশ ও গুপ্ত অবস্থিতি প্রমুখ ঘটনা, কখন কখন যে শ্রুতিগোচর হয় নাই তাহা বলিতে পারি না।

"আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই স্থূলকায় ও কেহ কেহ বেশ লম্বোদর। তাহাতে যে কোনও সৌন্দর্য্য নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তাহাতে শারীরিক বলের শোচনীয় অভাব। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বঙ্গবাসীর খাদ্য কি তাহা দেখিলেই অনেক বোঝা যাইবে। বাঙ্গালীর খাদ্য প্রধানতঃ ফলমূলাদি,—তাহাতে যবক্ষারজান (Nitrogen) বড়ই অল্প। তাহার জন্য ফলমূলাদি শরীরের চরবি ও আয়তনই বৃদ্ধি করে মাত্র, পেশী বৃদ্ধি করে না, এবং তাহারই জন্য শরীরের পুষ্টিসাধনার্থ অধিক আহার আবশ্যক। কিন্তু তাহাতে শরীরের ভার-বৃদ্ধি ও বলের হ্রাস করে।

"এখন ইংরাজ জাতি বা সভ্য ইউরোপ কি খায়, দেখা যাউক।

"ইহা কাহারো অবিদিত নাই যে, ইংরাজ উচ্চ আসনে পা ঝুলাইয়া বসে, উচ্চতর আসনে খাদ্য রাখিয়া আহার করে। পরে, এ কথাও সকলে জানেন যে, তাহারা মুখে আহার তুলিতে রিক্ত হস্তের পরিবর্ত্তে 'কাঁটা-চামচ' ব্যবহার করে।

*   *   *   *

"আমাদের দেশে খাওয়ার বন্দোবস্ত অন্য প্রকার। কুশাসন বা কাষ্ঠাসন চেয়ারের, ও অনাবৃত মেঝে টেবিলের কাজ করে। আর রিক্ত হস্ত ছুরি, কাঁটা ও চামচের কার্য্য করে। ইহা অবশ্য পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ-প্রথা অপেক্ষা স্বল্পব্যয়সাধ্য ও সহজ। কিন্তু যাহা স্বল্পব্যয়-সাধ্য তাহাই সভ্যতানুমোদিত নহে, এবং যাহা সহজ তাহাই সুবিধাকর নয়। এক পদোপরি অন্য পদ স্থাপন করিয়া, বামকর তদুপরি রক্ষা করিয়া, সম্মুখানত শরীরে বাঙ্গালী আহার করিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, শরীরের এই প্রকার অবস্থা নিতান্ত অস্বাভাবিক। * আহার করিবার

* শেষ জীবনে কিন্তু কোনদিনও দ্বিজেন্দ্রলালকে সচরাচর কেহ বিলাতী 'ঢঙে' খানা খাইতে বা কাঁটা-চামচের দ্বারা আহার করিতে দেখে নাই!—গ্রন্থকার।

সময়ে শরীরের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা রাখা প্রয়োজন। একথা সকল ভাল চিকিৎসক একমনে স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। সঙ্কুচিত শরীরে আহারপ্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই মঙ্গল। কুশাসন ও কাষ্ঠাসনের পরিবর্ত্তে চেয়ার, এবং মেঝের পরিবর্ত্তে টেবিল ব্যবহারে কোন আপত্তি হইতে পারে না। এখন প্রায় প্রতি মধ্যবিত্ত ভদ্র-পরিবারের বাড়ীতেই চেয়ার-টেবিল আছে। তাহাতে আহার অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। ছুরি, কাঁটা ব্যবহার করা স্থবিধা, না করিলে ক্ষতি নাই।

"আমি জানি, আমার এ প্রস্তাবে অনেকেই অন্তরে সম্মত। কিন্তু লোকাচার ছাড়িতে অনেকে সম্মত নহেন। অনেকেই সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে ভীত। আমি জানি না, এ আশঙ্কার কারণ কি? সমাজ? কেন, প্রতি মনুষ্য লইয়াই ত সমাজ। সমাজ আমাকে চ্যুত করিবে? তাহাতে কি ক্ষতি কেবল আমারই? তাহার নয়? সমাজ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেও হীনবল হইল না? সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিল, আমি কি সমাজকে পরিত্যাগ করিলাম না? অবশ্য, প্রথমে ক্ষতি আমার, কিন্তু পরিণামে ঐ সমাজের ক্ষতি। নূতন সমাজ সংগঠিত হইবে, নূতন ও সভ্যতর আচার অনুষ্ঠিত হইবে। সমাজ সর্ব্বত্রই সংস্কারের প্রতি খড়গহস্ত। বাঙ্গালায় অনেক ব্রাহ্ম আছেন যাঁহারা হিন্দু-সমাজকে তুচ্ছ করেন। তাঁহাদের এ নব-প্রথানুবর্ত্তী হইবার বিষয়ে আপত্তি কি? তাহার কারণ বোধ হয়, ব্রাহ্মদিগের পুরা-প্রথানুবর্ত্তী প্রবৃত্তি বা (বাহ্যতঃ) পার্থিব বিলাস-বিদ্বেষিতা। কিন্তু আমার বোধহয় কুশাসন ও মেঝের পরিবর্ত্তে অধিকতর স্থবিধাজনক চেয়ার-টেবিল ব্যবহারে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধৃত হয় না! উন্নতি-অনুবর্ত্তিতাই ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব।* ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রথানুযায়ী নহে,—স্বাধীন, চিন্তাবান। প্রত্যেকেই বুঝিবেন—সভ্যতা পাপ নহে, স্থবিধানুসরণ ধর্ম্মের পথে কণ্টক দেয় না। কোন পার্থিব স্থবিধার যদি জীবনের স্থখ বর্দ্ধিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের সন্তোষ বই অসন্তোষ হইতে পারে না। ঈশ্বর স্বার্থপর নহেন। মানুষের সভ্যতা তাঁহারই গৌরব, মানুষের সামান্য স্থখ ও তাঁহার অভিপ্রেত।

* শেষ বয়সে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি তিনি একেবারেই ভিন্ন মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে, যে কারণেই হৌক, তাঁহার মনে শ্রদ্ধাবুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছিল।—গ্রন্থকার।

"দেখাযাউক এখন ইংরাজের খাদ্য কি প্রকার। ইংরাজের আহার প্রধানতঃ মাংস, রুটি ও আলু; পানীয়—সুরা বা মদিরা। মাংস প্রায়ই গো-মাংস (Beef) মেষ-মাংস (mutton) বা পক্ষী মাংস (fowl) ইত্যাদি। মধ্যবিত্ত লোকে সর্ব্বপ্রথমে ঝোল, (Soup,) পরে মাংস, পরে মিষ্টান্ন, (Pudding or Tart,) পরে ফলমূলাদি (Grapes or Berries) খাইয়া থাকে। ইহার সঙ্গে রুটি, পনীর (Cheese) ঘি (Butter) মৎস্য প্রভৃতিও তাহারা খাইয়া থাকে। কিন্তু আহার প্রধানতঃ মাংস, আলু, মিষ্টান্ন ও ফলমূলাদি। ইহা ইংরাজের প্রধান খাদ্য (Dinner)।

"ইংরাজেরা সর্ব্বশুদ্ধ চারিবার খায়। ১ম—উপবাস-ভঙ্গ (Break-fast)—বেলা ৮টা ও দশটার মধ্যে। তাহাতে তাহারা কখন শূকর-মাংস ও ডিম্ব, (অবশ্য অশ্ব-ডিম্ব নহে!) কখন মৎস্য, কভু বা পরিজ, (Porridge) রুটি ও মাখন এবং সকলেই চা বা কফি খাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ জলখাবার (Lunch)—বেলা ১টার সময়ে, তাহাতে প্রায়ই বাসি মাংস ভুক্ত হয়। পরে ৬টা ও ৭টার মধ্যে (Dinner)—প্রধান খাদ্য। তাহাতে ঝোল (Soup,) গরম মাংস, আলু, পুডিং বা টার্ট ও ফলমূলাদি খাওয়া হয়। পরে ৯টা বা তাহার পূর্ব্বে চা।

"ইংরাজের খাইবার নিয়ম বড অসভ্য রকম, তাহারা 'মিশিয়ে-গুশিয়ে' খাইতে জানে না। আগে খানিকটা ঝোলই খাইল, শুধু শুধু খানিক অর্দ্ধ-সিদ্ধ মাছই খাইল! তাহারা সিদ্ধ বা অর্দ্ধ-সিদ্ধ ৵৫ সের খানিক একটা মাংসখণ্ড টেবিলের উপর রাখিয়া, পরে কাটিয়া কাটিয়া খায়। আমাদের খাদ্যের প্রণালী অনেক সভ্যতর এবং পাক-প্রণালীও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বড় সুন্দর!

"একদিন বঙ্গদেশে একজন সাহেব আমাদের বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীদের যে রং কাল, তাহার কারণ, তাহারা হলুদ খায়। ইহার খুব গূঢ় কারণ থাকিতে পারে; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, ইংরাজদিগের অর্দ্ধ-সিদ্ধ, এই আস্বাদহীন মাংস অপেক্ষা আমাদের হলুদ-মিশ্রিত তরকারী অধিক উপাদেয়। অর্দ্ধ-সিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, পশুদিগের ভক্ষণ-প্রণালীর এক ধাপ উঁচু মাত্র। পশুরা অপক্ক মাংস ভক্ষণ করে, অসভ্য মানুষ অর্দ্ধ-সিদ্ধ মাংস খায়, এবং পূর্ণ-সভ্য মানুষ সুপক্ক মাংস খাইয়া থাকে। ইংরাজদিগের এই অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস-ভক্ষণ আমি তাহাদিগের

ভূতপূর্ব্ব বর্ব্বরতারই পরিশিষ্ট (Remnant) বলিয়া মনে করি। বঙ্গবাসীর এই প্রকার সুপক্ক ব্যঞ্জনাদি আহার তাহাদিগের ভূতপূর্ব্ব সভ্যতার অকাট্য প্রমাণ।

"তথাপি আমি বাঙ্গালীদিগের আহার-প্রথার কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে চাই। তাহারা মাংস যথেষ্ট পরিমাণে খায় না। তাহারা ব্যঞ্জনাদি উদ্ভিদই অধিক পরিমাণে আহার করিয়া থাকে। মানুষের কেবলই যে ফল-মূলাদি খাওয়া প্রকৃতির অভিপ্রেত নহে, তাহা তাহার দন্তের গঠন দেখিলেই প্রতীত হইবে। তাহাদের যেমন ফল-মূলাদি খাইবার দন্তও আছে, তেমনি তাহাদের (কুকুরের ন্যায়) মাংস-চর্ব্বী (Canine teeth) দন্তও আছে। তাই মানুষকে মাংসাশী অথবা সর্ব্বভুক্ জীব বলিয়া কার্লাইল নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—'Man is an omnivorous biped that wears breeches' এ কথার শেষাংশ সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, ইহার প্রথম অংশ বড়ই সত্য। লীটন-প্রণীত Kenelm Chillingly'তেতাহার পূর্ণতর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেখিবে।

"এখানে হয়ত কেহ কেহ বলিবেন যে, বঙ্গদেশের জল-বায়ু বিলাত হইতে স্বতন্ত্র। বিলাতে মাংস ভক্ষণ পোষায় ; তাহা না হইলে, ইংরাজ শীতে বাঁচিবে কেন ? কথাটা কতক সত্য। এখানে শীতের প্রাবল্যের জন্য অধিক মাংস-আহার নিতান্তই প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া কোন স্থানে কোন জাতি—বিনা-মাংস আহারে থাকিবে, ইহা অন্ততঃ প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়। বাঙ্গালী যথার্থই মোটে মাংস খায় না। দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার রাত্রে 'ডিনারে' মাংস খাইলে শারীরিক অবস্থার উন্নতি বই অবনতি হইবে না, ইহা নিশ্চয়। অবশ্য মাংস খাইতে হইলে ব্যঞ্জন এখন হইতে অল্পতর পরিমাণে খাইতে হইবে। আমাদিগের জাতীয় লোকদিগের ঐ প্রলম্বিত তরঙ্গায়িত উদরের কারণ—এই অধিক পরিমাণে ব্যঞ্জন-ভক্ষণ। শাক-ভোজী পশু ও মাংস-ভোজী পশুর শরীর-গঠনের তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীত হইবে। হস্তীর, গরুর, ছাগের শরীর ও সিংহের, ব্যাঘ্রের, কুকুরের অবয়ব তুলনা কর। শেষোক্ত জন্তুগণের কেমন সুন্দর পেশীময় অবয়ব ! আর, পূর্ব্বোক্ত জন্তুদের কিরূপ ভারময়, বলহীন দেহ। অবশ্য হস্তী বলবান জন্তু। কিন্তু কতখানি শরীরে সে বল ব্যাপ্ত তাহাও দেখিতে হইবে। হস্তী সিংহের মত ক্ষুদ্রতর জন্তু হইলে তাহার কতটুকু বল হইত ?

"এখানে মসৃণ ও মস্ত লম্বোদর প্রবীণ কেহ হয়ত বলিবেন, যে 'আমরা মাংস না খাইয়াই এত দিন বাঁচিয়া রহিয়াছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরাও ত মাংস খাইতেন না'। আমি তাঁহাদিগকে সসম্মানে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহাদের সহিত যদি কখন মাংসভুক্ কোন জাতির সহিত সংঘাত হইয়া থাকে, তাহাতে সেই জাতির দ্বারা পদাহত হইয়াছেন কিনা? আরও জিজ্ঞাসা করি, সদা সর্ব্বদা শশকের মত প্রাণভয়ে ভীত থাকিয়া জীবন-ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ কিনা।

"এখন সংক্ষেপে ইংরাজের শয়ন-ঘরের কথা কিছু বলিব। ইংরাজের শয়নঘর অন্য সকল ঘর অপেক্ষা (অবশ্য রান্না-ঘর ইত্যাদি বাদ) অল্প সজ্জিত। ড্রয়ার, আয়না, মুখ ধুইবার পাত্রাদি ও টেবিল, একটি 'স্প্রিং'-যুক্ত শয্যা, খানকতক ছবি, আর খান দুই চেয়ার,—ইহাই সে ঘরের আভরণ। শয্যাটি বেশ পুরু বটে। কিন্তু ইংরাজের গায়ের লেপের অবস্থা বাঙ্গালীর অপেক্ষা অসভ্যতর। দুইখানি কম্বল, তার উপর একখানি চাদর ও নীচে একখানি চাদর—ইহাই কম্বলের কাজ করে। তবে উপাধানটি অতিশয় নরম ও আরামময়।

ইংরাজের শয়ন-প্রথা।

"তবে এখানে একটি সুবিধা; মশা, মাছি, ও ছারপোকা নাই,—মশারীর আবশ্যক হয় না। ঘরে যে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় দুইটি জানালা থাকে, তাহা শয়নকালে বিষমরূপে বদ্ধ এবং দ্বারও দৃঢ়-বদ্ধ থাকে। অতএব, সেই প্রকোষ্ঠের বাতাসই নিদ্রিতের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের একমাত্র সহায়। আমাদের দেশের ন্যায় বিলাতে রাত্রে নির্ম্মুক্ত শ্যাম বাতায়ন দেখিবে না, কুসুম-পরিমলবাহী স্নিগ্ধ সমীরণ শয়নকক্ষে উদ্যানের সঙ্গীতময় কবিত্ব ঢালিয়া দেয় না; পূর্ণচন্দ্রের রজত করময় সৌন্দর্য্য নিদ্রিতের শয়ন-প্রকোষ্ঠে ক্রীড়া করে না; অযুত তারকার স্বপ্নময়, তমস-জড়িত কর-লেখা সে গৃহে প্লাবিত হয় না; এক কথায়,—এখানে শীতের জন্য অর্দ্ধ-নিদ্রিত মনুষ্য নিশীথের শোভা ও সঙ্গীত, মোহ ও মাধুরী, সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব অনুভব করিতে পায় না। আমাদের দেশের স্বর্গীয়, কল্পনা-জড়িত, প্রাণ-প্লাবী, নৈশ-সমীরণ এ দেশে কোথায়?

(ঋ)

৩০এ জানুয়ারী।

"আজ তোমাদের একটা নিজের বিষয় সংবাদ দিব। ইংরাজী আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে পরে বলিব।

"কাল কুমারী ম্যানিং'এর 'সোয়ারী'তে গিয়াছিলাম,—অবশ্য 'সোয়ারী' অর্থে পাল্কী নামক মনুষ্য-যান মনে করিও না! 'সোয়ারী' অর্থ নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের সমাগম। এ 'সোয়ারী' (Soiree) বড় সঙ্গীন ব্যাপার। ইহা ফরাসী সভ্যতা-প্রসূত এক অদ্ভূত কাণ্ড! ইহাতে নিমন্ত্রণ হয়, অথচ দস্তর মত খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত কিছুই নাই। লোকের সমাগম হয়, অথচ বসিবার স্থান নাই। তুমি হয়ত ভাবিবে, এ এক রকম সভা (Meeting); কিন্তু তাহাতে বক্তৃতা নাই, 'Resolution' নাই, সুরেন্দ্রবাবু নাই। তবে যদি ভাব, এ এক রকম 'conversazoine'; কিন্তু তাহাতে বাদানুবাদ নাই ও কোন বিশেষ বিষয় নাই! এক কথায় 'সোয়ারীর' সবই 'কাকস্য পরিবেদনা'! এখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মিলিত বন্ধুবর্গের কথা-বার্ত্তা, সাদর সম্ভাষণ ও নূতন আলাপ হয়।

মিস্ ম্যানিংএর 'সোয়ারী' (soiree)

"কুমারী ম্যানিং'এর এ সভা ভারত-হিতার্থিনী। লণ্ডনস্থ ভারতবাসী ও ভারত-বন্ধু ইংরাজের এ স্থানে সম্মিলন হয়। যিনি যাঁহার সহিত ইচ্ছা, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একপার্শ্বে কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন, তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না; সাহেব-রমণী বা সাহেবের গায় ঘেঁস লাগিলে পুলিস হাঙ্গামা করিবে না, **বেত্রাঘাত করিবে না, সাহেব ঘুসী মারিবে না। তুমি বলিবে তা আর বিচিত্র কি? অবশ্য বিলাতে তাহার কিছুই বৈচিত্র্য নাই, * *। আমার যেন স্মরণ হইতেছে, কৃষ্ণনগরে বাসন্তী মেলায় ছাত্রদিগের ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে গুটিকতক ছাত্র ভীড়ে বাঁশের বেড়া ভাঙ্গিয়া কোন ইঙ্গ-বঙ্গ মহিলার গায়ে পড়িয়া যাওয়ার জন্য কোন্ এক সাহেবের বেত্রাঘাত সহ্য করিয়াছিল! এখানে ইংরাজ-মহিলা বাঙ্গালীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে সতত উৎসুক। কি স্বর্গ-নরক প্রভেদ!

"কুমারী ম্যানিং স্বয়ং সকলের সাদর সম্ভাষণে নিযুক্ত। তিনি ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষিনী প্রৌঢ়া, চির-প্রসন্না রমণী। তিনি একখানি ভারত বৈষয়িক প্রবন্ধপূর্ণ পত্রিকা চালাইয়া থাকেন।

"আমার একটি অজানিত-পূর্ব্ব ইংরাজের সহিত বহুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তিনি 'ইলবার্ট' বিল, রিপণ, ইঙ্গ-বঙ্গ ইত্যাদি ভারতীয় অনেক বিষয় কথাবার্ত্তা কহিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজ-রাজত্বে বড সন্তুষ্ট নহে। তাহারা বিদ্রোহ করিবার চেষ্টায় আছে, এবং তিনি কি তাঁহার কোন বন্ধু, (আমার ঠিক মনে হইতেছে না) ভারত-বিদ্রোহ আশঙ্কায় পরিবার লইয়া যাইতে সাহস করিতেছেন না। আরও একটি সাহেব সাইরেনসেষ্টরে আমাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, সব মিথ্যা।

"এ সভায় অনেক ইংরাজ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কেহ কেহ সন্ধ্যাবেশে সজ্জিতা, (Evening-dress) পুরুষেরাও সন্ধ্যাবেশ-ভূষিত। তিনটি ভারতীয় মহিলা ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই স্বজাতীয় পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছিলেন। ভারতীয় পুরুষদিগের ন্যায় বেশ-পরিবর্ত্তন করেন নাই। গুটিকতক ভারতীয় পুরুষও স্বজাতীয় পোষাক পরিয়া আসিয়াছিলেন। ভারতীয় মহিলাগণকে, ইংরাজী পোষাকধারিণী হইলে তাঁহাদের যেরূপ দেখাইত, তদপেক্ষা শতগুণ ভাল দেখাইয়াছিল! তাঁহাদের মধ্যে একজন রূপবতী মহিলা স্বজাতীয় বেশে বিবিদিগের অপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া প্রতীয়মানা হইয়াছিলেন। তিনিই সেদিন সভার দৃষ্টির কেন্দ্র হইয়াছিলেন। বিলাতী রমণীগণও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে ব্যগ্র, এরূপ বোধ হইল। তিনি যেখানেই দাঁড়ান সেইখানেই বৃটিশ রমণীর সমাগম, ইংরাজ পুরুষের প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি। একজন ইংরাজ পুরুষ আমাকে তথাস্থ কোন একটি ভারতীয় রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাবে বোধ হইল, তিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে বিশেষ উৎসুক।

"এই সভায় বহু শ্যামমূর্ত্তির সমাগম হইয়াছিল। বম্বে, মান্দ্রাজ, কলিকাতা, বরদা প্রভৃতি স্থানের লোক একত্রে সমাগত। দুই তিনটি ইংরাজী ও ইটালীয় গান গীত হইল। একটি রমণী পরিষ্কার চাঁছা, খুব জোরওয়ালা কণ্ঠে ক'টি গান গাহিলেন। তবু আমার তত ভাল লাগিল না। দুই একটি ভারতীয় পুরুষ তাহাতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া নিতান্ত অশিষ্ট আচরণ করিয়াছিলেন। ইংরাজী সঙ্গীত অবশ্য বিলাতে নবাগতের ভাল না লাগিবারই কথা। কিন্তু শুনিতে শুনিতে হাস্য করা অভদ্র আচরণের সীমা। চা কফি খাওয়ারও বন্দোবস্ত ছিল।

যাহার ইচ্ছা তিনি খাইয়া আসিলেন। পরে, রাত্রি ১১টা ও ১২টার মধ্যে সভা সাঙ্গ হইল; এবং বাড়ি আসিয়া, আমার কেবল মিছামিছি খরচ বোধ হইল। সভা এখানে অনেক রকম আছে। 'সোয়ারী' (Soiree) এখানে বিশেষ প্রচলিত নয়। 'কথোপকথন সভা' (Conversazoine) বক্তৃতা (Meeting) খোলা-বাতাস সভা (Open-air meeting) রাজনৈতিক ভোজন-সভা (Political dinner)—এই সবই নগরে নগরে দেখিবে। পথ দিয়া হাঁটিয়া যাও দেখিবে, একজন একটি উঁচু স্থান পাইয়া চেঁচাচ্ছে—'ভাই মদ ছাড়িয়া দাও, যে মদ খায় সে মাতাল, জুয়াচোর, বদমাইস, সয়তানের বন্ধু ও মিথ্যাবাদী।' অমনি শ্রোতার মধ্য হইতে একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—'কি তুই যে আমাকে গালাগালি দিস্, তোর তো বড় স্পর্দ্ধা'! এই বলিয়াই ঘুসী। মহা গোলমাল, চীৎকার, ঠেলাঠেলি, পরে সভাভঙ্গ। আর একস্থানে দেখিবে, কেহ বলিতেছে—'গ্লাড্‌ষ্টোন আমাদের সর্ব্বনাশ করিল, তোমরা একত্র হও, গ্লাড্‌ষ্টোনকে তাড়াও, —তাহা না হইলে দেশের উদ্ধার নাই।' আর এক জায়গায় একজন একটা নিশান লইয়া চীৎকার করিতেছে—'তোমরা নরকে ডুবিতে যাইতেছ, আমাদের কাছে আইস; নইলে, সর্ব্বনাশ হইবে। আইস, আইস, আইস।' এইরূপ স্থানে স্থানে নৈতিক, রাজনৈতিক, ধার্মিক (!) সব বিষয়েই খোলা জায়গায় বক্তৃতা হইতেছে। প্রায় সকল স্থানেই বক্তা অশিক্ষিত, মূর্খ, নির্ব্বুদ্ধি। কেহ কেহ ঘুসী মারিতেও খুব মজবুত। তাহাদের বক্তৃতায় কোন যুক্তি নাই, কেবল চীৎকার, কোলাহল, গালাগালি ও ঘুসাঘুসী। এ সবও অন্যান্য সভার বিষয়ে পরে বলিবার বাসনা রহিল।"

বিলাতের সভা।

(ঞ)

৫ই ফেব্রুয়ারী,১৮৮৫।

"বিলাতের বাস-গৃহ, পরিচারিকা, আহার ও শয়নের বিষয় পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি। এবার বিলাতের দোকান সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলিব।

"আমাদের দেশীয় যে দোকানে যাও, কোথায়ও বেশ সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতা দেখিবে না। —কিন্তু এখানে পুরবাসীর বাসগৃহ যেরূপ পরিষ্কার দেখিবে, প্রতি

দোকানও সেইরূপ সুন্দর, পরিস্কার, সুসজ্জিত দেখিতে পাইবে। রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া যাও, রাস্তায় দুইধারে সুন্দর, নয়ন-মনোরঞ্জক নেত্রাকর্ষী বিবিধ বিপণী দেখিতে পাইবে। দোকানগুলির প্রায় সকলেরই সম্মুখের আবরণ একখানি সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত কাঁচ। এত বড় একখানি অখণ্ড কাঁচ আমি বঙ্গদেশে কখনও দেখি নাই। দূর হইতে হঠাৎ বোধহয় যে দোকানের সম্মুখে কোন আবরণই নাই। নিকটে গিয়া স্পর্শ করিয়া দেখিলে ভ্রম দূর হয়। এই বিষয় হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, ইংরাজের বালকগণ খুব ধীর ও শান্ত। তাহাদের বাল-সুলভ চপলতা নাই; কারণ, কোন দোকানের কাঁচ বালক-হস্ত প্রক্ষিপ্ত ইট বা প্রস্তরাহত বলিয়া বোধ হয় না। বাহির হইতে কাঁচের মধ্য দিয়া নানাবিধ বিক্রেয় বস্তু সজ্জিত দেখিতে পাইবে। রাত্রে দোকান সুন্দররূপে আলোকিত হয়। ক্রেতাকে আকর্ষণ করিবার জন্য যে সব ব্যবস্থা তাহা তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে না। বোধ হয় ক্রেতার এখানে একটি বিষয় সুবিধা—দাম লইয়া বিক্রেতার সহিত বাদানুবাদ করিতে হয় না। আমাদের দেশে সাধারণ দোকানদারের আচরণে ভদ্র-লোকের তাহাদিগের নিকট যাইতেই প্রবৃত্তি হয় না। কেবল পুস্তকের দোকান আমাদের দেশের ভদ্রলোকদের গম্যস্থান। তুমি একটি দোকানে গিয়া বিক্রেতার সঙ্গে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ধরিয়া মহা আন্দোলন, গোলযোগ ও তর্ক না করিলে মূল্যের মীমাংসা হয় না, কখন কখন তাহাতেও হয় না। এবং এই দামের জন্য ক্রেতাকে এক দোকান হইতে আর এক দোকানে কিছুকাল কেবল পরিভ্রমণ করিতে হয়। * * * * "আর এখানে অধিকাংশ দোকানেই জিনিষের উপর তাহার দাম লেখা আছে। তোমার দোকানদারকে দাম জিজ্ঞাসাও করিতে হইবে না। অর্থস্থলী লিখিত দামে সম্মত হইলে জিনিষ কিনিয়া লইয়া যাও। দোকানদারকে দাম জিজ্ঞাসা করিলেও সে যথার্থ দামই বলিয়া দিবে। তাহার সহিত গোলমাল করিতে হইবে না। দোকানদারেরা খুব সম্মানময়। তুমি দোকানে জিনিষ কিনিতে গেলে—'Sir' (মহাশয়)—সম্বোধন করিবে; যাহা দেখিতে চাও, দেখাইবে; অবশ্য সে জিনিষের একটু প্রশংসা করিবে; পরে, তুমি দাম দিলে 'Thank you, sir' (কৃতার্থ হইলাম) বলিয়া, তোমাকে বিদায় দিবে। তুমি যদি জিনিষ হাতে করিয়া লইয়া যাইতে না চাও,

বিলাতের দোকান

—তোমার নাম-ধাম লিখিয়া দাও, বিক্রেতা জিনিষ পাঠাইয়া দিবে, প্রেরণের জন্য কিছু অর্থও চাহিবে না। এখানে দোকানদারদের সাধুতা ও সত্যপরায়ণতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য। তুমি যাহা ফরমায়েস দিতে চাও, দিয়া যাও; টাকা দিয়া যাও বা না-ই যাও, নাম-ধামাদি লিখিয়া দিয়া গেলে, যথাস্থানে ক্রীত দ্রব্য প্রেরিত হইবে। তোমার উপর দোকানদারের অবিশ্বাস নাই,—দোকানদারের উপরও তোমার অবিশ্বাস থাকিবার কারণ নাই। এখানে বিক্রেতা জিনিষের দাম, যথার্থ দাম অপেক্ষা প্রায়ই একটু বেশি লয়। তাহার কারণ বোধ হয় যে, তাহাদের অনেক ব্যয় করিতে হয়। একটি সামান্য রুটিওয়ালাকেও বাসার ভাড়া লণ্ডনে প্রায় মাসিক দুইশত টাকা করিয়া দিতে হয়। যতদিন আমাদের দেশের বিক্রেতাগণ এই ইউরোপীয় সাধুতা, সম্মান-পরায়ণতা, সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে শিক্ষা না করিবে ততদিন তাহাদের দুর্নাম ঘুচিবে না ;—তাহাদের অবস্থারও উন্নতি হইবে না। ইহার জন্য বঙ্গেও ইংরাজ দোকানদার সৌভাগ্যশালী। * * আমাদের বঙ্গীয় দোকানের দুরবস্থার অবশ্য অন্য কারণ ও আছে। আমাদের দেশের দোকানদারগণ বড় গরীব। ইহারই জন্য তাহাদের দোকান ক্ষুদ্র, অপরিষ্কার ও আকর্ষণহীন। লণ্ডনে রাজ-প্রাসাদের ন্যায় অসংখ্য হর্ম্ম্য কেবল দোকান। এখানে রাস্তার সৌন্দর্য্যই—এই সজ্জিত, সুরম্য দোকান। পথ দিয়া চলিয়া গেলে খুব গরীব লোকও সজ্জিত দ্রব্যরাজির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া যায়। আমার এরূপ বিশ্বাস যে, এই দৃষ্টিপাত তাহাদের দারিদ্র্যজাত কষ্টের কিছু লাঘব না করিয়া হয়ত তাহা বাড়াইয়া দেয় ; অথবা তাহাদিগের মনে ধনী হইবার বলবতী বাসনার সঞ্চার করে। তবে ইহা আমার পূর্ব্ব-কথিত বৃটিশ জাতির বর্ত্তমান অসন্তোষের একটি হেতু। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই—'গোপাল যাহা পায়, তাহাই খায় ; ভাল খাইব, ভাল পরিব, বলিয়া আবদার করে না'। যতদিন বঙ্গবাসী 'রাখাল' হইতে না শিখিবে, ততদিন তাহাদের পারিবারিক সুখ-সচ্ছন্দতাও ঘটিবে না।

* *　　* *　　* *

এখানে ময়রা-দোকানে মাছি নাই, বোলতা নাই। সন্দেশ থাকে থাকে সাজান থাকে না। ইহাদের মিষ্টান্ন পরিষ্কার বোতলে থাকে। এ ময়রা সন্দেশ

বা রসগোল্লা তৈয়ার করে না। তরল, রসহীন, বিবিধ রঞ্জিত, সুন্দর মিঠাই'এর দোকান—এদেশেরও শিশুদের বড় প্রিয় স্থান।

(ট)

২৫এ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৫।

"বিলাতে পরিচিতের সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা হইলে 'How do you do'? —'মহাশয় কেমন আছেন?' বলিতে হয়। তবে পথে, ঘাটে, যখন-তখন দেখা হইলে—'Good morning' 'সুপ্রভাত', 'Good evening' বা 'Good afternoon'—'সুসন্ধ্যা' বলিলেই চলে।

সামাজিক ব্যবহারাদির যৎকিঞ্চিৎ,

* *   * *   * *

"আমাদেরও ভদ্রতা যে নাই তাহা বলি না। যদি কোন বাঙ্গালী পথে কেহ গামছা কাঁধে স্নান করিতে যাইতেছে দেখিতে পান, তবে হয়ত বলিবেন,—'কি মহাশয় স্নান করিতে যাইতেছেন?' (যদিও সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।) অথবা 'মহাশয় ভাল আছেন?' যদি তাহার সঙ্গে বহুদিনের 'ভাব' (Warmth of feeling) থাকে, তবে বলিবেন—'আরে কামিনী বাবু যে! বলি, আপনার যে দেখাই পাইবার যো নাই।' কামিনী বাবু হয়ত বলিবেন —'আর মহাশয় কি করি, সময় পাইয়া উঠি না।' সুখের বিষয়, আমাদের আলাপ-পরিচয়ে দুর্ব্বৃত্ত সয়তানকে (Devil) লইয়া কোন আন্দোলন হয় না। আমরা তাহার পরিবর্ত্তে হয়ত বন্ধুর ঘাড়ে এক টপেটাঘাতই করিয়া দিই।

"পথে যদি কোন পরিচিতা রমণীর সহিত দেখা হয়, ত' এখানে—'Good morning Miss বা Mrs Jones!' বলিয়া টুপী খুলিতে হয়। Miss বা Mrs Jones'ও 'Good morning' বলিয়া মস্তক নত (Bow) করিবেন। তোমার সঙ্গে যদি তোমার কোন বন্ধু থাকেন, এবং তিনি সে রমণীর অপরিচিত, হয়েন, তাঁহারও টুপী খুলিতে হইবে। ইহা ভদ্রতা।

আমাদের দেশে পথে ঘাটে কোন ভদ্র-মহিলার 'টু' শব্দটি পর্য্যন্ত পাইবার যো নাই। অতএব রমণী জাতির সঙ্গে এ ভদ্রতা রাখিবার আবশ্যকও হয় না।

* *   * *   * *

"এখানে পথে কোন মহিলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহাকে দেওয়ালের দিকের পথ দিতে হইবে। ইংরাজীতে একটি কথাই আছে—'The weakest goes to the wall' (তুর্ব্বলতম ব্যক্তি দেওয়ালের দিকে যায়।) ইহাই বোধহয় এ ইংরাজী প্রথার গূঢ় কারণ; তাহা না হইলে রমণীরাই যে দেওয়াল একচেটে করিয়া লইয়াছেন তাহার কারণ কি? তুমি যদি দেওয়ালের নিরাপদ দিক গ্রহণ করিয়া, শকটাদিপূর্ণ বিপদ-সঙ্কুল, রাস্তার খোলা দিক্ তাঁহাকে দেও, তাহা হইলে তুমি বর্ব্বর ও কাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইবে।

"পথে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা এখানে ঘোর অসভ্যতা। আমাদের দেশের ছাত্রেরা পথ দিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে স্থরেন্দ্র বাঁড়ুয্যে বড় বক্তা, কি, কে, সি, বাঁড়ুয্যে † বড় বক্তা,—এই লইয়া পথের মধ্যে মহা হুলস্থূল বাধাইয়া দেয়। এখানে সে সব হইবার যো নাই। পথে অতি আস্তে কথা কহিতে হইবে, নতুবা উন্মাদাগারে নীত হইবার খুবই সম্ভাবনা; অন্ততঃ লোকে মনে করিবে, তাহাই তোমার যোগ্য বাসস্থান। আমাদের দেশে ৪।৫ জন শান্ত কৃষক পথ চলিবার সময়ে হাততালি সহকারে, 'আরে রামশশী, তুই হবি বনবাসী, কে আমারে ডাক্‌বে মা বলে'—মহানন্দে এই গান ধরিয়া দিয়াছে; অথবা, কোন আমোদ-প্রিয় শিক্ষিত যুবক তদপেক্ষা একটু নীচু স্বরে করুণরসাত্মক প্রেম-গীত গাহিয়া থাকেন। এখানে এরূপ করিলে গায়ককে নিঃসন্দেহ উন্মাদাগারে যাইতে হয়। পথে শিষ পর্য্যন্ত দেওয়া অসভ্যতা। তবে, নির্জ্জন প্রান্তরে কেহ হয়ত দেখিবে, গুণ্ গুণ্ করিয়া প্রায় মনে মনে গাহিতেছে—'Wait till the clouds roll by Jeunie, wait till the clouds roll by!' অথবা একাকী ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে শিষ দিতে দিতে চলিয়াছে। কিন্তু তুমি হয়ত বলিবে "তবেই হইল;" কিন্তু এটা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, * * যেখানে লোক-সমাগম নাই সেখানে ভদ্রতার প্রয়োজনও নাই, এবং সেখানে শিষ দেওয়াতেও অভদ্রতা হয় না।

"পথে চুরুট খাওয়াও অভদ্রতা। আমাদের দেশে সে ভয় নাই, কারণ কেহ কিছু হুঁকা হাতে করিয়া পথ দিয়া তামাক খাইতে খাইতে যায় না। কিন্তু চুরুট

† স্বদেশ-প্রেমিক, পুণ্যশ্লোক ৺ কালিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এ পোড়া দেশ এমনই অকৃতজ্ঞ ও অন্তসারশূন্য যে, এমন-একজন অকৃত্রিম দেশ-সেবকের নামটিও আজকাল আর ভুলিয়াও কেহ করেন না।—গ্রন্থকার।

যেরূপ শীঘ্র বঙ্গদেশে প্রচলিত হইতেছে, তাহাতে এ ভয়ের কারণ যে একেবারে নাই তাহা বলি না। আমার বোধ হয়, চুরুট অপেক্ষা হুঁকায় তামাক খাওয়া অনেক স্বাস্থ্যকর ও প্রীতিপদ। এখানে লোকে সর্ব্বদাই 'ফুক্ ফুক্' করিয়া চুরুট খায়। * * আমাদের দেশে লোকে 'একবার হুঁকোটা দেওত হে, একটা টান্ দিয়া দি'—বলিয়া, যে দুই একটা টান টানিয়াই নিরস্ত থাকে, সেটা খুব ভাল। তবে যে কেহ কেহ অলস ভাবে শুইয়া, সুদূরস্থ গুড়্গুড়ির নল মুখে দিয়া ক্রমাগতই তামাক খান, এরূপ আলস্যের আমি প্রশংসা করি না। উহা পরিহার্য্য।

"পথে যদি এক অথবা অধিক বন্ধুর সঙ্গে যাও, তালে তালে পা ফেলিতে হইবে। * * যেন রণ-বাদ্যের সহিত তালে তালে পা পড়িতেছে। তুমি বলিবে—'এত কারীকুরির আবশ্যক কি বাপু? যেমন তোমার স্বাভাবিক চলন সেইরূপ চল।' কিন্তু তোমার এটা স্মরণ রাখা উচিত, ইহা পায়ের সংযম (Discipline) বই আর কিছু নয়।—'Civilisation is nothing more or less than discipline,—discipline not only of the mind, but of the limbs.' অর্থাৎ সভ্যতা সংযম ভিন্ন আর কিছু নয়—মনের ও শরীরের সংযম, মস্তিষ্কের ও অবয়বের বিকাশ। বর্ব্বরতাই সংযমহীন, স্বভাবানুবর্ত্তী। অবশ্য, আমি স্বাভাবিকতা ভালবাসি, কিন্তু সে অন্তরের স্বাভাবিকতা; সে স্বাভাবিকতা হৃদয়ের অকাপট্য, ভালবাসার অনাবৃতত্তা, বাক্যের সরলতা। তাহাই ভাল, আর তাই আমি ভালবাসি।

কিন্তু বৃত্তির সংযম, মস্তিষ্কের অনুশীলন, অঙ্গের পরিচালনা কপটতা ও অসারল্য নহে। আমরা বঙ্গদেশে মেষপালের মত হাঁটি; 'মটর্ মটর্' ক্রমাগত এই শব্দ। তালে তালে অনেকের একত্র দর্প সহকারে চলা আমার বড় ভাল লাগে (আমার কেন—সকলেরই লাগে)। এখানে ১২।১৩ বৎসরের ছোট ছোট মেয়েরা পর্য্যন্ত দুই জন বা তিন জন বা বহুজন একত্রে কেমন সুন্দর তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া যায়! যেন স্বাভাবিকই পা পড়িতেছে বোধ হয়। অথচ কেমন মনোহর! ১২।১৪ জন ছোট মেয়ে বা ছেলে, প্রতি সারিতে ২জন করিয়া, ৬ কিম্বা ৭টি সারিতে, তালে তালে দর্প সহকারে, অবনত মুখে চলিয়াছে,—দেখিতে কি সুন্দর! ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, যে জাতির প্রতি

বালক-বালিকার পর্য্যন্ত গতি সংযত, সে জাতির সামরিক ক্ষমতা যে এইরূপ হইবে তাহা আর বিচিত্র কি?—সে জাতি যে রণ-বাদ্যের সহিত নাচিতে পারিবে, সগর্ব্বে বীরদর্পে অকুতোভয়ে দৃঢ়পদে শত্রুর বিপক্ষে ধাবমান হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

(৯)

৫ই মার্চ্চ, ১৮৮৫ সাল।

"আজ তোমাদের বিলাতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় কিছু বলিব,—যদি কিছু মনে না কর। রাজনীতির নামে বাঙ্গালী ঘোর চটা। আমি নিজেই রাজনীতি দেখিতে পারি না। তবে প্রতিদিন ইংরাজের আচার-ব্যবহারই বা কাঁহাতক লক্ষ্য করি? নূতনত্বের খাতিরেও দুই একটা রাজনীতির কথা বলিতে হয়।

বিলাতের তৎসাময়িক রাজ-নীতির যৎকিঞ্চিৎ।

"বিলাত ভারতবর্ষ নহে। (তুমি হয়ত বলিবে 'কি নূতন কথাটা!!') এখানে লোকে দিনে ঘুমায় না, (যদিও আমি মধ্যে মধ্যে দিনে ঘুমাইয়া থাকি।) তাহারা দেশের খবর-'টবর' লইয়া থাকে। সামান্য কৃষকও রাস্তায় খবরের কাগজ হাতে করিয়া যায়। গাড়োয়ান কোন জায়গায় গাড়ী থামিলেই, একটু সুবিধা পাইয়া, পকেট হইতে খবরের কাগজ বাহির করিয়া পড়ে। চাকরাণী, ছেলেটিকে কোলে করিয়া না গেলেও, ছোট ছেলের গাড়ী ঠেলিতে ঠেলিতে, খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে যায়, এবং রাজনীতির কঠিন প্রশ্ন লইয়া তর্ক-বিতর্কও লাগাইয়া দেয়। খার্টুমের পতন (Fall of Khartoum) অর্থাৎ মাদী কর্ত্তৃক খার্টুম অধিকার শুনিয়া পরিচারিকা বলিল—'ইহা গ্লাড্‌ষ্টোনের রাজনৈতিক মূর্খতার ফল।' বেচারী গ্লাড্‌ষ্টোন্!

"ছেলে বেলায় বোধ হয় Goldsmith' এর 'Citizen of the World' নামক গ্রন্থে একজন পরিশ্রান্ত ভারমুক্ত মুটে ও এক কারাগারস্থ কয়েদির রাজনৈতিক কথোপকথনের বিষয় পড়িয়াছিলাম। তাহা পড়িয়া যে আমোদ পাই নাই তাহা বলি না। কারণ, যদি একজন সামান্য মুটে, কয়েদী বা দাসীও গ্লাড্‌ষ্টোনের রাজনীতির নিন্দা করে আর বলে যে, গ্লাড্‌ষ্টোন ঘোর রাজনৈতিক

মূর্খ তাহা হইলে হাস্য-সম্বরণ করা নিশ্চয়ই বিশেষ প্রশংসানীয় আত্ম-সংযম বলিতে হইবে। কিন্তু দেশের পক্ষে ইহা সামান্য হিতের ও গৌরবের বিষয় নহে। গ্লাড্‌ষ্টোন স্বদন সমরে যে রাজনৈতিক ঘোর ভুল করিয়াছেন, সে বিষয়ে উন্নতিসাপেক্ষ (Liberal) দলও স্বীকার করেন। 'দৈনিক সমাচার' (Daily news') পর্য্যন্ত গ্লাড্‌ষ্টোনের যে ভুল হইয়াছে তাহা প্রকারান্তে স্বীকার করিয়াছেন। গ্লাড্‌ষ্টোনের রাজনৈতিক বুদ্ধি লইয়া সামান্য দাস-দাসীর তর্ক করা হাস্যকর হ'লেও, তাহারা এ সবের ফলাফল দেখিতে ও বুঝিতে পারে। যে রাজনীতির ফল বিষময়, সে রাজনীতিও যে মন্দ ও অহিতকর হইবে, ইহা স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত। প্রত্যেকেই এ বিষয়ে বুঝিতে পারে। অতএব ফলাফল বিষয়ে সকলেরই তর্ক করিবার অধিকার আছে।

ইংরাজ জাতি বড় অহঙ্কারী। তাহারা তাহাদের ক্ষুদ্র দ্বীপকে অমরাবতী ও পৃথিবীর ভাবী কেন্দ্র মনে করে। সত্য তাহাদের গৌরবের বিষয় আছে। তাহাদের বাণিজ্য, বিস্তীর্ণ আধিপত্য, তাহাদের সৈন্যের বাহুবল, বীরত্ব ও সাহস গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। আর, তাহাদিগের সাহিত্য একটি অমূল্য রত্ন। অমর সেক্ষপিয়র, মিণ্টন, শেলি ও বাইরণ, পীট্ ও বার্ক, স্কট্ ও জর্জ্জ ইলিয়ট, বেকন ও নিউটন, ফ্যারাডে ও টিণ্ডাল, বেন্থাম ও মিল, ডারউইন ও স্পেন্সার,—প্রত্যেকেই জগতের সাহিত্যে একটি একটি উজ্জল রত্ন। এ সকল রত্ন লইয়া কে গৌরব না করিয়া থাকিতে পারে? তথাপি তাহারা তাহাদের যতদূর অহঙ্কার করিবার অধিকার তাহা অতিক্রম করে। জার্ম্মানীও গেটে, সিলার, হুমবোল্ট ও সহস্র অন্য মনীষীর নাম করিতে পারে। ফ্রান্সও রুসো, মলেয়ার, লাপ্লাস, লাভয়িজিয়র প্রভৃতি লইয়া অহঙ্কার করিতে পারে। কিন্তু ইংরাজের বিশ্বাস যে, জগতে একা সে-ই পরাক্রান্ত, বুদ্ধিমান।

ইংলণ্ড ও স্কট্‌লণ্ড

"বিলাত শুধু ইংলণ্ড নয়। বিলাত—ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, আয়র্লণ্ড জড়াইয়া। কিন্তু এ মিলন যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা প্রমাণ করিতে গোর থেকে প্রেতাত্মার আবির্ভাব দরকার করে না। স্কট্‌লণ্ডবাসী ইংলণ্ডবাসীকে ঘৃণা না করুক, অন্ততঃ তাহার সহিত হরিহরাত্মা নয়। স্কট্‌কবি নিজের পাহাড়ময় দেশেরই গরিমা গান করেন 'The land of lakes The land of lakes,' 'Auld lang syne' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ গান ইংলণ্ডের

মহিমা কীর্ত্তন নহে। ইহারা—স্কচ্ জাতিরা অত্যন্ত স্বদেশপ্রেমী। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বহুদূর যাইতে হয় না। ইংরাজজাতি যে স্কচ্জাতিকে তত ভালবাসে না, ইহা একটি দেদীপ্যমান সত্য। স্কচ্জাতি স্বাধীনচেতা উন্নত-চরিত্র, বীরজাতি; স্কট্লণ্ড বীরের জননী। তাহাদের দেশও ক্রস, ওয়ালেসের প্রসূতি। তাহাদেরও বিস্তৃত সাহিত্য আছে; তাহাদের স্কট্, বর্ণস্ ও কার্লাইল আছে। তাহারা কেন গৌরব করিবে না? ইংরাজজাতি স্কচ্দিগের সহিত বহুদিনব্যাপী সমর প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে। ইংলণ্ড স্কট্লণ্ডের শাসয়িতা বা শাসয়িত্রী। চিরকাল প্রায় শত্রুভাবেই রাজত্ব করিয়াছে। ইংলণ্ড বালক বর্ণ্ কিলিক্রাঙ্কি ভুলিতে পারে না, স্কট্লণ্ডও Falkrik প্রভৃতিকে কখন ভুলিবে না। সুন্দরী, রাজনৈতিক-পারদর্শিতা-সত্বেও হীনচেতা, রূপ-গর্ব্বিতা, নিষ্ঠুরা এলিজাবেথ্ কর্ত্তৃক হতভাগিনী মেরীর হত্যা স্কট্লণ্ড বিস্মৃত হইবে না। তাহারই জন্য দুই জাতির বিদ্বেষ এখনও যায় নাই। তাহারই জন্য স্কচ্জাতি বহুদিন প্রপীড়িতা জন্মভূমিকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না।

আমরা অনেক সময়ে অনেককে ভালবাসি, কিন্তু কতখানি ভালবাসি তাহা বুঝিতে পারি না। ভালবাসার পাত্র অপমানিত বা প্রপীড়িত হইলে, ক্রোধের সহিত আমাদের ভালবাসার স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া ওঠে। তখন ভালবাসার পাত্রের নিমিত্ত স্বার্থ-ত্যাগের পরিমাণে প্রেমের পরিমাণ করিতে সমর্থ হই। স্কট্লণ্ডও যদি ইংরাজ-প্রপীড়িত না হইত, তাহা হইলে এত স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস উঠিত না। স্কচ্জাতির দেশ-প্রেমিকতা গভীর, অপরিমেয়। প্রতি গানেই তাহার স্ফুলিঙ্গ বিদ্যমান।

(ড)

৫ই বৈশাখ, ১২৯২।

"গত পত্রে স্কচ্ ও ইংরাজের পরস্পরের প্রতি অসন্তোষের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। দুই জাতি এক হইলেও, তাহাদের মধ্যে তেমন প্রীতি ও অনুরাগ নাই, বরং অন্তরে অন্তরে বিরাগের অঙ্কুর আছে।

"আইরিষ্গণের সহিত ইংরাজের দা-কুমড়া সম্পর্ক। আইরিষ্গণ ক্রমাগত গোলযোগ করিতেছে। ইংরাজ রাজত্বের উপর নাকি তাহাদেরও দারুণ

অসন্তোষ। আইরিষ্‌দিগের প্রতি ইংরাজের ভূতপূর্ব্ব অবিচারের কথা ইতিহাসজ্ঞ কাহারও অবিদিত নাই। তাহারা সে সব ভুলিতে পারে নাই। এমেটের (Emmet) জ্বালাময়ী উক্তি এখনও তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ অবস্থিতি করিতেছে। কথায় কথায় তাঁহাদিগকে অত্যাচারী, উৎপীড়ক বলিয়া গালি দেয়। ইংরাজজাতির উপর তাহাদের প্রেমের আজ একটি জলন্ত নিদর্শন দিব! * * † ইহা একখানি প্রধান ইংরাজী সংবাদপত্র হইতে অনুবাদিত।

ইংলণ্ড ও আয়র্লণ্ড

* * * * *

"পূর্ব্বোক্ত ঘটনা একটি জলন্ত নিদর্শন যে, আইরিষ্‌দিগের সহিত ইংরাজদিগের সদ্ভাব নাই। উভয়ের প্রতি উভয়ে বিরক্ত। তাহারা সেদিন মাদীর খার্টুম-অধিকার-বার্ত্তা শুনিয়া হরিবোল দিয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল— 'Three cheers for the Mahdi' * * তাহাদিগের গৌরব ভূতকালের কথা নয়। আয়র্লণ্ড ডিউক অব্‌ ওয়েলিংটন, বার্ক ও মুরের জননী। তাহাদের বাহুবল আছে, বুদ্ধি আছে। তাহারা ইংরাজের মতই সভ্য। কেন তাহারা ইংরাজ-রাজত্বের অবিচার নীরবে সহিবে?

"হতভাগ্য ভারত! * * * * * * ইংরাজ শাসন ভিন্ন তোমার কি গতি আছে? ইংরাজ ভিন্ন তোমার কে সহায়? * * * * ইংরাজের সহিত এক হইয়া যাওয়াই, তোমার একমাত্র মুক্তির উপায়। কিন্তু * * * *।"

(ঢ)

৬ই আষাঢ়, ১২৯২

এখন বসন্তকাল। দারুণ শীতের অত্যাচার নাই; অন্ধকারময়ী কুজ্‌ঝটিকা নাই। প্রভাতের তরুরাজির শুষ্ক, হাস্যহীন, পতিত পল্লব-দৃশ্য হৃদয়কে আর ব্যথিত করে না। সন্ধ্যার কৃষ্ণা, মেঘময়ী, ধূমময়ী কাতরতা নাই। মধ্যাহ্নের বৃষ্টিজাত পথের মালিন্য নাই। সব হাস্যময়, সৌন্দর্য্যময়, উল্লাসময়।

আজ পথে পথে হর্ষধ্বনি। রাজ-বর্ত্মে শিশুর বাল-সুলভ হাস্য, উদ্দেশ্যহীন ক্রীড়া, যুবকযুবতীর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের নিভৃত প্রান্তে প্রেমালাপ, * * * স্থবিরেরও

† বাহুল্য ও অন্তবিধ কারণে বিবরণটি পরিত্যক্ত হইল।

নিঃসঙ্গ বিহার, বসন্তের আনন্দের সহিত যোগ দিতেছে। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হইতেছে; নীরব কুঞ্জ বিহঙ্গের গীতিপূর্ণ হইতেছে, প্রান্তরে প্রান্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'ডেসি' (Daisy) ও 'বটার কপ্' (Butter cup) শ্বেত ও পীত সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া, ইংলণ্ডকে কুসুমময়ী শোভার আধার করিয়া তুলিয়াছে।

বিলাতী-বসন্তকাল।

বিলাত ভারত নহে। এখানে সে গম্ভীর মোহময়, স্বপ্নময়, স্বর্গীয় মাধুর্য্য নাই; অনন্ত মধুরিমাপূর্ণ প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ নাই; সে ফুলের হিল্লোল নাই, বিহঙ্গের গানময় উৎসব নাই। কিন্তু সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়া ভারতমাতার সহিত বিলাতের কেন, অন্যান্য অনেক দেশেরই তুলনা সম্ভবে না। তথাপি বিলাতেরও সৌন্দর্য্য আছে। সেখানেও বসন্তে ফুল ফোটে, পাখী গান গায়, পল্লবহীন তরুরাজি জাগে। সকল মনুষ্যজাতি সুন্দর হইলেও, বাল্যকালে সকলেরই কিছু শোভা আছে; বাল্যকালে সকলের মুখ হাস্যময়, সরলতাময় ও সৌন্দর্য্যময় থাকে। বসন্ত প্রকৃতির নবজীবনের সময়, বসন্ত প্রকৃতির শৈশব। তখন সর্ব্বস্থানই মনোহর, উল্লাসময়, সঙ্গীতময়।

বসন্তে লিমিংটন নগরে গিয়াছিলাম। লিমিংটন (Leamington) ইংলণ্ডের প্রায় মধ্যভাগে। ইংলণ্ডের এই স্থান একটি অতি রমণীয় স্থান। প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয়।

লিমিংটন।

লিমিংটন বিলাতে একটি উৎসবময় স্থান। ইহাকে ইংরাজেরা একটি সুন্দর Watering place বলিয়া থাকে। এস্থানে ভিন্ন ভিন্ন চারিটী প্রধান স্বাস্থ্যকর উৎস আছে। সব জলই লবণাক্ত। কিন্তু তাহাতে লবণ ভিন্ন অন্যান্য স্বাস্থ্যকর উপকরণও আছে। কতকগুলি Salts. কতকগুলি বায়বীয় (Gaseous)। এই জল পান করিবার জন্য বিলাতে নানাস্থান হইতে পীড়িত ও তৎসহ পীড়িতের বন্ধুবর্গ আসিয়া থাকেন। এই উৎসগুলির জন্য লিমিংটন ক্রমে ক্রমে একটি ক্ষুদ্র পল্লী হইতে জনাকীর্ণ নগরে পরিণত হইয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন কুমারী ছিলেন, তখন অনেকবার এই স্থানে আসিতেন, এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে ইহার নাম "লিমিংটন প্রায়র্স" রাজকীয় লিমিংটন—* পরিবর্ত্তিত হয়"

লণ্ডন হইতে লিমিংটন প্রায় ৪৫ ক্রোশ। এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান সমূহ,—

* অস্পষ্ট

কলেজ, পীড়িতশালা, 'পার্ক', গ্রন্থালয় ও জেকসন উদ্যান। এখানকার 'পার্ক' বেশ পরিষ্কার ও সুন্দর। এ 'পার্ক'টী বড় ছোট। তাহার জন্য তাহার সমীপস্থ আর একটি বাগান আছে, তাহারই নাম জেক্‌সন বাগান। এখানে প্রতিদিন তিন পেনি (প্রায় ৵০ আনা) দিয়া ঢুকিতে হয়। কেবল রবিবারে তাহাতে প্রবেশ করিতে কিছু দিতে হয় না। এই বাগানে বৈকালে অনেক নরনারীর সমাগম হয়। ইহাতে সুন্দর নিকুঞ্জ আছে, পাদ-প্রক্ষালী নির্ঝর অবিরাম ঝর্ ঝর্ করিয়া উপর হইতে পড়িতেছে, নানাবিধ কুসুমে বহুস্থান সমাকীর্ণ থাকে। এই স্থানে একটি প্রধান আকর্ষণীয় জিনিস—রমণীদিগের বাণ নিক্ষেপ করা। একথা শুনিয়া কোন কবিত্বপ্রিয়, সংস্কৃত কবিদের অনুরাগী পাঠক হয়ত ভাবিয়া বসিবেন যে, আমি খুব করিত্ব করিয়া ফেলিলাম। তিনি ভাবিবেন যে রমণীদিগের বাণ নিক্ষেপের অর্থ কবিত্বময়; বুঝি, রমণীরা ভ্রূযুগরূপ ধনুতে কটাক্ষরূপ বাণ সংযোগ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে পুরুষদের প্রতি বর্ষণ করেন! তাহা হইলে কবিত্ব হইত, কিন্তু সত্য হইত না; এবং কবিত্বের অর্থ —"Misrepresentation in verse", এই সংজ্ঞা সম্পূর্ণ সার্থক হইত। কিন্তু এখন আমার হঠাৎ কবিত্ব করিবার প্রবৃত্তি নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ঘোর অনাবৃত সত্য। এখানে রমণীরা যথার্থই ধনুকে শর-সংযোগ করিয়া দূরস্থ একটি লক্ষ্যের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। কোন্ রমণী কিরূপ বাণ চালনা করিতে সমর্থ তাহাই পরীক্ষা করা ইহার উদ্দেশ্য। এ দৃশ্যটি বড় সুন্দর। ভারতবর্ষীয়, অন্ততঃ বঙ্গীয় রমণীরা যে এইরূপ বাণক্ষেপ করিতেছেন এরূপ মনে ধারণাও করিতে পার না। চিরান্তঃপুরবাসী হিন্দু-মহিলার ক্রীড়া ও ব্যায়াম রন্ধনশালার ধূমময় গৃহেই পর্য্যবসিত হয়। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত, সন্ধ্যা হইতে আবার প্রভাত পর্য্যন্ত রান্নাঘর ও শয়নঘর, শয়নঘর ও রান্নাঘর,—ইহাই দুর্ভাগ্য বঙ্গীয় রমণীদিগের বিহার-ক্ষেত্র ও বিরাম-স্থান! পায়ে আল্‌তা দেওয়া জীবনের সর্ব্বোচ্চ সম্ভোগ, অক্ষ ও তাস ক্রীড়া জীবনের সর্ব্বোচ্চ উৎসব; কি ধনী কি মধ্যবিত্ত রমণী—সকলেরই একমাত্র ক্রীড়াভূমি সেই অন্তঃপুরের অন্ধতাময় নীরব অরণ্য! দিবসে পরিচারিকা একমাত্র সঙ্গিনী রাত্রে স্বামীর সহিত কলহই একমাত্র কথোপকথন!

(৭)

১৭ই জুন, ১৮৮৫।

২রা শ্রাবণ, ১২৯২।

"পূর্ব্ব পত্রে তোমাদের Leamington-এর বিষয় বলিয়াছি, এবার সমীপবর্ত্তী স্থানগুলির বিষয় ক্রমে বলিব।

"তোমাদের বলিয়াছি যে, বসন্তকালে বিলাত বড় সুন্দর হয়। সুবেশা রমণীর সন্ধ্যা-বিহার ও দেব-সন্তানোপম বালক-বালিকাদিগের ক্রীড়াময় হাস্য; নব শ্যাম তরুরাজির উপর প্রভাত-রবির আলোক-ময় নৃত্য এবং হীরক-খচিত নীল গগনে চন্দ্রের শুভ্রোজ্জ্বল কবিত্ব; ঘন কুঞ্জে নবোদ্ভিন্ন কুসুমের বিবিধ বর্ণময় নীরব কোলাহল ও বিহঙ্গের সঙ্গীতময় উৎসব; ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, প্রান্তরে প্রান্তরে নব-দূর্ব্বাদলের শ্যাম সৌন্দর্য্য, ও ক্ষুদ্র অসংখ্য ফুলের শ্বেত, পীত উল্লাস,—ইহাই বিলাতের বসন্তকাল। অবশ্য ভারতের সে উজ্জ্বল, প্রশান্ত, গম্ভীর বাসন্তী, স্বর্গীয় মাধুরী এখানে পাইবে না। পাখীর সে হৃদয়োন্মাদী মিলিত ঝঙ্কার, সে মধুমাসের প্রাণস্পর্শী মলয় সমীরণ, সে সূর্য্যের প্রখর, মধুর জ্যোতি, সেই আকাশের স্থির-বিশ্বাসসম প্রশান্ত, ঘন, সুনীল বিস্তার,—সে সব এখানে কোথায়? কিন্তু তাই বলিয়া কি বিলাতে বসন্ত নাই? এখানেও সূর্য্য ওঠে, ফুল ফোটে, পাখী গান গায়, চন্দ্র হাসে!

বিলাতে বসন্তকাল।

"এস ভাই, এই মধুর বসন্তকালে, আমার সঙ্গে লিমিংটন নিকটস্থ কেনিলওয়ার্থ, (Kenilworth) ওয়ারউইক, (Warwick) আভন (Avon) তীরবর্ত্তী অমর ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড প্রভৃতি স্থানে এস।

"ওয়ার-উইক, ওয়ার-উইক-সায়ারের প্রধানা নগরী; ইহা লণ্ডন হইতে প্রায় ৯০ মাইল এবং লিমিংটন হইতে দুই মাইল। লিমিংটন হইতে প্রতিদিন ওয়ার-উইকে গাড়ী যায়। কেহ কেহ বলেন, এস্থান প্রথম শতাব্দীর বৃটিশরাজ সিম্বেলিন (Cymbeline) দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার পর কারাক্টেকস (Caractacus) ইহার পুনঃস্থাপনা করেন, এবং সেণ্ট জনের সম্মানে একটি গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করেন। তারপর আর এক বৃটিশরাজ (Constantine) পরে গাইয়ার (Gwayr) ওয়ারমণ্ড (Warremond) ক্রমশ: এ স্থানের উন্নতি বিধান করেন। পরে

ওয়ারউইক্-নগর।

ডেনদের দ্বারা ইহা অনেকবার আক্রান্ত হয়। তাহার পর আলফ্রেডের বীর-দুহিতা এথেল্‌ফ্রেডা (Ethelfreda) নব দুর্গ নির্ম্মাণ দ্বারা ইহা দৃঢ় করেন। মহামারী ও দাহ প্রভৃতি দুর্ঘটনা এ নগরের অনেক সুন্দর দৃশ্য বিলোপ করিয়াছে।

"এখন ওয়ার-উইক একটি ক্ষুদ্র স্বল্প-লোক-নিবসিত কোলাহলহীন নগরী। সে অস্ত্রের ঝনাৎকার নাই, অগ্নিদাহ নাই, ম্রিয়মাণ সহস্রের আর্ত্তনাদ নাই। সিনক্লেয়ার দুহিতা বলেন যে, নগরটি যেন পরিত্যক্ত পুরীর ন্যায় দেখায়। এখানে নগরের বাহির সীমায় চারটি গীর্জ্জা আছে। কিন্তু এখানে প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান দুর্গ (Warwick Castle)। সেটি দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখিতে। উর্ব্বরা ভূমির সন্নিধানে উচ্চতরু-সমাবৃত দুর্গটি নিকটস্থ সেতুবন্ধের উপর হইতে বড় গম্ভীর দেখায়। আমি যখন ওয়ার্‌উইকে গিয়াছিলাম, তখন সে দুর্গদ্বার খোলা ছিল না, তজ্জন্য ভিতরে প্রবেশ করিতে পাই নাই।

"আমি যখন গিয়াছিলাম, তখন সেখানে কুকুর-প্রদর্শনী খোলা। তিন টাকা দিয়া ত ঢুকিলাম। ঢুকিয়া দেখিলাম, অসংখ্য কুকুর এক স্থানে আনীত। বলা বাহুল্য, তাহাদের চিৎকারে—গাঁ মাথায় না করুক, —অন্ততঃ পুরবাসীর বিশেষ অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল। তাহাদের যে খৃষ্টীয় শিক্ষা বড় বিশেষ কিছু হয় নাই, এবং তাহাদের ভ্রাতৃভাব ও উদারতার যে অত্যধিক অভাব, তাহা সকলেই বেশ দেখিতে পাইলেন। প্রতি কুকুর অন্য কুকুরের উপর বিদ্বেষপূর্ণ, অসন্তোষজ্ঞাপক দৃষ্টিপাত করিতেছিল। যেন সকলেই বলিতেছে—"কি গেরো, মানুষগুলি আমাকে কুকুরের মাঝখানে কেন এনে ফেল্‌ল? মানুষের কাছে থাকি ভাল, আমার কুরূপ বুদ্ধি-বিদ্যাহীন জাতিগুলিকে দেখিলে আমার গা চিড়চিড় করিয়া উঠে।" ইহাতে কুকুরের দোষ দিই নাই। ইংরাজের পদ-লেহী, কোন কোন ইংরাজের পোষা বাঙ্গালীও স্বজাতির প্রতি এইরূপই বিদ্বেষপূর্ণ; এবং এইরূপই ইংরাজের চরণ-লেহন করিয়া, সাহেব একটু মাথায় হাত বুলাইলে আপনাকে চরিতার্থ ও ইংরাজের সমতুল্য জ্ঞান করেন। কুকুরেরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রভুভক্ত হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা পরাধীনতার দাস। তাহার জন্যই কি তাহারা এমন ভাবে স্বীয় জাতি কুকুর দেখিলে রাগে ও বিদ্বেষে জ্বলিয়া ওঠে?

কুকুর-প্রদর্শনী।

"সে যাহাই হউক, সে মেলায় নানাবিধ কুকুর দেখিলাম। শ্বেত, পীত,

কৃষ্ণ নানা রংএর ছোট বড়—অনেক দেখিলাম। তাহাদের দাম কত জান? পাঁচ হাজার, ছয় হাজার—সাধারণ ভাল কুকুরের দাম। একজন ডাচেস (Duchess) একটি কুকুর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দাম ঔপন্যাসিক!—এক লক্ষ টাকা তাহার বিক্রয়ের মূল্য লেখা! আরও দুই একটি কুকুরের দাম এরূপ লেখা ছিল। কৈ আমাকে বিক্রয় করিলে ত কেহ এক লক্ষ টাকা দেয় না? কবি টমাস্ হুড বলিয়াছেন, —

'Oh God ! that bread should be so dear,
And flesh and blood so cheap !'

আমি বলিতে পারি,—

'Oh God ! that dog should be so dear,
And human being so cheap !'

"সম্প্রতি বিলাতে আর একটি মজার সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। এটা চোর-সম্মিলনী। এ সম্মিলনীতে দেশের যত চোর তাহাদের একত্র করিয়া এক মহাভোজ দেওয়া হয়। চোরদিগের যে লজ্জার শোচনীয় অভাব তাহা কিছু আর নূতন নহে। লণ্ডনের যত চোর একত্রে সমাগত হইয়াছিল। তাহারা দর্শক-দিগের প্রতি ঘোর অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিপাত করিতেছিল। তাহার অর্থ—'তোমরা পয়সা দিয়া দেখিতে আসিয়াছ, আমরা পয়সা না দিয়া খাইতে আসিয়াছি, কাহার জিৎ?' * * * * যে যত চুরি করিয়াছে, সে তত অহঙ্কারী। দুই জনে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। একজন আর একজনকে বলিতেছে—'হ্যাঃ। তুইত ভারি চোর, কয়টা জেল খাটিয়াছিস্ বল্ দেখি?' সে উত্তর দিল 'তিনটা'।—তবে তো তুই ভারি লোক, আমি পাঁচটা জেল খা'টিয়াছি।' 'ইঃ,—সে আর হইতে হয় না, জেলের নাম কর্ দেখি।' 'নাম করিব তাহার আর কি?' এই সব বলিয়া তাহাদের মহা তর্ক। যে কম জেল খাটিয়াছে তাহারই অবশ্য পরাজয়।

চোর সম্মিলনী।

"অহো মনুষ্য! তোমার অধোগতি ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? এখন দেখিতেছি, এমন বিষয় নাই, যাহাতে পতিত অবস্থায়, তুমি গৌরব করতে পার না। যোদ্ধাদিগের অবস্থা প্রায় এইরূপ। হর্চ্‌পরের (Pery Horspur) স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—'আজ কয়টা মানুষ মারিয়াছ? পারি

বলিলেন—'সামান্য, সামান্য, মোটে দশজন।" ওঃ! কোথায় বিশ্ব-প্রেমের কৃতকার্য্যতায় স্বর্গীয় সন্তোষ ও অকৃতকার্য্যতায় স্বর্গীয় বিষাদ। আর কোথায় নর-হন্তার বহু হত্যার এই নারকীয় উল্লাস, ও অল্প হত্যায় নারকীয় ক্ষোভ!"

(ত)

৯ই শ্রাবণ, ১২৯২।

২৪এ জুন, ১৮৮৫।

"আইস ভাই! লিমিংটন হইতে অমর সেক্ষপিয়রের জন্মভূমিতে চল। চল, এভন-প্রক্ষালিত-চরণা, অমর-স্মৃতিময়ী ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড নগরীতে যাই।

"শ্রান্ত পথিক! এই স্থানে দাঁড়াও! বিরামের জন্য নহে,—মৃত প্রতিভার পূজার জন্য দাঁড়াও! প্রেম-বাষ্পাকুল-নয়নে, অবনত-শিরে, ভক্তিভরে এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে প্রণাম কর। এ স্থানের ধূলিকণা স্বর্ণময়, তরুলতা সঙ্গীতময়, তরঙ্গিণী কবিত্বময়। দেখ দেখি, এখানকার আকাশ গাঢ়তর নীল কিনা? সূর্য্য সুন্দরতর,—শান্তোজ্জ্বল কিনা? চন্দ্রমা অধিকতর মধুময় কি না? দেখ দেখি, এই স্থানে সর্ব্বোচ্চ কবিত্বের জন্মস্থান হইল কেন, বাগ্দেবীর মধুরতর ঝঙ্কারের প্রিয় স্থান হইল কেন? সঙ্গীতের দোলা, প্রেমের আধার, আনন্দের লীলাস্থান, কবিত্বের ধাত্রী—এ সুন্দরী নগরী! পথিক, এ স্থানে দাঁড়াও।

ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড নগর।

"ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড লিমিংটন হইতে প্রায় ৫ ক্রোশ। সেখান হইতে এখানে রেলেও যাওয়া যায়, হাঁটিয়াও যাওয়া যায়। এখানকার পুরবাসীদের অবস্থা সঙ্গতিপন্ন বলিয়া বোধ হইল। সুন্দর হর্ম্ম্যরাজি ও প্রশস্ত 'রাজ-বর্ত্ম' এখানকার শোভা। এখানকার নদী বেশ প্রশস্ত ও বেষ্টনময়ী, কিন্তু যাহা এখানকার সর্ব্বোচ্চ আকর্ষণ,—তাহা সেক্ষপিয়রের জন্মভূমি, প্রেমালাপ-গৃহ ও সমাধি-মন্দির।

"সেক্ষপিয়রের জন্ম-গৃহ 'হেন্‌লি'-রাস্তায়। ইহা অর্দ্ধকাষ্ঠময়, ভগ্ন-গবাক্ষ, জীর্ণ-সোপান, সামান্য কুটীর মাত্র। ইহার নীচে তিনটি ও উপরে দুইটি ঘর। নীচে রান্নাঘর, যাদুঘর (Museum) উপরের একটি ঘর কবির জন্ম-ঘর। আর একটি তাঁহার বসিবার ঘর। বসিবার ঘরে বাতায়ন-সমীপস্থ একটি টেবিল, একখানি ভগ্নার্দ্ধ চেয়ার,

মহাকবি সেক্ষপিয়রের জন্মভূমির বর্ণনা।

আর আপাতত জানালার উপরস্থ সেক্ষপিয়রের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি। জন্মঘরে খানকতক চেয়ার; জন্মঘরের দেয়ালের গায়ে ও জানালার গায়ে কবি Longfellow এবং তদীয় পরিবার, প্রসিদ্ধ উপন্যাসকার Sir Walter Scott এবং অন্যান্য অনেক ভুবন-বিখ্যাত লোকের নাম পেন্সিলে লেখা দেখিলাম। লব্ধ-নামা কবি ও উপন্যাসকার, যোদ্ধা, রাজনীতিজ্ঞ, ধনী ও পরিব্রাজক এই স্থান তাঁহাদের তীর্থ-ভূমি করিয়াছেন। এ ভগ্ন কুটীরের প্রতি ভগ্ন গবাক্ষ স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত; প্রতি জীর্ণ কাষ্ঠাসন পবিত্র সঙ্গীতে জড়িত।

"এস ভাই, তারপর, তরঙ্গায়িত ময়দানের ভিতর দিয়া সটারি-নির্ঝরের সমীপস্থ, পাহাড়ময় নিভৃততার ক্রোড়ে সেক্ষপিয়র-বনিতা এনা হ্যাথায়োয়ে'র কুটীরে যাই। নির্জ্জন পল্লীগ্রামে, ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর নিকটে সে কুটীর বড় স্বপ্নময়।

"কুটীরটী তৃণাচ্ছাদিত দ্বিতল। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি প্রায় সমস্তই আধুনিক বঙ্গীয় কৃষক-কুটীরের ন্যায়। সেইরূপ কব্জার উপর জীর্ণ দুয়ার, সেইরূপ অর্দ্ধভগ্ন সিঁড়ি। তবে জানালা সব কাচের! কুটীরটী পরিচ্ছন্ন। নীচে দুইটি কি তিনটি ঘর আছে, উপরেও তাই। উপরে এলিজাবেথের কালের চেয়ার-টেবিল আছে। দেওয়াল কাষ্ঠাচ্ছাদিত, একটি খোলা চিম্‌নি, একখানি বেঞ্চি—এই ঘরের প্রধান আভরণ। উপরে কারিকুরি-করা 'ওক' কাষ্ঠের একখানি খাট, এবং কতকগুলি ছবি দেখিতে পাইবে। নীচেও একখানি বড় ছবি আছে, তাহাতে সেক্ষপিয়র ও এনা হ্যাথাওয়ের প্রেমালাপ চিত্রিত। আমি এনার বংশজ একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মুখে শুনিলাম যে, এই অর্দ্ধাঙ্গ গৃহে, সেই বেঞ্চির উপরেই সেক্ষপিয়র এনার সহিত প্রেমালাপ (Courtship) করিতেন। আমি বেশ অনুমান করিতে পারিলাম, অষ্টাদশবর্ষীয় যুবা, ষড়্‌বিংশ-বর্ষীয়া এনার সহিত কিরূপ কথাবার্ত্তা করিতেন, কিরূপ তাঁহাকে তোষামোদ করিতেন, আর বলিতেন—"এনা, আমি তোমারই প্রেমের দাস।" বিবাহের পূর্ব্বে এমনই সকল পুরুষ রমণীর দাস, আর রমণী পুরুষের দাসী; বিবাহের পরে পরস্পর পরস্পরের প্রভু।

"এ কুটীরে বড় বড় লোকের সমাগম হইয়াছে। দর্শক্-গ্রন্থে (Visitor's book'এ) প্রেসিডেণ্ট গার্‌ফিল্ড, (President Garfield) প্রসিদ্ধতম গায়িকা মিস্ মেরি অণ্ডার্সন প্রভৃতি কত বিদ্বান্, কবি, গুণী ও চিত্রকরের নাম দেখিলাম,

বলিতে পারি না। কে বলে বিলাতে তীর্থ-যাত্রা নাই? কে বলে বিলাতে তীর্থ নাই? সর্ব্বত্রই প্রতিভার আদর ও সম্মান আছে। তীর্থ-যাত্রার মূল কুসংস্কার নহে; মৃত প্রতিভার সহিত কথোপকথন। এখন ভারতের তীর্থের মহিমা বিলুপ্ত হইতে পারে, তীর্থ-যাত্রার প্রকৃত অর্থ চলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার মূলে এই বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেম। তীর্থ-যাত্রা ভবিষ্যতের মঙ্গল-প্রার্থনায় নহে, ইহা বর্ত্তমান পূজা-জড়িত ভালবাসার সন্তান। যখন এই ভক্তি ও প্রেম চলিয়া যায় তখন তীর্থ-যাত্রা আর তীর্থ-যাত্রা নহে।

"এই গৃহের প্রাঙ্গণে একটি কূপ আছে; একটি কুসুম-শোভিত উদ্যান আছে। সেই উদ্যান হইতে গুটিকতক ফুল তুলিয়া, গৃহস্বামিনী স্মরণার্থ রাখিতে আমাকে দিলেন। তাহার পর আমি বিস্ময়ে, প্রেমে, ভক্তিভরে কুটীরটি দেখিতে দেখিতে সেস্থান পরিত্যাগ করিলাম।

"এস এখন সেক্ষপিয়রের সমাধি-মন্দিরে যাই। একদিন সেই বাল্যকালের নবীন আনন্দের হাস্য-প্রতিধ্বনিত জন্ম-গৃহ ও অর্থ-শূন্য ক্রীড়ার দোলা পরিত্যাগ করিয়া, যৌবনের আবেগময় প্রেমের লীলাস্থান এনার কুটীর পরিত্যাগ করিয়া, চল যেখানে এক সঙ্গীতময় জীবনের অবসান সেইখানে যাই।

"সেক্ষপিয়রের সমাধি-বেদী সমীপস্থ গীর্জ্জার ভিতর, গোরের উপরে, এক পার্শ্বে, লেখনী-হস্তে কবির প্রতিমূর্ত্তি। প্রতিমূর্ত্তির নীচে প্রস্তরের উপর নিম্নলিখিত কথা কয়টি অঙ্কিত,—

'Stay, passenger, where goest thou so fast?
Read, if thou canst, whom envious death has plast
Within this monument, Shakespeare, with whom
Ruined nature dide (i. e., died,) whose name
doth deck this tomb
Far more than cost: sich (since) all that he hath writt
Serves living art, but page to serve his witt.'

আরও গুটিকতক কথা লাইনে লিখিত :—

'Judicis Pyluim, genio Socratesu arte Maronem
Tersa regit populous maret, Olympus habet.'

* * * *

গোরের প্রস্তরের উপর অনুমানিক সেক্সপীয়রের নিজের লিখিত এই কয়টি ছত্র খোদিত :

'Good friend, for Jesus, sake, forbeare
To dig the dust enclosed heare,
Blest be the man that spares these stones
But curst be he that moves my bones.'

"সেখানে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, এই স্থানে অনন্ত কবিত্ব-নির্ঝরিণীর উৎস সেই মহাকবি আজ নীরবে অন্ধকারময় আগারে শায়িত! মনে যে ভাব উদিত হইল তাহা অবর্ণনীয়। অনন্ত তরঙ্গায়িত, অমর কবিত্বের বীণাময়ী ভাষা এই স্থানে নিদ্রিত। ঘুমাও কবিবর! যেথানে ইংরাজীভাষা বিদিত সেখানে তোমার নাম অশ্রুত থাকিবে না। আট্‌লান্টিক মহাসাগরের অপর পার হইতে তোমার নাম গীত হইবে, দক্ষিণ মহাসাগরে তোমার নাম প্রতিধ্বনিত হইবে; সমগ্র ইউরোপ জাতি-বিদ্বেষ ভুলিয়া তোমার গুণগান করিবে। আর দূরে গঙ্গাতীরবাসী আর্য্যাবর্ত্তের শ্যামল সন্তান তোমাকে ভারতের বর-পুত্র কালিদাসের প্রিয় ভ্রাতা, জগতের প্রিয় কবি বলিয়া আলিঙ্গন ও আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে।

(খ)

৩০ এ শ্রাবণ, ১২৯২।

"আমি এভন-তীরবর্ত্তী (Stratford-on-Avon'এ) সেক্সপীয়রের জন্ম-তিথি উপলক্ষে গিয়াছিলাম। মৃত কবিবরের সম্মানে প্রতিবৎসর সেখানে ঘোড়দৌড় প্রভৃতি ক্রীড়া-উৎসব হইয়া থাকে। শত শত লোক দেশ-দেশান্তর হইতে তাঁহারই সম্মানে বর্ষে বর্ষে সমাগত হয়। সে সময়ে সেখানে বিশেষ জনতা হয়। কে বলে বিলাতে বা ইউরোপে মৃত মহাত্মার পূজা নাই? কার্লাইল বলিয়াছেন, 'বীরপূজা' (Hero-worship) জগৎ হইতে কস্মিন্‌কালেও অন্তর্হিত হইবার নহে।

মহাকবি সেক্সপীয়রের জন্মতিথি-সমাগত।

"তোমাদিগকে গত পত্রে কবির জন্মঘর—হাস্য-প্রতিধ্বনিত শৈশব ক্রীড়ার

প্রভাত-অরুণ বিকশিত লীলাস্থল, তাঁহার প্রেমালাপ-গৃহ, যৌবনের চপলতাপূর্ণ হৃদয়ে আরাধ্যা দেবী এনার কুটীর ও তাহার সমাধি-মন্দির, বার্দ্ধক্যে জীর্ণ শরীরে চির-বিশ্রামের স্থান, মৃত্তিকা-নির্ম্মিত তিমিরাবৃত নিভৃত আলয়,—এ সকলের বিষয় পর্যায়ক্রমে বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার সম্মানার্থে স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে কিনা বলি নাই। ইহা সম্ভব নয়, যে জগতের একজন মহত্তম কবির জন্য কেহ একটি স্মৃতি-চিহ্ন নির্ম্মাণ করে নাই। তাঁহার স্মরণার্থে আভনের তীরে একটি রঙ্গভূমি নির্ম্মাণ হইয়াছে ; সেটী বৃহৎ নহে। তাজমহলের গম্ভীর 'প্রস্তরে গঠিত দীর্ঘনিঃশ্বাসে'র ন্যায় প্রাসাদসম স্মৃতি-মন্দির নহে। সেটী আড়ম্বর-শূন্য একটি সামান্য রঙ্গভূমি। বেশ সুন্দর, নয়ন-রঞ্জন, প্রীতিপ্রদ, আভন-তরঙ্গ-ধৌত-চরণ, ক্ষুদ্র গৃহখানি। সেখানে সেক্সপীয়রের ও অন্যান্য নাটককারের নাটকাদি অভিনীত হয়। আর সেক্সপীয়রের গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন দৃশ্যের বিবিধ ছবিও সেখানে আছে। ঘণ্টা দুই সেখানে ব্যয় করিলে সময়ের অপচয় হয় না।

"এস ভাই! ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড ছাড়িয়া লিমিংটনের নিকটস্থ কেনিল্‌ওয়ার্থে যাই। সেখানেও পুরাতন স্মৃতিময় কিছু দেখিবে। কেনিল্‌ওয়ার্থ ষ্ট্রাট্‌ফোর্ড হইতে ১৩ মাইল বা ৭॥ ক্রোশ। এখানকার প্রধান আকর্ষণ—Sir Walter Scott-বর্ণিত কেনিল্‌ওয়ার্থ দুর্গ। এ দুর্গের রচয়িতা Geoffrey of Clinton। ইহা পার্লামেণ্ট-সৈন্যের হস্তে ভগ্ন ও হীন-সৌন্দর্য্য হয়। এখানে এখন যাহা দেখিবে, তাহা দুর্গের ভগ্নাবশেষ মাত্র।

কেনিল্‌ওয়ার্থ নগর।

"এখন ইহার গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। ভগ্ন দুর্গের পার্শ্বে দাঁড়াইলে মন মুগ্ধ ও স্তব্ধ হয়। প্রথমে Leicester's gate-house নামক একটি প্রবেশ-গৃহ দেখিলাম। অনেক ইট স্থান-চ্যুত হইয়াছে, তথাপি ভিতরের দুর্গ এখনও মস্তক উন্নত করিয়া আছে। কোন কোন স্থান কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা রক্ষিত, কোন কোন স্থান একেবারে ভগ্ন। অনেক ঘরের একটিমাত্র কাষ্ঠহীন ক্ষুদ্র আলোক-দ্বার। অনেক ঘরের কোন অর্থই বুঝিতে পারিলাম না। কোন স্থানে একটি-গহ্বর বা চতুর্দ্দিক্‌-বেষ্টিত প্রবেশ-দ্বার-রহিত, ছাদহীন সঙ্কীর্ণ স্থান। আমি ভারতে অধিক পুরাতন হর্ম্ম্যরাজি দেখি নাই, তজ্জন্য তুলনা করিতে পারি না ; তবে কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর চক অনেকটা ছোট রকমে এই প্রকার ভগ্ন গৃহ। সেইরূপ কাষ্ঠহীন ছাদ, সঙ্কীর্ণ গুপ্তঘর, উদ্দেশ্যহীন

সিঁড়ি। 'আইভি' লতা না হইয়া, সেখানে ভগ্ন প্রাচীরে ঘাসই আবরণের কাজ করিতেছে। অবশ্য পরিমাণে ইহার সহিত তাহার তুলনাই হয় না, তবে তাহা দেখিলে কতকটা ইহার আকৃতি বোঝা যায়।

"কেনিল্‌ওয়ার্থের ভগ্ন দুর্গ (Ruined castle) বিলাতের একটি প্রাচীনতম দুর্গ। তাহার জন্য পুরাতন প্রথানুবর্ত্তী (?) ইংরাজ জাতি এই ভূত-গৌরববিশিষ্ট, দুর্গের অবশিষ্টটুকু সযত্নেই রক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন দুর্গ বা গৃহ নির্ম্মাণ করেন নাই; তাহার এই ভগ্ন সৌন্দর্য্যই তাহার আকর্ষণ ও আভরণ।

"লিমিংটনের নিকটস্থ আর কোন উল্লেখ্য স্থান নাই; কেবল 'গাই'র গিরি-কক্ষ (Guy's cliff) একটি দ্রষ্টব্য। এইটি একটি বড় কবিত্বময়, রম্যস্থান।

'গাই'র-গিরি-কক্ষ।

কাম্‌ডেন্ (Compden) ইহাকে—'The very seat of pleasantness' নামে অভিহিত করিতেছেন। পঞ্চম হেন্‌রী একবার এখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গীয় বিপ্রবর এ সবকে 'কাকস্য পরিবেদনা' রকম ভাবিয়া সেখানে না যাওয়াই মনঃস্থ করিলেন। পৃথিবীতে সবই যে দেখিতে হইবে, এমন কোন শাস্ত্রেই লেখে না। পৃথিবী বিপুলা, কাল নিরবধি, কিন্তু জীবন সঙ্কীর্ণ। সব কাঁহাতক দেখিয়া উঠি? অতএব Guy's cliff না দেখাই সাব্যস্ত করিলাম।

(দ)

২০এ ভাদ্র, ১২৯২।

১৪ই আগষ্ট, ১৮৮৫ সাল।

"বাঙ্গালীর পোষাক অতি আদিম বা 'আদমিক' (Adamite)। বাঙ্গালীর

বাঙ্গালীর পোষাক।

কোন পোষাক নাই বলিলেও চলে। যদি জাতি, গুটিকতক সভ্য শিক্ষিত যুবকে না হয়, যদি জাতির আচার-ব্যবহার, ভদ্রতা, শিক্ষা, কেবল জগতের পঞ্চমাংশে স্থিরীকৃত না হয়, যদি অশিক্ষিত লক্ষ লক্ষ কৃষক ও ব্যবসায়ী (merchants) জাতির ভিত্তি ও মূল হয়, তাহা হইলে দুঃখের সহিত বলিতে হইবে, বাঙ্গালীর কোনই পোষাক নাই। যদি এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে, তিনি একবার দেখিয়া আসুন। কিন্তু আমি এস্থলে

তাহাদিগের বিষয় কিছুই বলিব না। আমি কেবল সভ্য বাঙ্গালীর পোষাকের বিষয় বলিব। দেখা যাউক তাঁহাদের পোষাক কি।

"আদিমতঃ বাঙ্গালীর পোষাক—পরিধেয় ও উত্তরীয়, কাষ্ঠ পাদুকা ও মুণ্ডিত মস্তক। তাহাই তাহাদের আভরণ ও অলঙ্কার, তাহাই তাহাদের গাত্র-রক্ষণী ও জুতা। পরে কাষ্ঠ-পাদুকার বদলে চর্ম্ম-পাদুকা এবং চাদরের নীচে পিরাণ স্থান পাইয়াছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর একই পোষাক ছিল; এখন দুই প্রকার পোষাক হইয়াছে। টাউনহলে কিম্বা অন্য শিক্ষিত সমিতিতে পাজামা, চাপকান, চোগা-পরিধেয়ী বাঙ্গালী অসামান্য ভাগ্যেই দৃষ্ট হয়। ইহা যে ইংরাজী শিক্ষার ফল * এবিষয়ে সন্দেহ নাই; লোকে বুঝিতেছে, যে তাহাদের পোষাক সব সময়ে ঠিক নয়, তথাপি লজ্জা ও প্রথার খাতিরে অনেকে এখনও পূর্ব্ব প্রথা ছাড়িতে পারিতেছেন না। বঙ্গে দেশ-হিতৈষিতা বড়ই সস্তা। একটিবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া যদি কেহ কাপড় ও চোগা-চাপকান পরেন, এবং আলবার্ট হলে জাতীয় গৌরব গান করেন, তিনিই দেশ-হিতৈষী বলিয়া বঙ্গ-সমাজে আদৃত হইলেন।

"অবশ্য জাতির সহিত মিলিয়া জাতিকে তুলিতে হইবে; এবং জাতির সহিত মিলিতে হইলে, তাহার দুই একটি প্রিয়-প্রথা, যদি কাহারো বিবেকের বিরোধী না হয়, তাহা হইলে তাহাতে একটু সায় দেওয়াতে জাতির মঙ্গল বই অমঙ্গল হয় না। ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক যে, যদি কেহ জাতির প্রথা ভঙ্গ করেন, জাতি তাঁহার বিরোধী হইবে এবং তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসী নেত্রে দৃষ্টিপাত করিবে। জাতির নেতা হইতে হইলে, কতকটা জাতির মতেও চলিতে হইবে। A leader, in order to be a successful leader, must be, in a certain sense, a follower too.

*　　　*　　　*

"এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু যদি কাহারও নেতা বা সংস্কারক হইবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা না থাকে; 'আমি যাহা ভাল বুঝি তাহাই করিয়া যাইব' —ইহাই যদি কাহারও মত হয় এবং তিনি যদি কোট চাপকান হইতে শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন, অমনই তিনি কি

ব্যক্তিত্ব বা স্বানুবর্ত্তিতা।

* চাপকান ও চোগা ইংরাজী আমলের পূর্ব্বে, মুসলমানী আমল হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার।

হেয় হইলেন ? তাঁহার স্বজাতির প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকিতে পারে ; কিন্তু জাতির সব প্রথায় চলিতে পারেন না বলিয়া কি তিনি জাতির নিকটে অশ্রদ্ধেয় ? অবশ্য পোষাক এমন কিছু একটা জিনিষ নয়—যাহাতে আমাদের জাতীয় উন্নতির গতি স্থগিত থাকে ; তথাপি অতি সামান্য বিষয়েও মনুষ্যের প্রবৃত্তি ও রুচি আছে,—তাহার সম্যক্ পরিচালনা ও উন্নতি, ব্যক্তির ও জাতির মঙ্গলেরই কারণ।

"স্বাতন্ত্র্য (Individuality) মনুষ্যের উজ্জ্বল আভরণ। প্রত্যেক মনুষ্যেরই নিজের একটি মনোগতি ও রুচি আছে। তাহার পরিচালনায় মনুষ্যের উন্নতি বই অবনতি হয় না। প্রতি মনুষ্য এক প্রথাবলম্বী হইলে, জাতির কোন বিষয়েই উন্নতি হয় না। যাহার যে রুচি সে তাহা অনুসরণ করুক। মনুষ্যকে শিক্ষা দিবার দুইটি উপায়—দৃষ্টান্ত ও উপদেশ। দ্বিতীয়টি—যাঁহাদের বাগ্মিতা বা লেখনী-ক্ষমতা আছে তাঁহারা অনুসরণ করুন।—প্রথমটিও তাহার সঙ্গে চাই। কিন্তু অন্য সকল লোক যাঁহাদের তদ্রূপ কোন ক্ষমতা নাই, কেবল প্রথমটি দ্বারা অন্য লোককে শিক্ষা দিউক। পরিচ্ছদ, হাজার সামান্য বিষয় হউক, ইহাতেও এই বিধি খাটে ;—Individuality is the fountain of progress and the source of human happiness.

"মনুষ্য-জীবনের সুখের মূলে এই স্বানুবর্ত্তিতা। ইহা প্রতি জীবনে নবীনতা আনিয়া দেয়, উদ্দেশ্যহীন জীবনকে অর্থপূর্ণ করে, পুষ্পহীন তরুকে কুসুমিত করে। ইহাই আবার জাতীয় জীবনে আদর্শ আনিয়া দেয়, দূরস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় দীপ্তিপুঞ্জ বিকীর্ণ করে। ইহা আনন্দের নিদান, উন্নতির চির-প্রবাহী নির্ঝর।"

(ধ)

১৭ই আশ্বিন ১২৯২।

৩০ এ আগষ্ট, ১৮৮৫।

"এবার ছুটিতে ইংরাজী হ্রদসমূহ দেখিতে 'লাক্কাসায়ারে' আসিয়াছি। এ স্থান লণ্ডন হইতে বহুদূর। এখানকার দৃশ্য অবর্ণনীয়রূপ সুন্দর। একদিন 'পতাকা'তে এ বিষয়ে লিখিবার ইচ্ছা আছে।

লাক্কাসায়ারে।

চারিদিকে উচ্চ শৈলমালা আর মধ্যে 'উইণ্ডারমিয়ার' হ্রদ। একদিন একটা খুব উচ্চ পাহাড়ে উঠিয়াছিলাম। পাহাড়টির নাম 'ল্যাভ্‌ডহ পিটস্‌'। এক স্থানে উঠিতে বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। সেখানে উঠিতেও পারি না, নামিতেও পারি না। পা ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল; নীচে এক ভয়ানক পাথরের গর্ত্ত, —পড়িলে মৃত্যু নিশ্চয়; উপরেও উঠিবার যো নাই; পরে হামাগুড়ি দিয়া কোন প্রকারে শৃঙ্গোপরি উঠিলাম। উঠিয়া কিন্তু যে কি সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম তাহা বলিতে পারি না। দূরে 'উইণ্ডারমিয়ার' হ্রদ, পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত, আর চারিদিকে গিরিশৃঙ্গ! উঠিতে প্রায় ১ ঘণ্টা লাগিয়াছিল, তারপর নামিয়া আবার গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। আজ সকালে ও বৈকালে বোট ও কেন্নু (Canoo) করিয়া আ *,—ব্যো †—ও আমি হ্রদে দাঁড় টানিয়া বেড়াইয়া বেড়াইলাম। জীবন কিরূপে সুখময় করিতে হয়, বাঙ্গালীরা জানে না। আমাদের মধ্যে যাঁহার অর্থ আছে তিনিও ত স্বীয় পুষ্করিণী বা দীঘিতে সন্ধ্যার সময়ে নৌকায় করিয়া বেড়াইতে পারেন।

"আমাদের নদীয়ার রাজকুমার প্রতিদিন গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইতেন। যদি দু' একদিন বন্ধুগণসহ দীঘিতে দাঁড় টানেন তাহাতে শরীর ও মন,—দুইই ভাল থাকে। এ দেশের মত বোট কোথাও দেখি নাই। কি সুন্দরই দেখিতে! এ দেশের বড় লোক অথবা 'লর্ড'রা জীবনকে কেমন সুখময় করিতে জানেন। তাঁহাদের বিস্তীর্ণ 'পার্ক' আছে; সুন্দর, দূর-বিস্তৃত সরোবর আছে, সেখানে তাঁহারা বেড়ান বা দাঁড় টানেন।

* * * * * *

"আমাদের ছুটীর আর দেড়মাস বাকী আছে। আমি এ ছুটীতে লিভারপুল, প্রেষ্টন লিথাম্‌' এ গিয়াছিলাম। তারপর এ হ্রদে আসিয়াছি। এ সকলের বৃত্তান্ত 'পতাকাতে' যথা সময়ে বাহির হইবে।

"আমার এবার গুটিকতক পরিবারের সহিত আলাপ হইয়াছে। তাহার মধ্যে R—র পরিবার একটি। পরিবারটি বড় সুন্দর। আমাকে বড় যত্ন করিয়াছিলেন।

* 'আ'—অর্থাৎ মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়।

† 'ব্যো' অর্থাৎ নেতৃবর শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ব্যারিষ্টার মহাশয়।

২
বিলাত-প্রবাস।

যাহাহৌক্ ক্রমে জাহাজ লণ্ডনে গিয়া উপনীত হইল। সেই বিপুল জনসাগর-সংক্ষুব্ধ লণ্ডন শহরে দ্বিজেন্দ্রলালের সহায়-সম্বল স্বরূপ আপন বলিতে তখন কেহই ছিল না বলিলে চলে। কোথায় যাইবেন, ও কি করিবেন তাহার কোন স্থিরতা নাই। এই অগণ্য লোক-সমাকুল, বিশাল নগরে গিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমতঃ অজ্ঞাত আশঙ্কায় মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে 'বঙ্গবাসী' কলেজের বর্ত্তমান সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় সে সময়ে কৃষি-বিদ্যাশিক্ষার্থ লণ্ডনেই বাস করিতেছিলেন। তিনি তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 'বঙ্গবাসী' সংবাদ-পত্রের খ্যাতনামা পরিচালক, ৺যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি সুপারিশ-পত্র পাইয়া, দ্বিজেন্দ্রলালকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া-যাইবার জন্য জাহাজঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; এবং বলা বাহুল্য—তাঁহাকে দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তখন যেন যথার্থই 'হাতে চাঁদ' পাইলেন। এই বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ গিরিশবাবু আমাকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।—

লণ্ডনে অবতরণ।

"দ্বিজুর সঙ্গে আমার পূর্ব্বে আলাপ ছিল না। তাঁহার দাদা জ্ঞানেন্দ্রবাবুর সঙ্গে পরিচয় ছিল। দ্বিজু বিলাত যাইবার সময়ে তাঁহার দাদা জ্ঞানেন্দ্রবাবু 'বঙ্গবাসী' কাগজের সম্পাদক ছিলেন। আমার ছোট ভাই যোগেন্দ্রনাথ বসু দ্বিজুর দাদার হইয়া আমাকে চিঠি লেখেন—"দ্বিজু অমুক জাহাজে বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। জাহাজ লণ্ডনে পঁহুছিলে আপনি তাঁহাকে জাহাজ হইতে নামাইয়া লইয়া যাইবেন, নতুবা বড় মুস্কিল হইবে"। জাহাজ লণ্ডনে পঁহুছিলে

আমি দ্বিজুর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভায়ার পত্র পাইয়া, আমি জাহাজের সংবাদ লইয়া, যথাসময়েই লণ্ডন-'ডকে' গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে জাহাজ আসিয়া নঙ্গর করিল। সে জাহাজে যদিও অনেক যাত্রী ছিল,—দ্বিজুকে বাছিয়া লওয়া সম্বন্ধে কিন্তু কোনই গোলের সম্ভাবনা ছিল না। তিনিও যেন আমারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,—আমাকে চিনিয়া লওয়ার পক্ষেও তাঁহার কোন অসুবিধা ঘটিল না। উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। * * * "আপনাকে দেখিয়া আমি 'হাতে চাঁদ' পাইলাম। আপনি না আসিলে আমার দশা কি হইত"—এই বলিয়া, দ্বিজু আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন,—আলিঙ্গন করিলেন। জাহাজ হইতে নামিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আমার 'আস্তানায়' আসিলাম। পথে নানা কথা হইল; কিন্তু এতদিন পরে সে সকল কথা কোন প্রকারে মনে করিতে পারিতেছি না। তবে, একজন দেশের লোক—বিশেষ তাঁহার মতন লোক পাইয়া যে অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম, সে কথা বেশ মনে আছে। যাঁহারা দূর দেশে না গিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় বুঝিবেন না, বিদেশে স্বদেশী-দর্শনে কি আনন্দ অনুভব হয়।

"আহারাদির পর তাঁহাকে লইয়া তাঁহার আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিয়া দিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া 'Cirencester'এ (সিসিটারে) উপস্থিত হইলাম। আমি ও ব্যোমকেশ (Mr. B. Chakrabarty) উভয়ে এক বাটীতে থাকিতাম। তথায় স্থান না থাকায় দ্বিজুকে অন্য বাটীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। দ্বিজু সম্পর্কে ব্যোমকেশের শ্বশুর ছিলেন, উভয়ে অনেক বিশ্রম্ভালাপ হইল। পরদিন প্রাতে কলেজে লইয়া গেলাম ও কলেজের Principal'এর (অধ্যক্ষের) সহিত আলাপ (Introduce) করাইয়া দিলাম। তদবধি তিনি যথারীতি কলেজে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।"

বিলাতে ৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম্-এ, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায়, এম্-এ, রায় শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, এম্-এ, মহাশয়েরা সিসিটার কলেজে দ্বিজেন্দ্রলালের সহাধ্যায়ী ও প্রধান সহচর ছিলেন। তদ্ভিন্ন, তদীয় বাল্যবন্ধু, বর্ত্তমানে কলিকাতা-হাইকোর্টের মাননীয়

বন্ধু লাভ

বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, এম্-এ, এল্-এল্-বি ; প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, এম্-এ ; অদ্বিতীয় প্রতিভান্বিত ব্যারিষ্টার সার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, কে-টি ; মনস্বী জেলা-জজ ৺লোকেন্দ্রনাথ পালিত, আই-সি-এস, প্রভৃতির সঙ্গে এই সময়ে বিলাতে দ্বিজেন্দ্রলালের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। অকলঙ্ক চরিত্র, নিরভিমান ও সারল্য বশতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি তদীয় বন্ধুবর্গ চিরদিনই একান্ত অনুরক্ত ও শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।

মান্যবর বন্ধু শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু বলেন,—

"তারপর সেখানে অল্পদিনের মধ্যেই জানিতে পারিলাম,—দ্বিজু একজন Embryo (কোরক) কবি ;—ইতিপূর্ব্বে 'আর্য্য-গাথা' রচিয়া স্বদেশের কবি-জগতে প্রবেশ লাভ করিয়া আসিয়াছেন। গীতিবাদ্যেও যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ তাহাও শীঘ্র প্রকাশ পাইল। একদিন কথায় কথায় গল্পচ্ছলে তিনি বলিলেন —যাঁহার কাছে সেখানে তিনি গান শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন সে রমণীটি তাঁহার নাকী সুরের সংস্কার ও ভরাট্ গলার চর্চ্চা করার জন্য তাঁহাকে বহুবার বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। সেই অনুরোধের পরিণামে, পরে যে কি ফল ফলিয়াছিল তাহা আজ বঙ্গবাসী কাহারও অজ্ঞাত নাই। যিনিই তাঁহার গান একবার শুনিয়াছেন তিনিই জানেন দ্বিজুর গলা কিরূপ ভরাট্ ছিল এবং পরে তাঁহার সুরের সঙ্গে নাকের আর অণুমাত্র সংস্রব ছিল না।

বিলাতী সঙ্গীত-শিক্ষা।

"তিনি সিসিটারে পঁহুছিবার কয়েক মাস পরেই আমার সিসিটার-লীলা সাঙ্গ হয়। সেই উপলক্ষে আমার স্বদেশবাসী ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী (Now B. K. Chakrabarty, Bar-at-Law,), অতুলকৃষ্ণ রায় (Now A. K. Roy, Retd. Dy. Magistrate), সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (Now Sir S. P. Sinha ভূপালচন্দ্র বসু (Now Rai-Bahadur B. C. Bose, Retd. Dy. Director of Agriculture), প্রভৃতি বন্ধুগণ, কয়েকটি পরিচিত ইংরাজ-সহপাঠী ও কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রোফেসারগণ একত্র হইয়া আমাকে এক বিদায়-ভোজ দেন। সেই ভোজে দ্বিজু এক গান গাহিয়াছিলেন। ইংরাজী সুর ও কায়দায়

তখন তাঁহার সবেমাত্র 'হাতে-খড়ি' হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি সেদিন তাঁহার গান শুনিয়া অভ্যাগত সকলেই অজস্র প্রশংসা করিলেন।"

মাননীয় বিচারপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় এ সময়ে কথাপ্রসঙ্গে জানাইতেছেন,—

"বিলাতে আমি থাকিতাম Cambridge'এ (কেম্‌ব্রিজে'এ) আর সে থাকিত Cirencester'এ (সিসিটার্‌'এ)। ছুটির সময় ছাড়া কাজেই বড় একটা দেখা-শুনা হইত না। তখন সে লণ্ডনের এক প্রান্তে থাকিত, আমি অপর প্রান্তে থাকিতাম। তবে যেদিন দেখা হইত,—যখনই দেখা হইত,— সেই পুরাতন ভাই দ্বিজুকেই দেখিতাম। চরিত্র চিরদিনই এক। তখনও সেই স্নেহ, সেই মাধুর্য্য! সেই ছেলেবেলার ভালবাসা ও অনুরাগ তাহার কাছে সব সময়েই পাইয়াছি। চিরদিন তাহার একটু যেন 'পাগ্‌লাটে' ভাব ছিল। কাপড়-চোপড় ঠিক তেমনি অযতন করিয়া পরিত। চিরদিনই সেই গান, সেই কবিতানুরাগ, সেই মুখভরা-হাসি, প্রাণ-খোলা আলাপ তাহাকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছিল।

'খেয়ালি' প্রকৃতি।

"তাহাকে সেই ছেলেবেলা হইতে চিনিতাম বলিয়া এবং বাঙ্গালী আমাদের রুচি ও 'ধাত্‌' একটু ভিন্নভাবের বলিয়া আমাদের কাছে সে যতই কেন সুন্দর ও মধুময় হোক না, তাহার ঐ খেয়ালি মেজাজ বা 'ক্ষ্যাপাটে' স্বভাবের দরুণ বিলাতে তাহাকে বড় কেহই তেমন পছন্দ করিত না। সেখানে সবই ঘড়ির কাঁটার উপর চলে। চারিদিকে সামাজিক বন্ধন অনেক রকম বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। ক্ষ্যাপামি (Eccentricity) তাহারা মোটেই ভাল চক্ষে দেখে না। কিন্তু আমরা ঈশ্বরকেও পাগল বলিতে কুণ্ঠা বোধ করি না। বিলাতী ও দেশীর এও একটা ভীষণ প্রভেদ। একদিন এই বিষয়ে জনকতক বিশেষ লেখাপড়া-জানা ইংরাজের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলাম। ঈশ্বরকে কেন আমরা ভক্তিভাবে পাগল বলি তাহা কিছুতেই বুঝাইতে পারি নাই। তাঁহাদের মাথায় এ ভাবটি প্রবেশই করিল না। ঈশ্বরকে 'Insane', 'mad',—কি ভয়ানক কথা! তবে ইহা যে আমাদের ধর্ম্মভাবেরই পরিচায়ক, এই তাঁহাদের বিশ্বাস, বুঝিলাম।

"দ্বিজুকে আমি আমার কোন বিলাতের বিশেষ বন্ধু-পরিবারের সহিত আলাপ করাইয়া দিলাম। দেখিলাম—তাঁহাদের দ্বিজুকে মোটেই ভাল লাগিল না। অতি সুশিক্ষিত পরিবার। আমাদের দেশের প্রতিও তাঁহাদের খুঁবই অনুরাগ ছিল। কিন্তু, ব্যবহারিক নিয়ম যে জানে না তাহাকে সহজে ইংলণ্ডে বড় কেহই আদর করিতে প্রস্তুত নহে। তবে দ্বিজু যে ভয়ঙ্কর একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, এটা তাঁহাদিগকে দ্বিজু খুবই বুঝাইয়া দিয়াছিল। তাঁহারা সংস্কৃত কবিতা শুনিতে চাইতেন, দ্বিজুও অম্লান বদনে বাঙ্গলা ছড়া,—এমন কি, 'লাল পাতা' 'কাল মেঘ'—যা মনে হইত তাহাই আবৃত্তি করিয়া, মনের মত যাহা-তাহা ইংরাজী অনুবাদ করিয়া শুনাইত। তাঁহারা সরলভাবে এই বহু-পুরাতন জাতির পক্ষে রচনা-চাতুর্য্যের অভাব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে করিয়া তাহার পদ-লালিত্যের খুব প্রশংসা করিতেন।"

দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মীয়, শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ, সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাকে লিখিয়াছেন,—

"ইংরাজী ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আমার বিবাহ হয় এবং তাহার দেড় মাস পরেই আমি বিলাত চলিয়া যাই। বিলাত যাওয়ার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নাই। তিনি সম্পর্কে আমার সহধর্ম্মিণীর সাক্ষাৎ খুল্লতাত। আমি বিলাত যাওয়ার প্রায় চারি বৎসর পরে 'খুড়ো' বিলাতে গিয়া উপস্থিত হন। তৎকালে সেই প্রথম সিসিটারে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়।

বিলাতে খুড়োর 'খামখেয়ালি' ব্যবহারের বিষয়ে আজ আমি মাত্র দু'টি ঘটনার উল্লেখ করিব। আমার এখন অবসর বড়ই অল্প, বিশেষ আপনারও এখন আর অপেক্ষা করার উপায় নাই ; নতুবা, আরও অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনাদি আমি সুযোগ মত আপনাকে জানাইতে পারিতাম।—

(১) সিসিটারে তিনি যে বাসায় অবস্থান করিতেন তথায় একটি বালিকা পরিচারিকা তাঁহাদের কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। একদিন খুড়োর কেমন খেয়াল হইল—তিনি ধুতি ও চাদর পরিয়া দিব্য বাঙ্গালী বাবুর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বসিলেন। আন্তরিক ধারণাবশেই হৌক্ অথবা সাধারণ ভদ্রতার খাতিরেই

হৌক্—উক্ত পরিচারিকা সে অভিনব বেশের 'তারিফ্' করিবামাত্র, খুড়ো 'সটাং' সেই পোষাকে একেবারেই ঐ বাসার পার্শ্ববর্তী গোর-স্থান সন্নিহিত, বহু সাহেবম্যাম্-পরিপূর্ণ, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গিয়া দিব্য অসঙ্কোচে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য—এই অদ্ভুত জীবটিকে দেখিয়া সমবেত জনমণ্ডলী নিতান্তই বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কিন্তু, খুড়ো তাঁহার এই আচরণের মধ্যে বিন্দুমাত্রও কিছু 'বে-খাপ', বিসদৃশ বা অশোভন দেখিতে পাইলেন না।

"(২) সেখানে আমাদের কলেজে সমস্ত ছাত্রদের মিলিত হইয়া মাঝে মাঝে নিয়মিত Regulation Break-fast or Dinner' এ (প্রাতরাশ ও নৈশ-ভোজে) যোগদান করিতে হইত। নির্দ্দিষ্ট, শাদাসিধা দু'চারি রকম আহার্য্য ভিন্ন সে সব ভোজে সাধারণতঃ আমাদের বেশী-কিছু খাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু, যদি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অতিরিক্ত কাহারও কোন স্বাদু খাদ্য—যথা, জ্যাম্, জেলী, কেক্ বা আর কিছু—খাইতে সাধ যাইত তাহা হইলে সে-সব জিনিষ অতিরিক্ত মূল্য দিয়া খরিদ করিয়া যথাকালে আহারের সময়ে টেবিলে লইয়া গিয়া খাইতে পারা যাইত। একদিন একটা এই রকম ভোজে খুড়ো টেবিলে খাইতে বসিয়াছেন, দেখেন—তাঁহারই সম্মুখে কাহার যেন খানিকটা 'জ্যাম্' রহিয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, সেই আহার্য্য দ্রব্যটি যাঁহার, যদিচ তিনি সেই টেবিলে খুড়োর পাশেই খাইতে বসিয়াছিলেন,—'খুড়ো' তাঁহার কাছে তবু কোন 'উচ্চ-বাচ্য' বা জিজ্ঞাসাবাদ পর্য্যন্ত না করিয়া, বেশ তৃপ্তিপূর্ব্বক অম্লান-বদনে সেই 'জ্যাম্' টুকু সপ্রতিভভাবেই আহার করিয়া ফেলিলেন! ইহার পর যাঁহার সেই 'জ্যাম্' তিনি আমার কাছে অভিযোগ জানাইলে আমি খুড়োকে তাঁহার কাছে ক্ষমা চাইতে বলিলাম। কিন্তু ক্ষমা চাওয়া তো দূরে থাক্,—প্রথমটা খুড়ো উল্‌টা তাঁহারই উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া বলিলেন—ঐ রকম দশজন লোকের সামনে অন্য সকলকে বঞ্চিত করিয়া স্বার্থপরের মত একা একা ঐ সুখাদ্যটুকু ভোজন করিতে যাওয়ায় তিনিই অত্যন্ত অন্যায় ও অসভ্য ব্যবহার করিতেছিলেন;—খুড়ো তাহাতে ভাগ বসাইয়া বরং অতি উচিত ও ন্যায় কর্ত্তব্যই পালন করিয়াছেন। এইরূপে অনেক যুক্তিতর্ক ও বাক্-বিতণ্ডার পর খুড়ো শেষে মাপ চাহিলেন বটে; কিন্তু তাঁহাকে দিয়া সেটুকু করাইতে আমার যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল।"

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুবাবু পুনরপি জানাইতেছেন,—

"বিলাতে সে প্রথম সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করে। তখনও তাহার প্রতিভার তেমন কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। * বরং তাহার লেখা লইয়া কত হাসি-ঠাট্টা করিয়াছি। তাহাতে সে কিন্তু কখনও রাগ বা দুঃখ করিত না। যেটা যথার্থ ভাল হয় নাই, মানিয়া লইত। তাহার দরুণ সে ভাল লিখিবে সেই চেষ্টাই বরং প্রাণপণে করিত। তখন আমিও সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে ভালবাসিতাম। দ্বিজুকে শেলী-ভক্ত আমিই করি। ফরাসী সাহিত্য তাহাকে পড়িয়া শুনাইতাম। ক্রমে সে কিছু ফরাসীও শিখিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে এই সময়েই তাহার অত্যন্ত অনুরাগের উদয় হয়।

সাহিত্য প্রীতি।

একদিন হঠাৎ ইংরাজী কবিতা লিখিয়া লইয়া, আমার কাছে উপস্থিত। আমি বলিলাম—"বাঙ্গালীর ছেলে ইংরাজী কবিতা লিখিবে কি?" তাহার কবিতা আমার ভাল লাগিল না। তাহা কেন ভাল হয় নাই, বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিছুদিন ধরিয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিল। শেষে 'আর ইংরাজী কবিতা লিখিব না' বলিয়া, চলিয়া গেল। কিন্তু, তার পরেও সে লুকাইয়া লুকাইয়া লিখিত। বহু অর্থ-ব্যয় করিয়া 'Lyrics of Ind' বলিয়া একখানি কবিতা-পুস্তক ছাপায়। দ্বিজু কেমন অসঙ্কোচে পুস্তকখানি আমায় আনিয়া দিয়াছিল, তাহা এখনও মনে পড়ে। সে জানিত যে, আমি তাহাকে পুনরায় কবিতা লিখিতে বারণ করিব। বইখানি দিয়া, আমি কোন কথা বলার আগেই বলিল—"পড়ে' দেখে গালাগালি দিও"। আমি বলিলাম,—"না পড়িয়াই দিব।" যদিও 'Lyrics of Ind' এর মধ্যে সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে, তবু আমি সর্ব্বদাই তাহার দোষ দেখাইয়া তাহাকে জ্বালাতন করিতাম। সে কখনও কিন্তু এক মুহূর্ত্তের তরেও সেজন্য মুখ-ভার করে নাই।"

'Lyrics of Ind' কাব্য-প্রকাশ।

'Lyrics of Ind'এর জন্ম-বিবরণ উপলক্ষে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল

*শ্রদ্ধেয় আশুবাবুর এ কথায় আমরা বিস্মিত হইয়াছি। কেননা, দ্বিজেন্দ্রলালকে যাঁহারা বালককাল হইতে চিনিতেন তাঁহারা সকলেই তৎকালে তাঁহার প্রতিভার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছিলেন। এমন কি, অতি শৈশবে তাঁহার পিতাও তাঁহাকে 'Genius' বলিতেন। তা'ছাড়া তাঁহার 'আর্য্যগাথা' ও বিলাত যাইবার পূর্ব্বে রচিত।—গ্রন্থকার।

'নাট্যমন্দির' নামক মাসিক পত্রে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন,—"বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক-পাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল যে, বিদ্যাভ্যাসকালে 'Manfred' ও 'Childe Harold' এর দুই Canto এবং মেঘদূত, উত্তরচরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম। বিলাত গিয়া ক্রমাগত Shelley পড়িতাম ও তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare বার বার পড়িতাম। বিলাতে গিয়া ইংরাজীতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্যার এডুইন আর্ণল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসহ কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা-প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন; তখন সেই কবিতাগুলিকে 'Lyrics of Ind' আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি"। সেই গ্রন্থের ভূমিকায়, এই পুস্তক-প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছিলেন,—

"The principal object in the composition of the following verses has been to harmonise English and Indian poetries as they ought to be. Both are beautiful but whilst the one is visionary and sensuous, the other is vigorous and chaste ; whilst the one dreams, the other soars ; whereas the one makes a poetry of religion, the other makes a religion of poetry. If it has pleased God to unite England and India in the strong ties of wedded interest, and in the still stronger, more sacred, and indissoluble bond of mutual love and gratitude, it is the aim of the

author to establish a marriage and an intellectual commerce between their poetries as well." * *

দ্বিজেন্দ্রলালের তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলেন,—

"দ্বিজেন্দ্র তখন ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইবেন, এইরূপ আশা পোষণ করিয়াছিলেন। ইহা আশ্চর্য্য নহে। মাইকেলও প্রথমে ইংরাজী গ্রন্থ লিখিয়া কীর্ত্তিলাভ করিবেন, মনে করিয়াছিলেন। পরে অনুতাপের সহিত মাতৃভাষার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া অমর গ্রন্থ লিখিয়া ফেলিলেন। এই কথা আমি তখন দ্বিজেন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। ইহার পর আর দ্বিজেন্দ্র ইংরাজী কবিতা লেখেন নাই"।

শ্রদ্ধেয় জ্ঞানবাবুর উক্তির সঙ্গে প্রসঙ্গতঃ এখানে একটা কথার উল্লেখ করা আবশ্যক হইয়া পড়িল। জ্ঞানেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে, তিনি নিষেধ করার পর দ্বিজেন্দ্রলাল আর ইংরাজী কবিতা লেখেন্ নাই; প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এ ধারণা কিন্তু নির্ভুল নহে। 'Lyrics of Ind, প্রচারিত করার পর বহু বর্ষ যাবৎ দ্বিজেন্দ্রলাল আর বড়-একটা ইংরাজী কবিতা লেখেন নাই মানি; কিন্তু বহু বৎসর পরে সুহৃত্তমের সাগ্রহ আহ্বানে, আমি যখন একবার তাঁহার সঙ্গে তদীয় কর্ম্ম-স্থান গয়ায় গিয়া, কিয়দ্দিবস তাঁহার আতিথ্য-সম্ভোগ করি তৎকালে একদিন প্রাতে চা-পান করিতে-করিতে তিনি হঠাৎ আমাকে একটা অত্যন্ত অভিনব ও অভাবিত 'বাজী' দেখাইবেন বলিয়া, বিশেষ ভাবেই প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিলেন। আমি এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে প্রথমটা খুব কৌতুক অনুভব করিলাম, এবং তাঁহার 'ধাত্' আমার পূর্ব্ব হইতেই ভাল রকম জানা থাকায়, ভাবিলাম—হয়ত কোন 'রঙ্গ' দেখাইবার জন্য তাঁহার মাথায় সহসা একটা নূতন কোন খেয়াল বা ঝোঁক চাপিয়াছে। যাহাহোক্, আমি কোন আপত্তি না তুলিয়া, তাঁহার কথামত, কক্ষ-কোণের আমার প্রিয় সেই 'আরামকেদারা'টি ছাড়িয়া, তাঁহার সম্মুখে আসিয়া

টেবিলের পাশে একখানা চেয়ারে উঠিয়া বসিলাম ; আর, সেই টেবিলটির যেস্থানে বসিয়া সচরাচর তিনি গ্রন্থাদি লিখিতেন ঠিক সেইখানে (তাঁহারই প্রস্তাব মত) তিনটি 'টোকা' মারিলাম। যেই আমার সেই 'টোকা'র তৃতীয় শব্দ হওয়া, অমনি 'তড়াক্' করিয়া তড়িৎবেগে দ্বিজেন্দ্রলাল লাফাইয়া-উঠিলেন, এবং মস্তকের উপরে বহুবার বাহু সঞ্চালনপূর্ব্বক, তালি দিতে-দিতে, আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া, "আও ! আও !—প্যারী মেরি, আ যা, আ যা !" বলিয়া, যেন কত কাতরকণ্ঠে কাহাকে ডাকিতে লাগিলেন। এই ভাবে, অর্থাৎ—বাজীকরেরা যেরূপ বহু আয়োজন ও আড়ম্বর সহকারে কৃতিত্ব-প্রদর্শনে অগ্রসর হয় তিনিও তদ্রূপ—বহুবিধ অঙ্গ-ভঙ্গী ও হস্ত-সঞ্চালন করিয়া, আমাকে একটি বারের জন্য তাঁহার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইতে বলিয়া, আমার অলক্ষিতে, অকস্মাৎ ক্ষিপ্রহস্তে সেই টেবিলটির দক্ষিণ দিকের একটা (Drawer'এর) দেরাজের ভিতর হইতে কাগজ-মোড়া, একখানা রুল-টানা, বাঁধানো খাতা বাহির করিয়া, সেই 'টোকা'-দেওয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে রাখিয়া দিলেন ; এবং যেন কতই ধ্যান করিতেছেন—কিছুই জানেন না, এই ভাবে চক্ষু বুজিয়া রহিলেন। আমি তখন সেই কাগজের মোড়ক হইতে খাতাখানি মুক্ত করিয়া, খুলিয়া দেখি—তাহাতে প্রায় ৩০।৩২' টি ক্ষুদ্র-বৃহৎ ইংরাজী কবিতা ! কিছুকাল কৌতুক-হাস্যের পর, তিনি নিজেই তখন আমায় সেগুলির ক'একটি পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পর একা-একা, এক সময়ে আমি সেগুলি সব খুব মনোযোগ দিয়া পড়িয়া দেখিলাম—তন্মধ্যে প্রায় দশ-বারোটি কবিতা একেবারেই প্রথম শ্রেণীর অতীব উৎকৃষ্ট রচনা ! ভাল করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া, সেগুলি তাঁহাকে ছাপাইবার জন্য অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন, "আগে দেখি, লোকেন কি বলেন।" মনস্বী শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত (Late Mr. L. Palit, I.C.S.) মহাশয়

তখন গয়াতেই জজিয়তি করিতেন। পর দিবস সন্ধ্যাকালে পালিত-'সাহেব' তদীয় পরম বন্ধুর গৃহে যথারীতি আগমন করিলে, দ্বিজেন্দ্রলাল সে খাতাখানি পালিত মহাশয়ের হাতে দিয়া বলিলেন,—"এগুলো অবসরমত পড়ে' দেখো তো লোকেন,—ছাপ্‌বার মত হ'য়েছে কিনা!" পালিত মহাশয় সে রাত্রে আমার সাক্ষাতেই বইখানি তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন; এবং ইহার প্রায় ৫।৬ দিন পরে, একদিন আসিয়া সজোরে দ্বিজেন্দ্রলালের কর-মর্দ্দন করিয়া, সেই কবিতাগুলি লেখার জন্য তাঁহাকে খুব আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত যথেষ্ট congratulate (অভিনন্দন ?) করিলেন। ইহার ৫।৬ দিন পরে আমি গয়া হইতে চলিয়া আসি; কাজেই, সে কবিতাগুলির মুদ্রণ-বিষয়েও তখন আর কোন তদ্বির করার তেমন সুবিধা ঘটে নাই।

উক্ত ঘটনার প্রায় চার বৎসর পরে, একদিন কি কথা-প্রসঙ্গে যেন,—আমি দ্বিজেন্দ্রলালকে 'সেই কবিতাগুলির কি গতি হইল', জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন,—"ওঃ, সেই কবিতা! তার আর কোন খবর আমিও জানি না। পালিতকে তারপর সেগুলো আবশ্যকমত একটু-আধ্‌টু সংশোধন ও পরিমার্জ্জনাদি করে' দেবার জন্য অনুরোধ করি; সেই থেকে খাতাখানা তাঁর কাছেই পড়ে' আছে"। আমি বলিলাম—"গয়া থেকে চলে' আস্‌বার সময়েও সেটা সঙ্গে নিয়ে এলেন না?" 'ভোলানাথ' দ্বিজেন্দ্রলাল হাসিতে-হাসিতে উত্তর করিলেন,—"চেয়ে দেখেছি,—ফেরৎ দিলেন না! তাঁ'র তখনও দেখা হয়নি, বল্‌লেন। * * হারিয়ে গেছে নাকি তা'ই বা কে জানে!" দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোক-যাত্রার পরে, তাঁহার পরিত্যক্ত রচনাবলীর মধ্যে যখন এ কবিতাগুলির কোন সন্ধান মিলিল না তখন আমি স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া, বন্ধুবর পালিত সাহেবের নিকটে এই কবিতাগুলির জন্য

ক্রমান্বয়ে দু'তিন খানি পত্র লিখিয়া, যদিও শেষ পত্রের সামান্য একটু উত্তর পাইয়াছিলাম,—তাহাতে আসল কথার কোন উত্তর ছিল না। কি আপ্‌শোষ!

যাহাহৌক্, 'Lyrics of Ind' প্রকাশিত হইলে, বিলাতী ও এদেশী সম্পাদক ও সাহিত্যিকবর্গ একবাক্যে তাহার প্রচুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অপরিচিত কোন নূতন বিদেশী লেখকের পক্ষে অনন্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বিলাতী সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি-লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে পক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের আশা তাদৃশ ফলবতী না হইলেও, এই পুস্তক-প্রকাশে তাঁহার একটা লাভ অন্ততঃ এই হইল যে, তদ্দেশীয় পরিচিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা এতাবৎ Unconventional—(অসামাজিক বা লোকাচার-বিরুদ্ধ) আচরণের জন্য তাঁহাকে একটা অদ্ভুত জীব গণ্য করিয়া অপ্রীতির চক্ষে দেখিতেন, এখন তাঁহার অন্তর্নিহিত এই অসামান্য শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রদর্শনে যত্নশীল হইলেন; এবং এতদ্দারা তিনি তাঁহার সুহৃৎ-সম্প্রদায়ের মধ্যেও অচিরে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সম্মানের আসন অধিকার করিয়া লইলেন।

বিধাতার আশীর্ব্বাদে বাল্যাবস্থায় দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকবার কিরূপ সাংঘাতিক ও মারাত্মক 'ফাঁড়া' কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহা অবগত হইয়াছি। বিলাতেও তিনি একবার ভীষণভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

খেয়ালের বিড়ম্বনা।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও মাননীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়দের সঙ্গে একবার তিনি একটা পাহাড়ে চড়িবার সঙ্কল্প করেন। প্রচলিত পথে সহযাত্রীরা সহজেই পাহাড়ের উপরে আরোহণ করিলেন; কিন্তু 'অতি-বুদ্ধি' দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদের অনুবর্ত্তী না হইয়া, তাঁহাদের পূর্ব্বে সোজা পথে পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করিবার

আশায়, অপথে ঋজুভাবে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। পাহাড়টি অত্যন্ত বেশি উঁচু না হইলেও, দ্বিজেন্দ্রলাল যেস্থান দিয়া যাইতেছিলেন, একটু পরেই তাহা এমন ভয়ানক খাড়া হইয়া উঠিয়াছে যে, অল্প উঠিবারপর তিনি আর উপরে চড়িবার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু, তখন নীচেও আর নামিবার সাধ্য নাই; কারণ, যে কয়েকটি ফাঁক্-ফাঁক্ পাথরের সাহায্যে কোনমতে 'হামাগুড়ি' দিয়া এতটা উঠিয়াছেন, তাহাতে এখন ভর করিয়া নামিতে গেলে অনিবার্য্যরূপেই পতনের আশঙ্কা। সঙ্গীরা তখন উপরে উঠিয়া 'দ্বিজু দ্বিজু' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতেছেন;—তিনিও তাহা শুনিতেছেন, অথচ শক্তি নাই যে, উত্তর দেন;—সর্ব্বাঙ্গ স্বেদ-সিক্ত, হস্ত-পদ শিথিল, শিরা-উপশিরাসমূহ 'থর্ থর্' কম্পিত হইতেছে। একটু হাত-পা পিছ্‌লাইয়া গেলে আর রক্ষা নাই,—একেবারে নীচে মাংস-পিণ্ডাকারে পতিত হইতে হইবে। তখন গত্যন্তর না দেখিয়া, তৃণ-গুচ্ছ ও বৃক্ষ-মূল অবলম্বনে, সাহসে ভর করিয়া, উপরেই উঠিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করার পর ভগবান্ সে যাত্রাও তাঁহাকে রক্ষা করিলেন; কিন্তু, উপরে উঠিয়াই তিনি অবসন্ন হইয়া এলাইয়া পড়িলেন। এই ভয়াবহ ঘটনাটি দ্বিজেন্দ্রলালের নিজ মুখ হইতে যে ভাবে শুনিয়াছিলাম, এ স্থলে আমি তদ্রূপই লিপিবদ্ধ করিলাম। কিন্তু, এ বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ বিচারপতি আশুবাবু আমাকে যাহা জানাইয়াছেন, মূলতঃ ও মুখ্যতঃ এক হইলেও, তাহা উল্লিখিত বিবরণ হইতে যৎকিঞ্চিৎ পৃথক্। বিচারপতি মহাশয় বলেন,—

পরিভ্রমণ।

"একবার আমার সঙ্গে দ্বিজু Lake-District' এ পরিভ্রমণ করিতে যায়। ইংলণ্ডে ইহার মত সুন্দর স্থান আর নাই। দ্বিজু মন্ত্র-মুগ্ধবৎ চারিদিকে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইত। একটি পাহাড় হইতে ঝর্ণার জল নামিতেছে দেখিয়া, সকলেরই সেই পাহাড়ে উঠিবার ইচ্ছা হইল। যেই বলা,—দ্বিজু যে

কোথায় গেল ; দেখিতে পাইলাম না। আমরা সহজ রাস্তা অবলম্বন করিয়া উপরে গেলাম। কিন্তু, আঁধার হইয়া আসিতে লাগিল, দ্বিজুর দেখা নাই। তখন তাহাকে খুঁজিয়া দেখা প্রয়োজন হইয়া পড়িল। পাহাড়ের উপর হইতে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে, দ্বিজু একস্থানে পাহাড়ের উপরে সুখ-শয্যায় শায়িত দেখিতে পাইলাম। তখন তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র আমাদের নিকটে আসিতে বলিলাম। কিন্তু, দ্বিজু উত্তর করিল,—"রাস্তা বড় দুর্গম, উঠিবারও আর উপায় নাই, নামিবারও উপায় নাই। চারিদিকে, উপরে, নীচে বড় বড় পাথর, পা দিবার স্থান নাই ; তাই, শুইয়া আছি। শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছি—কেহ আসিবে কিনা"। তখন কি করিয়া তাহাকে উদ্ধার করা যায় তাহা এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অতি কষ্টে, প্রাণ হাতে করিয়া, আমরা দুই জন তাহার নীচে একটা বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া বলিলাম—"এখন এস,— আমাদের কাঁধে পা দিয়া নাম।" দ্বিজু অমনি জুতাসমেত চরণযুগল স্কন্ধে দিতে প্রস্তুত দেখিয়া বলিলাম,—"জুতাজোড়া খুলিয়া পা দাও!" দ্বিজু তখন "হাঁ হাঁ—তাই তো!" এই বলিয়া কোনক্রমে সে যাত্রা নামিয়া পড়িল। রাস্তা ছাড়িয়া সে পথে আসিবার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করায় অম্লান মুখে উত্তর দিল,—"দেখা গেল, একটা নতুন কিছু আবিষ্কার করা যায় কিনা।"

মাননীয় শ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত এই বিবরণ দেখিয়া বোধ হয়—দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে সে পাহাড়ে উঠিবার সময়েও যে দারুণ বিপদে পড়িয়াছিলেন, সম্ভবতঃ উপহাসিত হওয়ার ভয়ে, তাহা আর তাঁহাদের নিকটে ব্যক্ত করেন নাই। যাহাহৌক, কোনমতে সে যাত্রা সমূহ বিপৎ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, তাঁহারা 'সন্ধ্যা হয়-হয়' এমন সময়ে পাহাড় হইতে অবতরণপূর্ব্বক নীচে নামিয়া আসিলেন।

কিন্তু 'খেয়ালী' দ্বিজেন্দ্রলালের তখনও, একটা খেয়ালের এইরূপ ফল-ভোগ করিয়াও, সমুচিত শিক্ষা হয় নাই। নীচে আসিয়া, তাঁহার মাথায় আবার একটা যে অদ্ভুত খেয়াল বা ঝোঁক চাপিল তাহা শ্রীযুক্ত আশুবাবুর স্ব-কথিত বিবরণ হইতেই পাঠকগণ অবগত হউন,—

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি দ্বিজু চিরদিনই একটু পাগ্‌লাটে রকমের ছিল। পাহাড়

হইতে নামিয়া আসিয়া, সেই ঝরণাটার জল যেখানে জমিয়া একটি Pool' এর (ডোবার) মত হইয়াছিল, দ্বিজুর হঠাৎ ইচ্ছা হইল—সেখানে সে স্নান করিবে! সেখানে জলের উত্তাপ (Temperature) শূন্যের (Zero' র) কাছাকাছি। নিউমনিয়া হইবে ইত্যাদি কতরকম ভয় দেখানো গেল,—সে কোন কথাই শুনিবে না। তখন বলিলাম—"এখানকার আইন বড় কড়া। ঝরণা অপরিষ্কার করার শাস্তি—কারাদণ্ড"! "বটে! তবে থাক, কাজ নাই" বলিয়া, তখন নিরস্ত হইল। এরূপ আইন যে আছে, বলা বাহুল্য—তাহা আমাদিগের কল্পনামাত্র।"

বাল্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাবে আমরা যে একটা অবসাদ বা বিষাদের ভাব লক্ষ্য করিয়াছি, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, যৌবনে বিলাতে গিয়াও, তাঁহার সে ভাব তিরোহিত হয় নাই। লণ্ডনের নিয়ত-চঞ্চল বিচিত্র, কর্ম্মময় দৃশ্য ও ঘটনাবলী মানুষের মনকে সর্ব্বদাই শত মতে ব্যাপৃত ও উত্তেজিত করিয়া রাখে। বাল্যকালে আমরা দেখিয়াছি—নিভৃত-নির্জ্জন কানন-ক্রোড়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তখনই অনেক সময়ে একাকী আত্মস্থ হইয়া থাকিতেন। তাঁহার কবিত্বময়, বিষাদ-ম্লান, বিজন-প্রিয় প্রকৃতি আজ বিলাতে আসিয়া, ব্যসন-বিলাস-সঙ্কুল, কর্ম্ম-কোলাহল-ক্ষুব্ধ সেই লোকালয়ের এতটা বহির্ম্মুখ বিক্ষেপ যেন কোনমতেও সতত সহিতে পারিতেছে না; তাই, দেখিতে পাই—এখানে আসিয়াও তিনি মধ্যে-মধ্যে প্রায়ই 'পার্কে' অথবা সমাধি-ক্ষেত্রে গিয়া দিবসের অধিকাংশ কাল আপনাতে আপনি নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। বিচারপতি আশুবাবুর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী প্রসন্নময়ী আমাদের এই কথার পোষকতা করিয়া জানাইতেছেন—"সেখানেও দ্বিজু নাকি দিনের মধ্যে অনেক সময়ে একলাটি গিয়া সমাধি-ক্ষেত্রে বসিয়া থাকিত।" দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ আত্মীয় ও সুহৃৎ শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও এ সম্পর্কে আমায় যাহা বলিলেন তাহার মর্ম্ম এই,—

বিজন বিহার ও বৈরাগ্য।

"তিনি সমাধিতে বা শ্মশান-ক্ষেত্রে বেড়াইতে বড় ভালবাসিতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় এক দিন বলিয়াছিলেন যে, "মানুষের সকল দর্প অহঙ্কারের এই তো শেষ ! তাই এখানে আসিলে ঠিক আমরা বুঝি যে, আমাদের ক্ষমতা কতটুকু এবং এ সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধটা কতদূর ক্ষণ-স্থায়ী ও অসার। এই অল্প ক্ষমতা ও অবসরটুকু যাহাতে মানুষকে ভালবাসিয়া, নিজের ও সংসারের উন্নতির জন্য ব্যয় করা যায় তাহাই করা কি প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য নহে ? এই কথাটা এখানে আসিলে যেমন সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় এবং এই মনের ক্ষুদ্র আমিত্ব এখানে আসিলে যেমন আপন গণ্ডীটুকু ছাড়াইয়া বিশ্বের দিকে ছড়াইয়া পড়ে এমন আর কোথাও না। এই জন্যই এখানে আসিতে ও বসিয়া থাকিতে আমার এত ভাল লাগে। সত্য-উপলব্ধির ও প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে এমন মহাতীর্থ আর কোথায় আছে ?"

এই বৈরাগ্য ও বিশ্ব-প্রেমের ভাব আমরণ মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাভাবিক প্রকৃতিগত স্ব-ধর্ম্ম ছিল। এই ভাবে, জীবনের সকল সময়ে সর্ব্ববিধ অবস্থাতে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম-জাত কবি-প্রকৃতি কোন দিনও আপনাকে কোন কারণে ক্ষুণ্ণ, মলিন বা বিকৃত হইবার অবকাশ দেয় নাই। স্বভাব-কবি দ্বিজেন্দ্রলালের এইরূপে আমরা সর্ব্বদাই সাক্ষাৎ পাইতেছি।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবু এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

"দ্বিজেন্দ্র যে জাহাজে বিলাত রওনা হইলেন সে জাহাজে অন্য কোন ভারতবাসী ছিলেন না। নৃত্যগোপালবাবু অন্য জাহাজে গিয়াছিলেন। * * সাহেবদিগের সঙ্গে দ্বিজুর ক্রমে আলাপ হইতে লাগিল। সাহেবদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভারতবাসীদিগকে নিন্দা করিত। দ্বিজু তাহার উচিত উত্তর দিতেন —কঠিন কঠিন উত্তর দিতেন। ইহা জানিয়া এখানে কোন বন্ধু বলিলেন যে, জাহাজে দ্বিজেন্দ্র একটি মাত্র ভারতবাসী, সাহেব অনেক; দ্বিজেন্দ্রকে জাহাজ হইতে অনায়াসে সমুদ্রে ফেলিয়া দিতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করিলাম, সাহেবেরা এরূপ কাপুরুষ জাতি নহে যে, সকলে মিলিয়া একজন বিদেশী যাত্রীকে, সাহসী উচিত উত্তর দেওয়ার জন্য এরূপ খুন করিবে।" * * * "দ্বিজেন্দ্র

একদিন 'রিজেন্ট '—পার্কের ভিতর দিয়া আসিতেছেন, এমন সময়, দেখিলেন একজন পাদ্‌রী মহা চীৎকার করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন, চারিদিকে লোক ঘিরিয়া আছে। দ্বিজু তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে উৎসুক হইয়া সেখানে গেলেন, অমনি ধর্ম্ম-প্রচারক গম্ভীর স্বরে বলিলেন "And you, the Devil is staring you in the face"—"সয়তান তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে।"

বলা বাহুল্য—প্রতিমা-পূজকের জাতি, ভারতবাসীর একজন বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশেই এই গালাগালিটা প্রযুক্ত হইয়াছিল।

"যেই তাঁহাকে এই কথা বলা অমনি দ্বিজু তাহাতে আরও গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"Yes, you are."—"হাঁ, তুমি তাকাইয়া আছ বটে।" এইরূপ ঠিক মুখের মত জবাব শুনিয়া, সে স্থলে সমবেত লোকদের মধ্যে হাসির 'গট্‌রা' পড়িয়া গেল।"

জ্ঞানেন্দ্রবাবু আরও বলেন,—

"দ্বিজু যখন সমুদ্রে তখন একখানি ইংলণ্ড-যাত্রী পোত ডুবিয়া যায়, সংবাদ আইসে। তাহার পরই কিছুকাল দ্বিজুর সংবাদ পাওয়া গেল না। জননীর নিকট একথা আমরা প্রকাশ করিলাম না। কিন্তু আমরা সকলেই বড় উদ্বিগ্ন হইলাম। পিতৃদেব বড়ই চিন্তিত হইলেন। জীবনের প্রান্তভাগে সর্ব্বকনিষ্ঠ দ্বিজুকে বিলাতে পাঠাইয়া তাঁহার যে কত কষ্ট হইয়াছিল তাহা তাঁহার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের ভিতর ঢাকা ছিল। এখন তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। যাহা হউক, কয়েক দিবস পরে ভগবানের কৃপায় দ্বিজুর নিকট হইতে পত্র পাওয়া গেল।"

বিলাতের গৃহ ও মিসেস্ হারমার্।

লণ্ডনে তিনি একটি ভদ্রমহিলার সংসারে 'Paying guest' হিসাবে, তাঁহারই পরিবারভুক্ত হইয়া, তদীয় ভবনে প্রায় তিন বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। বিদেশীয় বালক বা যুবকগণের পক্ষে সেই প্রলোভনপূর্ণ, বিপজ্জনক, অপরিচিত স্থানে গিয়া, এই ভাবেই অবস্থান করা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্ ও সুবিধাকর সন্দেহ নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল যে পরিবারে বাস করিতেন তাহার গৃহ-কর্ত্রীর নাম--মিসেস্ হারমার

(Mrs. Harmar)। মিসেস্ হারমারের তুইটি পুত্র ছিল; কিন্তু অতি অল্প কাল পরে দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়-মনের বিবিধ সদ্‌গুণে বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে তিনি এতই স্নেহ করিতে লাগিলেন যে শেষে তিনি প্রায়ই বলিতেন,—'ওটি আমার তৃতীয় পুত্র। বিধাতা তুইটি পুত্র দিয়াছিলেন, আমি আমার ভাগ্যবলে আর একটিকে উপার্জ্জন করিয়াছি।" এই মাতৃহৃদয়া ইংরাজ-মহিলার কথা উঠিলে সর্ব্বদাই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার শত মুখে বহুবিধ গুণ-কীর্ত্তন করিতেন; এবং একবার আমার বেশ মনে আছে—বিলাতের কথা-প্রসঙ্গে মিসেস্ হারমারের কথা স্মরণ করিয়া, তিনি অশ্রুদ্গাত-নেত্রে, তুই হাত যুক্ত করিয়া তাঁহার উদ্দেশে তুই-তিন বার নমস্কার করিলেন। এই বিলাত-প্রবাস প্রসঙ্গে আর একস্থলে জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় লিখিতেছেন,—

"দ্বিজেন্দ্র এবং আর কয়েকটি বঙ্গবাসী বিলাতে একটি মধ্য-বিত্ত ইংরাজ-পরিবারের মধ্যে বাসা-খরচ দিয়া থাকিতেন। ঐ বাটীর সমুদয় লোক—কি বাঙ্গালী কি ইংরাজ—দ্বিজুকে বড় ভালবাসিতেন! Land-lady দ্বিজুকে এত স্নেহ ও যত্ন করিতেন যে, দ্বিজু বাটীতে একবার আমোদ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "তোমার কোন ভয় নাই। এই রমণীকে আমি বিবাহ করিব, এমন সম্ভাবনা নাই। ইনি বয়সে আমার মাতাঠাকুরাণীর তুল্য"। দ্বিজু তখন বিলাতী খানা ভাল খাইতে পারিতেন না। তজ্জন্য এই শ্রদ্ধেয়া মহিলা দ্বিজুর জন্য একদিন পোলাও বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য পোলাও কিরূপ হইয়াছিল, তাহা পাঠককে বলিতে হইবে না। যাহাহৌক্, তিনি বিদেশে দ্বিজুকে মায়ের মত স্নেহ করিতেন, সেবা-শুশ্রূষা করিতেন।"

মাননীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের 'দিদি' প্রসন্নময়ী দেবী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—

"কুমারী রো'কে (রো সাহেবের ভগিনী) দ্বিজু আগে জানিত না। বিলাতে এক 'বন-ভোজনে'র পার্টি'তে তাঁহাকে নৌকা হইতে মাঝির সাহায্যে নামিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া, বিলাতি সভ্যতার প্রতি কটাক্ষ করায়, কুমারী রো বড় অসন্তুষ্ট হন। তাহার পর ক্রমে দ্বিজুকে প্রকৃতরূপে চিনিতে পারিয়া

বন্ধুতা করেন। দ্বিজু তাঁহাকে (Granny) 'গ্রানী' বলিয়া ডাকিত ও প্রতি বৎসরই তিনি বড়দিনে দ্বিজুকে একটা ভ্রমরের ছবি উপহার দিতেন। তাহার কারণ, ভ্রমর গায়ে পড়িলে দ্বিজু তখন বড় ভয় পাইত।"

গ্রন্থারম্ভেই বলিয়াছি যে, আশৈশব পিতামাতার প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। স্বদেশে এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের পিতৃদেব বাঞ্ছিত ধামে অন্তর্হিত হন। কলিকাতা টাউনহলে দ্বিজেন্দ্রলালের লোকান্তর-প্রাপ্তি উপলক্ষে যে বিরাট্ শোকসভার অধিবেশন হয় তাহার সভাপতি হিসাবে মাননীয় ডাক্তার সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় এই সময়ের বিবরণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

পিতৃ বিয়োগ।

"যেদিন দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, সেইদিন কৃষ্ণনগরের সে সময়কার প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালী লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন—"দেওয়ানজী, আপনার কিছু মনের কথা বলিবার আছে? কোন অপূর্ণ সাধ, অপূর্ণ বাসনা ব্যক্ত করিবার আছে কি?" মৃত্যু-শীর্ণ মুখে একটু তৃপ্তির হাসি ফুটাইয়া দেওয়ানজী উত্তর করিলেন—"আমার মনে কোন ক্ষোভ নাই। আমার সাত পুত্রই জীবিত। সর্ব্বকনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্র বিলাতে গিয়াছে, সেখানে ভাল লেখা-পড়া করিতেছে। একমাত্র কন্যা সৎপাত্রে পড়িয়াছে। আমার সকল সাধ মিটিয়াছে। এখন যাঁহার আহ্বানে লোকান্তরে যাইতেছি তাঁহার দরবারে গিয়া হাজির হইতে পারিলেই আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়।"

কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের জীবনের শেষ মুহূর্ত্তের বিষয়ে 'রাঙ্গাদাদা' শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয় বলিতেছেন,—

"স্বর্গীয়া দেবী-সদৃশী মাতৃদেবীকে এই আশ্বাস দিলেন যে, "তোমার ভাবনা কি, তোমার সাত ছেলে; সর্ব্ব-কনিষ্ঠ পুত্রও এম-এ পাশ করিয়া বিলাতে গিয়াছে।" যতদূর স্মরণ হয়, এই কথাগুলি মৃত্যুর প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন তাঁহার বন্ধু, সিভিল মেডিকেল অফিসার ডাক্তার মহানন্দ মুখোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"দেওয়ানজী ভয় কি?" পিতৃদেব ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমার ভয়!"

দেওয়ানজীর মৃত্যু হইলে, সে মর্ম্মান্তিক শোচনীয় দুঃসংবাদ জ্ঞানেন্দ্রবাবু তাঁহার এক বন্ধুর দ্বারা তদীয় সর্ব্ব-কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিলাতে জ্ঞাপন করেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বন্ধুটি অতিশয় সন্তর্পণে, ধীরে-ধীরে দ্বিজেন্দ্রলালকে এ সংবাদটি জানাইবামাত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল দাঁড়াইয়াছিলেন, সহসা দুই হাতে মাথা চাপিয়া-ধরিয়া, অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং বলিয়াছেন,—এই ভয়ানক খবরটি শুনিবা-মাত্র তাঁহার মনে হইল,—যেন সে স্থলের সমস্ত দ্রব্যাদি সজীব হইয়া-উঠিয়া, তাঁহার চতুর্দ্দিকে অতি-দ্রুত কম্পিত হইতে-হইতে, তাণ্ডববেগে নৃত্য করিতে লাগিল ; এবং হঠাৎ তাঁহার পদতল হইতে যেন পৃথিবী সরিয়া-যাইতে লাগিল ! কিছুক্ষণ পরে, তাঁহার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া এতদূর শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হইল যে, তিনি মনে করিলেন—বুঝিবা তাঁহারও তখনই অন্তিম সময় উপস্থিত ! প্রথম 'ধাক্কা' সাম্‌লাইয়া-লইয়া, এই বুক-ভাঙ্গা ব্যথার হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য, দ্বিজেন্দ্রলাল সে সময়ে অনাবশ্যক ভাবেও পরিচিত ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়া বসিয়া থাকিতেন, অথবা পথে-পথে অনির্দ্দিষ্ট গতিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহার বহু বৎসর পরে তাঁহার কোন 'প্রিয়তম' বন্ধুর নিকটে এক পত্রে লিখিয়াছেন,—"যথার্থ শোকে যে মানুষকে কি রকম করিয়া ফেলে তাহা লোকের মুখে শুনিয়া ও পুস্তকে পড়িয়া আমি কতকটা অনুমান করিয়া নিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু আমার পিতার পরলোক-গমনে সেটা সর্ব্ব-প্রথম আমি অতীব অসহ্যভাবে অনুভব করিতে বাধ্য হই।" প্রায় একমাস ধরিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের এই রকম সঙ্কটাপন্ন শোচনীয় অবস্থা ছিল।

রঙ্গালয় ও নাটকের প্রতি অনুরাগ।

বিলাতে থাকিতে তিনি সেখানকার বিখ্যাত ও বড়-বড় 'থিয়েটার' বা রঙ্গালয়ে প্রায়ই অভিনয়াদি দর্শন করিতে যাইতেন। এইরূপে, সেই কয় বৎসরের

মধ্যে, সেখানকার যত প্রসিদ্ধ ও বিশ্ব-বিশ্রুত অভিনেতা ও অভিনেতৃগণের নানাবিধ অভিনয় দর্শন করিয়া, রঙ্গালয় সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও শিক্ষালাভ করিতে সফলকাম হ'ন। ফলতঃ, এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মনে রঙ্গালয় ও নাটকাদি সম্পর্কে অকৃত্রিম আকর্ষণ ও অনুরাগের সঞ্চার হইতে থাকে। শ্রদ্ধেয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশু চৌধুরী মহাশয় জানাইতেছেন,—

"একদিন দ্বিজুর সঙ্গে 'Drury-Lane' থিয়েটারে 'প্যাণ্টোমাইম' (Pantomine) দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে 'আলাদীন ও আশ্চর্য্য প্রদীপ' অভিনয় হইতেছিল। চোখের সামনে যেই (Lamp) বাতি-ঘষা সেই প্রকাণ্ড সাদা পাথরের রাজবাটী প্রস্তুত ইত্যাদি 'সিন' দেখিয়া দ্বিজুর এত আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমি আশ্চর্য্য হই। ঠিক ছোট ছেলের মত এই সব দেখিতে আনন্দ পাইত।"

বিদেশিনীর প্রেম।

বিলাতে জনৈক ইংরাজ-যুবতী দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। মহিলাটি সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া, বিদুষী, এবং গ্রন্থাদি রচনা করিয়া তখনই সমাজে যশস্বিনী হইয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল মনে-মনে যদিও তাঁহাকে পছন্দ্ করিতেন,—প্রীতির চক্ষে দেখিতেন তবু বাহ্যিক ব্যবহারে, মৌখিক আলাপে অথবা পরোক্ষে অন্যের নিকটেও তিনি কখনও স্বীয় মনোভাব বা প্রণয়-প্রীতি জ্ঞাপন করেন নাই। এসম্পর্কে আমাকে স্বয়ং তিনিই বলিয়াছেন যে, একদিন একটি গোলাপফুল উপহার দেওয়া ছাড়া, তিনি আর কখনও তাঁহাকে কোনরূপ প্রশ্রয় বা আশা দেন নাই। যাহাহৌক, ক্রমে কিছুকাল অতীত হইলে, দ্বিজেন্দ্রলালের তদ্রূপ কোন বাসনা বা অভিপ্রায় না থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কথঞ্চিৎ গাঢ় ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিলে, একদা হঠাৎ সেই কুমারীটির পিতা দ্বিজেন্দ্রলালকে এক পত্র লিখিয়া

জানাইলেন যে, তাঁহার কন্যাকে তিনি যদি বিবাহ করিতে সম্মত না হ'ন তবে সে ভগ্ন-হৃদয় হইয়া নিশ্চয়ই মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে! অভাবিতভাবে অকস্মাৎ এই পত্র পাইয়া, দ্বিজেন্দ্রলালের মনে তখন যে কি বিমিশ্র ভাবের উদয় হইল তাহা অনুমান বা কল্পনা করা সহজ নহে; বস্তুতঃ, পত্রখানির মর্ম্ম অবগত হইয়া, তিনি বিস্মিত, বিহ্বল ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, এবং এ সম্পর্কে তাঁহার মত অবস্থায় লোকের পক্ষে যে কি কর্ত্তব্য তাহা তিনি কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না। এক দিকে তাঁহার অস্থির ও অনির্দ্দিষ্ট তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ, আর একদিকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির, অসহায়া, সরলা গুণবতী রমণীর এই হৃদয়-বিদারক, প্রাণ-সংশয় অবস্থা! কোমল-প্রাণ, অকপট ও উদার-হৃদয় কবি অকস্মাৎ নিতান্তই অপ্রস্তুতভাবে এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে পতিত হইয়া বাস্তবিকই বিষম বিপন্ন ও অস্থির হইলেন। জনকের চির-বিয়োগ-ব্যথায় দ্বিজেন্দ্রলালের মনঃপ্রাণ তখনও প্রগাঢ় অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল। সম্মুখে সহসা এই বিচিত্র ও অভিনব আত্মীয়তার প্রলোভনটি অযাচিতরূপে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও, দূরে তিনি যেন একটি নবীন আশা ও আশ্বাসের স্নিগ্ধ-ক্ষীণ আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইলেন। সেই সময়ে তাঁহার মনোমধ্যে কে যেন অতি মৃদু অথচ মমতা-মধুর কণ্ঠে বারংবারই তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—'এমন সুযোগ মিলিল যদি, হেলায় হারাইও না। এ বিবাহ করিয়া, পরম সুখে ও নিশ্চিন্ত সম্ভোগে এই নশ্বর জীবনের অবশিষ্টকাল এখানেই অবস্থান কর; আর সে শ্মশান-সম শূন্য স্বদেশে ফিরিয়া-গিয়া কি হইবে?' ইচ্ছা যখন ক্রমে সাগ্রহ সঙ্কল্পে পরিণত হইতে চলিল তখন তিনি এ সম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে অকপটে তাঁহার অন্তর্নিহিত এই অভিপ্রায়টি ব্যক্ত করিয়া তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। নৃত্যবাবু তখন দ্বিজেন্দ্রলালের

সঙ্গে একত্র একই বাসায় (অর্থাৎ মিসেস্ হারমারের গৃহে) অবস্থিতি করিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এবংবিধ বাসনার বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া, তিনি বহুবিধ যুক্তি-তর্ক, অনুরোধ-উপরোধ, উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বহুদিনের চেষ্টার ফলে, দ্বিজেন্দ্রলালকে এ আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বিলাতী 'মেম' বা 'ম্যাম' বিবাহ করিয়া কেন যে ভারতবাসী কিছুতেই কোন দিন পবিত্র দাম্পত্য-সুখের অধিকারী হইতে পারে না, উভয় জাতির চিন্তা, আদর্শ, স্বভাব ও আচরণের যে আদ্যোপান্ত কি আকাশ-পাতাল পার্থক্য ও বৈষম্য,—বহু চেষ্টায় একে-একে তাহা যখন নৃত্য-গোপালবাবু নিপুণ তার্কিক ও প্রখর বুদ্ধিমান্ দ্বিজেন্দ্রলালকে বুঝাইয়া দিলেন তখন দ্বিজেন্দ্রলাল কেবল যে সে আকাঙ্ক্ষা চিত্ত হইতে বিষবৎ বর্জ্জন করিলেন তাহা নহে,—এই মহদুপকারের জন্য আজীবন তিনি নৃত্যগোপালবাবুর কাছে আপনাকে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ ও 'বিক্রীত' বলিয়া মনে করিতেন। এ উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"নৃত্যগোপালের কাছে আমি যে কি অপরিসীম ঋণী তা' আমি এক মুখে বলে' শেষ কর্‌তে পারি না। সে যে আমার কত বড় উপকার করেছিল, তা' আমার যত বয়েস বাড়্‌ছে ততই আমি সব রকমে বুঝ্‌তে পারছি। তার সে উপকার আমি মরে' গেলেও হয়ত ভুল্‌তে পারব না।" এই প্রীতিময়ী, গুণবতী রমণীটির এক্ষণে বিবাহ হইয়াছে ; অতএব, এখন আর তাঁহার নাম প্রকাশ করা আমি কোনক্রমেই উচিত বা শোভন বিবেচনা করি না।

বিলাতের কথা উঠিলে তিনি মধ্যে-মধ্যে তাঁহার স্বজন-বান্ধব, এমন কি তরুণ-বয়স্ক পুত্র-কন্যার নিকটে পর্য্যন্ত দর্পভরে বলিতেন,—

প্রবাসে সংযম।

"বিলাতে আমার জীবন যে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিষ্কলঙ্কভাবে কেটেছে একথা আমি যেমন জোর করে', বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পারি, খুবই অল্প লোকে তেমন পারে,

—এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস।" তৎকালে বিলাতে তাঁহার অন্যতম প্রধান সহচর, অবসর-প্রাপ্ত, সুযোগ্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় মহাশয়কে একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি যুবক বন্ধু কৌতূহল-পরবশ হইয়া নাকি গোপনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মহাশয় প্রথম যৌবনে আমাদের রায়-সাহেবের বিলাতে থাক্‌তে স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল, বল্‌তে পারেন?" একথার উত্তরে অত্যন্ত উৎসাহিত ও উত্তেজিত স্বরে অতুলবাবু বলিলেন,—

"দ্বিজুর চরিত্র!—একথা আজ আপনারা যদি জিজ্ঞাসা করলেন ত' বলি, দ্বিজুর মত একেবারে নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ জীবন এ সংসারে আর কয়টা লোকের আছে বা থাকতে পারে, আমি জানিনা। আমাদের সকলের তুলনায় সে যে দেবতা, একথা আমি মুক্তকণ্ঠেই বলতে রাজী আছি। ঐ যে দেখছেন একটি মানুষ, যদি ওকে মানুষই বল্‌তে হয় ত' জানবেন, ও এই আজকালকার এ যুগের কেউ নয়,—ও সেই ভীষ্ম-টিষ্মর মত একটা অদ্বিতীয় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ।"

ইহার অধিক আর সে পুণ্যাত্মার চরিত্র সম্পর্কে কোন কথা বলা যায় না। যিনি তাঁহাকে একটুও ঘনিষ্ঠ বা আত্মীয়ভাবে জানিবার সুযোগ বা সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, আমারও নিশ্চিত ও ধ্রুব ধারণা—তিনি উক্ত উক্তির তাৎপর্য্যটুকু বর্ণে-বর্ণে সত্য বলিয়া আজ একান্ত অকপটে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। আমি মনে করি যে, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গের এটা একটা প্রকৃত গৌরব ও পরম সৌভাগ্য যে, বিধাতার অনুগ্রহে, এ পাপ-পঙ্কিল ও কলুষ-মলিন সংসারে তাঁহারা এমন অম্লান-শুভ্র, পবিত্র চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন।

উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-লাভ।

যাহাহৌক্ বিদ্যার্জ্জনের জন্য লণ্ডনে তিনি প্রায় তিন বর্ষ কাল বসবাস করিয়া, সিসিটার কলেজ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কৃষিবিদ্যা-শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া F.R.A.S., (এফ্-আর-এ-এস্) উপাধি প্রাপ্ত হ'ন; এবং সেই

সঙ্গে রাজকীয় কৃষি-কলেজ ও কৃষি-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া যথাক্রমে M.R.A.C. ও M.R.S.A.E., (এম্-আর্-এ-সি এবং এম্-আর্-এস্-এ-ই) উপাধি লাভ করেন।

স্বদেশ-প্রত্যাগমনের অল্পকাল পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলালের জননী-দেবীও তাঁহার পিতৃদেবের পদাঙ্ক-অনুসরণ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। এই ভীষণ দুঃসংবাদ তাঁহাকে জানাইবার জন্য তাঁহার সেখানকার গৃহ-কর্ত্রী মিসেস্ হারমারকে এই সংবাদটি যথাকালে প্রেরণ করা হইয়াছিল; কিন্তু, কোমল-প্রাণা, মাতৃহৃদয়া হারমার-মহিলা ইতিপূর্ব্বে সেই পিতৃবিয়োগ-যন্ত্রণায় দ্বিজেন্দ্রলালের দারুণ দুর্দ্দশার বিষয় স্মরণ করিয়া, কোনমতেও তাঁহাকে এ ঘটনাটির কথা জানাইতে পারিলেন না। তিনি সে সময়ে কেবলমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের মনকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বলিলেন যে, তাঁহার প্রেমময়ী মাতৃদেবী অতি অসাধ্য ও সাংঘাতিক রোগে শয্যাগত হইয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ এ যাত্রা তাঁহার আর রক্ষা পাওয়ার কোনরূপ আশা নাই। মা-অন্তপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল এই শোচনীয় সংবাদে এতদূর উদ্বিগ্ন ও অস্থির হইয়া উঠিলেন যে তিনি আর সেখানে তিলার্দ্ধ কাল-বিলম্ব না করিয়া, সেই সপ্তাহের জাহাজেই স্বদেশে প্রত্যাগমনার্থ যাত্রা করিলেন। এদিকে মিসেস্ হারমার তাঁহার এই 'তৃতীয় তনয়টি'কে সাশ্রুলোচনে বিদায় দিয়া, তখনই ফ্রান্সে তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকটে, দ্বিজেন্দ্রলালকে জানাইবার জন্য তদীয় মাতৃবিয়োগ-সংবাদটা 'তার' যোগে প্রেরণ করেন। সেই 'বন্ধু'টি যখন দ্বিজেন্দ্রলালকে

মাতৃবিয়োগ

যথাকালে এই খবরটা বলিলেন তখন দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা শুনামাত্র একেবারেই 'ভাঙ্গিয়া' পড়িলেন। পিতৃবিয়োগে তাঁহার যতটা দুরবস্থা না হইয়াছিল, এবারে তাঁহার তাহাই হইল। দ্বিজেন্দ্রলাল এই সংবাদ শোনার পর প্রাণান্তকর শোকের প্রচণ্ড তাড়নায় দুই-তিন দিন যাবৎ অনিদ্রা ও অনাহারে

ঠিক যেন ক্ষিপ্তের মত হাহাকার করিতে লাগিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—"এই সময়ে আমার সমুদ্রজলে লাফাইয়া-পড়িয়া, আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে ইচ্ছা হইত; মনে হইত—বুঝি মরিতে পারিলেই মাকে পাইব। কিন্তু, তৎকালে সে জাহাজে একজন সহৃদয় পার্শী ছিলেন; তিনি আমায় বুঝাইয়া বলিলেন,—'মরিলেই যে দেখা পাইবে তারই বা নিশ্চয়তা কি!' তাঁর কথায় আমার শেষ আশাটুকুও লোপ পাইল, আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলাম; —হাহাকার করিয়া, সেই প্রথম জাহাজের ডেকের উপরে কাঁদিয়া-কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িলাম। কান্নাতেই আমার সে দাহ কিন্তু তখনি যেন অনেকটা দূর হইয়া গেল।" এ সংসারে সকল ক্ষতির, সর্ব্ববিধ অভাবেরই পূরণ আছে,—এ দুনিয়ায় সব জিনিষেরই যেমন-তেমন একটা-না-একটা জোড়া মেলে; কিন্তু, বিলাতে আসিয়া, দুর্ভাগ্য দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন এই যে দুইটি বস্তু হারাইল তাহার আর জোড়া নাই, তুলনা নাই;—এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সৌভাগ্য, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্য-সম্ভারের দ্বারা সে অপরিমেয় ক্ষতির আংশিক পূরণও অণুমাত্র সম্ভবপর নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল একটিমাত্র তুচ্ছ বৎসরে পিতা ও মাতা—এই উভয় নর-দেবতাকেই হারাইয়া ফেলিলেন; হাহাকারে জীবনব্যাপী অশ্রান্ত অন্বেষণের ফলেও, হায়,—তিনি এ সংসারে 'মাথা গুঁজিবার' বা নির্ভর করিবার একটুও আশ্রয় কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না! ঐ অনন্ত প্রসারিত, উন্মুক্ত অম্বরতলে দাঁড়াইয়া, নিরাশ্রয় দ্বিজেন্দ্রলাল তখন শূন্যহৃদয় ও ব্যর্থ আবেগে কেবলই কাঁদিতে লাগিলেন।

মূলতঃ, এ সংসারে সকল অবস্থা, সামাজিক সকল সম্বন্ধই বিধাতার অব্যর্থ বিধান হইলেও, মুখ্যতঃ তাহা আমরা স্থূল বুদ্ধিতে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া লই। প্রথমতঃ—যাহা স্বভাবজ, আর দ্বিতীয়তঃ—যাহা স্বেচ্ছা-লব্ধ বা স্বোপার্জ্জিত। মাতা-পুত্রে বা

ভ্রাতা-ভগিনীতে যে সম্বন্ধ তাহা স্বভাবজ, এবং স্বজন-বান্ধববর্গ বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও যে সম্বন্ধ তাহা স্বোপার্জ্জিত বা স্বেচ্ছা-লব্ধ। মানব-জীবনে এই সকল সম্বন্ধের স্থায়িত্ব যেমন সুখ বা সৌভাগ্যের আকর তেমনই আবার এ সকলের বিয়োগমাত্রই অশেষ শোক বা দারুণ দুঃখের নিদান। এই উভয়বিধ দুঃখই মর্ম্মান্তিক, সন্দেহ নাই; কিন্তু তবু, একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিলে ইহা অনুভূত হইবে যে, এই দ্বিবিধ বিয়োগ-দুঃখ বা বিরহ-ব্যথার মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। স্বাভাবিক সম্বন্ধের বিয়োগজনিত যে শোক তাহা—জন্ম-জাত প্রকৃতির 'ছেঁড়া নাড়ীর টন্‌টনানি' বা অসহ্য আক্ষেপ-স্পন্দন; আর, স্বোপার্জ্জিত বা স্বেচ্ছালব্ধ সম্বন্ধের বিয়োগ-দুঃখ—প্রকৃতিগত মায়ার মোহময়,করুণ ক্রন্দন!

আজ দ্বিজেন্দ্রলালের এ দুরন্ত দুঃখ শুধু যে আশ্রয়হীন বা নিরবলম্ব হওয়ার জন্য, তাহা নহে। গূঢ় ও নিবিড়ভাবে ইহার অন্যবিধ গুরুতর কারণও আছে। অনাদি সৃষ্টির সেই অনন্তকাল-প্রবাহী স্মৃতিময়, 'অতীতে'র সহিত যে সূত্রে অনাগত ভবিষ্যের জনকরূপী ঐ 'বর্ত্তমান' সংযুক্ত ছিল, অকস্মাৎ মহাকালের ভ্রূকুটি-ভীষণ কটাক্ষে তাহা বন্ধন-চ্যুত হইয়া-পড়ায়, এইভাবে, পতিত ও পরিত্যক্তের প্রাণ বিহ্বল ও ব্যথাতুর হইয়া উঠে! বোঁটার বাঁধন হইতে ফলটিকে বিচ্যুত করিয়া ছিঁড়িয়া-লইলে, এই জন্যই বুঝি—সেই বিচ্ছিন্ন অংশেও বেদনার অশ্রুদ্গম হয়!

বাষ্পীয় পোত ফেনিল তরঙ্গময় পাথার-বক্ষে একলক্ষ্যে ভাসিতে-ভাসিতে, ক্রমে কলিকাতার পশ্চিম-প্রান্তবাহী সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তটমূলে আসিয়া গতিহীন হইল; আর তাহারই এক কোণে, 'দরদর'-বাহী দুর্ব্বার অশ্রুর প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে, দুর্ভাগ্য দ্বিজেন্দ্রলাল এতকাল পরে স্বদেশে ফিরিয়া-আসিয়া একেবারেই আশ্রয়হীন হইলেন! ক্ষণ

প্রত্যাবর্ত্তন।

কালের জন্য জনাকীর্ণ কলিকাতার সেই কোলাহল-ক্ষুব্ধ, অট্টালিকা-কণ্টকিত পাষাণপুরী তাঁহার চক্ষে শূন্য, পরিত্যক্ত শ্মশানের ন্যায় স্তব্ধ ও ভীষণরূপে প্রতিভাত লইল! ভারাক্রান্ত অবসন্ন হৃদয়ে, একটা মর্ম্মভেদী গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, ভয়ার্ত্ত অপরাধীর মত, ধীরে-ধীরে এতদিন পরে মাতৃভূমির প্রিয় সুসন্তান তাঁহার ক্রোড়ে প্রত্যাগত হইলেন। অদৃষ্টের এ কি উপহাস!

তৃতীয় পর্য্যায়

উন্মেষ

১

কর্ম্ম-ক্ষেত্র ও সামাজিক পীড়ন।

প্রায় দীর্ঘ তিন বর্ষ পরে দ্বিজেন্দ্রলাল দেশে ফিরিলেন। নিষ্ঠুর নিয়তি তৎকালে তাঁহার পানে চাহিয়া বারেক বক্ররূপে যে বিরস-কঠোর ব্যঙ্গ-হাস্য করিল, সরলমতি দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা দেখিতেও পাইলেন না।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় বলিয়াছেন,—

"তিনি দেশে আসিয়া ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ছোটলাটের সহিত যেরূপ স্বাধীন-ভাবে কথা-বার্ত্তা কহিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ভাল চাকুরী পাইলেন না। তাঁহারন্যায় কৃষি-কর্ম্ম শিক্ষা করিয়া একজন বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী Statutory Civilian হইলেন, আর দ্বিজেন্দ্র ডেপুটি হইলেন!"

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম-গ্রহণ।

দুরদৃষ্ট আর কাহাকে বলে!

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৫'এ ডিসেম্বার, তিনি সরকার-বাহাদুরের অধীনে সামান্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হ'ন। ইহার অব্যবহিত পরে (Survey & Settlement'এর) জরিপ-জমাবন্দির কার্য্য শিখিবার জন্য গাভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলায় প্রেরণ করেন। অনূর্দ্ধ তিন মাস মধ্যে তিনি এ শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। রায়পুরে তিনি তাঁহার 'সেঝ্‌দা' জ্ঞানেন্দ্রবাবুর সহপাঠী ও

রায়পুরে অবস্থান ও জরিপ জমাবন্দী-শিক্ষা।

বন্ধু, রায়বাহাদুর তারাদাসবাবুর গৃহে গিয়া এই কয় মাস অতিথি-রূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে থাকার সময়ে তিনি যে এক 'কীর্ত্তি' করেন তাহা শুনিলে সকলেই তাঁহার প্রকৃতি-সুলভ স্বাভাবিক বিশেষত্বটুকুর যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। মান্যবর বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী এ বিষয়ে আমাকে যে বিবরণটি দিয়াছেন, এস্থলে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।—

পোষাকে জাতি-সমন্বয়।

"সেখানে এক দরবার হয়। দ্বিজু সে দরবারে ধুতি, চাদর, লাল কোট ও বিলাতী হ্যাট্ পরিয়া সভায় গিয়া হাজির হন। সভাস্থ সকলে তাঁহার এই অদ্ভুত বেশ দেখিয়া তো একেবারে অবাক্! কমিশনার সাহেব তাই দেখিয়া তারাদাসবাবুকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"লোকটা কি পাগল? নইলে এইরূপ পোষাকের অর্থ কি?" তাহাতে তারাদাসবাবু বলিয়াছিলেন,—"খেয়ালী লোক —পাগল নহে। অতিশয় বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্। বাহ্য পোষাক দেখিয়া বিচার করিবেন না, ভিতরটা খুব ভাল। কাজে ক্রমশঃ তাহা প্রাকাশ পাইবে।" বিলাতী ও দেশী পোষাক মিলাইয়া-পরিয়া, তিনি তদ্দ্বারা এই দুই বিভিন্ন জাতির মিলনের পরিচয় দিতে চাহিয়াছিলেন।

দরবারের মত একটা সভ্যজনসমবেত, বিশিষ্ট স্থানে নিজের মত ও ধারণারূপ, এমন হাস্যকর ও বিচিত্র ব্যবহার করিতে কয়জনে পারেন বা সাহস করেন, তাহা একটু ভাবিয়া-দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনই-সব ক্ষুদ্র-তুচ্ছ অসংখ্য আচরণের ভিতর দিয়া সেই সরল ও তেজস্বী দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরূপটি আপনা আপনি নিয়ত প্রকাশিত হইয়া পড়িত। এই ঘটনার বহু বৎসর পরে, তিনি একটা সর্ব্বজন-বিদিত সাহিত্যিক বাদানুবাদ উপলক্ষে আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"এটা আমি নিজে বেশ বুঝ্‌তে পারি, আমার এ ব্যর্থ জীবনের যদি কিছুমাত্র বিশেষত্ব থাকে তা' এক সোজা কথায়

—'কারো-তোয়াক্কা-রাখিনা-বাবা'-তা।" বাস্তবিক যাঁহারা তাঁহাকে একটুও বুঝিতে বা চিনিতে পারিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন—এমন 'নিছক্' সত্য কথা তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই হইতে পারে না। উল্লিখিত ব্যাপারে আমরা এ বিষয়ের একটু সামান্য নিদর্শন পাইলাম ;—ক্রমশঃ ভাবী জীবনে আমরা চিরটা কাল ইহার অসংখ্য প্রমাণ ও পরিচয় পদে-পদেই প্রাপ্ত হইব।

ক্রমান্বয়ে তিন বৎসরের অদর্শনের পর দ্বিজেন্দ্রলালকে পাইয়া, তদীয় স্বজনগণ যদিও মুখে খুব সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু, কার্য্যতঃ সামাজিক ও অন্যবিধ আনুষ্ঠানিক ব্যবহারে তাঁহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত একটু স্বাতন্ত্র্য ও ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। 'পাতানো' সম্পর্কের স্থলে —বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে এবংবিধ আচরণ তিনি হাস্যমুখে, অবজ্ঞাভরে অগ্রাহ্য করিতেই প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু ক্রমশঃ যখন প্রকাশ পাইল যে, প্রকৃত অবস্থা শুধু তাহা নহে, তদপেক্ষা বহুল পরিমাণেই শোচনীয় ও সাংঘাতিক, অর্থাৎ—বিলাত যাওয়ার জন্য তদীয় আত্মীয়গণের মধ্যেও কেহ-কেহ সামাজিক হিসাবে তাঁহাকে বর্জ্জন করিতে কৃত-নিশ্চয়—তখন অসহায় ও বড়-অভিমানী দ্বিজেন্দ্রলালের ভাব-প্রবণ কোমল হৃদয় আর-একবার তাঁহার পিতামাতার কথা স্মরণ করিয়া হাহাকারে কাঁদিয়া-উঠিল!—এই অভাবিত, প্রচণ্ড আঘাতে তিনি স্তম্ভিত, আহত ও মুহ্যমান হইয়া গেলেন।

সামাজিক পীড়ন।

শুনিয়াছি—এই সময়ে তাঁহার হিতার্থিগণের মধ্যে কেহ-কেহ সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্তের পরামর্শ ও ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু, বিলাত-যাত্রা অশাস্ত্রীয় কিংবা অবৈধ কর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে না পারায়, তিনি বিনা দোষে ও অকারণ তাঁহাদের এ ব্যবস্থা মানিলেন না। পিতৃ-আদেশে, বিদ্যা-লাভার্থ বিলাতে গিয়া,

তিনি যে এমন কি অপরাধ করিয়া ফেলিলেন তাহা বস্তুতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের বুদ্ধি ধারণা করিতে অক্ষম হইল। অন্য কেহ হইলে অবশ্য স্বজনবর্গের এবংবিধ আগ্রহ অনুরোধ, এবং শত অযৌক্তিক ও অন্যায় হইলেও সমাজের এই একটা আদেশ বা 'আব্দার'—অন্ততঃ স্বীয় স্বার্থ ও সুবিধার খাতিরেও—রক্ষা করিতে সম্মত হইত; কিন্তু আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারেই সে 'ধাতের' মানুষ ছিলেন না,—তাঁহার জীবন সম্পূর্ণ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন,—

"দ্বিজেন্দ্র দেশে আসিলে মাননীয় ৺রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর আমাকে নদীয়া জেলার একজন পদস্থ গণ্যমান্য পণ্ডিতের সাক্ষাতে বলিলেন যে, "আমরা দ্বিজেন্দ্রকে সমাজে লইব।" এই কথা বলিয়া উক্ত পণ্ডিতের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"কি বলেন ঠাকুর?" ঠাকুর যাহা বলিলেন তাহা লিখিতে লজ্জা হয়। ঠাকুর অম্লান বদনে বলিলেন,—"তোমরা আমাকে কত টাকা দিবে?" ঐ ঠাকুর এবং অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত-ঠাকুরের প্রকৃতি আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। তথাপি ঐ কথাটা শুনিয়া বড়ই ঘৃণা বোধ হইল। আমি রায়বাহাদুরকে বলিলাম—"এ বিষয়ে আমাদের যত্ন ও শ্রম করিবার আবশ্যক নাই। দ্বিজু কখনই প্রায়শ্চিত্ত করিবে না।"

ব্যক্তিত্ব ও স্বানুবর্ত্তিতা।

স্বাবলম্বন বা স্বানুবর্ত্তিতাই দ্বিজেন্দ্রলালর জীবনের মূল মন্ত্র ও সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব। যে অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রভাবে তিনি এই সময়ে স্বজন-বান্ধব ও সমাজের সমবেত অনুরোধের বিপক্ষে, একা অনন্যসহায়ে, একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া, স্বীয় মতের উপরে নির্ভর স্থাপন পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে সাহসী হইয়াছিলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সেই অমিততেজা, অদম্য ব্যক্তিত্বের (Individuality'র) দ্বারাই পরিচালিত হইয়া গিয়াছেন। বিলাত হইতে লিখিত পত্রাবলীর এক স্থানে তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—"স্বাতন্ত্র্য—(Individuality)

মনুষ্যের উজ্জ্বল আভরণ। প্রত্যেক মনুষ্যেরই নিজের একটি মনোগতি ও রুচি আছে। তাহার পরিচালনায় মনুষ্যের উন্নতি বই অবনতি হয় না। প্রতি মনুষ্য একই প্রথাবলম্বী হইলে জাতির কোন বিষয়েই উন্নতি হয় না। যাহার যে রুচি, সে তাহা অনুসরণ করুক্। মনুষ্যকে শিক্ষা দিবার দুইটি উপায়—দৃষ্টান্ত ও উপদেশ। দ্বিতীয়টি যাঁহাদের বাগ্মিতা ও লেখনী-ক্ষমতা আছে তাঁহারা অনুসরণ করুন; প্রথমটিও তাহার সঙ্গে চাই। কিন্তু, অন্য সকলে কেবল প্রথমটির দ্বারা অন্য লোককে শিক্ষা দিউক। * * * 'Individuality is the fountain of progress and the source of human happiness'. মনুষ্য-জীবনের সুখের মূলে এই স্বানুবর্ত্তিতা। ইহা প্রতি জীবনে নবীনতা আনিয়া দেয়, উদ্দেশ্যহীন জীবনকে অর্থপূর্ণ করে, পুষ্পহীন তরুকে কুসুমিত করে। ইহা জাতীয় জীবনে আদর্শ আনিয়া দেয়, দূরস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় দীপ্তিপুঞ্জ বিকীর্ণ করে। ইহা আনন্দের নিদান, উন্নতির চিরপ্রবাহী নির্ঝর।" দ্বিজেন্দ্রলালের যে কথা সেই কাজ। যে বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি প্রথম জীবনে এই কথাগুলি লিখিয়াছেন, চিরদিনই তাঁহার ধারণা ধ্রুব-তারার ন্যায় অচল দীপ্যমান রহিয়া তদীয় জীবন-গতি নিত্য-নিয়ত নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছে। বিশ্বাসের বল (Courage of conviction) যে কাহাকে বলে, বিচার-বুদ্ধির অনুশাসনে যে কি ভাবে বীরদর্পে এ সংসারক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হয়,—তদীয় জীবন তাহার জ্বলন্ত আদর্শ। জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক শোপেঁহর (Schopenhauer) বলিয়া গিয়াছেন,

'Individuality is of far more account than nationality.'
(অর্থাৎ,—জাতীয়তা অপেক্ষা ব্যক্তিত্ব বহুগুণেই শ্রেষ্ঠ বা মূল্যবান্।)

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে বাল্যাবধি এই মহামূল্য গুণটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে, উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত ও

বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। তদীয় সমগ্র জীবনে, শত গুরুতর কারণ সত্ত্বেও, কখনও ভ্রমক্রমে, যাহা তিনি ন্যায় ও সত্য বলিয়া বুঝিতেন তাহা হইতে ক্ষণতরে—নিমেষের জন্যও স্খলিত ও বিচ্যুত হন নাই। সত্য-প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়-নিষ্ঠা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে জীবনের চরম ব্রত ও মুখ্য লক্ষ্য ছিল। পার্থিব সম্মান ও প্রতিষ্ঠাকে তুচ্ছ করিয়া, লোক-নিন্দাকে কণ্ঠ-হার করিয়া, এজন্য সারাটা জীবন কতই না তুমুলভাবে সমূহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে; কিন্তু, তবু তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের সেই শ্রেষ্ঠ সাধন-সম্পৎ, অচঞ্চল ধ্রুব-জ্যোতি—'সত্য'-সম্রাট্‌কে চিরদিন তিনি অজেয় গৌরবে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও অবশেষে তাহাই ঘটিল। বিলাতে গিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া কিছুতেই দ্বিজেন্দ্রলাল স্বীকার পাইলেন না; তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করাও সম্ভব হইল না। ফলে, সমাজ কর্তৃক অনতিবিলম্বে তিনি পরিত্যক্ত হইলেন,—সকলে মিলিয়া তাঁহাকে 'একঘরে' করিল।

একদিন বিলাত হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল 'পতাকা' পত্রিকায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—'অনেকেই সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে ভীত। আমি জানি না, এ আশঙ্কার কারণ কি। সমাজ? কেন, প্রতি মনুষ্য লইয়াই তো সমাজ? সমাজ আমাকে চ্যুত করিবে? তাহাতে কি ক্ষতি আমারই কেবল? তাহার নহে? সমাজ কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া হীনবল হইল না? সমাজ আমাকে পরিত্যাগ করিল, আমি কি সমাজকে পরিত্যাগ করিলাম না? অবশ্য প্রথমে ক্ষতি আমার অধিক, কিন্তু পরিণামে সমাজেরই ক্ষতি। এই ভাবে ক্রমশঃ নূতন সমাজ গঠিত হইবে, নূতন ও সভ্যতর আচার অনুষ্ঠিত হইবে।' দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতে-বসিয়া, কথার ছলে যে মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে ভাগ্য-বিধাতা যে তাঁহারই জীবন-নাট্যে সে ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিনয়ের

আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। কিন্তু, তেজস্বী দ্বিজেন্দ্রলালের যে কথা সেই কাজ। যে মুখে একদিন তিনি বলিলেন,—'অনেকে সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে ভীত। আমি জানি না, এ আশঙ্কার কারণ কি!'—বাস্তবিক স্বজনেরা তাঁহাকেই যখন প্রকৃতপক্ষে সমাজ-চ্যুত করিলেন তখনও কার্য্যতঃ দেখা গেল,—তাঁহারই মনে 'ভয়' বা 'আশঙ্কা'র বিন্দুমাত্রও উদয় হয় নাই। সমাজ তাঁহাকে 'অকারণ' বর্জ্জন করিল, তিনিও নির্ভীক-ভাবে বীরের মতই সে বিধান গ্রহণ করিলেন।

আপন বিশ্বাস ও ধারণানুরূপ সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া, এইরূপে তিনি সমাজের নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলেন, সত্য; কিন্তু এই ঘটনা তাহার জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক পীড়াদায়ক হইয়াছিল। এই ব্যাপারে তাঁহার মনোরাজ্যে যে ভয়াবহ আন্দোলন উপস্থিত হইল তাহার ফলে তাঁহার চিন্তা ও মতি-গতির আমূল 'ওলোট পালট্' ঘটিল; এবং ইহা হইতেই তাঁহার জীবনে একটা অভূতপূর্ব্ব, কল্পনাতীত পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। সমাজের এই চরম বিধানে তিনি স্তম্ভিত বিস্ময়ে, ধীরে-ধীরে, দূরে চলিয়া গেলেন বটে; কিন্তু, দূর হইতে 'দর্পী' দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তরের অনিবার্য্য ক্ষোভে ও অসহ অভিমানে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, এতদুপলক্ষে বারেক বিদ্রূপের যে অট্টহাস্য করিলেন তাহা বিষাক্ত তীক্ষ্ণ তীরের মত, ('একঘরে' পুস্তকের রূপে,) তীব্র ও প্রচণ্ডভাবে সমাজের স্তরে-স্তরে আসিয়া তাহার মর্ম্ম-বিদ্ধ করিল। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালেরই ভাষায় বলি,—'ইহার ভাষা ঠাট্টার ভাষা নহে। ইহার ভাষা অন্যায়ক্ষুব্ধ তরবারির বিদ্রোহী ঝনৎকার, ইহার ভাষা পদ-দলিত ভুজঙ্গমের ক্রুদ্ধ দংশন, ইহার ভাষা অগ্নিদাহের জ্বালা।'

সমাজের যাবতীয় গ্লানি, মালিন্য ও দোষরাশি অতি নিষ্ঠুররূপে নির্দ্দেশ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল 'একঘরে' নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা

প্রচারিত করিলেন। এ পুস্তকে অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল আক্রোশবশে আত্মবিস্মৃত হইয়া, নিতান্ত একদেশদর্শীর মতই হিন্দুসমাজকে অতি প্রবলবেগে আক্রমণ করিয়াছেন; কিন্তু, তৎকালে তাঁহার মানসিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিলে, ভাষার সে অত্যধিক অসংযমও একেবারে অমার্জ্জনীয় ও নিন্দনীয় মনে হয় না। তিনি হিন্দুজাতি ও হিন্দুসমাজের যে সকল ত্রুটি, অন্যায় ও দৌর্ব্বল্য অতি স্পষ্টাক্ষরে ও স্থানে-স্থানে অতিরঞ্জিতরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহার কতকগুলি এ দেশের ও সমাজের পক্ষেও যে অবস্থাবিশেষে অনিষ্টকর ও অত্যন্ত আপত্তিজনক,—একটু স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে, কিছুতেই তাহা অস্বীকার করার উপায় থাকে না। ভাষা ও ভাবের এই উচ্ছৃঙ্খল অসংযম ও সাময়িক ব্যক্তিগত আক্রোশবশে লিখিত বলিয়া, এ পুস্তিকাখানির দ্বারা হিন্দু-সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনা সমধিক; এবং প্রধানতঃ সেই কারণে ইহা সাহিত্যে স্থায়িত্ব-লাভের একেবারেই অযোগ্য বলিয়া মনে হয়। ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হইলে দ্বিজেন্দ্রলাল আজীবন ভাষার সংযম রক্ষা করিতে পারিতেন না। অবশ্য সরলতা ও সত্যানুরাগই ইহার প্রধান ও প্রকৃত কারণ, এবং এ বইখানাতেও তিনি সর্ব্বত্র সেই সরলতারই আশ্রয় লইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু, যে কারণেই হৌক্, সাহিত্যের স্নিগ্ধ, সৌম্য, প্রশান্ত ও উদার বক্ষে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতা কোনদিনও প্রশ্রয় পায় নাই এবং পাইতেও পারে না। এই পুস্তিকা-রচনার ইতিহাস-প্রসঙ্গে 'সাহিত্য'-পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি আমাকে জানাইয়াছেন,—

"এই সময়ে ডাক্তার ৺বিহারীলাল ভাদুড়ী ও তদীয় জামাতা ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে (যাঁর কন্যাকে দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহ করেন) নিয়ে শ্রীরামপুর-সাঁতরাগাছিতে খুব দলাদলির সূত্রপাত হয়। বিহারীবাবু বিধবা

কন্যার বিবাহ দিয়ে চিরজীবন স্বীয় সমাজে নির্য্যাতিত হ'য়ে আস্‌ছিলেন। এই সময়ে তিনি 'থিওজফির গর্ত্তে' পতিত হ'ন, এবং বুড়া বয়সে প্রায়শ্চিত্ত করে' প্রতাপবাবু ও দ্বিজুবাবুর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক অস্বীকার করেন। এই সকল ব্যাপার দেখে ন্যায়-নিষ্ঠ দ্বিজুবাবু ভয়ানক চটে' ওঠেন। অন্যান্য কয়েকটি এই রকমের ঘটনা এবং ইহারই ফল তাঁর লিখিত সেই 'একঘরে'।"

কিন্তু, মঙ্গলময়ের বিচিত্র নিয়মে, এ সংসারের সর্ব্ববিধ সদসৎ ঘটনার মধ্যেই কোন-না-কোন প্রকারে একটা শুভোদ্দেশ্য সন্নিহিত থাকে। আমরা এ ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই—এই শোচনীয় ব্যাপারের ফলে, দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাবে তদীয় বহুমুখী প্রতিভার সেই অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব—রসিকতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবার শক্তি সহসা স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে। 'একঘরে' বইখানার যতই কেন ত্রুটি বা দোষ থাকুক না, ইহাতে দ্বিজেন্দ্রলালের রসিকতা ও বিদ্রূপ যে ভাবে অকস্মাৎ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে তাহাতে ইহার স্থলবিশেষ হিন্দুসমাজেরও কোন-কোন শিক্ষিত ব্যক্তি উপভোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। যাহা হউক, এ বইখানা যে কতদূর ক্রোধ ও বিরক্তির উদ্রেক করে তাহা স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালের কথিত একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।—একদিন কলেজ ষ্ট্রীটে জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের দোকানে একটি ভদ্রলোক এই বইখানা চাহিয়া-লইয়া, সেইখানেই বইটা পড়িতে আরম্ভ করেন। ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি অল্পকাল মধ্যে আদ্যন্ত পাঠ করিয়া, তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ তাহা 'টুক্‌রা-টুক্‌রা' করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন; এবং তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া, উঠিয়া যাইবার সময়ে সেই ছিন্ন খণ্ডগুলিকে বারংবার পদাঘাত করিয়া সে স্থান হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সাহিত্যে সামাজিক আদর্শ।

কিন্তু, সমাজের এই ঘোরতর অবিচার তাঁহার প্রাণে এমন বদ্ধমূল বেদনার সূত্রপাত করিয়াছিল যে, শুধু 'একঘরে' লিখিয়াই তাঁহার প্রাণের জ্বালা মিটিল না।

উত্তরকালে তাঁহার 'হাসির গানে' ও অন্যান্য গ্রন্থাদির বহু স্থলে তিনি সমাজের এই সকল দৌর্ব্বল্য ও দুর্গতির প্রতি বারংবার ব্যঙ্গ, হতাশা ও আক্ষেপের সহিত কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে, সংক্ষেপে আমরা সেই সব উক্তির এ স্থলে একটু আলোচনা করিয়া দেখিব। 'হাসির গানে'—'বলি তো হাস্‌ব না' বলিয়াই, তিনি আবার হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—

"যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে' বেঁকে
প্রায়শ্চিত্ত করে ;
যবে কোন মতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত
ধর্ম্ম ভাঙ্গে গড়ে ;
যবে কোন প্রবীণ ষণ্ড মহাভণ্ড
পরেন হরির মালা,
তখন ভাই, হাসি চেপে' নাহি ক্ষেপে
রইতে পারে কোন্—!
হা হা হা হা, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !"

এই গান লেখার অনেক দিন পরে, প্রতাপসিংহের পুণ্যোজ্জ্বল, স্বর্গীয় স্বাদেশিকতার মহিমময়ী কাহিনী নাটকাকারে সন্নিবদ্ধ করিতে গিয়া, সেই গ্রন্থের এক স্থলে মহারাজ মানসিংহের মুখে যে-কয়েকটি কথা বলিয়াছেন তাহা প্রকৃতই প্রণিধানযোগ্য।—

'গোয়ালিয়ার। বল্‌ছিলাম না যে, মহারাজ মানসিংহকে পাবার আশা দুরাশা ? ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্ন মাত্র !

মানসিংহ। স্বাধীনতা মহারাজ ? জাতীয় জীবন থাক্‌লে তবে তো স্বাধীনতা ! সে জীবন অনেক দিন গিয়েছে। জাতি এখন পচ্‌ছে।

চান্দোরী। কিসে ?

মানসিংহ। তাও প্রমাণ কর্‌তে হ'বে ? এ অসীম আলস্য, ঔদাসীন্য, নিশ্চেষ্টতা জীবনের লক্ষণ নয়। দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মন বারাণসীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে খায় না ; সমুদ্র পার হ'লে জাত যায় ; জাতির প্রাণ যে ধর্ম্ম তা' আজ

লৌকিক, মাত্র আচারগত;—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়। ভ্রাতায় ভ্রাতায় ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, অহঙ্কার, প্রভেদ,—এ সব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়। সেদিন গিয়েছে মহারাজ!

বিকানীর। আবার আস্‌তে পারে—যদি হিন্দু এক হয়।

মানসিংহ। সেইটেই যে হয় না। হিন্দুর প্রাণ এতই শুষ্ক হয়েছে, এতই জড় হয়েছে, এতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে,—আর এক হয় না।

গোয়ালিয়ার। কখন কি হ'বে না?

মানসিংহ। হবে সেই দিন যেদিন হিন্দু এই শুষ্ক, শূন্যগর্ভ জীর্ণ আচারের খোলস হ'তে মুক্ত হ'য়ে, জীবন্ত, জাগ্রত, বৈদ্যুতিক বলে এক কম্পমান নবধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌বে।

গোয়ালিয়ার। কি সে ধর্ম্ম? (ব্যঙ্গস্বরে) মুসলমান ধর্ম্ম বোধ হয়?

মানসিংহ। না, গোয়ালিয়ার-পতি, সেধর্ম্ম—'মা'! আচারের বন্ধন-মুক্ত হ'য়ে যেদিন হিন্দু জন্মভূমিকে প্রাণভরে 'মা' বলে' ডাক্‌বে, সেদিন আবার হিন্দু এক হ'বে। আমরা কেউ তা' বল্‌তে পারি না, তাই হিন্দু পরাধীন।

মাড়বার। মানসিংহ সত্য কথা বলেছেন।

মানসিংহ। মনে করেন কি মহারাজগণ! আমি এই পরকীয় দাসত্ব ভার হাস্যমুখে বহন কর্‌ছি? ভাবেন কি যে, এই যাবনিক সম্বন্ধ-রজ্জু আমি অতি গর্ব্বভরে গলদেশে জড়াচ্ছি? অনুমান করেন কি, আমি রাণা প্রতাপের মহত্বও বুঝি নাই?—আমি এতই অসার! কিন্তু, না মহারাজ, সে হবার নয়। যা নেই, তার স্বপ্ন দেখার চেয়ে, যা আছে তারই যোগ্য ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ।'

মৃত্যুর মাত্র কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার 'মেবার-পতন' নামক নাটকের ছলে লিখিত অপূর্ব্ব কাব্যে ঠিক এই একই কথা অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সে গ্রন্থে যে স্থলে 'বিধর্ম্মী' মহাবৎখাঁর পিতা তাঁহাকে অতি কঠোর গালি বর্ষণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন সেই স্থলে মহাবৎ 'উত্তেজিত ভাবে' বলিতেছেন,—

'এত বিদ্বেষ! এত আক্রোশ! আশ্চর্য্য নয় যে এ জাতি বার বার মুসলমানের পদ-দলিত হয়েছে। আশ্চর্য্য নয়, যে এই ঘৃণা মুসলমান সুদ সমেত ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই এঁদের উদার, অত্যুদার সনাতন হিন্দুধর্ম্ম! মুসলমান-ধর্ম্ম আর যাই হোক, তার এটুকু মহত্ব আছে যে, সে যে-কোনও বিধর্ম্মীকে নিজের বুকে ক'রে আপনার ক'রে নিতে পারে। আর হিন্দু ধর্ম্ম? একজন বিধর্ম্মী শত তপস্যায় হিন্দু হ'তে পারে না। * * *

'রাজপুত জাতির প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ তত আন্তরিক হবে না জানি,—তার নিজের জাতির বিদ্বেষ যত আন্তরিক হবে। আমি ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস পাঠ করে' এটা ঠিক বুঝেছি যে, স্বজাতির উপর পীড়ন ক'রে হিন্দুর যত আনন্দ এত আর কিছুতে নয়। * *' ইত্যাদি।

গ্রন্থের শেষাংশে, সত্যবতী ও মানসীর কথোপকথনের আবরণে কবি পুনর্ব্বার এই অকাট্য সত্য কথাগুলি অতি সহানুভূতিপূর্ণ, করুণ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন,—

'সত্যবতী। সে পতন কবে থেকে আরম্ভ হ'য়েছে মা?

মানসী। যেদিন থেকে সে নিজের চোক বেঁধে চলেছে। যেদিন থেকে সে ভাবতে ভুলে গিয়েছে। মা! যতদিন স্রোত বয়, জল শুদ্ধ থাকে। কিন্তু সে স্রোত যখন বন্ধ হয় তখনই তাতে কীট জন্মে। তাই এই জাতিতে আজ এই নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রতা, ভ্রাতৃদ্রোহিতা, বিজাতি-বিদ্বেষ জন্মেছে। সেই থেকে—অতি উদার এই হিন্দুধর্ম্ম—আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল। যার ধর্ম্ম গেল মা, তার পতন হবে না? জাতি যে পাপে ভ'রে গেল তা দেখ্‌বার কেউ অবসর পায় না। 'মেবার গেল' ব'লে ক্রন্দন করলে কি হবে মা?

সত্যবতী। এ দুঃখে কি তবে এই সান্ত্বনা?

মানসী। না, এর চেয়েও বড় সান্ত্বনা আছে। সে সান্ত্বনা এই যে, মেবার গিয়েছে যাক্। তার চেয়ে বড় সম্পৎ আমাদের হোক্। আমি চাই যে, আমার ভাই নৈতিক বলে শক্তিমান্ হোক্; যে, সে দুঃখে, নৈরাশ্যে, ঝঞ্ঝার অন্ধকারে ধর্ম্মকে জীবনের ধ্রুবতারা করুক। যদি তা সে না করে, ত সে উচ্ছন্ন যাক্,—আমি ক্ষুব্ধ নই।

সত্যবতী। ভাই উচ্ছন্ন যাবে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব ?

মানসী। প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌ব তাকে তুলতে। তবু যদি না পারি—ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়ম পূর্ণ হোক্! যেমন স্বার্থ চাইতে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্ব চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয় ত মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হ'য়ে যাক্। দেশ, স্বাধীনতা ডুবে যাক্,—এ জাতি আবার মানুষ হোক্।

সত্যবতী। তাকি হবে মা ?

মানসী। কেন হবে না ? আমাদের সেই সাধনা হোক্। উচ্চ সাধনা কখনও নিষ্ফল হয় না। এ জাতি আবার মানুষ হবে।

সত্যবতী। সে কবে ?

মানসী। যেদিন তারা অথর্ব্ব আচারের ক্রীতদাস না হ'য়ে নিজে আবার ভাব্‌তে শিখবে ; যেদিন তাদের অন্তরে আবার ভাবের স্রোত বইবে ; যেদিন তারা যা উচিত, যা কর্ত্তব্য বিবেচনা কর্ব্বে, নির্ভয়ে তাই ক'রে যাবে ;—কারো প্রশংসার অপেক্ষা রাখ্‌বে না, কারো ভ্রূকুটীর দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্ব্বে না। যেদিন তারা যুগ-জীর্ণ পুঁথি ফেলে দিয়ে—নব ধর্ম্মকে বরণ করবে।

সত্যবতী। কি সে ধর্ম্ম মানসী ?

মানসী। সে ধর্ম্ম ভালবাসা! আপনাকে ছেড়ে ক্রমে ভাইকে, জাতিকে, মনুষ্যকে, মনুষ্যত্বকে ভালবাস্‌তে শিখ্‌তে হ'বে। তারপরে আর তাদের—নিজের কিছুই করতে হবে না ; ঈশ্বরের কোন অজ্ঞাত নিয়মে তাদের ভবিষ্যৎ আপনিই গ'ড়ে আস্‌বে। জাতীয় উন্নতির পথ শোণিতের প্রবাহের মধ্য দিয়ে নয় মা, জাতীয় উন্নতির পথ আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে। যে পথ বঙ্গের শ্রীচৈতন্যদেব দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথে চল, মা! * * *'

এই মানসী কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের মানসী কন্যা। ইহাঁর মুখে যে-সকল কথা উক্ত হইয়াছে তাহার প্রতি ভাব, প্রত্যেক বাক্য দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনব্যাপী জ্ঞান, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার চরম উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি! গ্রন্থে মানসীর বাক্যগুলি পাঠ করিতে-করিতে,

মধ্যে-মধ্যে মনঃপ্রাণ কি-যে এক প্রশান্ত, দিব্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও পবিত্র হইয়া ওঠে তাহা বলিয়া বুঝান অসম্ভব। এইরূপে, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রায় প্রত্যেক নাটকই কোন-না-কোন এক মহান্ ও অতুল আদর্শে মহোজ্জ্বল ও অনুপ্রাণিত হইয়া আছে : এবং একথাও আজ এই সঙ্গে অসঙ্কোচে ও অকুণ্ঠ কণ্ঠে প্রচার করা যাইতে পারে যে, সেই সকল ভাব ও আদর্শের প্রত্যেকটি মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের স্বীয় জীবনের সাধনা, লক্ষ্য, এবং প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত সত্য !

২

বিবাহ।

ডেপুটিগিরি কর্ম্ম-গ্রহণের পর কার্য্য-শিক্ষার্থ রায়পুরে মাসত্রয় কাল যাপন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। এই সময়ে একদিন শুভক্ষণে তাঁহার পিস্‌তুতো ভাই ৺শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা শ্রীমতী সুরবালা দেবীকে দর্শন করিয়া তিনি আপন মনে মোহিত হইয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই লিখিয়াছেন,—

'নিশায় প্রসারিত উর্দ্ধে অসীম সুনীল নভস্তলের
মানচিত্রে একা—
পড়্‌তেছিলাম গ্রহ-তারা-নীহারিকা-ধূমকেতুর
লীলাময়ী লেখা।
হঠাৎ তুমি পূর্ব্বাঙ্গনে উদয় হ'লে শরচ্চন্দ্র
শান্ত গরিমায়,—
ছেয়ে গেল আকাশ-ভুবন মগ্ন, মুগ্ধ, পরিপূর্ণ
সে শুভ্র জ্যোৎস্নায়!'

দর্শন-মাত্রই তাঁহার অন্তরে ঔপন্যাসিক নায়কের ন্যায় প্রেমের সঞ্চার হইল কিনা তাহা এক্ষণে 'হলফ্' করিয়া বলিতে পারা অসম্ভব; কিন্তু এ কথা সত্য যে, সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া সুন্দরী কুমারীর ললিত লাবণ্য লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্যপ্রিয় কবি-প্রকৃতি গোপনে সেই অসামান্য রূপরাশির বারংবারই 'তারিফ', করিয়াছিল। অকারণ আমি একথা বলি নাই।—সেই দিনই শরৎবাবুর জনৈক আত্মীয় যখন অকস্মাৎ তন্নিকটে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন, এই

স্থর-স্থন্দরী যোড়শী না হইলেও এবং তাঁহাদের পরস্পরের অন্তরে ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্বরাগের সঞ্চার না হওয়া সত্ত্বেও, তখনই বিলাত-ফেরৎ এই নব্য যুবকটি কতকটা যেন 'নিম্‌রাজী' হইয়া, এই প্রীতিকর প্রস্তাবটি প্রথমতঃ তদীয় অগ্রজগণের (সম্মতিলাভার্থ) গোচর করিতে বলিলেন। অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় লিখিতেছেন,—

"পূজনীয় (ডাক্তার) ৺কালীচরণ লাহিড়ীর পুত্র ৺সত্যজীবন লাহিড়ী কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্থরবালা দেবীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব আনয়ন করিলেন। ইহার পূর্ব্বে কোন বিশিষ্ট ধনী পরিবার তাঁহাদিগের একটি স্থন্দরী ও স্থশিক্ষিতা কন্যার সহিত দ্বিজেন্দ্রের বিবাহের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। সে বিবাহ আমার ইচ্ছনীয় বোধ হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রও প্রতাপবাবুর কন্যাকে মনোনীত করিলেন। দ্বিজেন্দ্র বিবাহে টাকা এবং দান সামগ্রী ইত্যাদি বিষয়ে কোন সর্ত্তই করেন নাই।"

এ সম্বন্ধে 'সাহিত্য'-সম্পাদক স্থরেশ সমাজপতি মহাশয়ও জানাইয়াছেন যে,—

"দ্বিজুবাবু 'কোর্টসিপ' করেন নাই। অনেক ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল, কিন্তু প্রতাপবাবুর মেয়েকে দেখে তিনি তাঁকেই পছন্দ করেন। প্রথম বয়সে দ্বিজুবাবু সমাজ সংস্কারের খুব পক্ষপাতী ছিলেন,—হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামিতে তাঁর একেবারেই সহানুভূতি ছিল না। বিধবা-বিবাহে তাঁর খুব সম্মতি ছিল, সেই জন্যে অনেকের আপত্তিতে কর্ণপাত না করে' তিনি বিধবা বিবাহের সংস্রবে আসেন। বিলেত থেকে ফিরে' এসে দ্বিজুবাবু কতকটা 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় ছিলেন,—না ব্রাহ্ম, না হিন্দু। কিন্তু, ব্রাহ্ম সমাজে যাবার যে সম্ভাবনাটুকু ছিল, হিঁদুমতে বিবাহ করায় তা লুপ্ত হ'য়ে গেল। অবশ্য হিঁদু সমাজের অনেক সংস্কারের আবার তিনি বিরোধীও ছিলেন।"

এই সময়ে প্রতাপবাবুর অবস্থা এখনকার মত এত উন্নত ও সম্পন্ন হয় নাই; —অর্থাৎ, তখন তিনি সবেমাত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন,—এখনকার মত লক্ষপতি হইয়া ওঠেন নাই।

তৎকালে বীডনষ্ট্রীটে একখানি ভাড়াটিয়া বাসায় থাকিয়া তিনি ব্যবসা করিতেন; কলিকাতাবাসীর মন তখনও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাদৃশ আস্থাবান্ ছিল না। যাহাহৌক, তাঁহার কন্যার সহিত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলে, সূচনাতেই, স্বাধীন-প্রকৃতি, সত্য-নিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, এ বিবাহে তিনি এক কপর্দ্দকও পণ গ্রহণ করিবেন না; অধিকন্তু, তদীয় বিবাহে তদ্রূপ কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি আদৌ বিবাহই করিবেন না। তাঁহার এবংবিধ উদারতা দেখিয়া কন্যাপক্ষ বিস্মিত হইয়া গেলেন, এবং যদিও বরপক্ষীয় কর্ম্মকর্ত্তৃগণের মধ্যে কেহ-কেহ ইহাতে প্রথমতঃ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন,—দ্বিজেন্দ্রলালের অটল প্রতিজ্ঞা বুঝিয়া, পরে তাঁহারাও আর এবিষয়ে কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে সাহসী হইলেন না। বিবাহের প্রস্তাব ক্রমে নির্দ্দিষ্ট ও সঙ্কল্পে পরিণত হইল। কিন্তু, হঠাৎ আবার এমন-এক অভাবিত আপত্তি উঠিল যে, সেই এক কথাতেই এ বিবাহ 'ভণ্ডুল' হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। বরপক্ষের কোন এক দুর্ম্মুখ সহসা রাষ্ট্র করিয়া দিলেন যে, মেয়েটি অমন সুশ্রী হইলে কি হইবে,—দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার বাক্‌শক্তি নাই,—পাত্রী 'বোবা'! দ্বিজেন্দ্রলাল মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু সহসা একথায় বিশ্বাস করিতে না পারিয়া তিনি স্বয়ং তৎক্ষণাৎ পাত্রীকে পরীক্ষা করিবার জন্য প্রতাপবাবুর বাসায় আসিয়া হাজির হইলেন। প্রথমতঃ বালিকাকে নাম জিজ্ঞাসা করা হইল; কিন্তু, স্বাভাবিক লজ্জা অথবা যে কারণেই হৌক্, সে প্রশ্নের তিনি স্পষ্ট কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। ফলে দ্বিজেন্দ্রলালের মনে পূর্ব-শ্রুত অশুভ আশঙ্কা বিশেষ বলবতী হইয়া উঠিল। নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য তৎপরে একখানি পুস্তক তাঁহাকে পুনরায় পড়িতে দেওয়ায়, সৌভাগ্যবশতঃ বালিকা সুরবালা সেবারে তাহা বেশ স্বাভাবিকভাবেই পাঠ করিলেন। এতক্ষণে দ্বিজেন্দ্রলালের

'ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল', এবং তিনি আশ্বস্ত ও প্রফুল্ল মনে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

ইতিপূর্ব্বে জ্ঞানেন্দ্রবাবুর স্ব-লিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিয়াছি যে, অপরাপর অনেকগুলি সম্বন্ধের মধ্যে এক বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারের একটি কুমারীর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিবাহের প্রস্তাব কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের পরমাত্মীয় ও অন্তরঙ্গগণের মধ্যে অনেকে বলেন যে, সে বিবাহ না হওয়ার মূলে প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে। দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুমতে ছাড়া বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না ; কিন্তু, উক্ত কন্যাপক্ষীয়গণ ব্রাহ্ম-পদ্ধতি ভিন্ন বিবাহ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। যাহা হউক, অতঃপর পরীক্ষা দ্বারা 'পাত্রী সুভাষিণী' সাব্যস্ত হইলে, বর ও কন্যা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে, বাঙ্গলা ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) শুভদিনে ও সুলগ্নে সম্পূর্ণ হিন্দু মতানুসারে দ্বিজেন্দ্রলাল দেবী সুরবালার সহিত শুভোদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন,—

"ভ্রাতাগণ দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে উপস্থিত থাকিয়া শুভবিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন। কৃষ্ণনগরে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে আমাদের সহিত বরযাত্রী গিয়াছিলেন। কিন্তু, বিবাহের পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের কোন প্রবল পক্ষ, যাঁহারা এ বিবাহে যোগ দিবেন তাঁহাদিগকে সমাজ-চ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা সহসা চলিয়া গেলেন। যাহাহৌক, বিবাহ হইয়া গেলে আমরা ভ্রাতাগণ দ্বিজু ও নবোঢ়া বধূকে সঙ্গে করিয়া কৃষ্ণনগরে লইয়া আসিলাম; দ্বিজেন্দ্রের এই বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া সত্ত্বেও কেহ আমাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না। কিন্তু, প্রকাশ্যভাবে দ্বিজেন্দ্রের সহিত তখন কেহ চলিতে স্বীকৃত হইলেন না।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী 'দাদামহাশয়' এ সময়ের কথা আমাকে অতি সামান্য ভাবে এইটুকু জানাইয়াছেন,—

"দ্বিজুর সঙ্গে তাহার বিবাহের দিন আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হইল। প্রতাপ তখন ৮০নং বীডন ষ্ট্রীটে থাকে। প্রতাপের বাসার নিকটে একটা গলিতে বরযাত্রীগণ বাসা বাঁধিয়াছিল। আমি বেলা প্রায় ১০টার সময় বর দেখিতে গেলাম। বরও কয়েকজন কৃষ্ণনগরের লোক চা পান করিতেছিল। বরের সহিত আমার বিশেষ আলাপ হইল না, তবে যেটুকু সময় ছিলাম এবং যে সব কথা-বার্ত্তা হইতেছিল তাহার মধ্য দিয়াই বুঝিলাম, যে দ্বিজুর মনে এমন একটা ভাব আছে যে বাঙ্গালীরা সাহেবদের ও বিলাত-ফেরতাদের অনেক নীচে। সাহেবদের অনেকগুলি গুণ আছে স্বীকার করি; কিন্তু এই বিলাত-ফেরৎরা—বিশেষতঃ তখনকার দিনের বিলাত-ফেরত সম্প্রদায়—তপ্ত বালুকা, সূর্য্য অপেক্ষাও অসহ্য উত্তাপের আধার!"

৩

কর্ম্ম-জীবন

বিবাহান্তে, 'Director of Land Records and Agriculture' এর অধীনে সহকারী 'সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার' হইয়া, ইংরাজী ১৮৮৮ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে, তিনি শ্রীনগর ও বনেলী ষ্টেট্ জরিপ করিতে যান। এই সময়ে তিনি মুঙ্গের 'ফোর্টে'র ৫নং বাংলায় বাস করিতেন।

সাহেবিয়ানা।

বিলাত হইতে ফিরিয়া-আসিয়া প্রথম-প্রথম কয়েক বৎসর দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত সাহেবী ভাবাপন্ন ছিলেন। উত্তরকালে যাঁহার লেখনী এবংবিধ 'ময়ূর-পুচ্ছধারী' বাঙ্গালী-সাহেবদের প্রতি অতীব তীব্র ব্যঙ্গ বর্ষণ করিয়া,—

"আমরা বিলেত-ফের্ত্তা ক'ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ;
তাই, কি করি নাচার স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই"।

*　*　*　*

এবং অন্যত্র—

"আমরা সাহেব সঙ্গে পটি,
আমরা 'মিষ্টার' নামে রটি ;
যদি 'সাহেব' না বলে' 'বাবু' কেহ বলে,—
মনে মনে ভারি চটি।"

—ইত্যাদি 'হাসির গান' রচনা করিয়াছিলেন, তিনি নিজেই একদিন 'মিষ্টার' ব্যতীত বাবু-নামে অভিহিত হইলে আপনাকে অপদস্থ মনে করিয়া বিরক্ত হইতেন। এ সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের

অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পত্রখানি হইতে পাঠক যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবেন। পত্রখানি দ্বিজেন্দ্রলালের দাদাশ্বশুর, আমাদের সরকারী 'দাদামহাশয়' প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয়ের লেখা।—

"* * * তারপর, বিবাহের দু'একদিন পরে দ্বিজু সস্ত্রীক আমার সহোদরার সহিত (সুরবালার মাতামহীর সহিত) শ্রীরামপুরে আমার মাতাঠাকুরাণী ও স্ত্রীকে প্রণাম করিতে যায়। সেদিন দ্বিজুর এক অপূর্ব্ব, হাস্যোদ্দীপক মূর্ত্তি! আগাগোড়া লাল মক্‌মলের পোষাক, ছোট প্যাণ্ট, হাফ কোট, একটা গোরাই ধরণের ক্যাপ্‌ বা টুপি মাথায়!—সব 'টক্‌টকে' লাল। দু'একটা তামাসা করিতে ছাড়িলাম না; নাতজামাই,—ছাড়িব কেন? দুই তিন ঘণ্টা পরেই তারা সকলে কলিকাতায় চলিয়া আসিল। * * একদিন শুনিলাম, দ্বিজু সুরবালাকে কবিতাতে পত্র লিখিতে লিখিয়াছে। দ্বিজু তখন তার কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছিল। দ্বাদশ না ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা কবিতা লিখিবে!—হাসিলাম।"

বিলাত গমনের ফলে, সমাজ তাঁহাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে বর্জ্জন না করিলে, অর্থাৎ—জাতিচ্যুত না হইলে নিশ্চয়ই তিনি অতখানি সাহেব সাজিতে পারিতেন না। সমাজও যেমন তাঁহাকে দূরে তাড়াইয়া দিল, তিনিও তেমনি—কতক সেই বয়সের দোষে কতক বা ইংরাজী আদর্শের দুর্ব্বার মোহে এবং প্রধানতঃ অভিমানভরে,—নিতান্ত অন্ধভাবেই, সমাজের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতিগুলির প্রতি অত্যন্ত উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন! এ সময়ে তিনি টেবিলে আহার, বদ্ধগৃহে বা গোসলখানায় স্নান, নিয়ত স্ব-গৃহেও 'হ্যাট্‌'-'কোট' এবং 'টাই' পরিধান করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। 'দাদামহাশয়' প্রসাদদাসবাবু তৎকালে ভগ্ন-স্বাস্থ্য পুনর্লাভ-কল্পে কিয়ৎকালের জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে মুঙ্গেরে গিয়া মিলিত হইয়াছিলেন। পাঠক এখন তাঁহারই মুখে দ্বিজেন্দ্রলালের তৎকালীন যথার্থ অবস্থাটা সম্যক্‌ শ্রবণ করিতে পারিবেন।—

"প্রথম প্রথম বিলাত হইতে আসিলে অঙ্গে বেশ একটু সাহেবি গন্ধ থাকে;

দ্বিজুর তখন তাহা যথেষ্টই ছিল। Bath-room'এ (স্নানাগারে) প্রবেশ করিয়া স্নান এবং বাহির হইবার পূর্ব্বেই গাত্রাবরণ করা, কোনও একটা 'বেফাঁস' কথা (যাহা আমরা অনেক সময় কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করিয়া থাকি এমন) কথা শুনিলে 'দাদামহাশয়, আপনারা বড় অসভ্য' বলা প্রভৃতি অনেক রকমই ছিল। একদিন দৈবাৎ তাঁহাকে উন্মুক্ত গাত্রে দেখি; দেখিলাম উপবীত নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, "দ্বিজু, তোমার পৈতা কৈ?" উত্তর—"কোথায় যেন হারাইয়া গেছে, আর পরিও নাই।" প্রশ্ন—"কেন, পৈতা গায়ে ফোটে?" দ্বিজু বলিল—"অনর্থক একটা ভণ্ডামি কেন? তারপর একটা বাজে জিনিষ লইয়া বিব্রত থাকা।" একথা শুনিয়া আমার রাগ হইল; একটু বিরক্তির স্বরেই বলিলাম,—"অনর্থক বটে! কিন্তু উহা তোমার পিতা দিয়াছেন। তিনি যদি তোমার কপালে 'চোর' বলিয়া উল্কি দাগিয়া দিতেন, তুমি কি করিয়া তাহা উঠাইয়া ফেলিতে? তিনি যখন দিয়াছেন এবং তুমি তাহারই সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া ইহা গ্রহণ করিয়াছ, এখন উহা ফেলিয়া দিলে তাঁহার প্রতিই বা কিরূপে ভক্তি প্রদর্শন করা হয়? তোমার উহা অনাবশ্যক মনে হয়, তোমার পুত্রের না হয় উপনয়ন-সংস্কার করিও না। তারপর তুমি বামুনেরই ছেলে, ওটাও তারই একটা নিদর্শন মাত্র; সে সত্য কেন গোপন করিতে চাও?" আমাতে দ্বিজুতে ঐ সম্বন্ধে আরও দুই একটা কথা হয়; তাহার সব আমার মনেও নাই, আর যাহাও বা মনে আছে, বলিব না। তবে, আমি তাহাকে যথারীতি এজন্য গালিও দিয়াছিলাম তাহা বেশ মনে পড়িতেছে। কিন্তু সেজন্য না হউক, অন্ততঃ পূর্ব্বোক্ত কথায়, অর্থাৎ—তাহার পিতার নামোল্লেখে বোধ হয়, তাহার মনে একটা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া গালি খাইতে খাইতে কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"দাদামহাশয় আপনার কাছে পৈতা আছে? থাকে তো একটা দেন।" আমার নিকট পৈতা ছিল, আমাদের গোত্রও এক, আমি একটা প্রস্তুত করিয়া তখনই তাহাকে দিলাম।—পরিল। সেই অবধি স্বেচ্ছায় কখন উপবীত ত্যাগ করে নাই। ক্বচিৎ কখনও স্নান করিতে বা অন্য কোনও কারণে পড়িয়া গেলে, জানিতে পারা মাত্র আবার ধারণ করিত।"

সে সময়ে সাহেবী চাল-চলন ও ধাঁজ-ধরণ তাঁহার এতই মজ্জাগত ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছিল যে, সরকারী চাকরী গ্রহণ করার পর

মিঃ, ডি, এল, রায়, । প্রথম-প্রথম গাভর্ণমেন্ট-'গেজেটে' ও 'সিভিল লিষ্টে' তাঁহার প্রকৃত নামটি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিতরূপে প্রকাশিত হইত। তৎকালে তাঁহার নাম ছিল, 'Mr. Dwijen Lala Ray, (মিষ্টার দ্বিজেন লালা রে বা রায়) ! সম্ভবতঃ এই সাহেবিয়ানার ফলেই কবি তাঁহার আসল নাম অপেক্ষা নকল নামেই, অর্থাৎ —'মিষ্টার ডি, এল, রায়' রূপে সর্ব্বত্র সমধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হইয়াছেন। কি দুর্দ্দৈব !

মুঙ্গেরে থাকিবার সময়ে, কিয়দ্দিনের জন্য তিনি ভাগলপুরে গিয়া একবার তাঁর আবাল্য-সহচর, অন্যতম সহোদর, 'রাঙ্গাদাদা' শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের ভবনে সস্ত্রীক অবস্থান করেন। সেখানে তাঁহার সহিত সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম পরিচয় হয়। পাঁচকড়ি বাবু স্বয়ং এ বিষয়ে আমাকে যাহা জানাইয়াছেন তাহা এই,—

"আমাদের ভাগলপুরে রামরতন মজুমদার একজন বড় বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি সেকালের বি-এ এবং বি-সি-ই। তাঁহার পুত্র রায় শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। স্বরেন্দ্রের ভগিনীকে বাবু হরেন্দ্রলাল রায় বিবাহ করেন। এই সূত্রে হরেন্দ্রের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। হরেন্দ্র দ্বিজুর 'রাঙ্গাদা'। দ্বিজু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর ডিপুটিগিরি চাকুরী পাইয়া প্রথম ভাগলপুরে যায়। এই সময়ে দ্বিজুকে আমি প্রথম দেখি। সাহেবী পোষাকে 'টুকটুকে' যুবাপুরুষটি। সভ্য সমাজ-সঙ্গত আলাপ-পরিচয়ের পর দ্বিজু অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। সম্মুখে একটা বড় 'আরশী' ছিল; সে আরশীতে একবার করিয়া নিজের মুখ দেখে, আর একবার আমার মুখের দিকে তাকায়। সহসা বলিয়া উঠিল,— "একটা গান শুনবেন ?" বলিয়াই হরেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল— "রাঙ্গাদা, পাঁচকড়িবাবুর সহিত 'আপনি, আজ্ঞে' করা চলে না; উহার মুখের উপরে যেন 'তুমি' মাখানো আছে।" আমি হাসিয়া বলিলাম,—"বিলাত না যাইলে, এমন খাসা 'টুকটুকে' সাহেবটি সাজিয়া না আসিলে, তোমার চোখের

কোণ হইতে আমিও তোমার 'তুমি'টি খুঁজিয়া বাহির করিতাম। আমার কথায় সকলেই 'হো-হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল। দ্বিজু সহসা চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া, আমার পৃষ্ঠে একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিল,—"তবে একটা গান শোন।" সে গানটার প্রথম দুটি কলি এই,—

'She is a fisherman's daughter,
And I'll marry her'

ইহাই আমার দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয়।"

অন্যান্য পরিবর্ত্তনের সহিত এই সময় হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলনেরও পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। হরেন্দ্রবাবুর পত্নী, দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাঙ্গা বউদিদি'র সঙ্গে এ সম্বন্ধে যে কথোপকথন হয়, তাহা যথাযথভাবে এ স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। বিবরণটি 'রাঙ্গা'-বউদিদি শ্রীমতী মোহিনী দেবী 'সাধক'-পত্রে নিজেই লিখিয়াছেন,—

সমাজ-সংস্কার ও স্ত্রী-স্বাধীনতা।

"অদ্য দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে দুই একটি সামাজিক কথা হইল। তিনি বলিলেন, "আমি স্ত্রীলোকের অত আবদ্ধ থাকাটা পছন্দ করি না। আপনি কি বলেন? পছন্দ হয় কি—বদ্ধ থাকতে?"

উত্তর। সম্মুখ দ্বার দিয়ে বেড়াইবার বিষয় অপছন্দ আছে, কিন্তু অন্দরের বিষয়ে বেশ মত। বাগান, পুষ্করিণী, এই সব থাকবে; বেড়ান, হাসি, খেলা, গল্প, একাকী কবিত্ব করা এসব চল্‌বে,—এবিষয়ে অমত নাই।

দেবর। আমার মত, স্ত্রীলোকে আমাদের মত বাহিরে নিঃসঙ্কোচে ছুটাছুটি করিবেন, ভদ্রলোকের পোষাকে—জুতা পায়ে, সেমিজ-জামা গায়ে দিয়ে বেড়াবেন, হাস্‌বেন, গল্প কর্‌বেন। আপনার এতে অমত কেন?

উত্তর। অমত কেন যদি বলেন, তাহলে সংস্কৃত ভাষায় বল্‌তে হয় যে, আপনারা—কি বলে সেই মুনি যাঁর নাম নিলে বিভ্রাট হয়—তাঁরি কাছাকাছি কিনা! আপনাদের মতের অন্ত নাই,—আজ বল্‌বেন, 'জুতা পর'; কাল বল্‌বেন, 'বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে'; পরশু বল্‌বেন, 'তোমাদের জুতা-পরা পা দেখ্‌লে আমার মনে হয়, তোমরা আমাদের

মা-খুড়ী-জ্যেঠীর মতন ধীরা, স্থিরা, ব্রীড়াবিনম্রা, কিশলয়-পেলবা বামা নও ;—তোমরা অতি খিট্‌খিটে, পায়ে খট্‌খটে বুটে চঞ্চলা, অধীরা, অস্থিরা, বিদুষী ইত্যাদি।

দেবর। তা বিদুষী বলাই তো উচিত। কেননা, অত কথায় কথায় কবিত্ব কর্‌লে কি বল্‌ব ?

উত্তর। কেন, আমাদের ঘরের কোণে একটু কবিত্ব কর্‌লেও কি দোষ? দেবর, ননদ, ভাজ, ভাই ইত্যাদির সঙ্গে কবিত্ব কর্‌তেও কি আমাদের দোষ ?

দেবর। না, না,—আমি তো তাই চাই! বিদুষী তো ভাল নাম, তাতে চটেন কেন ?

উত্তর। চটি এইজন্য, আপনারাই চান স্ত্রী-স্বাধীনতা, আবার স্ত্রীর স্বাধীনতাটারই আপনাদের কাছে বেশী মূল্য। এই জন্যই বলি, আপনারা ধন্য!

দেবর হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—তাই তো এতদিনে বলেছেন যে আমরা ধন্য। আমরা যে প্রভু তা এবার স্বীকার কর্চ্ছেন তো ?

উত্তর। হাঁ সাহেব! তা স্বীকার কর্‌ছি বই কি। উৰ্দ্ধতন ছাপ্পান্ন পুরুষের মা-বোন থেকে নিম্নতন পঞ্চান্ন পুরুষের মা-বোন একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। তবু একটা কথা বলি—আপনারা প্রভু ততক্ষণ যতক্ষণ আমরা জন্ম নেব। তারপরে ধরুন, আমরা চটে গিয়ে, জ্ঞান-চর্চ্চা করে', পুরুষের মত ধ্যান-ধারণা করে' যদি সকলে পুরুষ জন্ম গ্রহণ করি তখন আপনাদের দশা কি হবে ?

এবার দেবর সটাং বিছানায় পা ছড়াইয়া শয়ন করিয়া বলিলেন, "তাইতো কি হবে ? এ রকম ভাজের সঙ্গে দেখা না হ'লে কি রকম করে' জ্ঞানচক্ষু খুল্‌বে ? নারী, তোমায় নমস্কার। তুমি জন্ম জন্ম মা-বোন-ভাজ হ'য়ে জন্ম নিও! তাহলেই আমরা মোক্ষলাভ কর্‌ব। কেমন, এবার খুসী হলেন তো ?"

হাস্য-পরিহাস হইয়া গেল। দেবর বলিলেন, "রেলে ওঠ্‌বার সময় আপনি জুতা পায়ে দিয়ে উঠ্‌বেন কিনা ?" আমি বলিলাম, "যে জিনিস চিরদিন ব্যবহার কর্‌ব না, সে জিনিস ঘণ্টা কয়েকের জন্য ব্যবহার করা আমার পক্ষে

কখনই সম্ভব নয়।" দেবর বিরক্ত হইলেন, পরে স্নেহলতা আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিলেন,—"রাঙ্গাদি ও আমি উভয়েই খালি পায়ে গাড়িতে উঠ্‌ব।"

মুঙ্গেরে অবস্থানকালে প্রথমতঃ তিনি নেপাল-রাজ্যের প্রান্ত-সীমার নিকটে বেলুয়াবাজার ভাপ্টিয়াহি প্রভৃতি স্থানের জরিপী কার্য্যে মনোযোগ দেন। কর্ম্মজীবনের এই প্রথমাবস্থা হইতেই তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা, কর্ত্তব্যানুরাগ ও সত্যানুগত্য প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া যাইত। দীন দুঃখী, অসহায় দুর্ব্বলের প্রতি অন্যায় অত্যাচার বা উৎপীড়ন হইতেছে দেখিলে তিনি তদ্দণ্ডেই তৎপ্রতিকারার্থ বদ্ধ-পরিকর হইতেন। এজন্যও তাঁহাকে অনেকবার নানারূপে বিপন্ন হইতে হইয়াছে; কিন্তু, পূর্ব্বেই এক স্থানে বলিয়াছি—একবার যাহা তিনি উচিত ও কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির বুঝিতেন তাহা সম্পন্ন করার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব পণ করিতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না। এইখানে—এই অক্ষুন্ন চরিত্রবলেই, দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্লভ জীবনের যথার্থ মহত্ত্ব ও সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব।

কর্ম্ম-জীবন (আরম্ভ)।

দ্বিজেন্দ্রলালের শ্যালক, কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় লিখিতেছেন,—

"এই সময়ে কিছুদিন আমি দ্বিজুদাদার সহিত একসঙ্গে অবস্থিতি করি, এবং তখন হইতেই উহাঁর চরিত্র কি নির্ম্মল ও উচ্চ তাহা বুঝিতে পারি। অনেক সময় আমরা কাছারীতে যাইতাম, এবং তাঁহার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম। কোন গরীব-দুঃখীর উপর অত্যাচার করা হইতেছে দেখিলে তিনি তাহার সমুচিত বিচার করিতেন। ন্যায়-বিচার করিতে তিনি কোন মতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এমন কি—ইহার জন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে জীবনে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও তিনি কখনও ভীত বা সঙ্কুচিত হন নাই।"

বমেলী-ষ্টেট যখন তিনি জরিপ করেন তখন জি, ডাব্লু, কলিন্স্ সাহেব তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী—অর্থাৎ, 'সেটেল্‌মেন্ট অফিসার' ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বিশেষ উদ্যম ও হৃদ্যতার সহিত তাঁহার সঙ্গে কর্ম্ম-পরিচালন করিতেন; কলিন্স সাহেবও তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু, কলিন্স বদ্‌লি হইয়া গেলে, যিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসিলেন তাঁহার সহিত স্পষ্টবাদী ও দৃঢ়মনা দ্বিজেন্দ্রলালের সদ্ভাব রক্ষা করা সম্ভব হইল না। কাজেই, বাধ্য হইয়া, সহসা তাঁহাকে এ কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কলিকাতায় যাইতে হয়, এবং সেখানে গিয়া তিনি Land Records and Agriculture'এর অধ্যক্ষ বা ডিরেক্টারের সহকারী হইয়া কিছুকাল কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে থাকেন। এক্ষেত্রে এম্, ফিনিকেন সাহেব তাঁহার উপরিস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ফিনিকেন সাহেব সততা ও কর্ম্মদক্ষতার দরুণ তাঁহার খুব পক্ষপাতী ও গুণগ্রাহী হইয়াছিলেন; সুতরাং, সেখানে তিনি বিশেষ সুখ্যাতি ও যোগ্যতার সহিতই ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বেলুয়াবাজারে অবস্থিতিকালে বহুবর্ষ পরে তিনি আবার বাঙ্‌লা কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তিনি এক সঙ্গে অনেকগুলি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কবিতা ও গান রচনা করেন, এবং তথা হইতে সদরে অর্থাৎ মুঙ্গেরে ফিরিয়া, তিনি সেই সর্ব্বপ্রথম 'হাসির গান' লিখিতে প্রবৃত্ত হন। প্রায় দশ বৎসরের অধিক হইল তাঁহার সেই বাল্য-রচনা 'আর্য্যগাথা'—(প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদিনে উহা নিঃশেষ হইয়া-যাওয়ায় আবার সে গানগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইল; এবং তাঁহার নব-রচিত গানগুলিও 'আর্য্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ) বলিয়া এই সঙ্গে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া গেল। 'আর্য্যগাথা' দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভার প্রথম উন্মেষ,—ইহাই তাঁহার প্রতিভারুণের অম্লান প্রভাত-রশ্মি। যে

প্রতিভা একদিন সমগ্র বঙ্গভূমিকে কখনও উদ্বুদ্ধ, কখনও স্তম্ভিত, কভুবা প্রমত্ত করিয়া-তুলিবে, কবির এই প্রথম বয়সে—সূচনার সময়েই তাহার এই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। 'আর্য্যগাথা' গীতিকাব্যে দেশাত্ম-বোধ ও দাম্পত্য প্রেমের যে সকল কবিতা বা গান প্রকাশিত হইয়াছে, মৌলিকতার হিসাবে তত মূল্যবান্ না হইলেও, সেগুলির রুচি অতি বিশুদ্ধ, এবং ভাব যেমন মধুর তেমনই আবার একান্ত আন্তরিকতাপূর্ণ। কবিবরের এই সকল কবিতার অকৃত্রিম গুণগ্রাহিগণের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বিশ্ব-বন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম ভাগ 'আর্য্যগাথা' পাঠক-সমাজে কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা প্রাপ্ত-যৌবন দ্বিজেন্দ্রলাল উক্ত কাব্যের দ্বিতীয় ভাগ যখন মুদ্রিত করেন তৎকালে তাহার ভূমিকায় এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"দশ বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য-গাথা প্রতিশ্রুত হইয়াছিল যে, যদি সে আদর পায় ত আবার তখন গীত শুনাইবে। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, সে আশাতীত আদর পাইয়াছিল। তাই, আবার সে নূতন গীত শুনাইতে আসিয়াছে। * * * * দশ বৎসরে বঙ্গভাষা কত অমূল্য রত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছে। যখন 'আর্য্য-গাথা'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় তখন বঙ্গভাষায় অধিক নূতন সঙ্গীত-গ্রন্থ ছিল না। তাই বুঝি সে আদর পাইয়াছিল। আজ দেশে গীতের ছড়াছড়ি। এই বিচিত্র উজ্জ্বল নাট্য-মন্দিরে শত প্রাণোন্মাদী গীত-ধ্বনির শত কোমল বেণু-বীণা-ঝঙ্কারের ভিতর আজ এই পুরাণ সুর কেহ কি শুনিতে চাহিবে?"

বলা বাহুল্য—এ দেশ সে সুর-লহরী চিরদিনই অতৃপ্ত আগ্রহে শুনিয়া আসিয়াছে। দশ বর্ষ পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলাল কবি-কল্প-লোক হইতে যে গান শুনাইয়াছিলেন, আজ এই দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের সময়ে—এখন আর তাঁহার সে অস্ফুট কল-কাকলী নাই। তাই, সদ্য-বিবাহিত, বহুদর্শী, পূর্ণ-যৌবন এ দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালের

সহিত স্বীয় জীবনের প্রভূত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, নিজেই দ্বিতীয় ভাগ 'আর্য্যগাথা'র ভূমিকায় লিখিলেন,—

"দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে।—কাহার না হয়? আজ আমি আর সে পাঠাধ্যায়ী, অনূঢ়, জগতের দূরস্থ পরিদর্শক, বিস্মিত বালক—নাই।—

"আজ যেন রে প্রাণের মত কাহারে বেসেছি ভাল।
উঠেছে আজ মধুর বাতাস, ফুটেছে আজ নূতন আলো"।

মলয়ানিলস্পৃক্ত, প্রেমোদ্ভাসিত আমার হৃদয়-কুঞ্জে তাই এই কৃতজ্ঞ, অস্ফুট কুহু-ধ্বনি!"

এই কয়টি ছত্র হইতে সেই প্রেম-মুগ্ধ, নবপরিণীত কবির বর্ত্তমান মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

'আষাঢ়ে' ও 'হাসির গান' রচনা।

এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন প্রেমে পরিপূর্ণ, উদ্যমে উচ্ছ্বসিত এবং হর্ষের প্রাচুর্য্যে উদ্বেলিত হইয়া, যথার্থই যেন প্রমত্ত প্রবাহে, দুর্দ্দম আগ্রহে, দুই কূল পরিপ্লাবিত করিয়া, হাসিতে-হাসিতে, নাচিতে-নাচিতে, 'তরতর'-বেগে অনন্তের অভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে!—দ্বিধা-সঙ্কোচ, দুশ্চিন্তা বা বিষাদের কিছুমাত্রও সামর্থ্য নাই—সে দুর্ব্বার প্রবাহের ক্ষণতরেও গতি-রোধ করিতে পারে! এই সময়ে তাঁহার রসিকতা ও পরিহাসের প্রবৃত্তি ও শক্তি যেন উঠিতে-বসিতে, হাঁটিতে-চলিতে, সর্ব্বথা ও সর্ব্বদাই প্রতি আচার-ব্যবহার, কথা ও কার্য্যে ফুটিয়া-ফাটিয়া পড়িতে চাহিত! এই কথার প্রমাণস্বরূপ দেখিতে পাই—জীবনের এই সুখময় অবসরেই তিনি সেই অফুরন্ত হাস্য-রসের উৎস 'হাসির গান' এবং 'আষাঢ়ে' পুস্তকের হাস্য-মুখর সঙ্গীত ও কবিতাখণ্ডগুলির অধিকাংশই রচনা করিয়া রাখিতেছেন।

সঙ্গীত-চর্চ্চা।

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতৃদেব দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় মহাশয় একজন অতি-বিখ্যাত সুগায়ক ছিলেন। বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ৺দীনবন্ধু মিত্র

তদীয় 'সুরধুনী'-কাব্যে জলাঙ্গীর মুখে ইহাঁরই সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—

"কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য-প্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান্।
সুললিত স্বরে গান কিবা গান তিনি,—
ইচ্ছা হয় শুনি হয়ে উজানবাহিনী।"

এই কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের যোগ্য তনয় আমাদের দ্বিজেন্দ্রলালও অতি শৈশবকাল হইতে সঙ্গীত-প্রিয় ও পরম সুকণ্ঠ ছিলেন। স্বভাবতঃ, বাল্যাবধিই তিনি সুন্দর গাহিতে পারিতেন সত্য ; কিন্তু, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এতদিন তাঁহার তেমন বিশুদ্ধ তাল-লয়-জ্ঞান ছিল না। বাল্যে ও যৌবনের প্রারম্ভে, পাঠ্যাবস্থায় সঙ্গীতানুশীলনের কোন সুবিধা হয় নাই। তাই, মুঙ্গেরে থাকিতে, এই সময়ে তিনি নিয়মিতরূপে সঙ্গীত-শাস্ত্রের অনুশীলন আরম্ভ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে ভাগলপুরের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার ৺রামরতন মজুমদার মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র, বঙ্গসাহিত্যের বিখ্যাত গল্প-লেখক, সঙ্গীত-শাস্ত্রে সুনিপুণ, রায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার-বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া মুঙ্গেরে আগমন করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাঁর সঙ্গে মিলিত হইয়া, রীতিমত ওস্তাদের সাহায্যে, কিয়ৎকাল সঙ্গীত-চর্চ্চা করিয়া তৎপক্ষে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

পাঠকের কৌতূহল-নিবৃত্তির নিমিত্ত, এ সময়ে মুঙ্গেরে থাকিতে দ্বিজেন্দ্রলালের দৈনন্দিন জীবন কি ভাবে যাপিত হইত তাহার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তৎকালে তদীয় সহবাসী, 'দাদামহাশয়' প্রসাদদাসবাবুর প্রদত্ত বিবরণ হইতে নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

মুঙ্গেরে দৈনন্দিন জীবন।

"দ্বিজুর একটু উঠিতে বেলা হইত, প্রায় ৮টা বাজিত। আমরা পূর্ব্বেই

উঠিতাম (তখন আমিও সকাল সকাল উঠিতাম)। উঠিয়াই তৈয়ারি চা পান করিত। তাহার পর কিছুক্ষণ হয় তর্ক নয় সাহিত্য-সেবায় কাটাইয়া, বেলা ১১টার মধ্যে আহার করিয়া কাছারী যাইত। বেলা ৫টা আন্দাজ সময়ে ফিরিয়া আসিয়া খেলিতে যাইত। সে সময়ে ভগবতীচরণ মিত্র মুন্সেফ ও গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাব্‌জজ এক বাসায় থাকিতেন,—তাঁহাদের বাসার হাতায় 'টেনিস' খেলা হইত। আমি খেলিতাম না, সুতরাং যাইতে চাহিতাম না। জোর করিয়া লইয়া যাইত;—এক একদিন আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাইত। জোরে পারিতাম না,—পথের সব লোকেরা দেখিয়া হাসিত। সে একজন হাকিম ছিল, অথচ লজ্জা-সঙ্কোচ বা অহঙ্কারের লেশটুকুও ছিল না;—যেন বালকটি! রাত্রে দীনুবাবুর (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের) বাসায় তাস খেলিতে যাইতাম। দ্বিজু খেলিতে যত পারুক না পারুক, তাস কাড়িয়া লইয়া গোলযোগ করিতে বিলক্ষণ পটু ছিল। আমার মনে হইতেছে—তাহারই কি একখানা পুস্তকে (বোধ হয় পদ্যে) এই দীনুবাবুর বাটীর তাস খেলায় চীৎকারের উল্লেখ আছে।"

সারল্য, হাস্য-কৌতুক ও সাহিত্য-সেবা।

তাহার পর, এই প্রসঙ্গে 'দাদামহাশয়' আরও লিখিতেছেন,—

"আমাদের পাইয়া সেবার ৺পূজার ছুটিতে কলিকাতায় আসা হইল না। সেই সময়ে নিজে তো সারাক্ষণ বই লইয়া থাকিতই, তাহা ছাড়া একখানি খাতা লইয়া প্রত্যহ তাহার লেখা পড়িয়া শুনাইত ও গান করিত। * * আমার ছোট ছোট পুত্র-কন্যাদিগকে 'হোমিওপ্যাথিক শ্বশুর-শাশুড়ী' বলিত, তাহাদের হাত হইতে খাবার কাড়িয়া লইয়া ঘোড়াকে খাইতে দিত; আর তারা যখন এজন্য চটিয়া তাহাকে মারিতে আসিত, দ্বিজু হাত-তালি দিতে দিতে, তাহাদের ধরা না দিয়া 'কম্পাউণ্ড'ময় ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইত। দূর হইতে তাহার সে রঙ্গ দেখিয়া ও উচ্চ হাস্য শুনিয়া আমরা কতই না আমোদ উপভোগ করিতাম!"

পাঠক, এমনই নির্ম্মল আমোদ-কৌতুকে, নিয়মিত অধ্যয়ন ও সাহিত্য-চর্চ্চায়, শিশুসম সারল্য ও নিরুদ্বেগ সন্তোষের সহিত সেই নিষ্পাপ-শুভ্র, লঘু-স্বচ্ছ জীবনখানি তিনি চিরদিন যাপন করিয়া

গিয়াছেন। নিয়তির নির্য্যাতনে ভিন্ন তাঁহার সে সদানন্দ জীবনে বিষাদ বা অবসাদের মসী-ম্লান ছায়া কোনদিনও পতিত হয় নাই,—সে পুণ্যোজ্জ্বল জীবনে ঐকান্তিক আত্ম-প্রসাদই এই চিরপ্রবাহী আনন্দ ও উত্তমের অপরিমেয় আধারস্বরূপ ছিল।

বেলুয়াবাজার প্রভৃতি স্থানের কর্ম্ম শেষ হইলে তিনি মুঙ্গের হইতে পূর্ণিয়া জেলায় গমন করেন। সেখানেও সেটেল্‌মেণ্টের কার্য্য উপলক্ষে, উপরিস্থ কর্ম্মচারীর সহিত আবার মত-ভেদ ও মনান্তর উপস্থিত হওয়ায়, তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন; এবং সেখানে আসিয়া, অল্পকালের জন্য 'ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ ও য়্যাগ্রিকাল্‌-চারের' সহকারী 'ডিরেক্টারের' পদে নিযুক্ত হইয়া, বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই সে কর্ত্তব্য-সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল কলিকাতায় থাকিয়া এই কর্ম্ম করিলে, তাঁহাকে বর্দ্ধমান-রাজের সুজামুটা পরগণার জরিপ-জমাবন্দী করিতে পাঠানো হয়। এই কার্য্যে তাঁহার ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া সরকার বাহাদুর তাঁহাকেই আবার সুজামুটার 'সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসার' নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি—তিনি অত্যন্ত স্বাধীন-প্রকৃতি, সত্য-প্রিয় ও ন্যায়-নিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। সুজামুটার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তথাকার প্রজারা প্রবল-প্রতাপ রাজ-সরকার কর্ত্তৃক নানা অত্যাচারে অত্যন্ত নির্য্যাতিত ও উৎপীড়িত হইতেছে। ইহা দেখিয়া, তাঁহার স্বভাব-কোমল হৃদয়খানি সহানুভূতি ও অনুকম্পায় পরিপূর্ণ হইয়া-গেল; এবং তিনি ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা-রক্ষার্থ, প্রজাগণের হিতকল্পে, তাহাদের অনুকূলে বিবিধ ব্যবস্থা ও উপায়-উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে কিন্তু পরোক্ষভাবে রাজ-সরকারের অনিবার্য্যরূপে সমূহ অনিষ্ট ঘটিতে

সুজামুটার সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসারের কর্ম্ম-পরিচালন ও লাটসাহেবের সহিত সংঘর্ষ এবং হাই-কোর্টে জয়লাভ।

লাগিল। পরাক্রান্ত বর্দ্ধমান-রাজ-সরকারের কল্যাণকামী কর্ম্মচারিবৃন্দ তাঁহার এবংবিধ 'পক্ষপাতে' অতিশয় অপদস্থ ও অসন্তুষ্ট হইয়া, শুনা যায়—এজন্য স্বয়ং ছোটলাট সাহেবের নিকটে তাঁহার বিরুদ্ধে বিবিধ অভিযোগ উপস্থিত করেন। লাট-সাহেব সকল কথা শুনিয়া, বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক, প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করার জন্য 'ডিরেক্টারে'র প্রতি আদেশ প্রদান করিলে, স্বয়ং ফিনিকেন সাহেব ঘটনাস্থলে আসিয়া, সমস্ত জানিয়া-শুনিয়া 'রিপোর্ট' করিলেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কৃত কর্ম্মসকল সম্পূর্ণ সঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত হইয়াছে, বরং তাঁহার বিপক্ষে যে-সব অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে তাহা আক্রোশমূলক ও সর্ব্বৈব মিথ্যা। কিন্তু, লাটসাহেব, যে কারণেই হোক্, ইহাতে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট না হইয়া বর্দ্ধমান রাজ-কর্ম্মচারীদের কথার উপরেই আস্থা স্থাপন পূর্ব্বক, অকারণ এজন্য দ্বিজেন্দ্রলালকে ডাকিয়া-নিয়া প্রচুর ভর্ৎসনা করেন। ছোট লাট সাহেবের এই পক্ষপাত ও অন্যায় ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া, তেজস্বী দ্বিজেন্দ্রলাল তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখের উপরেই অকুণ্ঠিত ভাবে যথেষ্ট বাদানুবাদ করিয়া-আসিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষে, যদিচ দৈববিড়ম্বনাবশতঃ তাঁহাকে উর্দ্ধতন সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী—স্বয়ং ছোট লাটের কোপ-কটাক্ষে পতিত হইতে হইল, তথাপি ন্যায়-নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য-পালন করায়, বিধাতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ স্বীয় অন্তরে তিনি যে অসীম আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিলেন, এ সংসারে এমন-কোন পার্থিব পুরস্কার নাই যা' সে দিব্য সন্তোষের অণুমাত্রও তুল্য-মূল্য হইতে পারে। এই ব্যাপারে তাঁহার 'উপরওয়ালা' কর্ম্মচারিগণও —প্রধানতঃ প্রাদেশিক সর্ব্বময় শাসন-কর্ত্তার প্রীতি-সম্পাদনার্থ বা 'মন' রক্ষার্থ—তাঁহার প্রতি বিরক্ত হওয়ায়, ভবিষ্যতে তাঁহার পদোন্নতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতি হইল বটে ; কিন্তু সে পরিণামের জন্য সর্ব্বথা প্রস্তুত হইয়া, নিজের পার্থিব পদোন্নতির পথে স্বহস্তে

কণ্টক-ক্ষেপ করিয়া, প্রকৃত বীরেরই মত দ্বিজেন্দ্রলাল ন্যায় ও সত্যকে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিয়া, এ ক্ষেত্রে অসহায় ও দুর্ব্বলের পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর হইলেন। এই কারণে বিবিধরূপে বিপন্ন ও অপদস্থ হওয়া সত্ত্বেও, তিনি ভবিষ্যতে একটি বারের তরেও ভ্রমক্রমে অনুতাপ অথবা আক্ষেপ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু এই অদূরদর্শী রাজ-কর্ম্মচারিগণ তাঁহার যোগ্য সমাদর ও সম্মান না করিলে কি হয়?—পরগণা সুজামুটার সেই-সব কৃতজ্ঞ জনসাধারণ ডি, এল্, রায়কে অন্তরের অকৃত্রিম প্রীতি ও ভক্তিভরে আজও সাগ্রহে 'দয়াল রায়' বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

'দয়াল রায়'।

পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া, স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 'জন্মভূমি' পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—

"সেটেল্‌মেণ্ট কার্য্য শিখিবার জন্য বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট আমাকে মধ্য প্রদেশে (Central Provinces এ) পাঠান। সেখান হইতে ফিরিয়া আমি উক্ত কাজ শিখিতে আবার মোজাফারপুরে প্রেরিত হই। এই দুই কার্য্য ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শেষ হইলে, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে আমি শ্রীনগর ও বনোল ষ্টেটের আসিস্ট্যাণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার হইয়া ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ধাপার পরগণায় যাই। সেখান হইতে মুঙ্গের ও তথা হইতে পূর্ণিয়ায় উক্ত কাজ শেষ করিয়া, আমি বর্দ্ধমান ষ্টেটে সুজামুটা পরগণায় সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হই। উক্ত কাজ তিন বৎসর কাল করি।

"উক্ত (সুজামুটা পরগণার) সেটেল্‌মেণ্ট-সংক্রান্ত একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্গদেশে একটি উপকার সাধিত হয়। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারেরা জরীপে জমি বেশী পাইলেই খাজনাও বেশী ধার্য্য করিয়া দিতেন। আমি সুজামুটা-সেটেল্‌মেণ্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে, এইরূপ খাজনা বৃদ্ধি করা অন্যায় ও আইন-বিরুদ্ধ। প্রজার সহিত যখন পূর্ব্বে জমি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন মাপিয়া দেওয়া হয় না, আন্দাজ করিয়া সেই জমির পরিমাণ হস্তবুদে লেখা হয়। এমন কি, এরূপ হওয়া সম্ভব যে, সেই জমিই এখন জরীপে তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে মাত্র। তাহার জন্য তাহার

নিকট অধিক খাজনা চাওয়া অন্যায়। অতএব রাজা (বা জমিদার) যদি বেশী জমির বেশী খাজনা দাবী করেন ত' তাঁহার দেখাইতে হইবে যে, প্রজা কোন্ জমিটুকু বেশী অধিকার করিয়াছে। আর ড্রেনেজ খাল বন্ধ হওয়ায় জমির বাৎসরিক ফসল কম হইয়া যাওয়ার জন্যও আমি প্রজাদিগের খাজনা কমাইয়া দিই।

"(আমার) এই রায় হইতে জজের নিকট আপীল হয়, এবং তাহাতে জজ সাহেব উক্ত রায় উল্টাইয়া প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময় স্যার চার্লস এলিএট্ বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট-গবর্ণর ছিলেন। তিনি উক্তরূপ বিভ্রাট দেখিয়া, উক্ত বিষয় তদন্ত করিতে স্বয়ং মেদিনীপুরে আসেন, ও কাগজ-পত্র দেখিয়া অমাকে অযথা ভর্ৎসনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটেল্‌মেণ্ট-আইন বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দেই। ছোট-লাট বলেন, "আমি নিজে সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার ছিলাম। আমি সেটেল্‌মেণ্ট কাজ বেশ বুঝি।" তদুত্তরে বলি যে "আপনি পাঞ্জাবে সেটেল্‌মেণ্ট কাজ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের সেটেল্‌মেণ্ট-আইন ও বঙ্গদেশের সেটেল্‌মেণ্ট-আইন একপ্রকার নহে। উহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে।" এই উত্তর শুনিয়া ছোট লাট আমার পূর্ব্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন ও তাহা অবগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য লেখেন এবং তাহাই আইনে ('সেটেল্‌মেণ্ট-ম্যানুয়েলে'র নোটের ভিতর) ঢুকাইয়া দেন, এবং কিছুদিন পরে আমার প্রমোশন বন্ধ করেন।

"ইত্যবসরে জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। হাইকোর্ট জজের রায় উল্টাইয়া দিয়া আমার মতের সহিত ঐক্য প্রদর্শন করেন; এবং সেই হাইকোর্টের 'রুলিং' অনুসারে এখন বঙ্গদেশের সমস্ত সেটেল্‌মেণ্ট কার্য্য চলিতেছে। এখন জরীপে জমি বেশী পাইলেই প্রজার অসম্মতিতে আর খাজনা বৃদ্ধি হয় না। ইত্যবসরে হাইকোর্টে আর একটি আপীলে স্যার চার্লসের উক্ত মন্তব্যও নির্দ্দয়ভাবে সমালোচিত হয়। তাহাতে তিনি সেগুলি 'সেটেল্‌মেণ্ট-ম্যানুয়েল' হইতে উঠাইয়া লইতে বাধ্য হন।"

এ সম্বন্ধে তৃতীয় অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয় আরও জানাইতেছেন,—

"হাইকোর্টের বিচারে প্রতিপন্ন হইল, Mr. D. L. Roy ভ্রান্ত হন নাই, Sir Charlesই ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে স্যার চার্লসের ক্রোধ উপশমিত না হইয়া বর্দ্ধিত হইল। তিনি আইনে পরাস্ত হইয়া, 'Mr. Roy শ্রম-বিমুখ'—কলিকাতা গেজেটে এইরূপ দোষারোপ করিলেন। কিন্তু দ্বিজুর উপরিতন কর্ম্মচারী মাননীয় ফিনিউকেন সাহেব দ্বিজুর কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিখিলেন যে, Mr. Roy এর কার্য্য ('Monument of industry and ability') পরিশ্রম ও দক্ষতার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ।

"দ্বিজেন্দ্রের উপরিতন কর্ম্মচারী উচ্চপদস্থ শ্রীযুক্ত ফিনিউকেন সাহেব সাহস পূর্ব্বক এইরূপ না লিখিলে বোধ করি, ছোট লাট দ্বিজেন্দ্রকে 'ডিগ্রেড্' করিয়া দিতেন। যাহা হউক, দ্বিজেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে সত্যের অনুরোধে এবং গরীব প্রজাদিগের হিতকল্পে তিনি নিজের পদে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তিনি পদে পদে এইরূপ তেজস্বিতা প্রকাশ না করিলে তাঁহার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। তিনি কিছুকাল পরে গবর্ণমেণ্টে একটি মন্তব্য প্রেরণ করিলেন। তাহা গবর্ণমেণ্টের পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে। সেই পুস্তক আমি পাঠ করি। এই মন্তব্যে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই যে "আপনারা কার্য্যের ভ্রান্ত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন, ভ্রম বুঝাইয়া দিলে আপনারা বুঝিবেন না, শুনিবেন না। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ঐ ভ্রান্ত নিয়মাবলীর যাহা অনিবার্য্য অনিষ্টজনক ফল তাহা ঘটিলে আপনাদিগের আদেশানুসারে যে কর্ম্মচারী ঐ নিয়মাবলীতে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তাহার স্কন্ধে ঐ নিয়মাবলীর দোষ চাপাইয়া থাকেন। যাহা ঘটিয়াছে আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানাইয়াছিলাম, তাহাই ঘটিবে। এক্ষণে আমাকে দোষী বলা কতদূর সঙ্গত আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।" এইরূপ লেখার পর দ্বিজেন্দ্রের যে চাকরী যায় নাই তাহাই আশ্চর্য্য; কেবল আশ্চর্য্য নহে, তাহা ব্রিটিশ শাসনের ইংরাজদিগের পক্ষেও একটা প্রশংসার কথা।

নৈতিক বল ও তেজস্বিতা।

"উপরিউক্ত ফিনিউকেন সাহেব যে একাকী দ্বিজেন্দ্রের পক্ষ লইয়াছিলেন তাহা নহে। যখন ছোট লাটের সহিত সাক্ষাৎমতে দ্বিজেন্দ্রের বাদানুবাদ হইতেছিল, তখন সেই স্থানে মাননীয় F. R. S. Collier (এফ্, আর্, এস্,

কলীয়ার) কালেক্টার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। কলিয়ার (কলি?) সাহেব বিশেষ আইনজ্ঞ। ছোট লাট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি বলেন?" তাহাতে কলিয়ার সাহেব বলেন, "I think Mr. Roy is right" —"আমার বিবেচনায় মিঃ রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক।"

দ্বিজেন্দ্র কিছুকাল পরে কর্ত্তৃপক্ষের অবিচারে ত্যক্ত হইয়া Honesty is not the best policy'—'সততা সাংসারিক স্বার্থসাধক নহে' (?)—এই বিষয়ে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা করায় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব দ্বিজেন্দ্রের উপর চটিয়া দ্বিজেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠান। দ্বিজেন্দ্রের সহিত তাঁহারও বাদানুবাদ হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে একদিন আমি দ্বিজেন্দ্রের কলিকাতার বাসায় গিয়া দেখিলাম যে, দ্বিজেন্দ্র অতি গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "আমি এ চাকরী ছাড়িয়া দিব মনে করিতেছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি করিবে?" তিনি বলিলেন যে, "কলিকাতায় একটি জমিদার ৬০০৲ ছয় শত টাকা বেতনে আমাকে তাঁহার ষ্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক।" আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এ কাজ তুমি কদাপি করিও না। তুমি যেরূপ তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা, তুমি কোন জমিদারের ষ্টেটে একমাসও কাজ করিতে পারিবে না।"

বাস্তবিক দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন আদ্যন্ত পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, সাংসারিক হিসাবে এক্ষেত্রে অগ্রজ জ্ঞানেন্দ্রবাবু দ্বিজেন্দ্রলালকে সুপরামর্শ ই দিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে গাভর্ণমেণ্টের নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন করা যদিবা কোনরূপে সম্ভবপর হইয়াছিল,—কোন ব্যক্তিবিশেষের অধীনতা বা আনুগত্য স্বীকার করা একেবারেই অস্বাভাবিক ও অসম্ভব হইত। ইহার পরে, আরও কয়েকবার তিনি ডেপুটিত্ব-নিগড় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, অন্যবিধ দাসত্ব করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; কিন্তু, স্বাধীন বৃত্তি বা ব্যবসায় অবলম্বন ব্যতীত তদ্রূপ কর্ম্মে ব্রতী হইলে, তিনি যে পরিণামে বিশেষ বিপন্ন ও অধিকতর উত্যক্ত হইতে বাধ্য হইবেন,—ইহা বুঝাইয়া দিলে,

অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তিনি প্রতিবারেই সে আকাঙ্ক্ষা মন হইতে বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তাঁহার সমসাময়িক সতীর্থ ও সুহৃজ্জনের মধ্যে ব্যারিষ্টার স্যার-শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতির নাম আজ এ দেশের সর্ব্বত্র সকলেই অবগত আছেন। যদিচ আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদের কাহারও অপেক্ষা শিক্ষায়, জ্ঞানে অথবা শক্তিতে হীন ছিলেন মনে হয় না তথাপি অনিবার্য্য দৈববিড়ম্বনা বশতঃ, নিতান্তই দুরদৃষ্টক্রমে, আজীবন তিনি ঐ তুচ্ছ ডেপুটিত্বই করিয়া গেলেন; আর আজ স্বাধীনজীবী আশুতোষ, ব্যোমকেশ, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন প্রমুখ এদেশের মুখোজ্জ্বলকারী সুসন্তানবৃন্দ বিপুল ঐশ্বর্য্য ও অসীম সম্মানের অধিকারী হইয়া, দেশের ও দশের নেতৃপদবাচ্য হইয়া রহিয়াছেন। ডেপুটিদের মধ্যেও তো অনেকে অন্ততঃ জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদও প্রাপ্ত হইতেছেন; কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের অদৃষ্টে সে সম্মানটুকুও ঘটে নাই! ইহার হেতু অন্বেষণ করিলে তাঁহার স্বানুবর্ত্তিতা, অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা-প্রীতির কথা স্বতঃই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিজেন্দ্রলাল সামান্য ডিপুটী ছিলেন সত্য; কিন্তু, কোনদিনও তিনি সেলাম ঠুকিয়া বা চাটুকারিত্ব-প্রভাবে উপরিওয়ালার 'খয়েরখাঁ'-গিরি করেন নাই। দাসত্ব করিয়াও জীবনে কখনও তিনি যে মনুষ্যত্বের আদর্শকে খর্ব্ব হইতে দেন নাই, —এইখানেই তাঁহার মহত্ত্ব; এবং এই বিশেষত্বের জন্যই চিরদিন তিনি তদীয় দেশবাসী ও পরিচিত স্বজন-বান্ধববর্গের নিকটে নমস্যরূপে পরিগণিত রহিলেন। গাভর্ণমেণ্ট ভার-প্রাপ্ত সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য, অনুগত দাসের ন্যায় তিনি সম্যক্ বিশ্বস্ত যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু, ব্যস্—এই পর্য্যন্তই শেষ! ইংরাজজাতির বিবিধ গুণ-মুগ্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল চিরদিন অকপটে ইংরাজের নানা

গুণ-কীর্ত্তন করিয়াছেন ; তবে, স্বার্থ-সিদ্ধি বা পদ-মর্য্যাদা বৃদ্ধির নিমিত্ত একটি দিনের তরেও তাঁহাকে কেহ লালায়িত হইতে দেখে নাই। কত 'ঘটিরাম' তৈল-ম্রক্ষণ-দক্ষতায় 'রায়বাহাদুরি' হইতে আরম্ভ করিয়া, নানাবিধ 'স্পৃহণীয়' পদবীতে আরূঢ় হইয়া, যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় উচ্চাসনে ভ্রূকুটি-কুটিল বদনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, দেখিতে পাই ; কিন্তু, তুচ্ছ পদোন্নতি বা পার্থিব প্রতিষ্ঠার জন্য আত্ম-সম্মান বিনষ্ট করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না,—বরং তদ্রূপ নীচ প্রবৃত্তিকে তিনি নিতান্ত ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিতেন।

বক্ষ্যমাণ ব্যাপার উপলক্ষে আমাদের একটি কথা কোনমতে ভুলিলে চলিবে না যে, যে সকল উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের ক্ষণেকের ইচ্ছা বা তুচ্ছ ইঙ্গিতে, অতি সহজে—নিমেষপাতেই তাঁহার ডেপুটি-জীবনের অতি আকস্মিক অবসান ঘটিতে পারিত, শুদ্ধমাত্র সত্যের অনুরোধে,—অসহায়, আর্ত্ত বা দুর্ব্বলের প্রতি স্বাভাবিক ঐকান্তিক অনুকম্পা বশতঃ—তিনি তাঁহাদের আন্তরিক অসন্তোষ ও বিরাগ-উৎপাদনেও অণুমাত্র ভীত, শঙ্কিত বা পরাঙ্মুখ হন নাই। যে অচপল ও নিত্য-সজাগ ন্যায়-নিষ্ঠা এবং অপরাজেয় নৈতিক বলের প্রভাবে তিনি স্বীয় কর্ম্ম-জীবনে এতদূর তেজস্বিতা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন,—জ্ঞানে, কর্ম্মে ও চিন্তায়—প্রত্যেক বিষয়েই সতত তদীয় জীবনে সে অসামান্য গুণনিচয় চিরকাল অম্লান প্রভায় দেদীপ্যমান ছিল।

সুজামুটার এই-সকল গোলমালের পর দ্বিজেন্দ্রলাল সেটেল্‌মেণ্ট-বিভাগের কাজ ছাড়িয়া দিয়া, ১৮৯৩ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে, অল্পকালের নিমিত্ত দিনাজপুরের ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া যান। যতদূর জানা যায়—খুব সম্ভব এই সময়ে তিনি 'কল্কী অবতার' নামক প্রহসনখানা এবং মধ্যে-মধ্যে দুই-চারিটি হাসির গানও রচনা

করিতেছিলেন। কিন্তু, বহু চেষ্টা ও অনুসন্ধান সত্ত্বেও, তৎকালের বিশেষ-কোন বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইল না।

'ল্যাণ্ডরেকর্ডস্ ও য়্যাগ্রিকাল্‌চারে'র 'য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার' ও 'প্রথম আব্‌কারী ইন্‌স্‌পেক্টারে'র পদে নিয়োগ।

ইহার পরে, ১৮৯৪ সনের আগষ্ট মাসে তিনি আব্‌কারী-বিভাগের প্রথম ইন্‌স্‌পেক্টারের (পরিদর্শক) পদে নিযুক্ত হইয়া, প্রায় সুদীর্ঘ ৭।৮ বৎসর বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। মধ্যে অবশ্য একবার মাত্র তিনি (১৮৯৮ সনের মার্চ্চ মাস হইতে প্রায় আড়াই বৎসর কাল) 'ল্যাণ্ড রেকর্ডস্ ও য়্যাগ্রিকাল্‌চারে'র সহকারী 'ডিরেক্টার' পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

আব্‌কারী-বিভাগের পরিদর্শক-পদে নিযুক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে হিতকর হইয়াছিল। যদিও এই অনিয়মিত, অশ্রান্ত পরিভ্রমণ তাঁহার শরীর ও গার্হস্থ্য জীবনের পক্ষে তাদৃশ স্বাস্থ্য-সুখকর হয় নাই, তথাপি একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, এই 'ধন-ধান্য-পুষ্পভরা,' 'সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা' মাতৃভূমির বক্ষে যথেচ্ছভাবে নিরন্তর ভ্রমণ করার ফলে তাঁহার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তি সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করিবার অক্ষুণ্ণ অবকাশ পাইয়াছিল ; এবং এই উপলক্ষে, বিভিন্ন প্রকৃতির বহুলোকের সংস্পর্শে আসায়, মানব-চরিত্র-পর্য্যবেক্ষণেও তাঁহার প্রচুর পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। পরিদর্শনের জন্য তিনি যখন যেস্থানে গমন করিতেন, শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন যেন সেখানে একটা 'হুলস্থূল' ব্যাপার উপস্থিত হইত। অমায়িকতা, সরলতা, সততা, উদারতা ও রহস্য-প্রীতি বা রসিকতার গুণে তাঁহার সেই সদানন্দ জীবনখানি সর্ব্বত্রই সমাদৃত ও সম্মানিত হইত ; এবং বলা বাহুল্য--যিনি একবার তাঁহার সংসর্গে আসিতেন তিনিই তাঁহাকে 'পশন্দ্' না করিয়া কিংবা ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিতেন না। সুদীর্ঘ সাত-আট বৎসর ধরিয়া এইভাবে

গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে, শহরে-শহরে,—দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বত্রই এ সময়ে, হর্ষ, কৌতুক, কবিত্ব ও রসিকতা প্রভাবে সকলকে মাতাইয়া তুলিতেছিলেন; —চারিদিকে হাস্যামোদের অনাবিল উৎসধারা যেন দুর্ব্বার বেগে উন্মুক্ত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া, ছুটিয়া, নাচিয়া, বহিয়া চলিয়াছিল! বহু শতাব্দীর নিষ্পেষণ-শীর্ণ, এই মরণোন্মুখ, নির্জ্জীব ও অবসন্ন জাতিকে একটি দিনের নিমিত্ত,—মুহূর্ত্ততরেও যিনি এমন করিয়া উৎসাহে ও উল্লাসে হাসাইয়া-মাতাইয়া তুলিতে-পারেন তাঁহার নিকটে এ দুর্ভাগ্য দেশ যে কিরূপ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ তাহা সহসা বলিয়া শেষ করা সহজ নহে।

'হাসির গান' রচনা-প্রসঙ্গে, সাহিত্যজীবী, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যক 'সাহিত্য'-পত্রে) নিম্নোক্ত সুন্দর বিবরণটি লিখিতেছেন,—

'হাসির গান।'

"যখন দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এদেশে ফিরিয়া আসেন তখন বাঙ্গলায় ভাব-স্থবিরতা ঘটিয়াছিল। তখন কেবল বচনের আস্ফালন ছিল; নব্য হিন্দু কেবল 'অর্য্যামি'র আস্ফালন করিতেছিলেন, উন্নতিশীল শিক্ষিত-সম্প্রদায় সমাজ-সংস্কারের দোহাই দিয়া কেবল স্বেচ্ছাচারের আস্ফালন করিতেছিলেন এবং রাজনৈতিক সম্প্রদায় কংগ্রেসের বিশালতায় আগ্রীব নিমজ্জিত হইয়া কেবল একতার আস্ফালন করিতেছিলেন। 'ন্যাকামী'র প্রভাব চারিদিকে বেশ ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতের Humour বা ব্যঙ্গের এদেশে আমদানী করিয়া, দেশীয় শ্লেষের মাদকতা উহাতে মিশাইয়া, বিলাতী ঢঙ্গের সুরে হাসির গানের প্রচার করিলেন। সে গান বাঙ্গলা ভাষায় যেমন অপূর্ব্ব, সে গানের সুর ও গীত-পদ্ধতিও তেমনি বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন। হাসির গানের রচনায় তিনি যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, হাসির গান গায়িতেও তিনি স্বয়ং তেমনি অতুল্য ছিলেন। ময়মনসিং হইতে মালদহ পর্য্যন্ত, দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে ডায়মণ্ডহার্ব্বার পর্য্যন্ত—বাঙ্গলার সকল জেলায়, সকল সমাজে তিনি স্বয়ং তাঁহার হাসির গান গাহিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই নূতন অম্ল-মধুর সামগ্রী শিক্ষিত

বাঙ্গালী হাসিমুখেই গ্রহণ করিয়াছিল। * * ব্রাহ্ম, থিওসফিষ্ট, „নব্য হিন্দু, বিলাতফের্ত্তা বাঙ্গালী সাহেব, ভণ্ড দেশ-হিতৈষী রাজনৈতিক আন্দোলনকারী, বাবু, পণ্ডিত, হাকিম,—বাঙ্গলার সকল শ্রেণীর সকল রকম 'ন্যাকা' ও 'ভণ্ড' ধরিয়া তিনি ব্যঙ্গ করিয়াছেন। অথচ কেহই তাঁহার প্রতি রুষ্ট নহে, কেহই তাঁহাকে পর ভাবিয়া দূরে থাকে না। * * * দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান বাঙ্গালী সমাজে একটা ভাববিপ্লব ঘটাইয়াছিল।"

ইন্দ্রনাথের সহিত আলাপ।

পাঁচকড়ি বাবুর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের ইহার পূর্ব্বেই পরিচয় হইয়াছিল; দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে তিনি আমাকে এই সময়ের যে বিবরণটুকু দিয়াছেন, এখানে তাহাও আমি উদ্ধৃত করিলাম,—

"সেই ভাগলপুরে হরুর বাড়িতে দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ, সে কথা তোমাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। সেই আলাপের পর প্রায় ত্রিশ বৎসর আমাদের উভয়ের মধ্যে পরিচয় ছিল,—সে পরিচয় যতদিন কাটিয়াছে ততই ঘনীভূত হইয়াছে। বিশেষতঃ যখন আমি কলিকাতায় 'বঙ্গবাসী' কাগজের সম্পাদক হইয়া আসি তাহার পর হইতেই দ্বিজুর সহিত সখ্যভাব ক্রমশঃ প্রগাঢ়তর হইতে লাগিল। আমি তখন 'বঙ্গবাসী'র পূর্ণাবয়ব সম্পাদক। দ্বিজু যথারীতি একবার নিজের কাজ সারিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, এবং 'হ্যাট্ কোট' পরিয়াই আমার বাসায় আসিয়া হাজির হইয়াছে। সেদিন আমার বাসায় স্বয়ং ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতিথি। দ্বিজু আসিয়াই, আমাকে নত হইয়া নমস্কার করিল, প্রণাম করিতে গিয়া প্যাণ্টালুনের একটা বোতাম ছিঁড়িয়া গেল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া ঘরে আসিয়া বসিল। একবার আমার ও একবার ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তোমার এখানে আসিতে ভয় করে, তুমি 'বঙ্গবাসী'র 'এডিটার,' গোঁড়াদের সর্দ্দার।" ইন্দ্রনাথ অমনই মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"হুঁঃ, পাতিদের সর্দ্দার! কমলা শ্রীহট্টে জন্মায়, সে কমলার চাষ বাঙ্গালার মাটিতে করিলে তাহা গোঁড়ায় পরিণত হয়। পাঁচু এই দেশেরই; সুতরাং পাতি,—বড় জোড় যদি শ্রদ্ধা করিয়া বল ত' কাগজী বলিলেও বলিতে পার"। দ্বিজেন্দ্রলাল অমনি হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আপনার নাম ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—কেমন? কারণ,

এমন উপহাস-রসিকতা এক ইন্দ্রনাথ ছাড়া আর তো কাহারও নাই!" উত্তরে ইন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আর তোমাকেও চিনিয়াছি। তুমি দ্বিজেন্দ্রলাল।" কারণ, তখন দ্বিজেন্দ্রলালের গোটাকতক হাসির গান বাহির হইয়াছিল! 'বঙ্গবাসী'তে 'আমরা বিলাত-ফেরতা ক'ভাই,' 'Reformed Hindoos' প্রভৃতি ক'একটি গান আমি তুলিয়া দিয়াছিলাম। ইন্দ্রনাথ তাহা পড়িয়া 'বাহবা' দিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথকে সেদিন 'Reformed Hindoos' গানটা শুনাইয়া, কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেল। দ্বিজেন্দ্র-পরিচয়ের ইহাই আমার দ্বিতীয় স্তর।"

'হাসির গান' রচনা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই একস্থলে জানাইয়াছেন,—বিলাত হইতে ফিরিয়া,—

"এই সময়ে আমি ইংরাজী গান খুব গাহিতাম। ইংরাজী গান প্রায় কোন বাঙ্গালী শ্রোতারই ভালো লাগিত না। তখন ইংরাজী গান ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গলায় গান রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করি। বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া 'আর্য্যগাথা দ্বিতীয় ভাগ' নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং কার্য্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐ সকল গান আমার স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়।"

এইরূপে, তৎকালে প্রতিভার বরপুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র—কলিকাতায় ও মফস্বলে—তদীয় অপূর্ব্ব হাস্য-রসের স্বতোচ্ছ্বসিত, অনাবিল নির্ঝর-ধারায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে পরিস্নাত করিয়া তুলিলেন, এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা এক নবীন চেতনায় চকিত, উদ্বুদ্ধ ও সুস্থ হইতে লাগিলেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি 'বঙ্গীয় রঙ্গালয়সমূহে' গমন করিয়া, বহুবার বিবিধ অভিনয়াদি দর্শন করেন। সাধারণতঃ সেগুলির 'সারল্য ও স্বাভাবিকতা' একপক্ষে যেমন তাঁহাকে 'মুগ্ধ করিল', অপরপক্ষে আবার সেই

'কল্কী অবতার'।

সকলের 'কুরুচি ও অশ্লীলতা' লক্ষ্য করিয়া তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি নিজেই একস্থলে বলিয়াছেন যে, প্রধানতঃ এই কারণেই তিনি ক্ষুব্ধ চিত্তে 'কল্কী-অবতার' নামে একখানি প্রহসন ('লালিকা' বা 'ফার্স') রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানিতে হাস্য-রসের প্রচুর উপাদান বিদ্যমান থাকিলেও, মুখ্যতঃ দুইটি কারণে অদ্যাপি ইহা রঙ্গালয়ে অভিনীত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।—প্রথমতঃ, ইহাতে সমাজের সকল সম্প্রদায়ের উপরেই সমভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নির্ব্বিচারে বর্ষিত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয়তঃ, এই-সব লঘু উদ্দেশ্য সাধনার্থ অশোভন ও যথেচ্ছরূপে হিন্দু দেব-দেবীর সহায়তা গৃহীত হইয়াছে। ইংরাজীতে 'Judge Hale' এর একটা কথা আছে,—

'Never make a jest of any Scripture-expressions' (অর্থাৎ—ধর্ম্মগ্রন্থের কোন উক্তি লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিও না।)

মজ্জাগত ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন এ দেশের পক্ষে এ উপদেশটি বিশেষভাবে মূল্যবান্। আমাদের অনুমান—এই উভয় কারণবশতঃই, সাধারণ দর্শকবৃন্দের বিরক্তি-উদ্রেকের আশঙ্কায়, এই পুস্তকখানি অদ্যাপি রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতে পারে নাই। আর, কেবল 'কল্কী অবতারে'র কথাই বা বলি কেন? ইহা ছাড়া, পরবর্ত্তী কালে প্রণীত তাঁহার 'পাষাণী' নামক নানাগুণান্বিত, নাট্য-কাব্যখানিও এই-একই দোষে সাহিত্য-সমাজে অনাদৃত ও রঙ্গালয়-সমূহে অচল হইয়া রহিয়াছে। যাহাহৌক, কলঙ্ক-লেখা থাকিলেও, এ সময়ে রচিত এই 'কল্কী অবতারে' দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ লিপি-নৈপুণ্য ও ব্যঙ্গ-শক্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

এ সময়ের বিবরণ বলিতে-বসিয়া 'সাহিত্য'-পত্রের সুবিজ্ঞ সম্পাদক, বন্ধুবর সুরেশ সমাজপতি মহাশয় বলিলেন,—

"এই সময়েই আমি লক্ষ্য করি—বিলাত থেকে তিনি যে 'ক্লোক'টি (Cloak'টি)

বিলাতী 'ক্লোক' বা বিজাতীয় বহির্ব্বাস-বর্জ্জন।

নিয়ে এসেছিলেন সেটি যেন কোথায় খুলে' পড়ে' গেছে। সরল, উদার, নির্ভীক, সদানন্দ পুরুষ,—যাকে বলে 'খোলা প্রাণ'!—সকলের সঙ্গেই সমানভাবে মিশ্তেন।"

এস্থলে একটি কথার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে হয়। বিলাত হইতে ফেরার পর, প্রথম-প্রথম আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে খানিকটা খুব সাহেবী ভাবাপন্ন দেখিয়াছি বটে; কিন্তু, তা' বলিয়া তাঁহার স্বাভাবিক উদারতা ও অমায়িকতার কোনদিন এতটুকুও অভাব ঘটে নাই। সাহেবী বেশ-ভূষা করিয়া বিলাতী ধরণে খানা খাইতে ভালবাসিতেন বলিয়া, তিনি কোনকালেও স্বদেশী ভাইদের সঙ্গে তাঁহাদেরই একজন হইয়া, ছোট-বড় সকলের সঙ্গে সমানভাবে মেলা-মেশা করিতে ভুলিয়া যান নাই। নিজের যাহা ভাল বোধ হইত,—যাহা তিনি সঙ্গত ও শোভন বলিয়া বুঝিতেন, সম্পূর্ণ লোকমত-নিরপেক্ষ হইয়া, দ্বিধাহীন চিত্তে চিরদিন তাহাই তিনি করিয়া যাইতেন,—এইমাত্র; তদ্ভিন্ন, অহঙ্কার বা আত্মম্ভরিতার বশবর্ত্তী হইয়া, ভিন্ন মতাবলম্বী কিংবা ভিন্নাচারসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতে তিনি জানিতেন না বা পারিতেন না; বস্তুতঃ, তদ্রূপ ব্যবহার তাঁহার সে 'ধাতু' বা প্রকৃতির সর্ব্বথা বিপরীত ছিল। তিনি সাহেব সাজিতেন; কারণ, তৎকালে সেটাকে তিনি সুসভ্য বেশ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি সাহেবী আচরণ করিতেন; কারণ, তৎকালে তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, শিক্ষিত-সাধারণের সেই 'সদ্দৃষ্টান্ত' কালে সমাজের সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইবে; এবং ফলে, তদ্দ্বারা তাঁহার স্বদেশের যথার্থ শুভ সাধিত হইবে। আপনার আন্তরিক বিশ্বাস ও ধারণার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন বলিয়াই, সত্যসন্ধ দ্বিজেন্দ্রলাল অচিরে এ সম্পর্কে স্বীয় ভ্রমও অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন; এবং যেই নিজের ভ্রম বুঝিলেন অমনি তিনি এ সকল বিজাতীয়

আচার-ব্যবহার ইচ্ছামত পরিহার করিতেও অকারণ বিলম্ব করিলেন না। বিলাত-প্রবাসের এবংবিধ দুর্নিবার্য্য মোহ বা বিভ্রম, বিলাত-ফেরৎ বাঙ্গালীর প্রায় সকলেরই জীবনে অল্পাধিক পরিমাণে সংক্রামিত হয়; কিন্তু, বড় দুঃখের বিষয়—তন্মধ্যে অল্প লোকই দ্বিজেন্দ্রলালের মত যথাকালে সে অন্ধ অনুকরণের মোহ-বিভ্রমের কবল হইতে আত্ম-সংবরণ করিয়া, প্রকৃত নৈতিক বা মানসিক বলের পরিচয় দিতে পারগ হন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের অব্যবহিতকাল পরে, বিবাহের সময়ে, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া, আমাদের 'দাদা-মহাশয়, প্রসাদদাস বাবু সরল দ্বিজেন্দ্রলালের তৎকালীন কথা-বার্ত্তা হইতে ঠিকই ধরিয়াছিলেন যে, তখন তাঁহার মনেও এরূপ একটা ভাব ছিল যে, 'বাঙ্গালীরা সাহেবদের ও বিলাত-ফেরতদের অনেক নীচে।' অবশ্য একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, চির-স্বাধীন সাহেবদের কোন-কোন সদ্গুণের তুলনায় এখনও আমরা তাঁহাদের নিশ্চয়ই 'অনেক নীচে'; কিন্তু দু'এক বৎসর সেই সাহেবদের স্বাধীন ভূ-খণ্ডে অবস্থান ও তথাকার বায়ু-সেবন করিয়া, সাহেব সাজিয়া, হুক্কা ও সরবতের পরিবর্ত্তে চুরুট ও সুরা অভ্যাস করিয়া, 'মিষ্টার' হইয়া ফিরিয়াছেন বলিয়াই, এই-সব বিলাত-ফেরৎ অপেক্ষাও কি আমরা 'অনেক নীচে' নামিয়া পড়িয়াছি? হইতে পারে যে, বহুদর্শিতার ফলে ইহাঁদের মধ্যে কাহারও-কাহারও কোন-কোন বিষয়ে চিন্তা ও আদর্শের প্রচুর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে; কিন্তু, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া শত স্বাধীন দেশে ঘুরিয়া-ফিরিলে, এবং হাজার 'সাহেব সঙ্গে পটিয়া, 'মিষ্টার' নামে রটিলেও,' আসল যে 'তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে'ই ডুবিয়া রহিয়াছ!—প্রাণান্তেও আর এ জীবনে ললাট-পটে অঙ্কিত, ঐ জন্ম-জন্মাগত দাসত্বের অলোপ্য কলঙ্ক-লাঞ্ছনা কোনমতেও যে এভাবে ঘুচিবার নহে,—তা' সে যতই 'ভিনোলিয়া' মাখ, আর টুপিতে শতই কপাল ঢাক!

সুজামুটার সেই গোলযোগ আপাত-দৃষ্টিতে দুঃখ ও আক্ষেপের কারণ বলিয়া মনে হয় বটে ;--যেহেতু, ঐ ঘটনা উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের পদোন্নতির পথে অলঙ্ঘ্য কণ্টক-বাধা পতিত হইল ; —কিন্তু, অদূর-দৃষ্টি মানুষ বুঝিতে পারুক্ আর না পারুক্, মঙ্গলময় বিধাতার সকল বিধানের অভ্যন্তরেই অবশ্যম্ভাবী কল্যাণের বীজ সংগোপনে নিরন্তর নিহিত ও লুক্কায়িত রহে। সাধু সঙ্কল্প ও সদুদ্দেশ্যের ফলে, পরিণামে এ ক্ষেত্রেও অভাবিতরূপে অকস্মাৎ ঐ ভাবে আহত, বিড়ম্বিত ও বিপন্ন হওয়ায়,—বিলাত-ফেরৎ দ্বিজেন্দ্রলালের সকল দর্প, সর্ব্ব অভিমান ও গর্ব্ব একেবারেই যেন ধূলিসাৎ হইয়া গেল ; এবং চেতনা আসিয়া প্রচণ্ড আঘাতে, চকিতে তাঁহার বৃথা ভ্রান্তি ও নিরর্থক মোহ-বিভ্রম সহসা বিদূরিত করিয়া দিল। দ্বিজেন্দ্রলাল এতদিনে বুঝিলেন যে, তিনি অলীক স্বপ্ন-জালে এতকাল আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন মাত্র,—তাঁহার অযথা গর্ব্ব বা অভিমানের অণুমাত্রও হেতু নাই,—তিনিও এই 'নফরের জাতি', 'গোলামের গোলাম' বাঙ্গালীরই একজন ; আর, তাঁহার ও ঐ আমিরালী আর্দ্দালীর মধ্যে পদার্থগত তিলার্দ্ধ পার্থক্য নাই! আহত অভিমানে দ্বিজেন্দ্রলাল কণ্ঠ হইতে 'টাই' এর বন্ধন-বেষ্টনী অকম্পিত হস্তে নিমেষমধ্যে ছিঁড়িয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন,—তাঁহার বিনত মস্তক হইতে দুর্ভার 'হ্যাট্'টিও আপনা-আপনি স্খলিত হইয়া ধরাতলে ধূলায় গড়াইয়া পড়িল। তাই, 'এই সময়ে' সমাজপতি মহাশয়ও দেখিলেন,—"বিলাত থেকে তিনি যে 'ক্লোক'টি নিয়ে এসেছিলেন তা' যেন কোথায় খুলে' পড়ে' গেছে।" ভগবানের মঙ্গলেচ্ছা পূর্ণ হইল, বাস্তবিক এতক্ষণে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পূর্ণভাবে আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল হইয়া দেখা দিলেন।

বাল্য জীবনের আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি— তখন হইতে তিনি স্বভাবতঃ কেমন-যেন একটু লাজুক প্রকৃতির

স্বাভাবিক লাজুকতা বা ('Shyness') পরিহার।

বালক ছিলেন। সমবয়স্ক বালকদের সহিত মেলা-মেশা করিতে বা খেলিয়া বেড়াইতে তিনি কেন-যেন স্বভাবতঃই অশক্ত ছিলেন। আজন্ম যাঁহাদিগকে আপন জন বলিয়া জানিয়াছেন কেবলমাত্র তাঁহাদের সঙ্গেই যা' হৌক তবু একটু মিলিতে-মিশিতে পারিতেন; তদ্ভিন্ন নিজ হইতে কাহারও সঙ্গে আলাপ বা বন্ধুত্ব করিতে তাঁহার কেমন যেন 'বাধ-বাধ' ঠেকিত। এইজন্য, আমরা দেখিয়াছি—ইস্কুলে গিয়া তিনি আপন মনে গম্ভীরভাবে নিজের 'ক্লাস'টিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন,—একমনে পড়াশুনা করিয়া যথাকালে বাড়ি ফিরিয়া আসেন;—স্বীয় শ্রেণীর সহপাঠী ছাত্রদের সঙ্গে পর্য্যন্ত, অন্যান্য ছাত্রদের মত, মন খুলিয়া মেশেন না বা আলাপ করেন না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বীয় স্বভাবের এই দোষটা, এই অসামাজিক ত্রুটিটুকু নিজেই বুঝিতে পারিলেন; এবং পরিশেষে ক্রমাগত বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া, তাহা বহুল পরিমাণে একরূপ বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার অন্তরঙ্গ আত্মীয় শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও এইরূপ বলিয়াছেন,—

"স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, প্রথম বয়সে এই 'Shyness' এর (লাজুকতার) দরুণ তিনি বড় একটা লোক-সমাজে মিশিতে পারিতেন না। বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বেও এই স্বভাব তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার চরিত্রের এই দোষ তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রতিকারার্থ বিশেষভাবেই মনোযোগী ও সচেষ্ট হন। বিলাতে গিয়া তিনি যখন মিসেস্ হারমারের পরিবারভুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন তখনই তাঁহার লোকসমাজে মিশিবার প্রথম সুযোগ উপস্থিত হয়, এবং তিনি সে সুযোগের যথোচিত সদ্ব্যবহারও করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পরে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি India Club প্রভৃতিতে মেলা-মেশা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে সমাজের মধ্যে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিলেন। অনেক সময়ে

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতেন যে, "আমি আপনা হইতে অগ্রসর হইয়া লোকের সঙ্গে তেমনভাবে মিশিতে বা ঘনিষ্ঠতা করিতে পারি না বলিয়া লোকে ভাবে যে, আমি অহঙ্কারী। কিন্তু, তাহারা তো জানে না ইহা আমার জন্মগত স্বভাবের দোষ! আমি যে এই লজ্জা ও সঙ্কোচের বাঁধ নিজে হইতে ভাঙ্গিয়া-ফেলিয়া কাহারও সঙ্গে আলাপ বা ঘনিষ্ঠতা করিতে পারিই না, তার এখন আমি কি উপায় করিব!" এমনই করিয়া এজন্য তিনি এতদূর আক্ষেপ করিতেন যে, শুনিলে তখন আমাদেরও অত্যন্ত দুঃখ বোধ হইত।"

'অধরদাদা'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় যখন বগুড়ার পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তখন সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট, মিষ্টার রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের গৃহে এক নিমন্ত্রণে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং হরিশবাবু উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। আত্মীয়তা সত্ত্বেও, হরিশবাবুর সঙ্গে তাঁহার তদ্রূপ ঘনিষ্ঠ আলাপ না থাকায়, দ্বিজেন্দ্রলাল স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিলেন না। হরিশবাবু ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হ'ন, এবং প্রকাশ্যে তাঁহাকে তখনই অহঙ্কারী ও দাম্ভিক বলিয়া তিরস্কার করেন। হরিশবাবু কর্তৃক এইভাবে অভিযুক্ত হইয়া, শুনিয়াছি—সেদিনও দ্বিজেন্দ্রলাল নাকি সর্ব্বসমক্ষে আত্মদোষ অকপটে স্বীকার করিয়া হরিশবাবুর নিকটে এজন্য মার্জ্জনাপ্রার্থী হইয়াছিলেন।

যাহাহৌক, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, অবশেষে দ্বিজেন্দ্রলাল এই লাজুকতা বা 'Shyness' এর হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ফলে, দেখিতে পাই—এ বঙ্গদেশের বহুস্থান তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া হর্ষ-মুখর হইয়া উঠিয়াছে, এবং দ্বিজেন্দ্রলালকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতার শিক্ষিতসমাজের মধ্যেও সাহিত্যালোচনা ও হাস্য-কৌতুকের একটা সুস্পষ্ট 'সাড়া' পড়িয়া গিয়াছে! সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশবাবু সে সময়ের বিবরণ-প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"সকলের সঙ্গেই সমানভাবে খুব মিশ্‌তেন। আমাদের কাছে বিলাতের

কতই গল্প বল্‌তেন এবং ইংরাজের অনেক মহত্ত্বের ও বহু অনুষ্ঠানের ('Institution' এর) পরিচয় দিতেন। বিলেতে থাক্‌তে গিরিশবাবু, ব্যোমকেশবাবু, ভূপাল বসু প্রভৃতি আরও কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হয় এবং সে ভাবটা বরাবরই সমান ছিল। কল্‌কাতায় তখনও বেশি লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপের তেমন সুযোগ ঘটেনি। এরই বোধ হয় ২।৩ বছর পরে (তিনি কল্‌কাতায় এসে বাসা বেঁধে নেবার পর) India club বা 'ভারত সভা'র 'মেম্বার' হন এবং এইখানে নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যেই আপনাকে তিনি স্বভাবতঃ খুবই প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন। এর আগেই তিনি গোঁড়া হিঁদুয়ানী প্রভৃতিকে আক্রমণ করে, 'কল্কী-অবতার' লিখে রেখেছিলেন। আমাদের বাড়িতে ঐ সব লেখা কবির নিজের সুরে গীত হয়; এবং পরে 'ইণ্ডিয়া ক্লাবে' ঢুকে' তিনি সেখানা ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। যখন মুঙ্গেরে ছিলেন তখন ঐ 'আষাঢ়ে'র কবিতাগুলি লেখেন। ডাক্তার ৺বিহারী ভাদুড়ী মহাশয়ের পুত্র বীরেনই প্রথম আমাদের এ বিষয়ে সন্ধান দেয়। আমরা তারপর সেগুলো নিয়ে 'সাহিত্যে' সযত্নে প্রকাশ করি। কল্‌কাতায় আস্‌বার বছর খানেক পরে,—যতদূর মনে পড়্‌ছে,—দু'একটা ইংরাজী (Comic) হাসির গান থেকে বাঙ্গলায় গান বাঁধেন।"

সমাজপতি মহাশয়ের এই শেষ কথাটি নির্ভুল নহে; কেননা, 'দাদামহাশয়' প্রসাদদাস বাবু যখন মুঙ্গেরে গিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের অতিথি হন তখনই তিনি দেখিয়াছিলেন,—

"ইংরাজী সুরে ইংরাজী কতকগুলো হাসির ও অন্য ভাবের গান তিনি বাঙ্গলায় তর্জ্জমা করিয়াছিলেন। যথা, 'খুস্ খুস্ খুসী', 'হেম এসেছে ঘরে' প্রভৃতি।"

যাহা হৌক্, তৎপরে সমাজপতি মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—

'ইণ্ডিয়া ক্লাবে' থাক্‌তে থাক্‌তেই একদিন শোনা গেল যে, দিনদুপুরে 'Imperial Druggists Hall' এর একটা দোতলা বাড়ীতে ডাকাতি হ'য়ে গেছে। এই ঘটনাটি উপলক্ষ করে' 'ইণ্ডিয়া ক্লাবে' দ্বিজুবাবু ও তাঁর বন্ধুরা ('লক্ষীছাড়ার দল') সবাই মিলে একটা 'ডাকাত ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'ডাকাতের ক্লাবে' দ্বিজুবাবুর—

'ইণ্ডিয়া-ক্লাবে' প্রবেশ এবং 'ডাকাত-ক্লাব' প্রতিষ্ঠা।

অর্থাৎ তখনকার ডি, এল্, রায়ের—প্রায় সমস্ত পরবর্তী গানই জাহির হয়। তন্মধ্যে, হাসির গানের ভিতরে সর্ব্বপ্রথম তাঁর 'নন্দলাল'ই সকলের দৃষ্টি ও চিত্ত আকৃষ্ট করে,—এটাকে নিয়ে তখন চারিদিকেই মহা 'হুলুস্থূল' পড়ে' গেল। ছোটলাট বেকার সাহেব ক্লাবে আসেন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য বন্ধুবান্ধবসহ দ্বিজুবাবু Stage' এর (রঙ্গমঞ্চের) উপর থেকে, Chorus'এ (মিলিত কণ্ঠে) কতকগুলি হাসির গান গেয়েছিলেন। বেকার সাহেব বিশেষভাবে ঐ গানটা—Reformed Hindoos'টা—আবার গাহিতে বলেন, এবং Author'কে (রচয়িতাকে) সাগ্রহে ডেকে পাঠান। 'ইণ্ডিয়া ক্লাবে' এই নিয়ে এক মহা আন্দোলন আরম্ভ হয় যে, ছোটলাটের কাছে এসব গান করা উচিত হয় নি। দু' একজন চটে' গিয়ে সত্যি সত্যি সভ্য-পদ এস্তফাই (Resign'ই) দেন এবং কেউ কেউ 'রিজাইন' দেওয়ার ভয় দেখান। আবার এ পক্ষেরও কেউ কেউ অনেক নূতন সভ্য সংগ্রহ কর্‌তে থাকেন, এবং বলা বাহুল্য—এই উপলক্ষে 'ইণ্ডিয়া ক্লাব'টা কিন্তু, খুবই জেঁকে গেল। এই সময়ে দ্বিজুবাবুকেও অনেক অপ্রিয় কথা শুন্‌তে হয়েছিল। কিন্তু, জানই তো—তুচ্ছ কারণে তিনি মোটেই রাগ কর্‌তে জান্‌তেন না; সবই শুধু কানে শুনে যেতেন, আর একটু একটু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাস্‌তেন। 'ডাকাতের ক্লাব'টা সে সময়ে সামাজিক মেলামেশার (Social Intercourse'এর) কেন্দ্র ছিল। হাত-কাটা শ্যাম মিত্র (ডেপুটি) মশায় আমাদের সভাপতি ছিলেন। দ্বিজুবাবুকেই প্রথম সভাপতি হ'তে বলা হয়; কিন্তু, বয়োজ্যেষ্ঠ ব'লে তিনি নিজেই সে সম্মানটি শ্যামবাবুকে প্রদান করেন; এবং কিছুতেই সকলের সমবেত অনুরোধ এড়াতে না পেরে, শেষে নিজে অগত্যা সহকারী সভাপতি হন। প্রতি রবিবারে ক্লাবে সকলেই জমায়েৎ হতেন। প্রায়ই সেখানে সেদিন সকাল বেলা Breakfast'এর ('প্রাতরাশে'র বা মধ্যাহ্ন ভোজনের) ব্যবস্থা হ'ত; 'ডাকাতে'রা সকাল বেলা থেকেই ক্লাবে সমবেত হ'তেন, এবং সারাটা দিন একত্র কাটাতেন। পরে কখনও কখনও আবার Dinner'এরও (নৈশভোজেরও) আয়োজন হ'ত। 'ডাকাতে'রা অনেক রাত্রি অবধি একসঙ্গে থাক্‌তেন। গান, গল্প, পাঠ, আবৃত্তি, তর্ক-বিতর্কে সমস্তটা দিন যেন কোথা দিয়ে কেটে' যেত। রাত্রি দুপুরে এক এক দিন 'আড্ডা' ভঙ্গ হ'ত। 'ডাকাতের ক্লাবে'র সভ্যরা, অর্থাৎ—এই

'লক্ষ্মীছাড়ার দল'—পর্য্যায়ক্রমে একে একে 'ডাকাতের ক্লাব'কে আমোদিত (অর্থাৎ—ইংরাজীতে যাকে বলে Entertain) কর্‌তেন। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এক এক জনকে হঠাৎ একটা 'নোটিশ' দেওয়া যেত যে, অমুক দিন 'তোমার বাড়িতে ডাকাতি হবে'। সর্ব্বপ্রথম জোড়াসাঁকোর গগনঠাকুর মহাশয়কে এই রকম এক চিঠি দেওয়া হয়। গগনবাবু সন্ত্রস্ত হ'য়ে তার উত্তরে 'ডাকাতের ক্লাব'কে জানান যে, তাঁর বাড়িটা তখন মেরামত হ'চ্ছে; এবং চুণ, সুরকী ও বাঁশের 'ভারা'তে তার অবস্থা এম্‌নি হয়ে আছে যে, তখন ডাকাতেরা এলেও বিশেষ কোন সুবিধা কর্‌তে পারবেন না। তারপর, কিন্তু শীঘ্রই তিনি একটা সুন্দর 'সান্ধ্য-সম্মিলন' (Evening-party) দেন, এবং তাতে 'ডাকাতের দলে'র সমস্ত ও গগনবাবুর বন্ধু-বান্ধবগণ নিমন্ত্রিত হ'ন। সে 'পার্টিটা' খুবই জঁাকালো ও সফল (Successful) হয়ে'ছিল। এই সম্মিলনে রবিবাবুর গুটি ৪।৫ গান—যা' এখন খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—প্রথম গীত ও প্রচারিত হয়। 'এখনো তা'রে চোখে দেখিনি' তন্মধ্যে অন্যতম। আদি-সমাজের ভূতপূর্ব্ব গায়ক ৺অক্ষয় মজুমদার মহাশয় এই সম্মিলনে রবিবাবুর 'বিনি পয়সার ভোজে'র অভিনয় করেন। এমন অপূর্ব্ব অভিনয় আমরা আর কখনও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। আর একবার অভিলাষ মুখুজ্যে (৺রাধিকা মুখুজ্যে মহাশয়ের পুত্র, এখন 'রায়বাহাদুর') মহাশয়কে এই 'ডাকাতের ক্লাবে'র সভ্যেরা 'বধ' করেন, অর্থাৎ—তাঁর কাছ থেকে একটা ভোজ আদায় করেন। অভিলাষবাবু প্রথমটা রাজী হ'ননি; কিন্তু, 'লক্ষ্মীছাড়ার দল' ছাড়্‌বার পাত্র নন; কাজেই অবশেষে, তিনি 'ক্লাবে'ই একটা ভোজের হুকুম দেন এবং অভিলাষবাবুর আজ্ঞাতে এই ক্লাবের ক'একজন সভ্য এই 'ডিনার'টিকে খুবই 'ফলাও' ক'রে তোলেন। রবিবাবু এবারেও উপস্থিত ছিলেন। ভোজের পর দ্বিজুবাবুকে আর গাইতে বল্‌তে হ'ল না। তিনি নিজেই গিয়ে, 'হার্ম্মনিয়াম' খুলে গান জুড়ে দিলেন,—

'ডিনার-ফলার-ভোজ খেয়েছি বহুৎ

কিন্তু কভু খেয়ে হেন হয়নিক জুৎ'।—ইত্যাদি।

অভিলাষ বাবু সে গান শু'নে রাগের ভাণ ক'রে বল্‌লেন যে, "It is adding insult to injury. * আমার ঘাড় ভেঙ্গে খেয়ে-দেয়ে আবার কিনা শেষে

* অর্থাৎ—'এটা হ'ল নাক-কাটার উপরে নুনের ছিটে।' —গ্রন্থকার।

আমাকেই গালাগাল !" এ সময়ে দ্বিজুবাবু দিব্যি খেতে পার্তেন। ললিত মিত্র, তিনি, যোগিনী (চাটুর্য্যে) আর আমি—এই কয়জনে পাল্লা দিয়ে খাওয়া যেত। হায়,—সে সব কি দিনই গেছে !"

দ্বিজেন্দ্রলালের পরলোক-গমনের পর, তদীয় জীবনের এই অবস্থার আলোচনা-প্রসঙ্গে, অধুনা-লুপ্ত 'আর্য্যাবর্ত্ত' নামক মাসিক-পত্রের ১৯২০ শালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, ঔপন্যাসিক ও লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—

"বঙ্কিমচন্দ্র ভগীরথের মত সাধনা করিয়া যে ভাব-গঙ্গা-প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিলেন, এখন তাহার পুণ্যধারা শত শাখায় বিভক্ত হইয়া সমগ্র সাহিত্যকে স্নিগ্ধশ্রী ও সমুজ্জল সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে; কিন্তু তখন আর কেহ সেই শতধারার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছিলেন না। * * 'যে ইণ্ডিয়া ক্লাব' আজ জীবিত কিন্তু জীবন্মৃত * * সেই ইণ্ডিয়া ক্লাব তখন বহু শিক্ষিত বাঙ্গালীর সম্মিলন-স্থান। এই 'ইণ্ডিয়া ক্লাবে'র কতিপয় সভ্য আবার 'ডাকাইত ক্লাব' সংগঠিত করিয়া সভ্যগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর পরিচয়ের ও সৌহার্দ্দের উপায় করিয়াছিলেন। 'ইণ্ডিয়া ক্লাব' ও 'ডাকাইত ক্লাবে' সাহিত্যিক আলোচনা হইত। কখন ক্লাব-গৃহে, কখন উদ্যানে, কখন বা নৌকায় সম্মিলিত সভ্যগণ সঙ্গীত ও সাহিত্যাদির আলোচনা করিতেন।"

বলাবাহুল্য—এ সব অনুষ্ঠানে সর্ব্বত্র আমদের দ্বিজেন্দ্রলালই কেন্দ্র-বিন্দুবৎ এই সঙ্গীত ও সাহিত্যামোদের সর্ব্বপ্রধান উদ্‌যোগী ও প্রাণ-স্বরূপ ছিলেন।

বাস্তবিক দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় অমন সরল, উদার, অমায়িক, সর্ব্বজনে সমদর্শী, 'ভোলানাথ' পুরুষ আজকাল এই পাশ্চাত্য-মোহাচ্ছন্ন, ইহ-সর্ব্বস্ব, স্বার্থপর সমাজে এখন অতি দুর্লভ—যেন নাই বলিলেই চলে! তিনি যখন যেখানে থাকিতেন সেখানে সে সময়ে সত্য-সত্যই যেন সত্যের, ন্যায়ের, সারল্যের ও হৃদ্যতার অবারিত স্বতোচ্ছ্বাস,—একটা অপার্থিব, অনাবিল ভাব-স্রোত আপনা-আপনি স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া, সে স্থানটিকে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে ও আনন্দে অপরূপ

নন্দন-নিকেতনে পরিণত করিয়া তুলিত। সমাজপতি মহাশয়ের বাক্যের তাই, যথাযথ প্রতিধ্বনি করিয়া, আমাদেরও আজ বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাসের সহিত বারংবারই বলিতে হইতেছে,—হায়, দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের 'সে সব কি দিনই গিয়াছে'!

সেই তখন—যখন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশের এই-দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক,—দিবাকর রবি ও দ্বিজরাজ চন্দ্রমা—সতত এইরূপে নিয়মিত সম্মিলিত হইতেন, যখন তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের নব-নবোন্মেষশালিনী, বিশ্ব-বিজয়িনী, অপূর্ব্ব শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-বিস্ময়-সঞ্জাত অনুরাগে একে অন্যের প্রতি আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছিলেন, এ ভাগ্য-হত দেশের পক্ষে আহা, সে কি গৌরবের ও আনন্দের দিনই ছিল! 'সাহিত্য'-সম্পাদক সে সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

রবীন্দ্রনাথের সহিত বন্ধুত্ব।

"সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়েই পরস্পরের একান্ত গুণ-মুগ্ধ ও অনুরক্ত হ'য়ে পড়্ছিলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এই অবস্থায় খুবই প্রগাঢ় হ'য়ে উঠ্ছিল।"

এ সম্বন্ধে 'আর্য্যাবর্ত্ত'ও লিখিয়াছেন,—

"ইণ্ডিয়া ক্লাবে'র এই সকল সম্মিলনে দ্বিজেন্দ্রলালও থাকিতেন, রবীন্দ্রনাথও থাকিতেন। একের উপর অপরের প্রভাব কিরূপ হইয়াছিল বা কোনও প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে কিনা, কে বলিবে!"

'আর্য্যাবর্ত্তে'র এ সন্দেহের কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না; কারণ, অত-বড় দুইটি প্রতিভার একত্র সন্নিবেশ ঘটিলে, একের পক্ষে অন্যের নিকট হইতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা, একান্ত অনিবার্য্য এবং নিতান্তই স্বাভাবিক।

তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলাল পতিতা নারীদের সাহায্যে বঙ্গীয় রঙ্গালয়সমূহ পরিচালিত হওয়ার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। এ

'প্রায়শ্চিত্তে'র অভিনয় ও রঙ্গালয়ে প্রবেশ।

সব বিষয়ে তিনি তখন একটু অধিক মাত্রায় Puritan (নীতিনিষ্ঠ বা 'রুচিবাগীশ') ছিলেন। শ্রদ্ধেয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবাবু এ সম্পর্কে আমাকে যে একটা গল্প বলিয়াছেন তাহা এই,—

"তখন আমি রঙ্গালয়ে কাজ করি এবং 'রঙ্গালয়'-পত্র সম্পাদন করি ;— 'ক্লাসিক থিয়েটারে' অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সহচর ; দ্বিজু আমাদের বাসায় আসিয়াছেন। তাঁহার 'প্রায়শ্চিত্ত' বই 'বহুত আচ্ছা' নামে 'ক্লাসিকে' অভিনীত হইবার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে! 'রিহার্সালে' বা মহাল্লার সময় দ্বিজেন্দ্রলালের উপস্থিত থাকা আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়, এই কথাটি অমরেন্দ্র আমাকে বহুবার বলিয়া পাঠাইতেছিল। দ্বিজেন্দ্র কিন্তু ঘোর গর্‌রাজী। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, দ্বিজেন্দ্র থিয়েটারে একটা ঘরে বসিয়া গান করিবেন, দেবকণ্ঠ সেই গান শুনিয়া স্বর-লিপি লিখিয়া লইবেন ;—অভিনেত্রীরা যেখানে বসে, দ্বিজু সেখানে যাইবেন না। কিন্তু, অভিনেত্রীরা নিজেদের মধ্যে একটা ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল যে, দ্বিজেন্দ্রলালকে কোন রকমে একবার 'রিহার্সালে' নামাইতে হইবে। দ্বিজেন্দ্র যখন থিয়েটারের একটা ঘরে অতি সঙ্কোচের সহিত, অপরাধীর মত শুষ্ক মুখে গিয়া বসিল তখন একটি অভিনেত্রী 'সখি আমায় ধর ধর' গানটির স্বর আয়ত্ত করিতেছিল। মনে হইল—অভিনেত্রী যেন ইচ্ছা করিয়াই, দুষ্টুমী করিয়াই, বেহাগের সঙ্গে অন্য স্বর মিলাইয়া সে গানটাকে অশ্রাব্য করিতেছিল। দ্বিজুর তাহা ক্রমে অসহ্য বোধ হইল,—আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে আমার পীঠে হাত দিয়ে বলিল,— "শুন্‌ছ? গানটাকে কিরকম murder (নষ্ট) কর্‌ছে, দেখ্‌ছ?" আমি হাসিয়া বলিলাম,—"যাওনা, সাম্‌লাও না!" দ্বিজু সত্য সত্যই আর স্থির থাকিতে পারিল না, উঠিয়া-গিয়া, টেবিল-হার্ম্মোনিয়ামের সম্মুখে বসিয়া, গানটি ঠিকমত গাহিতে আরম্ভ করিল। সে তখন গানেই মস্‌গুল্ ;—সম্মুখে নর আছে, না নারী আছে তাহা লক্ষ্যই করে নাই। রাত্রি প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত গান শেখাইয়া যখন সে ওঠে তখন তাঁহার হুঁস হইল যে, সে সত্যই 'রিহার্সালে' নামিয়াছিল, —পণ-ভঙ্গ হইয়াছে! হঠাৎ অত্যন্ত দুঃখিতভাবে একটু যেন তিরস্কারের স্বরে আমায় বলিল,—"অ্যাঁ! কি করিলাম! কাজটা তো ভারি অন্যায় হইয়া

গেল! কেন তুমি আমার ভুল ভাঙ্গিয়া দাও নাই?" তাহার সে জড়িত স্বর ও বিষণ্ণ দৃষ্টিতে আমারও বড় দুঃখ হইল, বলিলাম,—"তাহাতে আর কি হইয়াছে? তুমি যা ছিলে, এখনও তাই আছ।" দ্বিজু যেন তখন একটু আশ্বস্ত হইল; মাথা নাড়িয়া শুধু একটিবার বলিল—"হু"!

হাসির যুগ ও 'সদানন্দ' প্রকৃতি।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়ে কিরূপ নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ততার সহিত অবিচ্ছিন্ন আমোদ-কৌতুকে ও হাস্য-পরিহাসে তদীয় জীবন সম্ভোগ করিতেন তাহা স্মরণ করিলে নির্জ্জীব প্রাণেও উৎসাহের সঞ্চার হয়। কি ভাবে জীবন যাপিত হইত, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের স্ব-কথিত বিবরণ হইতে পাঠক তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইবেন। সুরেশবাবু বলিতেছেন,—

"দ্বিজুবাবু যখন আব্‌কারী বিভাগে পরিদর্শক কাজে নিযুক্ত ছিলেন তখন তাঁহার একখানি বজ্‌রা ছিল। বজ্‌রাখানি কেল্লার সাম্‌নে, ঘাটে বাঁধা থাক্‌ত। 'ইণ্ডিয়া ক্লাব' থেকে আমি, দ্বিজুবাবু, যোগিনী প্রায়ই বজ্‌রায় যেতুম। বজর্‌াখানির নাম ছিল—*। রাত্রি ৯'টা ১০'টা অবধি সেই বজ্‌রায় ব'সে ব'সে নানাবিধ আলোচনায় বড়ই সুখে সময়টা কেটে যেত। সেখানে কয়েকখানি কেতাব, চা, কফি, কোকো, বিস্কুট, চকোলেট, প্রভৃতি সবই মজুদ্ থাক্‌ত; যখন যা ইচ্ছা হচ্ছে, খাওয়া যাচ্ছে। নানাবিধ রঙ্গ-ব্যঙ্গ, আলাপ-আপ্যায়নে সময় যে কোথা দিয়ে 'হুহু' ক'রে কেটে যেত তা' আমরা কেউই টের পেতুম না। একবার সেই বজ্‌রাটিতেই তিনি আমাদের একটা 'পার্টি' দিয়েছিলেন। কথা ছিল—এখান থেকে বরাবর খড়্‌দা পর্য্যন্ত গিয়ে সেখানে একটা বাগানে আহারাদি করা যাবে, এবং তারপর ধীরে-সুস্থে ফেরা যাবে। রবিবাবু এ পার্টিতেও ছিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হ'য়ে, সন্ধ্যার প্রক্কালে সব ছাদে গিয়ে বসা গেল; এবং কেদার মিত্র, রবিবাবু ও দ্বিজুবাবুর গান হ'তে লাগল। বজ্‌রায় বেড়াতে তখন কতই না Pleasant (আরাম) বোধ হচ্ছিল! তাই, তখন খড়্‌দায় না নেমে আরও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া গেল। শ্রীরামপুরের

* নামটা এখন আর কেহ মনে করিয়া বলিতে পারিলেন না। —গ্রন্থকার।

কাছে গিয়ে হঠাৎ খুব মেঘ করে এল ; এবং একটু পরেই প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। নৌকা তখন মাঝ-গঙ্গায় ;—না যায় এগুনো, না যায় পিছনো,—মহা বিপদেই পড়া গেল। বজ্‌রা যে তখন কোথায় যাচ্ছে ও কি হ'চ্ছে তা' কিছুই জানা যাচ্ছে না। এদিকে রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা। এই সময় হাত-কাটা শ্যামবাবু-ডেপুটির চাপরাশী বল্‌লে যে, আমরা বোধ হয় নদীর কিনারায় এসে পড়েছি ; কিন্তু, সেটা যে কোথায় তার কিছুই ঠিক করার উপায় ছিল না। যাহোক, সেখানেই তখন প্রাণ নিয়ে নেমে পড়া সাব্যস্ত হ'ল। শ্যামবাবু সর্ব্বাগ্রে নেমে, অতি কষ্টে হ্যারিক্যান ও বিদ্যুতের আলোতে স্থান-নির্ণয় ক'রে এসে বল্লেন,—"আমরা ব্যারাকপুরে লাট্‌সাহেবের বাড়ির বাগানে নেমেছি। এই পার্কের (উদ্যানের) পাশেই আমার মামার বাড়ি ;— অগত্যা সেখানেই সকলে চলুন।" বলা বাহুল্য—শ্যামবাবুর মাতুল নীলমণিবাবু তখন বাড়িতে ছিলেন না। কিন্তু, যাঁরা ছিলেন তাঁরা সেই রাত্রে আমাদের তথায় থাক্‌বার জন্য বার বার যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু, 'ডাকাত'রা তা' শোনবার লোক নন ; কাজেই সেখানে ক্ষণিক বিশ্রাম করার পর গাড়ীর চেষ্টা করা গেল। কিন্তু, অত রাত্রে—বিশেষ ঐ দারুণ দুর্য্যোগে—একখানিও গাড়ী পাওয়া গেল না ; অনন্যোপায় হ'য়ে সেই ঘোর অন্ধকারে পদ-ব্রজে খড়দহ-যাত্রা এবং খড়দহে পৌঁছিয়া সেই বাগানের আবিষ্কার। বাগানে যাঁরা আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন, তখন হতাশ হ'য়ে সব শুয়ে পড়েছেন। গিয়ে, সেই রাত্রে তাঁদের তোলা গেল। আবার তখন সেই রাত্রে আহারের যৎসামান্য আয়োজন, ২।৪ খানি করিয়া লুচি-ভক্ষণ ও কোনক্রমে পিত্ত-রক্ষণ, সমগ্র রাত্রি মশা-সন্তাড়ন ও অবিরাম চিৎকার এবং আস্ফালন। প্রত্যুষে উঠিয়াই যে যার সব ট্রেণে ক'রে কলিকাতায় ফিরে আসা গেল। দু'জন মহাকবি অম্লান-বদনে এই সব অসামান্য কষ্ট সহ্য করেছিলেন ; এবং হাস্যামোদ, কবিত্ব ও রসিকতায় অফুরন্ত প্রবাহে সেই দারুণ দুশ্চিন্তা ও ক্লেশকেও আনন্দময় ক'রে রেখেছিলেন। মেলা-মেশার স্ফূর্ত্তিটা দ্বিজুবাবুর চরিত্রে—বিশেষতঃ এই সময়ে—আশ্চর্য্য রকম স্বাভাবিক বলে মনে হ'ত। এমন নির্ম্মল, সরল, উদার বন্ধুগতপ্রাণ লোক এসংসারে দুর্ভাগ্যবশতঃ বড়ই বেশী বিরল ও দুর্লভ। সকলের সঙ্গেই সমভাবে—ঠিক যেন ঘরের লোকের মত মিশ্‌তেন। যে

অবস্থাতেই পড়ুন না, কোনমতেও মিলনের আনন্দটাকে মলিন হ'তে দিতেন না; আর, সেই তাঁর সদানন্দভাবে সকলকেই অনুপ্রাণিত ক'রে তুল্‌তে পার্‌তেন। দুই কবির মধ্যে এ সময় খুব সম্প্রীতি ছিল এবং তাঁদের বন্ধুত্ব-সম্বন্ধটাও খুবই ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌ছিল।"

সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল মধুপুরে একটা বাড়ি কেনেন। বাড়িটা মধুপুর বাজারের সন্নিকটে। তাহার নাম রাখেন 'দ্বিজাশ্রম'। মধ্যে-মধ্যে অবসর পাইলেই দ্বিজেন্দ্রলাল তখন ৫।৭ দিনের জন্যও সেখানে গিয়া, স্বাস্থ্য-সঞ্চয় করিয়া আসিতেন। মধুপুর তখন অতিশয় সুদৃশ্য ও স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। তখন এখানকার মত সেখানে অসংখ্য স্বাস্থ্যকাম লোকের সমাবেশ ঘটে নাই। দৃষ্টি-সীমার সুদূরতম শেষ প্রান্তে, দিগন্ত-বিতত তরঙ্গায়িত প্রান্তরের উদার-ধূসর, উন্মুক্ত বক্ষে, যেদিকে চাহ—অনন্ত নীলাম্বর আসিয়া ঢলিয়া-ঢলিয়া পড়িয়াছে;—সে কি শোভন-উদাস দৃশ্যই ছিল! কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ, প্রাণহীন মহানগরীর কলুষিত ও বদ্ধ বাতাসে হাঁফাইয়া-উঠিয়া, মাঝে-মাঝে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রুদ্ধশ্বাসে এখানে ছুটিয়া-আসিয়া, প্রকৃতির এই প্রশান্ত ও সুরম্য সরোবরে অবগাহন পূর্ব্বক স্নিগ্ধ ও সুস্থ হইয়া, আবার কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইতেন। তৎকালে তাঁহার জীবনখানি কেমন লঘু, নিশ্চিন্ত ও সুখময় ছিল, এই নিম্নোক্ত পত্রখানিতেও তাহার কিছু আভাস আছে। তাঁহার পত্নী ও শ্যালক-শ্যালিকারা তখন মধুপুরে। তিনি তথায় পৌছিয়া এ পত্রখানি কলিকাতায় তাঁহার শ্যালীপতি শ্রীযুক্ত গিরিশ শর্ম্মা মহাশয়কে লিখিতেছেন,—

'দ্বিজাশ্রম, মধুপুর।'

"প্রিয়তম গিরিশদাদা! এইছি আমি মধুপুরে;
আছি আমি ভারি মজায়,—দিবারাত্রিই বেড়াই ঘুরে'।

এখানেতে মেলা লোকে—সার্‌তে এসে নানান্ রোগ,
কর্চ্ছে সদাই 'কিচিমিচি', দিবারাত্রিই গোলোযোগ।
সকাল বেলায় ভারি ঠাণ্ডা, দুপুর বেলায় ভারি গরম;
রাত্রিবেলায় (আপাততঃ এই) বিছানাটা বেজায় নরম!
প্রথমতঃ এসে দেখি, আকাশ ঢাকা কালো মেঘে;
এক্কা আছে কোণে ব'সে,—তোমার উপর বড্ড রেগে'।
তবু তো বাইসিকিল্ বিনা, ঘরের কোণে, রবিবারে,—
ক্ষুণ্ণ মনে বসে আছে,—মুষ্‌ড়ে' গেছে একেবারে।
খুহুবুড়ি ঘুরে বেড়ায় কোন কার্য্য নাহি পেয়ে;
শারীরিক সব সুস্থ আছে অন্য সকল ছেলে-মেয়ে।
এক্কাকে পড়াতে আসেন তোমার বন্ধু শ্যামাদাসে।
(—যাহোক, সেটা শুনে দাদা, হোয়োনাক হতাশ্বাস হে!)

*　　　*　　　*　　　*

তুমি বোধ হয় এসব শুনে মুষ্‌ড়ে যাবার কাছাকাছি;
আমিও তাই মনের দুঃখে কোন ক্রমে টি'কে আছি!

—শ্রীদ্বিজেন্দ্র।"

পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, এ সময়ে তাঁহার হাঁটা-চলা, কথাবার্ত্তা, ধরণ-ধারণ, ভাব-ভঙ্গী, এমন কি—প্রত্যেক আচার-ব্যবহারেই একটা-কিছু বিশেষত্ব, কোন-না কোন নূতনত্ব এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গ, হাস্য-পরিহাস যেন আপনা হইতে স্বভাবতঃই ফুটিয়া বাহির হইত। 'হাসির গান' গাইবার সময়ে প্রত্যেক গানের বিভিন্ন ভাব ও বিবিধ তাৎপর্য্য অনুসারে তাঁহার সেই-সব বিচিত্র বর্ণনাতীত 'ঢং-ধাঁজ', অঙ্গ-ভঙ্গী, আকার-ইঙ্গিতের তো কথাই নাই; তা' ছাড়া প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রার প্রতি ব্যাপারে, প্রত্যেক ব্যবহার বা আচরণেই তাঁহার একটা-না-একটা বৈচিত্র্য বিশেষত্ব ও নূতনত্ব নিত্য-নিয়তই পরিলক্ষিত হইত। তৎকালে তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, —সে জীবনখানি হাস্যামোদ, উৎসাহ ও রঙ্গ-রসের অফুরন্ত আধার,

তাহা যেন প্রীতি ও আহ্লাদের চির-প্রবাহী, স্নিগ্ধ-শুদ্ধ, অম্লান উৎস-ধারা!

পাঠকগণের কৌতূহল-নিবৃত্তির নিমিত্ত, নমুনা স্বরূপ, এ স্থানে তাঁহার তৎকালীন ব্যবহারিক জীবনের আরও দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। কলিকাতায় তাঁহার ক্ষুদ্র বাস-গৃহে স্থান-সঙ্কুলন না হওয়ায়, দ্বিজেন্দ্রলাল 'অসার খলু সংসারে'র সারভূত 'শ্বশুর-মন্দিরে' একদা তদীয় গণ্য-মান্য বিখ্যাত ও অখ্যাত, বহু বন্ধু-বান্ধবকে একটা বিরাট্ ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার যে আহ্বান-লিপি 'জারি' হইয়াছিল তাহা এস্থলে অবিকল মুদ্রিত—* করিয়া দিতেছি।—

"যাঁহার কুবেরের ন্যায় সম্পত্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি, যমের ন্যায় প্রতাপ—এ হেন যে আপনি,—আপনার ভবনের নন্দন-কানন ছাড়িয়া, আপনার পদ্ম-পলাশ-নয়না ভামিনী সমভিব্যাহারে, আপনার স্বর্ণ-শকটে অধিরূঢ় হইয়া, এই দীন, অকিঞ্চিৎকর, অধমদের গৃহে, শনিবার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে আসিয়া যদি শ্রীচরণের পবিত্র ধূলি ঝাড়েন—তবে আমাদের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়! ইতি,

শ্রীসুরবালা দেবী। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার।"

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অনেকেই এ পত্রের নানাবিধ হাস্যকর উত্তর দিয়াছিলেন; কিন্তু, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তন্মধ্যে নিম্নলিখিত, এই দুইখানি উত্তর ব্যতীত আর একখানিও আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এই দুইখানির একখানি প্রসিদ্ধ শিকারী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত কুমুদ চৌধুরী মহাশয়ের, এবং অন্যখানি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ, পুণ্যশ্লোক, সুপ্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক, সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের লিখিত।

(ক)

"ডানাকাটা পরী,
গাঁজাগুলি-আব্‌করী,

* শুধু এ পত্রখানার 'পাঠ' বা সম্বোধনটা পাওয়া যায় নাই।

হোমো-পেত্নী-ধন্বন্তরি,
—ত্রয়ে নমস্করি !
এত কহে পায়ে ধ'রি
—শ্রীকুমুদ চৌধুরী ।"

(খ)

"ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধিবৃহস্পতি, যমঃ প্রতাপ চ নাহিক মে ।
ন চ নন্দন-কানন, স্বর্ণ-সুবাহন, পদ্ম-বিনিন্দিত পদ-যুগ মে ॥
আছে সত্যি পদ-রজ রত্তি,—তা'ও পবিত্র কি, জানিত নে ।
চৌদ্দ পুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি, অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে ॥
কিন্তু,—
মেঘাচ্ছন্নে শনি-অপরাহ্ণে যদি গুরু বাধা না ঘটে মে ।
কিম্বা যদ্যপি সহসা চুপি চুপি প্রেরিত না হই পরধামে ॥
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।"

এই তো গেল নিমন্ত্রণ-ব্যাপারের এক অদ্ভুত রঙ্গ ! তারপর, কর্ম্মান্বেষী বা 'উমেদার', জনৈক আত্মীয়কে সুপারিশ করিতে হইবে ; —তাহাতেও সাধ্য কি যে, স্বীয় কৌতুক-প্রিয় প্রকৃতিকে দ্বিজেন্দ্রলাল সংবরণ করিয়া রাখেন ? সপারিশ-চিঠিখানার রকমটা দেখুন ! এ চিঠিখানা দ্বিজেন্দ্রলাল রবিবাবুর কাছে লিখিতেছেন,—

"শুন্‌ছি নাকি মশায়ের কাছে
অনেক চাকৃরি খালি আছে,—
দশ-বিশ টাকা মাত্র মাইনে ।
দু'একটা কি আমরা পাইনে ?

* *

ইন্দুভূষণ সান্যাল নাম,
আগ্রাকুণ্ডা গ্রাম ধাম,
—চাপড়া গ্রামের অপর পারে ।
একেবারে নদীর ধারে ।

নাই বা থাকুক টাকাকৌড়ি,
—চেহারাটা লম্বা-চৌড়ি।
কুলীন ব্রাহ্মণ,—মোটা পৈতে,
ইংরাজিটাও পারেন কৈতে।

* * * *

"পাব্‌না-কোর্টের প্রধান প্লীডার,
গণ্যমান্য বারের লীডার—
প্রতাপ রায় হন ইহাঁর শ্বশুর,
এতেই মাপ এঁর হাজার কশুর।"—ইত্যাদি।

—অলমতিবিস্তারেণ। পাঠক অবশ্য এতক্ষণে বুঝিয়াছেন,—কেমন সরল-সুন্দর স্বাভাবিক গতিতে তাঁহার সেই শুচি-স্বচ্ছ জীবন-ধারাটি 'তর্‌তর্‌' গদ্‌গদ নাদে, এই সময়ে খর-বেগে বহিয়া চলিয়াছে; এবং তাহারই বক্ষে সুখ-সূর্য্যের সঞ্জীবন রশ্মি-সম্পাতে হাস্য-কৌতুক-রহস্যরাশির তরঙ্গগুলি কেমন ক্ষণে-ক্ষণে, থাকিয়া-থাকিয়া, 'ঝক্‌মক্‌' করিয়া, জ্বলিয়া, কাঁপিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া উঠিতেছে!

আয়োজন-পর্ব্ব।

একটু পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে আব্‌কারী পরিদর্শক হিসাবে এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালকে বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। প্রায়ই পরিভ্রমণ করিতে হইত বটে; কিন্তু, তাঁহার বাস-কেন্দ্র বা সদর ছিল—কলিকাতায়। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র কন্যা তখন কলিকাতা ২৮।১ নং ঝামাপুকুরের বাসায় থাকিতেন; এবং তিনিও এক-একবার কিয়দ্দিনের নিমিত্ত নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া, আবার ঘুরিয়া-ফিরিয়া এইখানেই আসিতেন। এ চাকুরীতে তাঁহার এই অশ্রান্ত অবিরাম পর্য্যটনই যা'-কিছু কষ্ট ও অসুবিধার কারণ ছিল; তা-ছাড়া, ইহাতে তাঁহার অন্য-কোন পরিশ্রম একরূপ ছিলনা বলিলেও চলে। একমাত্র তাঁহার স্বাস্থ্য ও গার্হস্থ্য-সুখের কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ও অনিষ্ট ঘটিলেও,

এইজন্য,—এই চাকুরী পাওয়ার ফলেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সেই চির-বাঞ্ছিত জ্ঞানার্জ্জন বা অধ্যয়ন-স্পৃহা সম্যক্‌রূপে মিটাইয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

এই দেশ-ভ্রমণে একদিকে যেমন তাঁহার অন্তর্দ্দৃষ্টি, পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও কবিত্ব-বুদ্ধি ক্রমশঃ বিকশিত হইতে লাগিল, অপর পক্ষে আবার প্রচুর অবসর থাকায়, এ সময়ে তিনি ইচ্ছানুরূপ স্বদেশের ও বিদেশের বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিদ্যায় অসাধারণ অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ এই সময়টাকে তাঁহার জীবনের আয়োজন-পর্ব্ব বলা চলে। কারণ, এই অবসরে তজ্জীবনে যাহা অর্জ্জিত ও সঞ্চিত হইয়াছিল, প্রধানতঃ তাহার ফলভোগী হইয়া, পরিণামে আজ এদেশবাসী অশেষরূপেই উন্নত, উপকৃত ও ধন্য হইতেছেন।

সারল্যের অবতার দ্বিজেন্দ্রলালের আভ্যন্তরীণ অবস্থার গতি অনুসারেই, আমরা দেখিতে পাই—তাঁহার রচনাবলীও নিয়ন্ত্রিত ও বিভিন্ন রূপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। স্বপ্নময় প্রথম যৌবনে প্রকৃতি ও প্রেম-মুগ্ধ তাঁহার প্রতিভা বিবিধ সঙ্গীতে ও

রচনা।

কবিতায় স্ফূর্ত্তি লাভ করিল; তৎপরে তদীয় জীবনের আনন্দোল্লাসময় এই সুমধুর অবকাশে, উহা বিচিত্র হাস্য-চটুল ব্যঙ্গে, প্রহসনে ও গানে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল; ক্রমে, সেই হাস্য ও ব্যঙ্গই আবার ঘনীভূত ও গাঢ় হইয়া, পরে সহানুভূতি, অনুকম্পা ও বেদনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ফাটিয়া পড়িল, এবং তখনই সে প্রতিভা অতি অপূর্ব্ব ও মোহন, শিল্প-কলাসম্পন্ন কবিতা, সঙ্গীত ও নাটকে সার্থক পরিণতি লাভ করিল।

বিবাহিত জীবনের এই কয় বৎসরকে আমরা বিশেষভাবে তদীয় জীবনের হাস্য ও আনন্দময় যুগ বলিয়া অভিহিত করিতেছি। এ সময়ে তাঁহার সেই 'সদানন্দ' জীবন সুখ-স্বাস্থ্য-সৌভাগ্যের অজস্রতায় সত্যই যেন কাণায়-কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া, ললিত লাবণ্যে ও

অহেতুক হর্ষ-হাস্যে 'ঢলঢল' ও 'ঝলমল' করিয়া, দুলিয়া-দুলিয়া নাচিতেছে! শেষ বয়সে বহুবার দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলিয়াছেন যে, এই সময়টা ছিল তদীয় জীবন-কুঞ্জের—'সুখ-মধুমাস'! আমরাও দেখিতে পাই,—কলিকাতায় আসার পর, যথাক্রমে তাঁহার—

(১) ১৩০২ শালে 'কল্কী অবতার',

(২) ১৩০৪ শালে 'বিরহ',

(৩) ১৩০৫ শালে 'আষাঢ়ে',

(৪) ১৩০৭ শালে 'ত্র্যহস্পর্শ',

এবং (৫) ১৩০৮ শালে 'প্রায়শ্চিত্ত',—এই পাঁচখানি বিচিত্র হাস্যরসের আধার, চটুল ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন বা 'লালিকা' প্রচারিত হয়। এতদ্ভিন্ন, এই সময়ে আবার তাঁহার হাসির গানগুলিও সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি সেগুলিকে 'হাসির গান' নাম দিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

শুভোদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রায় ছয় বৎসর পরে, অর্থাৎ—প্রণয়ের সেই উদ্বেলিত রস-সিন্ধু, উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ প্রশান্ত ও প্রশমিত হইতে যে সময়টুকু লাগিয়াছিল তাহার পর হইতে—তাঁহার অন্তর্জাত আনন্দ অন্য-এক ভিন্ন মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত ও প্রকট হইয়া, এই বিরস-শুষ্ক মৌন-ম্লান বঙ্গ-দেশকে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিল। উল্লিখিত প্রহসন ও 'হাসির গান' ব্যতীত, তাই, এ সময়ে তাঁহার কবি-প্রতিভার সুন্দর-সুরভি প্রসূনগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া, মাতৃভাষাকে অতি মোহন সুগন্ধ ও দিব্য সৌন্দর্য্যে আমোদিত ও গরিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

১৩০৭ শালে 'পাষাণী' ও ১৩০৯ শালে 'সীতা' নামক নাট্যকাব্য-দ্বয় এবং ১৩১০ শালে 'মন্দ্র' কাব্য ও 'তারাবাই' নামক নাটকখানিও প্রকাশিত হইল।

চতুর্থ পর্য্যায়

সুরভি

(১)

পত্নী-বিয়োগ ও চরিত্র-বল।
দেবী সুরবালার পরিচয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রণীত নাট্যাবলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার 'তারাবাই' প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হইয়াছিল। যতদূর স্মরণ হয়—তৎকালে বীডন ষ্ট্রীটে ছাতুবাবুদের বাড়ির ঠিক অপর পারে 'বেঙ্গল থিয়েটার' ছিল। এই বেঙ্গল থিয়েটারের ষ্টেজে তখন 'য়্যুনিক থিয়েটার' নামে একটা নূতন কোম্পানী অভিনয় করিতে আরম্ভ করে। 'তারাবাই' নাট্য-কাব্যখানা প্রথমে 'য়্যুনিক' রঙ্গালয়েই অভিনীত হয়; এবং সেই-প্রথম দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-রচনার প্রতিভা জন-সাধারণের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করিয়া, সাহিত্য-সমাজে তাঁহাকে দক্ষ নাট্যকাররূপে পরিচিত করাইয়া দেয়। কিন্তু, কি দুর্দ্দৈব! এই অভীপ্সিত যশোলাভে যে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল মনে-মনে পরম উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে, তদীয় সাংসারিক সুখ-সৌভাগ্যের একমাত্র স্নিগ্ধোজ্জ্বল, দীপ্যমান দীপ-শিখা নিষ্ঠুর নিয়তির একটিমাত্র ফুৎকারে নিমেষমধ্যে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলি,—নিয়তির সে কুটিল-কঠোর প্রাণে তাঁহার 'এত সুখ সহিল না!' সেই মূহূর্ত্ত হইতেই হতভাগ্য দ্বিজেন্দ্রলালের অমন আনন্দময় জীবনখানি অকস্মাৎ নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া

পত্নী-বিয়োগ।

পড়িল। বিগত ষোড়শ বর্ষ যাবৎ তাঁহার দাম্পত্য-জীবন বড় সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল! আহা, কি মধুর সে বর্ষ ক'টি!—

"যেন একটা লাগাও ছুটি,
যেন একটা অবিশ্রান্ত গীতি;
যেন একটা মলয় হাওয়া,
যেন শুদ্ধ ভেসে যাওয়া,
যেন একটা স্বপ্ন-রাজ্যে স্থিতি!
এ জীবনে সে সুখ পরম,
—সর্ব্ববিধ সুখের চরম,
সে সুখে নাই কলঙ্ক কি ত্রুটি,
স্বর্গ মর্ত্ত্যে আসে নেমে
মর্ত্ত্য স্বর্গে ওঠে প্রেমে।"—

প্রেমের সেই সে অতুল বর্ষ ক'টি! ষোড়শ বর্ষব্যাপী দাম্পত্য-জীবনের এই আনন্দময় অবসরেই তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল, স্বপ্নমোহময় যাবতীয় সঙ্গীত, প্রহসন, কবিতা নাট্য-কাব্যাদি প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। যৌবনের আশা, উত্তম ও স্বাস্থ্যে উচ্ছ্বসিত, অনাবিল লাবণ্যময়, স্ফূর্ত্তি-প্রীতিরূপী দুইখানি অকলঙ্ক প্রাণ এই প্রীতিময়ী প্রকৃতির পিক-'কল'-কূজিত, নিত্য-নব, অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের অভিরাম নন্দন-নিকেতনে কতই-না দিব্য আনন্দে বিভোর হইয়া, অবিরাম বিহার করিয়া বেড়াইত! কিন্তু, হায়! —নির্ম্মম নিয়তির কুলিশ-কঠোর বিধানে এই অভিন্ন-হৃদয় দম্পতির অদৃষ্টে 'এত সুখ সহিল না!' অতর্কিত আঘাতে দ্বিজেন্দ্রলালের সকল সুখ-স্বপ্নের অবসান হইয়া গেল! কে তখন ভুলেও একবার ভাবিয়াছিল যে, এমনই আচম্বিতে, সহসা নির্ম্মম নিয়তি—

'পিছন থেকে লৌহ-হস্তে একটির এসে ধ'র্ব্বে টুঁটি!
নিষ্ঠুর, কঠোর, কঠিন ভাবে টুঁটি ধরে' নিয়ে যাবে;
—চিরকালের জন্য হঠাৎ ভিন্ন হ'বে হৃদয় দু'টি!'

কিন্তু, এ দুনিয়ায় অদৃষ্টের এমনই অবোধ্য ও বিচিত্র গতি যে, অনেক সময়ে যে-সকল দুর্ঘটনার কথা ভুলেও একবার মনে পড়ে না অথবা যে-সব আশঙ্কা স্বপ্নেও কখন কল্পনা করা যায় না, হয়ত তাহাই সর্ব্বাগ্রে সংঘটিত হইয়া, এই অসহায় ও দুর্ব্বল মানুষের হৃদয় ও মেরুদণ্ডকে অকস্মাৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া শতধা ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়।

১২৯৪ সাল হইতে পূর্ণ ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিতে-না-করিতে, অর্থাৎ—১৩১০ সনে, দুর্ভাগ্য দ্বিজেন্দ্রলালের সুখ-স্বপ্নময় জীবন-নাট্য সহসা সেই ভীষণ ও দুর্ভেদ্য যবনিকার অন্তরালে—অকালে পরিসমাপ্ত হইয়া গেল;—জীবনের সেই 'সুখ-মধুমাস' অকস্মাৎ ফুরাইল,—হঠাৎ অদৃষ্টাকাশ হইতে বিনা মেঘে তাঁহার প্রশস্ত ললাটে প্রচণ্ড বেগে বজ্র-পাত হইল! প্রাণাধিকা পত্নীকে পূর্ণ-গর্ভা অবস্থায় একাকী কলিকাতার বাসায় রাখিয়া, তিনি কর্ত্তব্যের খাতিরে বাধ্য হইয়া, অল্পকালের জন্য মফস্বলে গিয়াছিলেন; ফিরিয়া-আসিয়া দেখিলেন—তাহারই মধ্যে সকলই ফুরাইয়াছে; তাঁহার বড়-সাধের স্বপ্ন নিমেষের ভর সহিতে না পারিয়া সহসা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! বুঝিলেন যে, তাঁহার হৃদয় শূন্য করিয়া, গৃহ শূন্য করিয়া, বিশ্ব শূন্য, মহাশূন্য,—শ্মশানে পরিণত করিয়া, তাঁহার সেই একমাত্র অন্তরতম 'আপন' এই শ্বাপদ-সঙ্কুল সংসার-অরণ্যের একমাত্র অবলম্বন ও আশ্রয়, তাঁহার শিষ্যা, দাসী, মন্ত্রী, সখী, গৃহিণী, অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী,—একাধারে, এককথায় তাঁহার সেই সর্ব্বস্ব,—অকস্মাৎ তাঁহাকে একটিবারের তরেও না বলিয়া, না জানাইয়া, তাঁহার জীবনভরা সেই-সব সুখ, সাধ, শত আশা ও সঙ্কল্প মুহূর্ত্ত মধ্যে ভস্মীভূত, ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া, কে জানে—সে কোন্ অজ্ঞাত আহ্বানে, কিসের অনিবার্য্য আকর্ষণে, একেবারেই একাকী অনন্ত পথের যাত্রী হইয়াছেন! বিদেশে তিনি যখন পরিদর্শন-কর্ম্মে ব্যাপৃত

তখন হঠাৎ তাঁহার কাছে 'তার'-যোগে এক সংবাদ আসিল,—তাঁহার স্ত্রী মুমূর্ষু! অবিলম্বেই দ্বিজেন্দ্রলাল তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় যাত্রা করিলেন; কিন্তু, হায়, গৃহে পহুঁছিয়া শুনিলেন,—ততক্ষণে সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে! শুদ্ধ মাত্র পাঁচ ছয় মিনিটের শোণিত-স্রাবে সেই নন্দন-কাননের মায়াময়, দিব্য পারিজাত পলক মধ্যে পরিম্লান হইয়া, কোথায় যেন বিলীন হইয়া গিয়াছে! দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বশুর, বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত প্রতাপ মজুমদার মহাশয় তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু, এতই অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া তাঁহার বুকের ধনকে নিমেষ মধ্যে ছিনাইয়া, কাড়িয়া নিয়া গেল যে, তিনি সেই সামান্য সময়ের ভিতরে সাধ মিটাইয়া সুচিকিৎসার তেমন ব্যবস্থা করিবারও সুযোগ পাইলেন না।

এই মর্ম্মভেদী ভয়ঙ্কর আঘাতে ক্ষণতরে, কেবলমাত্র একটিবারের জন্য, দ্বিজেন্দ্রলাল বিভ্রান্ত, বিহ্বল হইলেন বটে; কিন্তু, তখনই,—যেই তাঁহার পুত্র-কন্যা দু'টি তাঁহার কাছে আসিয়া, বাষ্পাকুল কণ্ঠে 'বাবা বাবা' বলিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল অমনই দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাদের দু'টিকে ব্যাকুল আগ্রহে দুই হাত দিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া-লইয়া, "কেন বাবা, কেন মাণিক? এই যে আমি, এই যে আমি, ধন!"—এই বলিয়া তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ অজস্র, আকুল চুম্বনে বারংবার প্লাবিত করিয়া দিলেন; এবং তখন হইতে সেই-যে তিনি কঠিন হস্তে নয়ন মুছিয়া ফেলিলেন,—এজন্য আর কখনও বুঝি তাঁহাকে সাধারণতঃ কেহ তেমন ভাবে অশ্রু-মোচন করিতে দেখে নাই। কিন্তু, যদিও আর তিনি কাঁদিলেন না, (কারণ, সেই অবোধ শিশু দুটির সাক্ষাতে তাঁহার পক্ষে কাঁদাও তখন সাধ্যাতীত ছিল, অথবা সে মর্ম্ম-দাহী প্রচণ্ড শোকাগ্নির উত্তাপে অশ্রুও বুঝি বাষ্পাকারে বিলীন হইয়া যাইত!) তবু, এই দুরন্ত আঘাতের ফলে তদীয় জীবনের আমূল আদ্যন্ত চিরদিনের তরেই পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তি

পরিগ্রহ করিল,—তাঁহার জন্মজাত, স্বাভাবিক ধাতু বা প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপেই রূপান্তরিত হইয়া পড়িল!

সেই ষোল বছর আগে যে দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন গাহিয়াছিলেন,—

"আজ যেন রে প্রাণের মত কাহারে বেসেছি ভাল!
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ তরুণ আলো"।

—সেই দ্বিজেন্দ্রলালই আজ অন্তরের অসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—

"যতখানি দেখা যায়—ধূ ধূ করে শুধু
অসীম বারিনিধি।
অহো—কি মনুষ্য-জন্মই তোমার এ বিশ্বে তৈয়ের
করেছিলে বিধি!"

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্লোকে এই একটি মাত্র ঘটনায় আজ যে প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাতের সূত্রপাত হইল তাহাতে তদীয় নিশ্চিন্ত জীবনের সুখ-স্বস্তি আশা-আশ্বাস ও আস্থা পলকপাতে যেন যথার্থ ঠিক স্বপ্নেরই মত ঘুচিয়া, মুছিয়া, মিলাইয়া গেল! নিরবচ্ছিন্ন সুখের উৎস, আনন্দের আধার সেই দাম্পত্য-জীবনে যদিও তাঁহাকে ইতিপূর্ব্বে আরও তিন বার অতি-শিশু সন্তান-বিয়োগে যৎসামান্য শোক ভোগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু তৎকালে, পত্নী বর্ত্তমানে, সে সকল ক্ষুদ্র-তুচ্ছ শোক-দুঃখ সম-প্রাণ ধর্ম্ম-সঙ্গিনীর সঙ্গে একত্র ভাগাভাগি করিয়া ভোগ করা,—সেও যেন পরোক্ষে তাঁহাদের প্রীতি ও সুখেরই এক অন্যতম কারণ ছিল! দৈব বিড়ম্বনায় স্নেহময় জনক-জননীর অভয় অঙ্ক হইতে অকস্মাৎ চ্যুত হইয়া, অদৃষ্ট-দোষে স্বজন-সোদর ও সমাজের আশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন, বিতাড়িত হইয়া, এই স্বার্থান্ধ সংসার-স্রোতে যে অমূল্য পদার্থকে তদীয় নিষ্পাপ-লঘু, অসহায় জীবনের অনন্য অবলম্বন বোধে, বক্ষের অন্তরালে,

বাহুপাশে পরম আগ্রহে তিনি আঁকড়িয়া রাখিয়াছিলেন, আজ যখন বিধাতা তাহা হইতেও তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেন তখন তাঁহার নিষ্পেষিত প্রাণে সে-যে কি প্রচণ্ড ও দুরন্ত দাব-দাহ আরম্ভ হইল তাহা এক্ষণে কাহারও পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। এই সময়ে তাঁহার মানসিক অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় বা আভাস পাইতে হইলে আমাদিগকে তাঁহারই রচনাবলীর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে হইবে। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার প্রত্যক্ষ প্রতিমূর্ত্তি দ্বিজেন্দ্রলাল বাহ্যিক ব্যবহারে আশ্চর্য্যরূপে আত্ম-দমনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু, কবিতায় ও অন্যবিধ রচনায় তিনি অন্তরের সে উদ্দাম শোক-বেগ প্রাণপণে সংযত ও নিরুদ্ধ করিতে গিয়াও, থাকিয়া থাকিয়া, যেন 'ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া' কাঁদিয়া উঠিয়াছেন!—আহা, সে কি মর্ম্মভেদী শোকোচ্ছ্বাস!—

"জান্তাম নাক, চিন্তাম নাক তোমায় আমি প্রিয়তমে,
ষোল বছর আগে;
আমার জীবন তোমার জীবন পৃথক্-গতি, এ সংসারের
ছিল পৃথক্ ভাগে!

*　　*　　*　　*

ছিলাম তো সে একা;
এক রকম তো যাচ্ছিল সে জীবন নিরুৎসবে কেটে;
—কেন হ'ল দেখা!
নিশায় প্রসারিত উর্দ্ধে অসীম সুনীল নভস্তলের
মানচিত্রে, একা,
পড়্তেছিলাম গ্রহ-তারা-নীহারিকা-ধূমকেতুর
লীলাময়ী লেখা।
হঠাৎ তুমি পূর্ব্বাঙ্গনে উদয় হ'লে শরচ্চন্দ্র
শান্তি গরিমায়,

ছেয়ে গেল আকাশ-ভুবন—মগ্ন, মুগ্ধ, পরিপূর্ণ
সে শুভ্র জ্যোৎস্নায়।
এসেছিলে সেদিন তুমি, যেমন শ্রান্ত নিদ্রাবেশে
সুখ-স্বপ্ন আসে,
এসেছিলে আসে যেমন কান্তারে চামেলী-গন্ধ
বসন্ত বাতাসে,
শুষ্ক, তপ্ত নদী-তটে উচ্ছ্বসিত কল্লোলিত
ঢেউ'এর মত এসে
স্মৃতি হ'তে হারা একটি অজানা রাগিণীর মত
কোথায় গেলে ভেসে'!

*   *   *   *

এই তো ছিল দেবী-মূর্ত্তি; আলাপ, বিলাপ, হাস্য রোদন
কর্চ্ছিল তো কাছে।
কোথায় গেল? ফিরিয়ে দাও হে বিশ্ব-পতি! দাবী কচ্ছি—
বল কোথায় আছে?
এই সে ছিল, গেল কোথায়? দেখা হ'বে আবার, কিম্বা
এ চির-বিচ্ছেদ?
আমি পার্লাম নাক; তবে তুমি করে' দাও হে প্রভু,
এ রহস্য-ভেদ!
—হারে মূর্খ! কাহার কাছে, কিসের জন্য দাবী করিস্?
জানিস্ নাকি ভবে
যা হ'বার তা' হ'বেই হ'বে; মাথা খুঁড়ে মরিস্ যদি,
যা' হবার তাই হ'বে?
কাহার কাছে বিচার চাস্ রে? বিচার-কর্ত্তা বহুৎ দূরে,
আর্জ্জি বড়ই ক্ষুদ্র।
তোর আর বিচার-কর্ত্তার মধ্যে পড়ে' আছে উত্তাল ঐ
প্রকাণ্ড সমুদ্র!

*   *   *   *

উঠে মাত্র আর্ত্তধ্বনি মিশে যেতে সমীরণে
ক্ষুব্ধ মূর্চ্ছনায় ;—
আমি কাঁদি, আমি কাঁদি, এ মহা ব্রহ্মাণ্ডে তাহে
কাহার আসে যায় !”

(২)

“শ্রান্ত দেহে সন্ধ্যাকালে ফিরে এসে যখন
আপন ঘরে যাব,
কাহার কাছে বস্‌ব এসে তখন আমি ? কাহার
মুখের পানে চা'ব ?
ক্ষুদ্র দুঃখ-সুখের কথা কইব এখন আমি
কাহার কাছে এসে ?—
যাহার কাছে কইতাম নিত্য, গৃহ আঁধার ক'রে
চ'লে গিয়েছে সে !
অপমানে খিন্ন প্রাণে পড়্‌তাম যখন এসে
তাহার কাছে লুটে
শান্তি-সুধারাশি দিয়ে ধুয়ে দিত ক্ষত
কোমল করপুটে !

* * * *

বাণ-বিদ্ধ পাখীর মত বহির্জ্জগৎ হ'তে
আস্‌তাম যখন নীড়ে
তখন নিত প্রাণের মধ্যে আমারে সে গভীর
স্নেহ দিয়ে ঘিরে'।
ভাব্‌তাম তখন—বহির্জ্জগৎ আঁধার বটে আমার,
শূন্য বটে মানি ;
তবু একটি স্নিগ্ধ জ্যোতি, বিমল হাস্যে পূর্ণ
আমার গৃহখানি।

* * * *

—লুটে-পুটে' নিল !
এমন সময় এসে কে গো আমার কুঁড়ে ঘরে
আগুন ধরিয়ে দিল !
অমনি আমার কুঁড়ের সঙ্গে সোনার স্বপ্ন আমার
হ'য়ে গেল ছাই ;
গেছে, গেছে, সবই গেছে,—উড়ে পুড়ে গেছে,—
চিহ্ন মাত্র নাই !"

সবই তো গেল ; কিন্তু, তবু—তবু এ স্মৃতি তো কিছুতেই দগ্ধ মর্ম্মস্থল হইতে মুছিয়া যাইবার নহে। তাহার উপরে ঐ যে অসহায়, মাতৃহারা পুত্র-কন্যা দু'টি 'ফ্যাল্-ফ্যাল্' করিয়া, তাঁহার শুষ্ক-পাণ্ডুর বদনমণ্ডলের প্রতি আর্ত্ত-অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে,—হা নিষ্ঠুর বিধাতা, এমন কি ভাষা আছে যাহাতে উহাদের পেলব-সুন্দর প্রাণদু'টিকে আজ সান্ত্বনা দিয়া আশ্বস্ত করা যায় ? দুধের বাছারা আজ ঐ যে কেবল এঘর-ওঘর করিয়া, তাহাদের লুকানো মা'কে খুঁজিয়া মরিতেছে,—ওগো, ও ঠাকুর, উহাদেরও এমন সর্ব্বনাশ না করিলে কি তোমার এ বিপুল সৃষ্টি রক্ষা পাইত না ?

এখন তারা তা'দের মায়ে কোথাও পায় না খুঁজে
—দুটি মাতৃহারা !—
চাহে আমার মুখের পানে ! অমনি বেগে আমার
চক্ষে বহে ধারা !
যখন তারা বিবাদ করে, নালিশ করে এখন
আমার কাছে এসে,
দোষী এবং নির্দ্দোষীকে ধরি সমভাবে
জড়িয়ে বক্ষোদেশে।

*   *   *   *

কেহ যেমন বিষম যদি আঘাত লাগে শিরে,
প্রশ্ন কর তা'কে—

কোথায় লেগেছে ? সে তা' বল্‌তে পারে নাক,
স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে।
এরাও বুঝ্‌তে পারে নাক, কোথায় ব্যথা তাদের,
সরল ক্ষুদ্র-মতি !
জিজ্ঞাসাও করে নাক কি হ'য়েছে তাদের,—
সে কি মহাক্ষতি।
দেখ্‌লে বিষাদ মুখে আমার, চক্ষে আমার বারি,
—জড়িয়ে আমাকে,
গাঢ় সহবেদনায়, সপ্রশ্ন নয়নে
শুদ্ধ চেয়ে থাকে।

কি মর্ম্মান্তিক শোচনীয় চিত্র !

আবার আর-একদিন সেই তাঁহার লোকান্তরিতা সাধ্বীর বড় স্নেহের, পরম আদরের 'নয়ন-মণি', 'অঞ্চলের নিধি', একমাত্র পুত্র-রত্নটি ('মন্টু') অনাদরে, একা, নিঃসহায়ভাবে ভূমিতলে শুইয়া, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ;—এ দৃশ্য দেখিয়া, দ্বিজেন্দ্রলালের বুকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া, কান্নার বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবেগ-বিহ্বল, অসংযত কণ্ঠে, তাই, তিনি আকুল হইয়া কাঁদিলেন,—

"কে দিল তোর মাথায় বালিশ ? কে দিল তোর চাদর গায়ে ?
কে পাড়াল ঘুম ?
ওরে আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো ! ওরে আমার বৃন্ত-চ্যুত,
ভূ-লুণ্ঠিত মন্দার কুসুম !
শুন্‌ত হুকুম, কর্‌ত পেয়ার
যে জন, এখন নাই রে সে আর ;—
মায়া কাটিয়ে চলে' সে তো গেছে এখান থেকে
তোকে যাদু আমার কাছে রেখে' !
যতদিন সে ছিল হেথায়, তোর জন্যই সে ছিল আকুল,
তুই ব'লে সারা ;

এখন একবার চোখের দেখা চেয়েও দেখে না সে তোরে
—ওরে মাতৃহারা।

*　　*　　*　　*

সে যদি তোর থাকৃত, খানিক আবদার করৃতিস্ শোবার আগে,
দাবী করৃতিস্ চুমা,
টেনে' নিত বুকের মাঝে, গাইত সে সুমৃদু স্বরে
—'ঘুমা যাদু ঘুমা'!
নাই সে যদি, নিজেই নিয়ে
চাদরখানি গায়ে দিয়ে,
বালিশ দিয়ে মাথায় ;—
ঘুমটি অমনি ছেয়ে এল আঁখির দু'টি পাতায়!
পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই, ঘুমিয়ে গেলি, নেতিয়ে গেলি
ছেঁড়া একটা মাদুরে,
ওরে আমার যাদুরে!

*　　*　　*　　*

—হায় যাদু, সকল দুঃখের বাড়া দুঃখ এই
নিজের দুঃখ বুঝ্তেও না পারা ;
সেই দুঃখে দুঃখী তুই—ওরে মাতৃহারা!
তাইরে, তোরে দেখে' এমন ভূমিতলে একা, অসহায়,
ওরে আমার হৃদয় ফেটে যায় ;
ওরে আমার চক্ষে বহে ধারা।
ওরে মাতৃহারা।"

ইহা একেবারে শোকের চরম সীমা! দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় ইহারই নাম—'স্ফটিকে গঠিত দীর্ঘশ্বাস' বা 'প্রস্তরীভূত প্রেমাশ্রু'! অনুভূতির (বা feeling'এর) উদ্রেক যদি কবিত্বের চরম সার্থকতা হয় তবে অকপটেই স্বীকার করিব যে, উদ্ধৃত, অনতিরঞ্জিত, সরল ও স্বাভাবিক শোকোচ্ছ্বাসে দ্বিজেন্দ্রলাল কবিত্বের অত্যুচ্চ অচল-শিখরে

আরোহণ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল রচনাতেও তদীয় স্বাভাবিক সত্য-নিষ্ঠা, সংযম ও সারল্য অতি আশ্চর্য্যরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে ; এবং এরূপ ভাবপ্রবণ হৃদয়োচ্ছ্বাসেও তিনি একটিবারের তরে কোনরূপ অতিরঞ্জন বা অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। বলা বাহুল্য—এবংবিধ সত্যনিষ্ঠা ও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকতার গুণেই এই কবিতাগুলি রস-গ্রাহী পাঠকবর্গের এতটা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। পত্নী-হারা, এক-নিষ্ঠ প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের মানসিক অবস্থা তৎকালে যে কতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল তাহাই বুঝাইবার জন্য আমরা উপরে এতগুলি কবিতা-পঙ্‌ক্তি এস্থলে মুদ্রিত করিয়া-দিতে বাধ্য হইলাম। এই একটিমাত্র আঘাতে দৃঢ়-চেতা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন যেন যথার্থই 'মুষ্‌ড়িয়া' একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি 'মাতৃহারা'দের লক্ষ্য করিয়া সেই-যে বলিয়াছেন,—

"টানে ছুরি রেখা যদি জলের উপর, মিলায় সেটা,
মিলায় না যা' পাষাণ কেটে' লেখে ;
আসে যদি প্রবল বাত্যা, নুইয়ে যায় সে ক্ষুদ্র তরু,
উচ্চ বৃক্ষে যায় সে ভেঙ্গে রেখে!"

—ইহার একটি বর্ণও নিরর্থক বা অত্যুক্তি নহে। তাঁহার সে সময়ের মানসিক অবস্থা ও পরবর্ত্তী জীবনের একনিষ্ঠ আচরণ মনে পড়িলে ঐ কথাগুলির নিঃসন্দেহ যাথার্থ্য আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করিতে বাধ্য হই।

সৌভাগ্যবশতঃ, এই সময় হইতে কবির সহিত আমার আন্তরিক ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। এই দারুণ দুর্ঘটনার কয়েক মাস পরে আমার গৃহে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমি একটা 'পার্টিতে' নিমন্ত্রণ করি ; এবং তাঁহাকে—যেমন করিয়া হোক্—সে সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে আসিতে হইবে বলিয়া, অত্যন্ত জেদ্ করিয়া এক পত্রও লিখি। কিন্তু, আমার অত আগ্রহ সত্বেও, দ্বিজেন্দ্রলাল আমার অনুরোধ

রক্ষা করিলেন না। এই উপলক্ষে অভিমান করিয়া প্রায় দশ-বারো দিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না যাওয়ায়, দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে যে পত্রখানি লেখেন তাহা, নিতান্ত ব্যক্তিগত হইলেও, এস্থলে আমি অংশতঃ মুদ্রিত করিয়া-দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।—

"আমি সেদিন আপনার আমন্ত্রণে যাইনি বলে' আপনি বেশ চটেছেন দেখা যাচ্ছে। তা' চটুন, চট্‌বেনই তো,—তা আর চট্‌বেন না? আমি আপনার আলোকোজ্জ্বল * * ভবনে অত সব আমোদ-প্রমোদ, রঙ্গ-রসে যোগ দিলাম না, একি আমার কম আস্পর্দ্ধা, কম অপরাধ? * * এতই বিরক্ত হয়েছেন যে, যেখানে রোজ অন্ততঃ একবার দেখা হ'ত, (কোন কোনদিন দুবেলাও,) ২।৩ ঘণ্টা করে' একত্র কাটানো যেত, সেখানে আজ এই প্রায় পক্ষকাল চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। উত্তম! ধন্যবাদ! সহস্র ধন্যবাদ! এমন না হ'লে বন্ধুত্ব? * * কিন্তু একটিবারের জন্যও ভেবে দেখেছেন কি,—আমার কি ভীষণ অবস্থা? আজ আমার মত ভাগ্য-বিড়ম্বিত, নিঃসহায় দুঃখী এ দুনিয়ায় কে? সকলেরই এ সংসারে একটা কোন আশ্রয় বা সান্ত্বনা থাকে। আর আমার? আমার যে কেউ নেই, কিছু নেই! চারিদিকে শ্মশান, আর তারপর 'ধু ধু' মরুভূমি! এত সুখী আমি; আমার এখনও আমোদ না কর্‌লে চলে? * * উঃ! কি ভয়ানক স্বার্থপর, নির্ম্মম, নির্ব্বোধ এই সংসারের লোক সব! * * তার উপরে আবার এই ছেলেমেয়ে,— এদের একটা কিছু উপায় বলে দিতে পারেন? কাঁহাতক এ দুটোকে বেড়ালছানার মত মুখে করে' করে' ঘুরে বেড়াই বলুন তো? * * * আর না, থাক্—এইপর্য্যন্তই যথেষ্ট। এত কথা আমি কি করে' যে আজ বল্‌লাম, তাই আমি অবাক্ হচ্ছি। এমন তো কোন কথা ছিল না! কিন্তু তোমার † কাছে—তোমাকেও কি প্রাণের এ জ্বালা জানাতে পারব না? যদি সত্যি দোষ হ'য়ে থাকে, ক্ষমা কর ভাই! এস, শীঘ্র এস। * * *"

—আর না, এই বেদনাপ্লুত পত্রেরও তবে এইখানেই শেষ হোক্।

সেবারে আমার গৃহে 'পার্টি'র 'আমোদ-প্রমোদে' যোগ দিতে

† এই প্রথম আমাকে 'তুমি' বলিতে 'সুরু' করিলেন।—গ্রন্থকার।

পারিলেন তো না-ই ; পরন্তু, এই দুর্ঘটনার পর হইতে তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, আর বোধ হয়—তেমন হাসি কোনদিনও তিনি হাসিতে পারেন নাই। সে অনাবিল, উচ্ছ্বসিত হাস্য, সেই প্রাণ-খোলা, মন মাতানো স্বভাব-সিদ্ধ, সরল হাস্য,—তেমনটি আর তাঁহার মুখে একটিবারের তরেও দেখিতে পাই নাই। আমাদের এ কথা কেবল 'কথার কথা' নহে।—এই একটিমাত্র ব্যাপারে তদীয় আজন্ম স্বভাবের, তাঁহার আমূল, আদ্যন্ত জীবনের যে কতটা 'ওলোট্-পালোট্' বা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার রচনাবলীর মধ্যেও অতি প্রত্যক্ষরূপে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। স্ত্রী-বিয়োগের পূর্ব্বে লিখিত তাঁহার অধিকাংশ গান, হাসির গান, প্রহসন ও কবিতাদির মধ্যে শুচি-শুভ্র, প্রগাঢ় ও সুধাময় প্রীতি এবং অনাবিল, অনুপম ও একান্ত আন্তরিকতাপূর্ণ হাস্য-রসের যে-সব পরিচয় পাইয়াছি, পরবর্ত্তী কালে আমরা আর তাহার আংশিক সৌন্দর্য্যেরও আভাস কোথাও দেখিতে পাই না! পত্নী-বিরহিত দ্বিজেন্দ্রলাল অতঃপর আর যতবারই হাসিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে হাসি যেন করুণায় ভরা, অনুকম্পা ও সহবেদনায় গড়া, ঘনীভূত বেদনা বা অশ্রুর রূপান্তর মাত্র!

ভ্রাতৃজায়ার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত কাল পরে একদিন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখেন,—

"দ্বিজেন্দ্র তখন তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের বাটীতে এক পালঙ্কে বসিয়া আছেন, —যেন বড়ই অন্যমনা ; বহুক্ষণ পরে পরে এক একটি কথা বলিতেছেন মাত্র। খুব লক্ষ্য করিলে বোধ হয় যেন—চক্ষু মধ্যে মধ্যে আর্দ্র হইয়া আসিতেছে। বহুক্ষণ নানা জনের নানা কথার পর সহসা দ্বিজেন্দ্র বলিলেন—"মনুষ্যের হৃদয় স্ত্রীলোকের মত, যুক্তি মানে না"। ইহা ছাড়া তিনি আর শোকের কোন কথাই বলিলেন না।"

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রীতিভাজন, কবি শ্রীযুক্ত রসময় লাহা এই সময়ে একদিন তাঁহার বাসায় গিয়া দেখিলেন—দ্বিজেন্দ্রলাল তখন আফিসে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এবং তাঁহার 'মুখ ক্রন্দনে স্ফীত ও আরক্তিম হইলে যেরূপ হয় তদ্রূপ'। দ্বিজেন্দ্রলাল রসময়বাবুকে একটি কথাও বলিলেন না। রসময়বাবু তাঁহার সহিত গাড়িতে উঠিয়া প্রায় মাইলখানেক পথ একত্র গেলেন; অথচ, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোনরূপ বাক্যালাপ হইল না।

বাস্তবিক পত্নী-বিয়োগের পর দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে—আলাপ-আলোচনা তো দূরের কথা—কোনরূপ প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত শুনিতে ও সহিতে পারিতেন না। এই দুর্ঘটনার তিন-চার মাস পর পর্য্যন্ত আমি দেখিয়াছি—তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ও অনুরক্ত বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিয়া, নিত্য তাঁহার শোক-সন্তপ্ত চিত্তে সান্ত্বনা দানের জন্য বিবিধ উপায়ে ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেন; কিন্তু, পত্নী-গতপ্রাণ, অতুল প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাদের সেই-সব নিস্ফল চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্ত, অনেক সময়ে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অশোভন বাক্যালাপ করিতে থাকিতেন; আবার কখনও বা সঙ্গীত-সুধায় অভিনন্দিত করিয়া সকলকে বিদায় দিয়া, যেন যথার্থই 'হাঁফ্' ছাড়িয়া বাঁচিতেন। তাঁহার এইরূপ বিচিত্র ব্যবহার দেখিয়া, একদিন দ্বিপ্রহরকালে তাঁহাকে একা পাইয়া আমি বলিলাম,—"আপনি অমনভাবে কি করে' যে এখনও এত গান ও বাজে আলাপ করেন, সত্যই তা' আমি বুঝ্‌তে পারি না।" এই কথা আমার মুখ হইতে বাহির হওয়ামাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল ঠিক যেন সর্প-দষ্ট ব্যক্তির মত সহসা শিহরিয়া-উঠিয়া, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, বাষ্পাস্পষ্ট স্বরে আমাকে বলিলেন—"দেখ, সব সয়; কিন্তু, সেই তাঁর প্রসঙ্গ অথবা এই-সব Conventional (সামাজিক রীতি-সম্মত) কায়দা-দুরস্ত, Lip-deep sympathy

(মৌখিক সান্ত্বনা বা সহানুভূতি) আমার একেবারে বরদাস্ত হয় না। সে যে আমার কি ছিল, তোমরা কি বুঝ্‌বে!" এই বলিয়া, বন্ধু-আমার তাঁহার অপোগণ্ড পুত্র-কন্যা দু'টির দু'হাত ধরিয়া, হঠাৎ পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া, দ্বার অর্গল-রুদ্ধ করিয়া দিলেন। আমি তখন অপ্রস্তুতভাবে, একাকী, অনুতপ্ত চিত্তে কিছুক্ষণ সেই শূন্য কক্ষতলে অপেক্ষা করিয়া, এই মহাপ্রাণের তন্ময় প্রণয়ের অপরিমেয় গভীরতার বিষয় মনে-মনে চিন্তা করিতে-করিতে, গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

যাহা হৌক, সর্ব্বদুঃখহরা কালের অব্যর্থ প্রলেপের প্রভাবে, ক্রমে-ক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের শোক-দগ্ধ, অবসন্ন প্রাণ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, তিনি সেই স্নেহের একমাত্র সম্বল পুত্র-কন্যা দু'টিকে আপনার দু'দিকে দাঁড় করাইয়া, কিছু দিন ধরিয়া, কেবল এই গানটি গাহিতে লাগিলেন—

"আমরা এক ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি ;—
জীবন জল-বিম্ব সম মরণ-হ্রদ-হৃদি !'
* * * *
দুঃখ মিছে, কান্না মিছে ; দু'দিন আগে, দু'দিন পিছে।
একই সেই পাথারে গিয়ে মিলিছে সব নদী। * * "

ধীরে-ধীরে, এমনই করিয়া, তাঁহার অন্তরে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ সুধা-ধারা বিধাতারই করুণায় বর্ষিত হইতে লাগিল ; এবং বহুদিন পরে আবার তিনি ভাঙ্গা বুকে ও শুষ্ক মুখে, ক্রন্দনের সুরে হাসিতে 'সুরু' করিলেন। মেঘ ক্রমে কাটিয়া গেল বটে ; কিন্তু, চাঁদ আর উঠিল না। —কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর চাঁদখানি সেই অবসরে কখন্ যে চিরতরেই অস্ত গিয়াছে!

থাক্,—আর এ প্রসঙ্গে বিস্তৃতির প্রয়োজন নাই।

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর প্রদত্ত একটি সামান্য ঘটনার এখানে একটু উল্লেখ করিয়া রাখি। পাঁচকড়ি বাবু বলেন,—

"একটা ঘটনার কথা বলি। আমার তখন প্রথমা পত্নী জীবিতা। দ্বিজেন্দ্রলালের স্ত্রীও বাঁচিয়া আছেন। উভয়ে থিয়েটার দেখিতে যাইবেন বলিয়া আমার বাসায় দ্বিজেন্দ্রের স্ত্রী আসেন। সে সময়ে স্থির হয় যে, আমার মাতৃদেবীও তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন। দ্বিজুর সেদিন আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা উভয়ে বসিয়া খাইতেছি এমন সময়ে দ্বিজু যেন কি একটা ফরমাইজ করিল। সে ফরমাইজ আমার কিংবা দ্বিজুর স্ত্রী কেহই রাখিলেন না। আমি তাহা লইয়া খানিক 'চেঁচামেচি' করিলাম, তাহাতেও কোন ফল দেখিলাম না। মায়ের কাছে আপীলেও আমরা উভয়েই হারিয়া গেলাম। তখন দ্বিজু বলিলেন,—"রোস, একটা গান বেঁধে ইহাঁদের মজা বাহির করিয়া দিতেছি।" তাহার ঠিক পরের দিনই গানটা লিখিয়া আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং আমার স্ত্রীর সম্মুখে হাত-মুখ নাড়িয়া গানটি গাহিয়া গেল। সে গানটা শুনিয়া আমার স্ত্রী একটু যেন বিরক্ত হইলেন; বলিলেন—"তা যখন যাব, তখন আর ধরে' রাখ্‌তে পারবে না।" দ্বিজুর পত্নীও নাকি এ গান শুনিলে চটিয়া যাইতেন। গানটি পরে 'রঙ্গালয়ে' প্রকাশিত করিয়া দিলাম। আমার স্ত্রী তো তাহাতে আমার সঙ্গে কথা কওয়াই বন্ধ করিলেন। দ্বিজুও (পরে শুনিয়াছি) তদবস্থ হইল, এবং সেই অবস্থায়ই আব্‌গারী পরিদর্শন করিতে বাহির হইয়া গেল। গানটা এই,—

'প্রথম যখন বিয়ে হ'ল ভাবলাম—'বাহা বাহারে'!
কি রকম যে হ'য়ে গেলাম বল্‌ব তাহা কাহারে!'—ইত্যাদি।

ঐ গানেরই একটা স্থানে আছে,—

'যদি একটু দাবা খেলায়,
আস্‌তে দেরী রাত্তির বেলায়
অম্‌নি তর্ক গুরু-চেলায়;
পালাই তাঁর বকুনির ঠেলায়
পগারে কি পাহাড়ে!
ভাবলাম—বাহা-বাহারে।'

ইহাতে একটু বেশ allusion (ইঙ্গিত) আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল কিছু দিন বেজায় দাবা খেলায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র মিত্র (হাইকোর্টের সরকারি উকীল, বাবু রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আত্মজ) ভায়ার বাড়ীতে যাইয়া দাবা খেলিতে বসিতেন এবং কোন কোন দিন রাত্রি ১১।১২টা করিয়া ফিরিতেন। ফিরিলেই প্রত্যহ তিরস্কৃত হইতেন ; সেই ঝগড়া ও তিরস্কার লক্ষ্য করিয়াই এটুকু লেখা হইয়াছে। কিন্তু, গানটা এমনই কুক্ষণে লেখা যে, উহা প্রকাশের ছয় মাস মধ্যেই আমার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয় এবং ঠিক এক বছর পরে দ্বিজুরও পত্নী-বিয়োগ ঘটে। ইহার পর দ্বিজু আর প্রাণান্তেও এ গান গাহেন নাই।"

এখন সেই যে-কথা বলিতে বসিয়াছিলাম।—অপেক্ষাকৃত একটু সুস্থ, প্রকৃতিস্থ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার চিত্তের অবসাদ তখনও ততটা কাটিয়া যায় নাই যাহাতে তিনি তখনই আবার পূর্ব্বের মত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে সাহস করিতে পারেন। চিরাচরিত অভ্যাসানুসারে তখনও যন্ত্রের মত তিনি দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতেছিলেন মাত্র ; কিন্তু, আবার সেই সরকারী হুকুম তামিল করার জন্য প্রত্যহ ধড়া-চূড়া আঁটিয়া 'আফিস করিতে', তখনও তাঁহার কর্ম্ম-বিমুখ, উদাসীন মনকে তিনি কোনমতেও রাজী করাইতে পারিলেন না। কিন্তু, তিনি 'পারি না' বলিলেই তো আর চলিবে না—ওদিকে যে ছাড়ে না! সঙ্কটে পড়িয়া, অগত্যা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার তৎকালীন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর মারফৎ গাভর্ণমেন্টের কাছে কিছু কালের ছুটি প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত 'পেশ' করিলেন। মাননীয় বাদশা সাহেব (Mr.K.J.Badshah I.C.S.) যদিচ যোগ্যতার জন্য তাঁহার প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন ছিলেন তবু তিনি এ আবেদন মঞ্জুর না করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"এখন আপনার পক্ষে বরং কাজে ব্যাপৃত ও ব্যস্ত থাকাই দরকার। ছুটি নিয়া, নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘরে বসিয়া-থাকিলে, আপনার অবস্থা আরও অনেক খারাপ হইয়া পড়িবে।" দ্বিজেন্দ্রলাল ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর

এই যুক্তিযুক্ত বাক্য অবহেলা করিতে না পারিয়া, পুনর্ব্বার কর্ত্তব্য কর্ম্মে সাধ্যমত মনোযোগী হইলেন বটে; কিন্তু, পূর্ব্ববৎ আবকারী বিভাগের পরিদর্শক ভাবে ক্রমাগত দেশ-বিদেশে যখন-তখন ঘুরিয়া বেড়ানো তখন আর কোনমতেও সম্ভব হইল না। তাঁহার একমাত্র পুত্র মণ্টুর (দিলীপের) তখন বয়স ৫।৬ এবং কন্যা মায়া তখন মোটে ৩।৪ বছরের শিশু। তাহাদের দু'টিকে কলিকাতায় ফেলিয়া, একাকী, নিজের সেই অবসাদ-নির্জ্জীব মনটাকে লইয়া, অমন-করিয়া নিয়ত নানাস্থানে পরিভ্রমণ করা, এখন তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসাধ্য হইয়া-ওঠায়, তিনি বাধ্য হইয়া, আবকারী বিভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এ সময়ে আবার নিয়মিত ডিপুটিগিরি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে তিনি কলিকাতা—৫ নং সুকীয়া ষ্ট্রীটের বাসায় অবস্থান করিতেন।

স্বভাব-কবি দ্বিজেন্দ্রলাল আজীবন মাতৃভাষার একাগ্রমনা উপাসক। কত সময়ে কতই-না ঝঞ্ঝাবিপৎ তাঁহার মাথার উপর দিয়া দুর্ব্বার বেগে বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু, ঐ সাহিত্য-সেবা না করিয়া তিনি যেন কোনমতেও স্থির থাকিতে পারিতেন না। এই-যে এমন-একটা মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা তাঁহার অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত আমূল আলোড়িত করিয়া-দিয়া গেল,—কয়েক মাস অতীত হইতে-না-হইতে, তবু আবার তেমনই তন্ময় আগ্রহে লেখনী লইয়া বসিলেন; এবং যথাসম্ভব মানসিক বিষাদ ও অবসাদকে মর্ম্মতলে দমিত ও বিদলিত করিয়া, অভিনব ধরণে একখানি নাটক-প্রণয়নের জন্য কয়েক দিন ধরিয়া কেবল রাজস্থান পড়িতে লাগিলেন। একদিন পূর্ব্বাপরাহ্নে তাঁহার কাছে গিয়া দেখি,—তিনি রাজস্থান হইতে কি-যেন লিখিয়া-লিখিয়া উঠাইতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওকি আবার?" বলিলেন—"উঃ, কি অপূর্ব্ব! কি চমৎকার!" বর্দ্ধিত-কৌতূহলে বলিলাম—হঠাৎ এমন কি ব্যাপারটা? বলুনই-না—শুনি!"

সাহিত্য-সাধনার পদ্ধতি ও নিরভিমান।

দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষণেক একটু অন্যমনা হইয়া, কতকটা যেন 'অৰ্দ্ধ-স্বগত' ভাবে, উৎসাহের সঙ্গে ঘাড় নাড়িতে-নাড়িতে বলিলেন,—"উহুঃ! অসম্ভব।—মানুষ কি এতটাও পারে?—আমাদেরই মত এই মানুষ!" এই বলিয়া, একবার সম্মুখস্থ দর্পণে নিজের মুখ দেখিলেন, পরে আমার নিকটে আসিয়া আমার আপাদমস্তক ভাল করিয়া একবার নিকট হইতে, আবার একটু দূরে সরিয়া-গিয়া দূর হইতে ঘাড় 'কাত্' করিয়া দেখিলেন; শেষে, ফিরিয়া-আসিয়া চেয়ারের উপরে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"নাঃ, অসম্ভব; সাব্যস্ত হ'য়ে গেল—অসম্ভবই বটে!" আমি এতক্ষণ তাঁহার 'রঙ্গ' দেখিয়া একটু একটু হাসিতেছিলাম; কিন্তু, আসল কথাটা তখনও বলিলেন না দেখিয়া, একটু রাগের ভাণ করিয়া কহিলাম, "তবে থাক্! কি ওটা, বল্‌লেন না যখন, তখন 'আড়ি'!—এই আমি চল্‌লাম।" দ্বিজেন্দ্রলাল মুখে আর কিছু না বলিয়া, তিনি এতক্ষণ যে খাতাটায় কি টুকিতেছিলেন সেখানা একটু হাসিয়া আমার কাছে ফেলিয়া দিলেন। দেখিলাম,—উন্মুক্ত পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে অপেক্ষাকৃত বড়-বড় অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা রহিয়াছে—'প্রতাপসিংহ'। তারপর সে পৃষ্ঠায় লিখিত সমস্ত লেখাটা পড়িয়া বুঝিলাম—তিনি মূল 'রাজস্থান' হইতে তাঁহার কল্পনারূপ, কোন নাটকের একটা সংক্ষিপ্তসার (Synopsis) লিখিয়া তুলিতেছেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে বলিয়া রাখি,—দ্বিজেন্দ্রলাল চিরকালই কোন নাটক বা প্রহসন লেখার পূর্ব্বে, লিখিতব্য গ্রন্থের এই ভাবে একটা Synopsis সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত করিয়া লইতেন। তাহাতে পাঁচটি অঙ্কের প্রত্যেক দৃশ্য, এবং সেই সকল দৃশ্যের অন্তর্গত প্রত্যেক 'কুশী-লবে'র (পাত্র-পাত্রীর) নাম উল্লিখিত হইত; ফলে, লিখিতে আরম্ভ করার পূর্ব্বেই আদ্যন্ত সমস্ত বইখানার একটা কাঠামো গঠিত হইয়া যাইত। অবশ্য, লিখিবার সময়ে যে এই সংক্ষিপ্তসার (Synopsis) সর্ব্বথা অক্ষুণ্ণ থাকিত

তাহা মোটেই নহে ;—শুধু একটা 'আইডিয়া' ঠিক করিয়া লওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ তিনি এই পন্থা অবলম্বন করিতেন। যাহা হৌক, Synopsis'টা লেখা হইয়া গেলে তিনি বই লেখা 'সুরু' করিতেন। কিন্তু, তাঁহার লিখন-পদ্ধতিও একটু ভিন্ন রকমের ছিল। তিনি যে নিয়মিতরূপে গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে লিখিয়া যাইতেন তাহা নহে। তাঁহার মনের অবস্থা ও গতি অনুসারে তিনি নির্ব্বিচারে যে-কোনও দৃশ্য যখন-তখন লিখিয়া-লিখিয়া রাখিতেন ; এবং এই ভাবে অভীপ্সিত গ্রন্থখানির একে-একে সমস্ত দৃশ্যগুলি লেখা হইয়া গেলে, কিছুকাল উহা ফেলিয়া-রাখিয়া, পরে তিনি সর্ব্বাগ্রে নিজে একবার একাকী সে বইখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া যাইতেন ; আর, সেই সময়ে উহার পরিবর্দ্ধন, পরিমার্জ্জন ও পরিবর্জ্জনাদি আরম্ভ হইত। এইরূপে কিছুদিন কাটাকুটি করিয়া যখন সেটা তাঁহার অপেক্ষাকৃত মনোনীত হইত তখন, প্রেসে পাঠাইবার পূর্ব্বে, বইখানা একবার (কখন-কখন বারংবার) তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধুগণের নিকটে পড়িয়া শুনাইতেন, এবং তৎকালে তাঁহাদের প্রত্যেকের অভিমত, পরামর্শ ও উপদেশ লইয়া ঘোর তর্ক-বিতর্ক ও বাদানুবাদ চলিতে থাকিত। এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা যে কতদিনে শেষ হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না,—কোন-কোন বার এই বাদানুবাদ ও তর্ক-বিরোধ এক মাস, দুই মাস, তিন মাস ধরিয়াও চলিতে থাকিত। দ্বিজেন্দ্রলাল এইরূপে বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করিয়া তাঁহাদের মত-সংগ্রহ করিতেন ; আর, নিজে অতি ধীর ও সশ্রদ্ধভাবে, তদ্বিষয়ে বিশেষ নিবিষ্ট মনে চিন্তা ও আলোচনা করিতেন। প্রয়োজন হইলে, মুক্তকণ্ঠে আপন ভ্রম সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিয়া, গ্রন্থের সেই অংশ হয় পরিবর্ত্তন করিয়া পুনর্ব্বার লিখিতেন, নতুবা তাহা একেবারেই বর্জ্জন করিতেন। অত-বড় প্রসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠাবান্ লেখক ; অথচ, নিজের লেখা কি কল্পনার

কোন দোষ বা ভ্রম—শুধু স্বীকার করা নহে—স্পষ্টতঃ প্রচার করিতে তাঁহার কোনই লজ্জা, সঙ্কোচ কিংবা এতটুকুও দ্বিধা ছিল না। ছোট হৌক্, বড় হৌক্, গণ্য হৌক্ আর নগণ্য হৌক্,—প্রত্যেক বন্ধুরই মতামত তিনি অতি আগ্রহের সহিত সশ্রদ্ধ মনে শ্রবণ করিতেন; এবং যে-মুহূর্ত্তে,—যাঁহারই কথায় হৌক্ না,—আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিতেন,—অমনই সকলের সমক্ষে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, নিজের ত্রুটি বা দোষ-ক্ষালনে যত্নবান্ হইতেন। তাঁহার কাছে যেমন ছোট-বড়, উচ্চ-নীচের কোন ভেদ ছিল না তেমনই আবার উপকারী জনের প্রতি নির্ব্বিচার কৃতজ্ঞতা-প্রকাশেও তাঁহার আদৌ সঙ্কোচ বা লজ্জা ছিল না। এই কারণে, আমাদিগকে আজ অকুণ্ঠ কণ্ঠেই বলিতে হইতেছে যে, এই আধুনিক শিক্ষিত সমাজে অমন সরল, সমদর্শী ও অত-বড় উদার, নিরভিমান লোক ইদানীং বাস্তবিক অত্যন্ত বিরল। যাহা হৌক্, এই ভাবে অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, লিখিত পুস্তকখানি প্রেসে মুদ্রণার্থ প্রেরিত হইত। কিন্তু তখনও তাঁহার নিষ্কৃতি লাভের আশা ছিল না। তিনি বলিতেন—"পরিষ্কার ছাপার অক্ষরে যেমন বই'এর দোষ-গুণ সম্বন্ধে বিচার-বুদ্ধি খোলে,—হাজার সুন্দর হরফ হইলেও, হাতের লেখাতে তেমন হইতেই পারে না।" ফলে, প্রুফ আসিলে তিনি তাহা এত পরিবর্ত্তন ও কাটাকাটি করিতেন যে, শুদ্ধ এইজন্য প্রত্যেক প্রেসে তিনি নির্দ্ধারিত মুদ্রণ-হারের অতিরিক্ত এক টাকা করিয়া 'ফর্ম্মা'-পিছু অধিক মূল্য দিতে বাধ্য হইতেন। আপন রচনার উপরে অমন নির্দ্দয় অস্ত্রোপচার করিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। সময়ে সময়ে প্রুফ দেখিতে-দেখিতে তিনি কোন-কোন দৃশ্য কাটিতে কাটিতে নির্ম্মূল, একেবারে অন্য রকম—সম্পূর্ণ নূতন করিয়া পুনর্ব্বার লিখিয়া দিয়াছেন, এমনও দেখিয়াছি। এক-একখানা বই লিখিতে তিনি যেরূপ ভাবিতেন ও পরিশ্রম করিতেন তাহা দেখিলে

অবাক্ হইতে হইত। তখন, কেন যে তাঁহাকে কেহ Genius (প্রতিভাশালী) বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিয়া কার্লাইলের উক্তি আওড়াইতেন তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষভাবেই বুঝিতে পারা যাইত। প্রসঙ্গতঃ, এই স্থলে তাঁহার অন্যতম স্নেহাস্পদ ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য আমাকে যাহা জানাইয়াছেন তাহার উল্লেখ করা সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি। প্রমথবাবু লিখিতেছেন,—

"তাঁহাকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি যে, "প্রাণে যতক্ষণ ভাব না আসে ততক্ষণ লিখিতে বসিবে না। মনের কাছে ভণ্ডামী চলে না।" আমরা যদি কখনও বলিতাম যে, 'আপনার রচনা-শক্তির সহিত আমাদের কি কোন তুলনা হয়! আপনি Genius!' তিনি অমনি বলিতেন,—"ও সব বাজে কথা আমি মানি না। ইংলণ্ডের একজন মহাচিন্তাশীল ব্যক্তি লিখিয়া গিয়াছেন—'Genius is another name for infinite capacity for taking pains,'—ইহা কখনও বিস্মৃত হইও না। লেখার আগে খুব পড়া আবশ্যক। পড়িলে যাহাদের মৌলিকতা নষ্ট হয় তাহাদের কোন মৌলিকতা যে থাকিতে পারে না, এটা নিশ্চিত। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ নাই—আমি কত পরিশ্রম করি? যে লেখা আমার বই হইয়া বাহির হইয়াছে তাহার দশগুণ লেখা আমি ফেলিয়া দিয়াছি। তোমরা মায়া করিয়া তো নিজেদের লেখা একটি ছত্রও কাটিতে পার না।"

প্রমথবাবুর এ কথাগুলির এক বর্ণও অত্যুক্তি বা কল্পিত নহে,—তিনি বহুবার বহু রকমে এই এক কথা আমাদিগকেও শুনাইয়া গিয়াছেন।

যাহাহৌক্, অতঃপর নিয়মিতরূপে প্রত্যহ তিনি প্রতাপসিংহের জীবন-কথা লইয়া নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাঝে-মাঝে লিখিত কোন অংশ তাঁহার ভাল না লাগিলে অথবা কোন স্থানে কোন দ্বিধা বা সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইলে, তিনি সে সকল অংশ আমাদিগকে পড়িয়া-শুনাইয়া আমাদের মতামত ও পরামর্শাদি গ্রহণ

করিতেন। নিজে যেরূপ সরল ও অকুণ্ঠ ভাবে সকলের মুখের উপরে স্বীয় ধারণানুরূপ মন্তব্য ব্যক্ত করিতেন, তাঁহার সাক্ষাতেও তাঁহার রচনাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসঙ্কোচে ও অকপটে তেমনই যে-কেহ স্বচ্ছন্দে অভিমত প্রকাশ করিতে পারিতেন। অকপট ধারণা ও অভিরুচি অনুসারে, তাঁহার বিরুদ্ধে যতই-কেন কঠোর মন্তব্য বা বিরূপ সমালোচনা করা হৌক্ না, তাহাতে তিনি বিরক্ত, বিচলিত বা ক্রুদ্ধ তো হইতেনই না;—বরং, ন্যায্য ও যুক্তিসিদ্ধ নিন্দাবাদ শুনিলে তিনি অনেক সময়ে উল্লাসে লাফাইয়া-উঠিয়া, বিরুদ্ধবাদীকে কখনও কর-মর্দ্দনে কখন বা আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া সারল্য ও সত্যের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও সমাদর প্রদর্শন করিতেন। তর্কে তিনি যেমন অদম্য ও দুর্জ্জয় ছিলেন, নিজের ভ্রম বা দোষ বুঝিবামাত্র, ঠিক তেমনই আবার তিনি আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত, অনায়াসে আপন ভ্রম ও অন্যায় স্বীকার করিতেও পারিতেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যূন পাঁচ মাস ধরিয়া তাঁহার 'রাণা প্রতাপ' বা 'প্রতাপসিংহ' নামক মনোজ্ঞ নাটকখানি কলিকাতায় থাকিতে রচনা করেন; এবং প্রায় ছয়-সাত মাস যাবৎ উহা পরিবর্ত্তনাদির জন্য নিজের কাছে ফেলিয়া-রাখিয়া, ঠিক একটি বৎসর পরে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। একটু পরে, এই গ্রন্থেরই শেষাংশে, দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করার ইচ্ছা আছে; অতএব এখানে আমি আর বেশি-কিছু না বলিয়া শুধু এইটুকু জানাইয়া রাখি যে, এই নাটকটি 'ষ্টার'-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলে নাট্যামোদী, সাহিত্যরসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই এটুকু নিশ্চিতরূপে বুঝিলেন ও একবাক্যে স্বীকার করিলেন যে, এই অসামান্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি সর্ব্বথা স্বীয় শক্তিবলে নাট্যজগতে নিজের জন্য এক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পথ আবিষ্কার করিয়া লইবেন। বড়ই শুভক্ষণে, বোধ হয়—যেন বিধাতারই বিশেষ ইচ্ছায়, দ্বিজেন্দ্রলাল এই অতীব মহান্ চরিত্রটি

লইয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, এই নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া যখন সহস্র সহস্র দর্শকের প্রাণ দেশাত্মবোধের মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও সঞ্জীবিত করিয়া-তুলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে এদেশে এমন-একটি অচিন্তিত ও অভূতপূর্ব্ব আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইল, যাহাতে পরিস্নাত হইয়া এই বঙ্গদেশের আপামর-সাধারণ, আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এক স্বর্গীয় শক্তিতে অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ ও উন্মত্ত হইয়া উঠিল। যাহাহৌক্, আমরা পরে সে সকল বিষয়ের যথাসম্ভব কিছু আলোচনা করিব। উপস্থিত আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের আর-কয়েকটি বিপত্তি বা উদ্বেগের কথা প্রথমে বিবৃত করিয়া লই।

পত্নী-বিয়োগের শোক-বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, তদীয় স্বজন-বান্ধববর্গের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আর-একটি

পুনর্ব্বার বিবাহের প্রস্তাব।

অনুনয় ও অনুরোধ করিয়া বিশেষ ব্যথিত ও উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহারা মনে করিলেন যে, মাত্র ৩৭।৩৮ বৎসর বয়সে গৃহহীন হইয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল কখনই এ প্রলোভনপূর্ণ সংসারে তাঁহার চরিত্র-বল অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন না; এবং তাঁহার সংসারে আর কোন স্ত্রীলোক না থাকায়, তাঁহার ঐ শিশু পুত্র-কন্যা দু'টিকে সুস্থ শরীরে লালন-পালন করিয়া বাঁচাইয়া-তোলাও কোনমতে সম্ভবপর হইবে না। এই স্বাভাবিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, তৎকালে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন অনেকেই তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার জন্য বারংবার বড়-বেশি 'জেদ্' করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তদ্রূপ অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু উত্যক্ত, বিরক্ত ও রাগান্বিত হন দেখিয়া, শেষে তাঁহারা যুক্তি-তর্ক ও প্রলোভনের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু, যিনি যেরূপ উপায়ই অবলম্বন করুন না, দ্বিজেন্দ্রলালের কেবল সেই এক উত্তর—"না, কখনই না, আমি আবার বিবাহ করিতে পারি না। আমায় এমন

অসম্ভব অনুরোধ করিয়া কেবল যাতনা দেওয়া ভিন্ন আর কোন ফল হইবে না।" বহু দিন ধরিয়া এইভাবে অনেক পীড়াপীড়ি করার পর, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আমি একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের কোন নিকট-আত্মীয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে গিয়া বলিলাম,—"সবাই যখন এতটা 'জেদ্' করিতেছেন (এবং ইহাঁরা সকলেই আপনার শুভানুধ্যায়ী) তখন অন্ততঃ এই ছেলে-মেয়ে দুটোর কথা ভাবিয়া একবার না-হয় এ প্রস্তাবে মতই দিয়ে ফেলুন না!" অপ্রত্যাশিতভাবে, এত দিন পরে আমার মুখেও এই অনুরোধ শুনিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল 'দপ্' করিয়া, যেন ঠিক আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন; অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন,—

"বটে! শেষে তুমিও তবে এ চক্রান্তে যোগ দিয়েছ! আমি নিশ্চয় বল্‌লাম, ফের্ যদি এমন অন্যায় কথা তুমি মুখাগ্রেও আন,—তোমার সঙ্গেও চিরদিনের মত আমি বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দেব। আস্পর্দ্ধা তো বড় কম নয়!—বিবেকবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে আমি এখন লোকের কথায় আত্ম-বিক্রয় কর্‌তে যা'ব? আমি নিজেকে তোমাদের চেয়ে তো অন্ততঃ একটু বেশি চিনি? আমার জন্য কা'রও কোন চিন্তা বা উপদেশের (advice' এর) বিন্দুমাত্রও অপব্যয় করার দরকার নেই। জ্বালাতন কর্‌ল!"

দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝিয়াছিলেন—আমি অন্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়াই এমন কথা তাঁহাকে বলিয়াছি। তাই, ঐ কথা কয়েকটি বলার পর অত্যন্ত (agitated) বিচলিতভাবে গৃহ-তলে পাদচারণ করিতে করিতে আবার বলিলেন,—

"হুঁঃ! আমার হিত-চিন্তা করে' করে' তো সকলের আহার-নিদ্রা বন্ধ হ'তে বসেছে! আমাকে এইসব কুপরামর্শ দিতে যাঁরা তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছেন তাঁদের বল গিয়ে যে, যদি তাঁরা আমাকে গৃহত্যাগী কর্‌তে না চা'ন ত' যেন এ-সব কথা আর কখ্‌খন আমার কানে না তোলেন।"

ঠিক এমন সময়ে শিশু 'মণ্টু' আসিয়া, তাস বা দাবা খেলার

জন্য তাঁহাকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে, সেখান হইতে কক্ষান্তরে লইয়া গেল।

এই সময়ের কথা বলিতে-গিয়া প্রসঙ্গচ্ছলে সাহিত্যজীবী, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমায় জানাইতেছেন,—

"আর একদিনের কথা মনে পড়ে। তখন দ্বিজুর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটিয়াছে। দ্বিজু ঝামাপুকুরের বাসা ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য Oxford Mission' এর উত্তর দিকে একটা তেতালা নূতন বাড়িতে উঠিয়া আসিয়াছে। ভ্রাতা হরেন্দ্রলাল আছেন। সকলেই দ্বিজুকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। এমন সময়ে আমি যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমাকে দেখিয়াই হরেন্দ্র বলিলেন,—"এই তো পাঁচকড়ি আবার বিয়ে করেছে।" দ্বিজু ধড়্‌মড়িয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন,—"পাঁচকড়ি একটা কেন দশটা বিয়ে কর্‌তে পারে। তাঁহার মা আছেন, বাপ আছেন। তাঁহার ছেলেদের আদর করিবার লোক আছে। তাঁহার আর আমার তুলনা?" আমি ধীরে-ধীরে গিয়া, চুপে-চুপে তাঁহার পাশে বসিলাম; বলিলাম,—"বটে, আমি বাপ-মায়ের এক ছেলে; আমাতে সকলই শোভা পায়। কিন্তু, কিভাবে দিন কাটাইবে, ভাবিয়াছ কি?" দ্বিজু উঠিয়া-বসিয়া, আমার কানটা ধরিয়া খুব জোরে মলিয়া দিল; এবং আমার স্বরে স্বর মিলাইয়া, নকল করিয়া বলিল,—"আর আমার অবস্থাটা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আমি আবার বিবাহ করিলে এখনও অনেকগুলি পুত্র-সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। তাহারা সমাজের কোন্ স্থানে গিয়া দাঁড়াইবে? আমি সেই সাধ্বীর কৃপায় এতদিনে চাকুরী করিয়া যাহা সঞ্চয় করিতে পারিয়াছি তাহাতে মণ্টু-মায়ার দিন না হয় সুখে কাটিয়া যাইবে,—তোমাদের সাহায্যে মায়াকে সৎপাত্রে দান করিলেও হয়ত করিতে পারিব। কিন্তু, দামোদরের প্রবল বন্যার মতন আরও ছেলে-মেয়ে আসিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের সকলকে আমার বংশ-যোগ্য ও সাধের মতন পদ বা Position সমাজে দিয়া যাইতে পারিব কি? তোমরা কি বলিতে চাও আমি গোটা কয়েক * * Pauper (লক্ষীছাড়া) সৃষ্টি করিয়া যাইব? তবে যদি আমার নিজের কথা বল,—সে তোমরা পরে দেখিয়া নিও,—সেজন্য এখন

কারও মাথা ঘামাইবার একটুও দরকার নাই।" ব্যস্, এই এক কথায় সে আমাদের একেবারে নীরব করিয়া দিল, এবং ইহার পরে আর আমিও তাহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করি নাই।"

বিশেষ-কোন জরুরী কার্য্যোপলক্ষে ইহার অল্প কয়েক দিন পরে আমি বরিশালে চলিয়া-আসিলে, তিনি আমাকে একটু-যেন ভয় দেখাইবার ছলে এক পত্রে লিখিলেন,—"আমি তো আবার বিবাহ করিতেছি। 'বেশ কথা, অতি উত্তম',—না?" আমি ইহার উত্তরে তাঁহার সে সংবাদ অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিয়া, প্রকৃত ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিলে, তিনি আমাকে পুনরায় লিখিতেছেন,—

"* * ভাইরে! তোমার ধারণাই ঠিক। আমি তোমার মন বুঝিবার জন্যই ঐ রকম 'ধাপ্পা' দিয়াছিলাম। আমি আবার বিবাহ করিব? এ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, আমার মানস-মন্দিরে এখন আমি সেই অনুপম স্বর্ণ-প্রতিমার ধ্যান-ধারণা, পূজা ও আরতি করিয়া থাকি। স্থূল-দৃষ্টি এই-সব লোক বাহির হইতে তাহার কি জানে—কিইবা বোঝে? * * * দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। সে প্রেমও নহে, পরিণয়ও নহে,—সে শুধু কামের প্রশ্রয়। কাম-পরিণয় সমাজের দিক্ দিয়া অবস্থা-বিশেষে সমর্থিত হ'লেও হৃদয় তা'তে বাধা দেয়। সমাজকে জীবনে অনেক ঠকিয়েছি। কিন্তু, নিজেকে—হৃদয়কে ঠকিয়ে কেমন করে' বাঁচ্‌ব ভাই? 'বিয়ে আবার ক'বার হয়'—এ তোমার লাখ কথার এক কথা।"

দ্বিজেন্দ্রলালের মনে এইরূপ অজেয়, দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল বটে; কিন্তু, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনেরা তখনও তাঁহার যথার্থ মনোভাব বুঝিতে না পারিয়া, দ্বিজেন্দ্রলালেরই কোন-এক পরমাত্মীয়ের একটি সুশ্রী ও বিদুষী কন্যার সহিত, আপনাদের মধ্যে তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া, নবোদ্যমে আবার তজ্জন্য ক্রমাগত তাঁহাকে 'নাছোড়্‌বন্দ'-ভাবে ধরিয়া বসিলেন। আত্মীয়-বান্ধবগণ তখনও ভাবিতেছিলেন যে, এ-সব ব্যাপারে যেমন সাধারণতঃ সকলে প্রথম-প্রথম অমন 'গর্‌রাজীর' ভাব দেখাইয়াই থাকে; কিন্তু, পরে, পীড়াপীড়ির

মাত্রা-বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে, অনেকেই শেষে আবার রাজী হয়,—দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধেও বুঝিবা সেই নিয়ম খাটিবে। কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলাল আর ঐ 'অত্যাচার' বা 'জ্বালাতন' সহিতে না পারিয়া, তদীয় শ্যালীপতি (ভায়রাভাই) শ্রীযুক্ত গিরিশ শর্ম্মা মহাশয়কে অত্যন্ত বিরক্তিভরে এক টুক্‌রা কাগজে নিম্নলিখিত বিষয়টি লিখিয়া-দিয়া স্পষ্টই বলিলেন,—

"ফের যখন বিয়ের কথা কেউ বল্‌বে তখন এই লেখাটা আমার হ'য়ে তাঁকে দেখিও।"—

গিরিশবাবু বলিয়াছেন যে, এই লেখাটুকু তাঁহাকে দেওয়ার সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মুখমণ্ডল ভাবাবেগে আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল ; এবং আপন মনের সেই চাঞ্চল্য যাহাতে ধরা না পড়ে—তজ্জন্য তিনি কাগজটি গিরিশবাবুর হাতে 'গুঁজিয়া'-দিয়া, নিকটবর্ত্তী, রুদ্ধ বাতায়ন মুক্ত করিয়া, সেখানে গিয়া কিছুক্ষণ নীরবে, পথের দিকে চাহিয়া, দাঁড়াইয়া রহিলেন। কৌতূহল-ভরে গিরিশবাবু তখন কাগজটার 'ভাঁজ' খুলিয়া দেখেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে,—

Dr. * অর্থাৎ সুবিধা।

(১) প্রথমবার বিবাহ করাই ভুল। যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে বা করার ইচ্ছা করে তাহার চিকিৎসার দরকার।

(২) বিবাহোপযোগী অর্থ না থাকিলে বিবাহ করা অনুচিত। 'বিবাহোপযোগী অর্থ' কাহাকে বলে তাহার ধারণা বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রূপ। আমার ধারণা যে, আমার পুনরায় বিবাহ করার অর্থ নাই।

* Dr. = Debtor

Cr. * অর্থাৎ অসুবিধা।

(১) আমার ঘরকন্না দেখে কে? উত্তর।—ঘরই নাই, তা'র আবার কন্না!

(২) আমার বৃদ্ধ বয়সে রোগে ইত্যাদিতে সেবা করে কে?

উত্তর।—গিরিশ ও সুশী †

* Cr. = Creditor.

† শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র শর্ম্মা ও তাঁহার স্ত্রী (দ্বিজেন্দ্রলালের শ্যালিকা) শ্রীমতী সুশোভিনী দেবী।

(৩) যে এক প্রকার চাকরী করে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যরূপ দাসত্ব যাচিয়া লওয়া বাতুলতা। দ্বিতীয় পক্ষের দাসত্ব ভয়ঙ্কর। বিশেষতঃ দ্বিতীয় পক্ষের মেজাজ যদি একটু উষ্ণ হয়। †

(৪) বিমাতা প্রকৃষ্ট নহে—শাস্ত্রে আছে। নূতন স্ত্রীর নিজের সন্তান হইলে বিমাতৃসন্তানের অবহেলা হইয়াই থাকে।

(৫) আমার স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল না যে, তিনি মৃত হইলে আমি পুনর্ব্বার বিবাহ করি।

(৩) আমার ছেলেপিলে দেখে কে?

উত্তর।—মাষ্টার। ‡

(৪) আমি বিবাহ করিলে কন্যাপক্ষের অনেক টাকা বাঁচিয়া যায়। কারণ, আমি টাকা নিই না।

উত্তর।—এতদূর স্বার্থ-ত্যাগ শিখি নাই। †

(৫) বিবাহ না করিলে জীবনের উদ্দেশ্য থাকে না। আমার জীবনের ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য কি?

উত্তর।—

সাহিত্যের সেবা।

(স্বাক্ষর) D. L. Roy,

11-4-05

---

† যাঁহার সহিত বিবাহের নূতন প্রস্তাব উঠিয়াছিল তাঁহার মেজাজটি তেমন 'মোলায়ম' বা মৃদু ছিল না।

—গ্রন্থকার।

‡ ছেলেমেয়েদের একজন Guardian-tutor (শিক্ষক-অভিভাবক) ছিলেন।

† অর্থাৎ—এরূপ পরোপকারার্থে নিজের এতটা অনিষ্ট ও অসুবিধা স্বীকার করিতে শিখি নাই।—গ্রন্থকার।

দেবী সুরবালার জীবন-কথা *

কলিকাতার কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীটে স্বর্গীয় ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর গৃহে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সুরবালা দেবী জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত চিকিৎসক ভাদুড়ী মহাশয় তাঁহার মাতামহ। তাঁহার পিতা ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তখন মেডিকেল কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। কন্যা-প্রসবের কয়েক দিন পূর্ব্বে ভাদুডী মহাশয় একটি রোগী দেখিতে পাণ্ডুয়ায় গিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সুরবালার মাতাকে নাতিনী বলিতেন, এবং তাঁহার প্রসবের সময় ভাদুড়ী মহাশয় উপস্থিত না থাকায় তিনি (বিদ্যাসাগর) উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত তত্ত্বাবধান করেন। কন্যা-প্রসব হইলে তাহার সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য লক্ষ্য করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় মহা হর্ষ প্রকাশ করেন।

সুরবালার বয়স-বৃদ্ধি হইলে মজুমদার মহাশয় তাঁহাকে বেথুন-স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন; কিন্তু পড়াতে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ থাকিলেও, একটু কষ্ট হইলে, তাঁহার মাতামহী তাঁহাকে স্কুলে যাইতে দিতেন না; তাঁহার অসুখ হইবে, 'মেয়ে-ছেলের আর বেশী লেখা-পড়ার দরকার কি'?—ইত্যাদি আপত্তি করিয়া পাঠের ব্যাঘাত করিতেন। ইহাতে তাঁহার বেশী দিন পর্য্যন্ত স্কুলে থাকা হইল না, কিন্তু স্বাভাবিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং মেধা থাকায় অল্পকাল মধ্যে তিনি একরূপ বাঙ্গালা ও অল্প ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত বিবাহ হইবার পরেও তিনি কিছু পড়াশুনা করেন; কিন্তু তাঁহার মাতামহীই তাঁহাকে ইংরাজী পড়া হইতে নিবৃত্ত করিলেন। স্কুলে পড়া বন্ধ হইলেও তাঁহার মাতা তাঁহাকে, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পড়াইতেন এবং গৃহকর্ম্ম রন্ধনাদি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে সে সকল বিষয়ে সুরবালা বিশেষ নিপুণা হইয়া উঠিলেন। ভাদুড়ী মহাশয় যখন প্রাকৃটিসে বাহির হইতেন প্রায়ই দৌহিত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, ইহাতেও পড়াশুনার

* পরম শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সাধারণতঃ ইহাতে প্রতাপবাবুর ভাষাই যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে।—গ্রন্থকার।

ব্যাঘাত হইত। দৌহিত্রীকে তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে এত ভালবাসিতেন যে, তাহাতে কেহই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিত না। সেই সময়ে অনেক কলিকাতার বর্দ্ধিষ্ণু লোক সুরবালা দেবীর রূপ-গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বোসপাড়ায় ৺বলরাম বসু মহাশয় তাঁহাকে 'রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী' বলিয়া বর্ণনা করিতেন। তিনি সুরবালাকে কোলে করিয়া লইয়া-গিয়া, তাঁহার বাড়ীতে দুই এক দিন রাখিয়াও দিতেন।

সুরবালা দেবীর বয়স যখন ছয় বৎসর তখন একবার তাঁহার ভয়ানক জ্বর-বিকার হইয়াছিল। তাঁহার পিতা প্রতাপচন্দ্র তখন ৮০নং বিডন ষ্ট্রীটে বাস করেন। তিনি প্রথম হইতেই চিকিৎসা করেন; পরে রোগ-বৃদ্ধি পাইলে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এবং বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়দ্বয়ও দেখিতে থাকেন। বিকার বৃদ্ধি পাইয়া যখন অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া উঠিল, তখন ডাক্তার সরকার হতাশ্বাস হইয়া তাঁহাকে বজরায় গঙ্গাবক্ষে রাখিয়া চিকিৎসা করিতে উপদেশ দিলেন। তখন অবস্থা এরূপ হইয়াছিল যে, বিছানায় পাশ-ফিরানও সহজ ছিল না। সুরবালার মাতামহী তাঁহাকে কোলে করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া আস্তে আস্তে আহিরীটোলার ঘাটে লইয়া বজরায় উঠিলেন। একমাস কাল তথায় রাখিয়া তাঁহাকে আরাম করা হইল। এই বিপজ্জনক সময় সরকার মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, এমন সুন্দরী এবং সুশীলা মেয়েটিকে যে বাঁচাইতে পারিলাম না ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় সুরবালা দেবী আরোগ্য লাভ করিলেন। * * দেখিতে লম্বা ও খুব মানানসই মোটা ছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে বয়স অপেক্ষা বড় দেখাইত। সুতরাং, তাঁর মাতামহী বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পিতা প্রতাপচন্দ্র চিরকাল বাল্য-বিবাহের বিরোধী, তাঁহার অন্যান্য কন্যাদিগকেও তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের নীচে বিবাহ দেন নাই। তাঁহার আপত্যে কতক দিন বিবাহ বন্ধ ছিল। কিন্তু মাতামহী বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, সুতরাং ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সেই তাঁহার পিতাকে বাধ্য হইয়া বিবাহ দিতে হইল।

পাত্রের সন্ধান হইতে লাগিল, কিন্তু মনোমত বর জুটিল না। একদিন প্রতাপবাবু সপরিবারে স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের বাটিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তথায় দ্বিজেন্দ্রলালেরও নিমন্ত্রণ ছিল। সেই স্থানে সুরবালাকে

দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রামতনুবাবুর পুত্র বসন্তবাবুকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। বসন্তবাবু জানিতেন, প্রতাপবাবু বিবাহের বর খুঁজিতেছেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রের নিকট সেই প্রস্তাব করিলেন। দ্বিজেন্দ্র রাজী হইলে, এ পক্ষও সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রতাপবাবু বলিলেন, সব বিষয় ঠিক বটে, কিন্তু দ্বিজেন্দ্র যদি হিন্দুমতে বিবাহ করেন তবেই তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে কন্যাদান করিতে পারেন। প্রতাপবাবু তখন বিলাত-যাত্রা করেন নাই; তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বিলাত-ফেরত যুবক হিন্দুমতে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন না। দ্বিজুবাবু অম্লান বদনেই বলিলেন, হিন্দুমতে বিবাহই তিনি সর্ব্বাংশে ভাল বিবেচনা করেন। সুতরাং সহজেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল। এই সময়ে কোন লোক দ্বিজেন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র লাল রায়ের নিকট প্রকাশ করেন, সুরবালার রূপগুণের কোনও ত্রুটি নাই বটে, কিন্তু তিনি 'বোবা'—বাক্-শক্তিরহিত। ইহাতে আবার মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্ঞানেন্দ্রবাবু অতীব বিনীত ভাবে প্রতাপবাবুকে এই কথা জানাইলেন। প্রতাপবাবু বলিলেন, দ্বিজেন্দ্র যখন কলিকাতা যাইতেছেন তখন তিনি নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই কথায় সব স্থির হইয়া—'বিবাহ-পত্র' হইয়া গেল। এই সভায় রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর, ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী, ডাক্তার মহানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। যদুবাবু তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করায় দ্বিজেন্দ্রলাল হারমোনিয়াম যোগে যে গান করিলেন তাহাতে তাঁহারা সকলেই অবাক্ হইয়া গেলেন, বিশেষতঃ প্রতাপবাবু তাঁহার ভাবী জামাতার গুণে মুগ্ধ হইলেন।

পরদিন প্রতাপবাবু তাঁহার মাসতুত ভগ্নি-পতি সত্যচরণ লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন, 'সব ঠিক হইল বটে, কিন্তু দেনা-পাওনার কথা ত কিছু বলা হইল না'। তাঁহারা উভয়ে তখন জ্ঞানেন্দ্রবাবুর নিকটে গিয়া এই কথা জানাইলেন। জ্ঞানেন্দ্রবাবু বলিলেন, "দ্বিজেন্দ্র বলিয়াছেন—টাকা লইবার কথা হইলে তিনি বিবাহই করিবেন না।" দ্বিজেন্দ্র সর্ব্বদাই বলিতেন—"লোকে টাকা বিবাহ করে, না, স্ত্রী বিবাহ করে? স্ত্রীর রূপ-গুণ দেখিয়াই বিবাহ করা উচিত"। যদিও টাকা লইবার কথা হইল না, কিন্তু প্রতাপবাবু তাঁহার জামাতাকে এরূপ সুন্দর ও

মূল্যবান্ যৌতুক দ্রব্যাদি দিয়াছিলেন যে,-কৃষ্ণনগরে তৎকালীন মহারাজা পর্য্যন্ত সে জিনিষ-পত্র দেখিয়া নাকি বলিয়াছিলেন যে, 'প্রতাপবাবু তাঁহার উপযুক্ত দ্রব্যাদিই দিয়াছেন। এ সমস্ত মূল্যবান্ ও সুন্দর দ্রব্য সচরাচর দিতে দেখা যায় না'।

শুভক্ষণে ১৮৮৭ সালের এপ্রিল (বৈশাখ) মাসে, কলিকাতায় প্রতাপবাবুর বাসা-বাটি ৮০ নং বিডন ষ্ট্রীটে, মহাসমারোহে এই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। বিলাত-ফেরতের সঙ্গে হিন্দুমতে এই প্রথম বিবাহ হইল। একদিকে মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি বিলাত-প্রত্যাগত মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন, অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতা ও আত্মীয়গণ, বিহারীলাল ভাদুড়ী, মহেন্দ্রলাল সরকার ও কলিকাতার আরও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। বিবাহের পর ইঁহাদের দাম্পত্য-জীবন অতি সুখেই অতিবাহিত হইয়াছিল। অল্পদিন পরেই সুরবালা তাঁহার স্বামীর সহিত তাঁহার কার্য্যস্থলে মোজাফরপুর গমন করেন। মাতার সুশিক্ষায় সুরবালা গৃহকার্য্যাদি এই অল্প বয়সে যেরূপ শৃঙ্খলার সহিত করিতেন এবং স্বামী-সেবার এমনই অনুরক্ত ছিলেন যে, সকলেই একবাক্যে তাঁহার কার্য্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। এদিকে কন্যাকে বিদায় দিয়া, প্রতাপবাবু ও তাঁহার পত্নী অস্থির হইয়া কন্যা-জামাতার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিজেন্দ্র তখন দ্বারভাঙ্গার নিকটে প্রতাপগঞ্জ ও বেলুয়াবাজার নামক স্থানে সেটেল্‌মেণ্ট-কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এস্থলে কিছুদিন বাস করিয়া সুরবালার পিতামাতা এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং বুঝিলেন, তাঁহাদের দুহিতা বেশ ভালরূপেই সংসারের কার্য্যাদি করিতে পারিবেন। বাস্তবিক এই অল্প বয়সে সুরবালা যেরূপ সংসারের সুশৃঙ্খলা সাধন করিয়াছিলেন, আজকাল অতি অল্প মেয়েই সেরূপ করিতে পারে।

সুরবালা দেবী এরূপ দয়ালু-প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, সামান্য চাকরের অসুখ ইত্যাদি হইলেও অতি যত্নের সহিত নিজে তাহাদের শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন, তাহাদের খাওয়া-দাওয়া হইল কিনা নিয়ত তাহার সন্ধান লইতেন। মোজাফারপুর হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল মুঙ্গের ও ভাগলপুরে আসিলেন। সুরবালা স্বামীর সহিত আসিয়া মুঙ্গেরে তাঁহার মাতামহের বাড়ীতে প্রথম উপস্থিত হইলেন। এই বাড়ীতে থাকাই তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল; কারণ,

তাঁহার ম্যালেরিয়া-জ্বর এখান হইতে সারিয়া যায়। কিন্তু আফিসের নিকট বলিয়া দ্বিজেন্দ্র গড়ের মধ্যে এক উত্তম বাড়ী ভাড়া লইলেন। এখানেও সুরবালা অতি আনন্দেই ছিলেন। মুঙ্গেরের আব্-হাওয়া তখন খুব স্বাস্থ্যকর ছিল। মনের অবস্থাও ভাল ছিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার পিতামাতা ও মাতামহ, মাতামহী মুঙ্গেরে তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন। তাঁহাদের সহিত সর্ব্বদাই দেখা-শুনা ও আমোদ-আহ্লাদ হইত। তথা হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন দিনাজপুরে বদলি হন তখন সুরবালা কিছুদিন তাঁহার পিতার বাড়ীতেই বাস করেন। এখানে তাঁহার মাতামহ ও মাতামহী ধর্ম্মের নির্ম্মল ছায়াতে সুরবালা দেবীর মন ও অন্তরকে অতীব সুন্দর করিয়া তুলেন। তাঁহাদের বাটীতে কিছুকাল থাকিয়া প্রত্যহ মধুর হরিনাম-শ্রবণ ও নানাবিধ ব্রত-নিয়মাদি-পালন করিয়া যথার্থ পুণ্য ও শান্তি লাভ করেন। * *

* * বস্তুত সুরবালা এই অল্প বয়সেই যেরূপ মায়াময়ী দেবী হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি যে আপনার আত্মীয়-স্বজন ভ্রাতা-ভগিনীদিগের উপরই স্নেহময়ী ছিলেন এরূপ নহে, তাঁহার ভাসুর-পো এবং ভাসুর-কন্যাদের প্রতিও ঠিক তদ্রূপ ছিলেন। তাহাদিগকে নিজের বাটিতে আনিয়া সর্ব্বদাই আনন্দ করিতেন! অনেক সময় বহুবিধ উত্তম উপহার ও বস্ত্রাদি দ্বারা তাহাদিগকে সুখী করিতেন। এই সুখ-সৌন্দর্য্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়া স্নেহ-মমতা বিতরণকল্পে তিনি মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণার ন্যায় প্রকৃতই দেবী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কখনও বিবাদ বা হিংসা-দ্বেষ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না।

বিদেশ-বাসকালে সুরবালা দ্বিজেন্দ্রলালের দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ থাকিয়া পরিপাটীরূপে সংসার চালাইতেন। অধিক খরচ বা অনর্থক বৃথা অর্থব্যয় না করিয়া, এমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে সংসার চালাইতেন যে, তাঁহারই গুণে স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ ক্রমে সঞ্চিত হইতে লাগিল। * এই শিক্ষা তাঁহার বুদ্ধিমতী

---

* শ্রদ্ধেয় প্রতাপবাবুর এ উক্তির যাথার্থ্য স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে আমি পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলাম। 'সুর-ধামে' বাস করার সময়ে কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, "এ যে তাঁহারই সঞ্চিত অর্থের পুণ্য মন্দির। এখানে আমি তাঁহারই স্মৃতির আশ্রয়-ছায়ায় এ শূন্য জীবনটা কাটাইয়া দিব।'—গ্রন্থকার।

মাতার নিকট বাল্যকালেই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্ষমতা ও অর্থ-সচ্ছলতা থাকাতেও তাঁহাকে কেহ কখন অহঙ্কারা হইতে দেখে নাই। এইরূপ কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর সুরবালা অন্তঃসত্ত্বা হইয়া কলিকাতায় তাঁহার পিতার ভবনে আসিয়া বাস করেন; এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২২এ জানুয়ারী অপরাহ্ণ ২টা ৩২ মিনিটের সময় এক স্বাস্থ্যসম্পন্ন সুন্দর পুত্র প্রসব করেন।

এই শিশুই পরে দিলীপ নাম প্রাপ্ত হন। দ্বিজেন্দ্রের বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়েরা সকলে ইহাঁকে 'মণ্টু' বলিয়া ডাকিতেন। এখনও আমাদের কাছে দিলীপ 'মণ্টু' নামেই সুপরিচিত। ইহার প্রায় দেড় বৎসর পরে সুরবালার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন; ১৮৯৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর বেলা ৯টার সময় এই কন্যার জন্ম হয়। ইনি এখন 'মায়া' নামে সকলের নিকট পরিচিত। গত বৎসর, অর্থাৎ ১৯১৬ সালের ২৭ শে মার্চ্চ, বাঙ্গালা ১৫ই ফাল্গুন, আমাদের এই মায়া দেবীর সঙ্গে স্বনামধন্য, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ ভবশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভ পরিণয়-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার পিতামাতা উভয়েই ইহার পূর্ব্বে এ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। করুণাময় জগদীশ্বর এই দম্পতি যুগলকে সর্ব্বথা সুখী ও দীর্ঘজীবী করুন।

মায়ার জন্মের কয়েক বৎসর পরে সুরবালার একটি যমজ সন্তান হয়, এবং অল্পকাল মধ্যেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার পর কয়েক বৎসর সুরবালার শরীর বেশ ভালই ছিল এবং এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায়ই কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দতার পূর্ণ বিকাশ এই সময়ের মধ্যেই হইয়াছিল। তিনি গৃহকার্য্য এরূপ সুন্দরভাবে করিতেন যে, তাহাতে সকলেই সুখী ও সন্তুষ্ট হইত। তাহার একটি ঘটনা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই সময় দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েক ভ্রাতা কলিকাতায় সমবেত হইয়াছিলেন। সুরবালা তাঁহাদের সকলকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন, প্রতাপবাবুও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। রান্না ও জিনিষপত্র এত ভাল হইয়াছিল যে, সকলেই প্রশংসা করিলেন। দ্বিজেন্দ্রের ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রবাবু প্রতাপবাবুকে বলিলেন, "প্রতাপবাবু আপনাকে ধন্যবাদ! আপনি ছোট বউমাকে (সুরবালাকে) এমন শিক্ষা দিয়াছেন যে, তিনি 'ল্যাঙো'

চড়িয়াও বেড়াইতে পারেন, আবার রন্ধনাদিতে সমান পটু। আমি নীচে গিয়া দেখিলাম, বউমা নিজেই সমস্ত রান্না করিতেছেন"। বাস্তবিক রসুই-ব্রাহ্মণ থাকা সত্ত্বেও স্বরবালা সেদিন নিজেই সমস্ত রান্না করিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা অনেকবার হইয়াছে।

১৯০৩ সালের মার্চ্চ মাসে স্বরবালা আবার অন্তঃসত্ত্বা হন। এই সময় তাঁহার শরীর খুব ভালই ছিল। ক্রমে প্রসব সময় উপস্থিত হইল। এই শালের ২৯শে নভেম্বর, শেষ রাত্রে অতি কষ্টে একটি মৃত কন্যা প্রসব করিয়া, কয়েক মিনিটের মধ্যেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া (Heart-failure'এ) স্বরবালা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ-ধামে প্রস্থান করিলেন! চিকিৎসা করিবারও সময়টুকু হইল না! এই সময় দ্বিজেন্দ্রলাল সরকারি কার্য্যে বাহিরে গিয়াছিলেন; আসিয়া দেখিলেন—গৃহশূন্য! এই অকাল মৃত্যুতে প্রতাপবাবুর পরিবারমধ্যে মহাশোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল। তাহার সন্তান দিগের মধ্যে স্বরবালাই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, বিশেষতঃ এমন সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা, কন্যার অকস্মাৎ মৃত্যুতে প্রবলতম শোকের প্রকোপ সহ্য করা সহজ নহে। যাহা হউক, জগদীশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইল। এই ভাবে, শ্রীমান্ দিলীপকুমার ও মায়া অতি অল্প বয়সেই মাতৃহীন হইয়াও, পিতা ও মাতামহীর কোলে গিয়া, মায়ের অভাব তেমন আর অনুভব করেন নাই।

২

নৈতিকবল।

'আলো-ছায়া'র খেলা।

শত অনুনয়-বিনয়, ষড়্‌যন্ত্র ও প্রলোভন সকলই শেষে ব্যর্থ হইল। কেহই দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁহার সেই সুদৃঢ় পণ ও অবিচলিত অটল প্রতিজ্ঞা হইতে এক তিলও বিচলিত করিতে পারিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল অবিবাহিত রহিলেন।

ইহার পর হইতে তদীয় পুণ্যময় জীবনের অবশিষ্ট কয় বৎসর তিনি অসীম সংযমে—যেন উদাসী সন্ন্যাসীর মত, উদাসীনভাবে এ নশ্বর জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। আপন স্বভাবদোষে বা অন্যায় ভাবে যিনি যতই কেন সন্দেহ করুন না, আমি ঘনিষ্ঠ ভাবে, তাঁহার সঙ্গে একান্ত অন্তরঙ্গরূপে বহুকাল মিশিয়া দেখিয়াছি—সে জীবন যথার্থ ই আদর্শ বিপত্নীক জীবনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যতঃ কোনরূপ পতন হওয়া তো দূরের কথা,—চিন্তা ও কল্পনায় পর্য্যন্ত অমন নিষ্পাপ, অকলঙ্ক ও পবিত্র লোক সচরাচর এ সংসারে খুব অল্পই দেখা যায়। পত্নী-বিয়োগের পর হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি চিরটাকাল মোটামুটি রকমে,—নিতান্তই শাদা-সিধা 'চাল' বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কেহ সাবান, সুগন্ধি বা তৈলটুকু পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে দেখে নাই। রুক্ষ-কেশ, মলিন-বেশ, নগ্ন-গাত্র, রিক্ত-পদ, বিলাত-ফেরৎ দ্বিজেন্দ্রলাল আপন বাড়িময় 'হুপ্‌ হুপ্‌' করিয়া পরুষ পদক্ষেপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন,—আজও সে দৃশ্য যেন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি! তিনি যে শুধু বিবাহই করেন নাই, তাহা নহে;

নৈতিক বল।—
বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্য।

দেবোপম তিনি,—আচারে, ব্যবহারে, জ্ঞানে, কর্ম্মে ও চিন্তায় অনেকটা যেন ঠিক হিন্দু-বিধবার ন্যায় অসীম সংযম, চরিত্রগত অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

বাল্যে আমরা যে দ্বিজেন্দ্রলালকে কেমন যেন একটু অন্যমনা ও উদাসীন দেখিয়াছিলাম, শেষ বয়সে, এই সময়ে তাঁহাকেই আবার কতকাংশে উদাসী বৈরাগীর মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইতেছি। কি খাইলেন, কি পরিলেন, নিজের সংসারে কি দিয়া যে কি হইতেছে, কি ভাবে দিন কাটিতেছে,—কোন-কিছুরই প্রতি যেন তাঁহার তেমন দৃষ্টি বা 'খেয়াল' নাই ;—কোন মতে তুনিয়ার এ দিনগুলা যেন কাটিয়া গেলেই হইল! এ যেন প্রবাসী পথিকের পান্থ-শালায় ক্ষণেকের জন্য অবস্থান মাত্র! অথচ, এ সংসারে তিনি যে কিছু করিতেন না, এমনও নহে ; কর্ত্তব্য যাহা, অবশ্য-দ্রষ্টব্য যাহা, তাহা তিনি সবই করিতেন, সকলই দেখিতেন ; শুধু, তাঁহার ঐ নিজের সম্বন্ধেই এই যত অবহেলা, আলস্য ও নির্ব্বিচার ঔদাসীন্য। নানা কার্য্যে, বহুতর ব্যাপারে লিপ্ত রহিয়াও, অমন নির্লিপ্তের ন্যায়, 'আলু-থালু' ভাবে,—আপনাকে যেন একেবারে লুপ্ত করিয়া-দিয়া,—উদাসীন বৈরাগীর মত জীবন-যাপন করিতে আমি তো অন্ততঃ (তু' চারটি মহাপুরুষকে ছাড়া) অন্য-কোন সংসারী গৃহস্থকে আর দেখিয়াছি বলিয়া বড় মনে হয় না। তাঁহার এই স্বাভাবিক ঔদাস্য সম্পর্কে তিনি আমাকে গয়া হইতে যে সব পত্র লেখেন, এস্থলে তন্মধ্য হইতে কতিপয় ছত্র মাত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যান্য বহু কথার পর নিজের সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ লিখিতেছেন,—

"এখানে বৃষ্টি নাই বল্লেই হয়, অথচ এটা শ্রাবণ মাস! রোজ রোজ সন্ধ্যায় ছাদে উঠে শুয়ে থাকি, তাতে কতক আরাম উপভোগ করি। উন্মুক্ত অবারিত নীলাকাশে অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জে রোমাঞ্চিত হ'য়ে আছে,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভাব্‌তে ভাব্‌তে আপনার এই ক্ষুদ্র গণ্ডীকে অতিক্রম করে' যেন কোথায়

উধাও হ'য়ে উড়ে যাই। * * তবে মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমার জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এ জীবন কেবল ধারণ করা মাত্র। পুত্র-কন্যা যদি না জন্মিত ত হয়ত একদিন সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যেতাম। নিজের ভোগ-লালসা বড় বেশী নাই,—যা আছে তাও বোধহয় বিনা বেশী আয়াসে ত্যাগ কর্ত্তে পারি। তবে সাহিত্যিকে যশ—এখনও আমার কাছে অতি প্রিয় ; আর,—সর্ব্বাপেক্ষা মণ্টু মায়ার মায়াই ত্যাগ করা শক্ত। সে টান বিষম টান! তাদের জন্যই আজো এই দাস্য কর্চ্ছি।" *

ইহার পর আর একখানি পত্রে † তিনি পুনরায় লিখিতেছেন—

"দেখ, আমি যতই ভেবে দেখছি, বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে 'এ জীবনটা কিছু নাঃ!' ‡ এটা একদিন একটা খুব বড় রকম Inspiration এর ধাক্কায় আমার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারে বেরিয়ে গিইছিল। (তখন এর মানে সম্যক্ বুঝতে পারিনি। এখন 'যেন' কতক বুঝছি!) দেখ ভাই! গত বৎসর পর্য্যন্ত তবু কি রকম সুখে কাটানো গেল। একদিন তুমি আর আমি সেই সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণ-মেঘান্তরিত পূর্ণচন্দ্র দেখ্‌ছিলাম,—মনে আছে? * * * আর এখন এই অসার গন্ধময় চাকরী। কোনই অর্থ নেই। ঠিক 'সোনার তরী'! জীবন-পথে যতই অগ্রসর হচ্ছি, চারিদিক্ থেকে শুধুই ঔদাস্য আর অবসাদ আমায় যেন ঘিরে ফেল্‌ছে। 'অসার সংসার' আগে বিচারে ও অনুমানে বুঝ্‌তাম,—এখন প্রতিপদে, হাড়ে হাড়েই বুঝ্‌ছি। আপন মনের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানে এ সংসারের উপরে অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজে পাই না! আসক্তি বা ভোগলিপ্সা এখন আর তিলার্দ্ধ নাই। তবে, কেন—কিসের জন্য এই পুঞ্জীভূত বিড়ম্বনা নিরন্তর ভোগ করে' মরি? * *"

এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রীতিভাজন ও তাঁহার একান্ত অনুরক্ত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র এম্ এ (হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক) মহাশয়ও আমাকে লিখিয়াছেন,—

"সকল বিষয়ে সর্ব্বদাই উদাসীনভাবে কার্য্য করিয়া যাইতেন। কোন

---

* ইংরাজী '০৩ সনের ২২' এ জুলাই, গয়া হইতে লিখিত পত্র।

† ইংরাজী '০৭ সনের ১৩' ই জানুয়ারী, গয়া হইতে লিখিত পত্র।

‡ 'জীবনটা কিছু নাঃ!' নামক হাসির গান দ্রষ্টব্য।

বিষয়েই আত্মহারা হইতেন না। একদিকে বুদ্ধদেবের মত বৈরাগ্য, অপর দিকে চৈতন্যদেবের মত প্রেম ছিল।"

হেমবাবু বহু বৎসর যাবৎ দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে ঠিক এক-বাড়ির লোকের মত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মেলা-মেশা করিয়াছিলেন ; অতএব, তাঁহার ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তির এই উক্তিকে উপেক্ষা বা অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। কিন্তু, তবু এই অকুণ্ঠ, উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদের মধ্যে যে অনুচিত অত্যুক্তি বা পক্ষপাত নাই, এমন অন্যায় কথা বলিতে সাহস করি না। তবে, এ কথাও অবশ্য আমরা এই সঙ্গে প্রচার করিতে বাধ্য যে, মানুষ বলিয়া স্বভাবতঃ বহু ব্যাপারে তাঁহার যথেষ্ট মানসিক দৌর্ব্বল্য ও অস্থৈর্য্য লক্ষিত হইয়া থাকিলেও, মোটের উপরে, সে জীবনে বৈরাগ্য ও প্রেম প্রচুর পরিমাণেই বিদ্যমান ছিল।

লোক-নিন্দা-নিরপেক্ষ দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনে কখনও কাহারও মুখাপেক্ষী হন নাই। নিজে বিচার করিয়া, আলোচনা করিয়া যাহা ন্যায্য, সঙ্গত ও কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, —সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, সত্য-নিষ্ঠ বীরের মত, তিনি তাহা প্রকাশ্যভাবে—সম্যক্ নিঃসঙ্কোচে, অসাধারণ দৃঢ়তা ও তেজের সহিত সম্পন্ন করিয়া যাইতেন। তজ্জন্য কোথায় কে কি মনে করিল তাহা তিনি আদৌ বিবেচ্য বলিয়াই গণ্য করিতেন না। সমাজ-নির্দ্দিষ্ট পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞানুসারে 'ভ্রষ্টচরিত্র' বা নিন্দিত লোকের মধ্যে কোথাও একটু সদ্‌গুণের সন্ধান বা পরিচয় পাইয়াছেন কি, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার সঙ্গে অমনই প্রকাশ্যভাবে মেলা-মেশা করিয়াছেন ;—এজন্য কতসময়ে হয়ত তাঁহাকেও লোকে কত রকমে তুচ্ছ ও নিন্দা করিয়াছে ; কিন্তু, দৃঢ়-মনা দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাতে শুধু মৃদু-মৃদু হাসিয়াছেন, আবার (আমাদের মধ্যে কেহ এ বিষয়ে তাঁহাকে সতর্ক করিতে গেলে) কখনও হয়ত দাঁড়াইয়া-উঠিয়া, হাত-মুখ নাড়িয়া, আমাদের মুখের কাছে আসিয়া, সুর করিয়া, সকৌতুকে গানই ধরিয়া দিয়াছেন,—

(আরও) রাধে বলে—'লোকের কথায় কোরোনা প্রত্যয়,
লোকে কিনা বলে' !

বাস্তবিক কত সময়ে আগুন লইয়াও তাঁহাকে খেলা করিতে দেখিয়াছি ; কিন্তু, কৈ—একটী বারের তরেও তো তাঁহার হাতে তজ্জন্য কোনরূপ একটু 'আঁচ'ও লাগে নাই ! সংসারে রহিয়া, এই কত-শত বাসনার বিবিধ ও বিচিত্র প্রলোভনরাশি অতি সহজে উপেক্ষা করিয়া, তিনি—

প্রলোভন হ'তে দূরে,—বিজনে, অরণ্য-কোণে
যোগী কি বৈরাগী
সংবরিতে আত্ম-মন যে সাধন-সিদ্ধি তরে
নিত্য রহে জাগি',

—সে সুকঠিন সাধনায় অবিচলিত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে অনেকাংশেই সাফল্য বা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি।

উদার ও অকপট দ্বিজেন্দ্রলালকে সর্ব্বতোভাবে দেখিবার ও চিনিবার পক্ষে যদিচ কাহারও কোন বাধা-বিঘ্ন বা অসুবিধা হয় নাই ;—কারণ, তাঁহার ভিতরে ও বাহিরে কোন-দিনও বিন্দুমাত্র বৈষম্য, পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য ছিল না ;—তবু, তিনি সর্ব্ব বিষয়ে ও সব রকমে, দয়া করিয়া, 'প্রাণোপম' অকৃত্রিম প্রীতির সহিত, আমার মত হীন, অযোগ্য ও অপদার্থকে যতটা আপনার বলিয়া চিরকাল অচ্যুত আগ্রহে সমভাবে ভালবাসিয়াছিলেন, সত্য বলিতে কি,—ততটা বুঝি তাঁহার পরমাত্মীয় ও বন্ধুবর্গের মধ্যেও অনেকের অদৃষ্টে ঘটে নাই। ব্যক্তিগত এ কথাটা এমন নির্লজ্জভাবে এখানে আমার বলার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আর কিছু না হোক্, অন্ততঃ এ জন্যও হয়ত সহজেই পাঠকবর্গ দ্বিজেন্দ্রলালের আভ্যন্তরীণ জীবন সম্পর্কে আমার এই-সব উক্তি সম্যক্ অভ্রান্ত ও অকাট্য সত্য বলিয়া দ্বিধাহীন

নিশ্চয়তার সহিত গ্রহণ করিতে সম্মত হইবেন। কিন্তু তবু, একা আমার কথায় তাঁহারা যদি নিঃসংশয় না-ই হইতে পারেন,—আমি দ্বিজেন্দ্রলালের আরও কতিপয় পুরাতন, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ব-লিখিত বিবরণ হইতে তাই, তাঁহাদের মন্তব্যও মুদ্রিত করিয়া দিতেছি। এ সম্বন্ধে,—

(১) শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন,—

'দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, নিরাবিল শরৎ-জ্যোৎস্নার মত ছিল। অতিবড় শত্রুও এপক্ষে তাঁহার কোনও নিন্দা রটাইতে পারে নাই।'

(২) জেলা-জজ, সুকবি শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয় এক পত্রে আমাকে লিখিয়াছেন,—

'শাস্ত্রে দেবতার কথা পড়িয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলালকে দেখিয়া তাহা প্রত্যক্ষ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র এতই মহৎ ছিল।'

(৩) শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন,—

'যে সচ্চরিত্রতার এবং সাধুতার জন্য বাল্যকালে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল, তাহা মৃত্যুর দিন পর্য্যন্তও অক্ষুণ্ণ ছিল, একথা তাঁহার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা সকলেই জানেন। তিনি যে কত-বড় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ছিলেন তাহা ভবিষ্যতে তাঁহার জীবনের অনেক ছোট-বড় কথায় দেশের লোকে জানিয়া সুখী হইতে পারিবে।'

(৪) শেষ জীবনের নিত্য-সহচর, 'দাদামহাশয়' শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী জানাইতেছেন,—

'আপাততঃ একটি কথা বলিয়া রাখি যে, যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রকে জানিতেন, তাঁহার সহিত বিশেষরূপে মিশিতেন তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, যে সকল মহাত্মাগণ চরিত্রগুণে মানবমধ্যে দেবতুল্য বা ঋষিতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, দ্বিজেন্দ্র চরিত্রগুণে তাঁহাদের কাঁহারও অপেক্ষা হীন ছিলেন না। এরূপ সত্য-প্রিয়, সরল, উদার, রিপুজয়ী, তেজস্বী লোক সংসারে বিরল। যদি দ্বিজেন্দ্রের কবি-যশঃ কিছুমাত্র না থাকিত তাহা হইলেও একমাত্র চরিত্রবলেই দ্বিজেন্দ্র পূজার্হ। * * 'সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিতম্'—এ কথা যদি সত্য হয় তবে

দ্বিজেন্দ্রে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল। যদি রিপুজয় করাকেই প্রকৃত বীরের লক্ষণ বলা যায়, তবে দ্বিজেন্দ্রও একজন প্রকৃত বীর পুরুষ ছিলেন।'

অধিক মিষ্টতায় তিক্ততার উদ্রেক করে, অধিক নিঙ্‌ড়াইলে এমন রুচিকর যে লেবু তাহাও বিস্বাদে পরিণত হয়। অতএব, আর এ বিষয়ে বহুল বাক্য-ব্যয়ের কোন আবশ্যকতা বোধ করি না। তবে, একথা আজ আমার ভাবিতেও বুক ভাঙ্গিয়া চক্ষে জল আসিল যে, সে নির্ম্মেঘ-গগন-নির্ম্মল, শুচি-শুভ্র, পুণ্যশ্লোক মহাত্মার চরিত্র-সমর্থন জন্য আজ এই এমন-করিয়া দশজনের প্রশংসাপত্র বা 'সার্টিফিকেট্' সংগ্রহ করারও প্রয়োজন হইতেছে! যাঁহার পুণ্য-স্মৃতি রক্ষা-কবচের মত কত দুর্ব্বল-চেতা মানুষকে আজও এই শ্বাপদ-সঙ্কুল সংসার-অরণ্যে সত্য-সত্যই নিয়ত নানারূপে রক্ষা করিয়া বাঁচাইতেছে; যাঁহার কথা দিনান্তে একবারও মনে পড়িলে এই তমসাবৃত পঙ্কিল প্রাণ শান্তি ও সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; যাঁহার অতুল্য প্রীতি ও আদর্শ সখ্যলাভে আমার এই নিঃসম্বল, শূন্য জীবনও ধন্য ও সার্থক হইয়াছিল,—এ দুর্ভাগ্য দেশে আজ যে এমন জীবও আছে যে তাঁহার প্রতিও অনাস্থা ও সন্দেহের দৃষ্টি-পাত করিতে পারে,—একথা মনে হইলেও, অমিশ্র দুঃখ ও অনুকম্পায় তাহার প্রতি একান্ত কৃপা ও সহানুভূতি সঞ্চার হয়।

স্বভাবের দোষ বা ত্রুটি-বিচার

একবার দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রকৃতির একটা অপরিহার্য্য স্বাভাবিক দোষ বা গুণ ছিল,—যাহাকে এক কথায় রঙ্গচ্ছলে তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন—'কাহারও-তোয়াক্কা-রাখিনা-বাবা'-তা! এই অনন্যমুখাপেক্ষিতা বা 'তোয়াক্কা-রাখিনা'-তা'র ফলে সারাটা জীবন ধরিয়া তাঁহাকে যে কতবার কত রকমে, কতই দুঃসহরূপে নির্য্যাতিত, অপদস্থ ও বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছে বস্তুতঃ তাহার ইয়ত্তাই করা যায় না। সমাজে থাকিতে হইলে লোক-মতকে

অতটা অগ্রাহ্য করা চলে না ; বস্তুতঃ তাহা যে কতদূর সঙ্গত বা বাঞ্ছনীয়, সে পক্ষেও 'নানা মুনির নানা মত'। 'A leader, in order to lead others, must be a follower too.' সমাজ ও দেশের যিনি নায়ক বা চালক তাঁহাকেও বহুল পরিমাণে লোক-মতের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। কিন্তু, গুণই হৌক্, আর দোষই হৌক্, এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিত্ব (Individuality) এমন দুর্দ্দম ও অনম্য ছিল যে, তিনি কিছুতে স্বীয় জন্মজাত এই স্বভাবের দ্বারা চালিত না হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কথায় বলে—'স্বভাব না যায় ম'লে'। বাস্তবিক তাঁহারও এই অপরিহার্য্য স্বভাবের দরুণ তদীয় বিরুদ্ধবাদী নিন্দকগণ অনায়াসে ও অতি-সহজে নানাপ্রকারেই তাঁহাকে লাঞ্ছিত, বিপন্ন ও নির্যাতিত করিবার অবকাশ ও সুযোগ প্রাপ্ত হইত ; এবং অসহায় দ্বিজেন্দ্রলাল, তাহা জানিয়া বা বুঝিয়াও, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিকার করিতেন না অথবা করিতে পারিতেন না।

স্বভাব-চরিত্রের কথা যখন উঠিয়াছে তখন ভাল-মন্দ দুই দিক্ দিয়াই তাহার সম্যক্ বিচারণা আবশ্যক। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রবল বিশেষভাবে আলোচনা করিতে-বসিয়া, আমরা ক্রমে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন তাঁহার চরিত্রের যাহা যথার্থ ভ্রম বা ক্রটি ছিল, প্রসঙ্গতঃ এখানে তাহারও সম্পূর্ণ আলোচনা না করিলে কর্ত্তব্যের অবহেলা ও সত্যের অপলাপ ঘটিবে।

ভাবিয়া-চিন্তিয়া, তাঁহার জীবন সম্যক্‌রূপে বিশ্লেষণ পূর্ব্বক যতটা বুঝিতে পারা যায় তাহতে মুখ্যতঃ দুইটি কারণে তাঁহার অমন অম্লান চরিত্র সম্বন্ধেও লোকে সন্দেহ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সে দু'টি কারণ এই,—(১) সুরা-পান (২) রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের শিক্ষা-দান।

প্রথম বিষয়টা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, তিনি মদ্য-পান করিয়া-থাকিলেও তাহার নির্দ্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করেন নাই।

সুরা-পান। যৌবনের প্রারম্ভে মতি-গতির স্থিরতা হওয়ার পূর্ব্বে, বিলাতে গিয়া, তিনি সেখানকার বহির্ম্মুখ-বাহ্য চাক্‌চিক্যে, —পাশ্চাত্য-সভ্যতার দুরতিক্রম্য মোহ-বিভ্রমে এতই বিমুগ্ধ বা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ইংরাজ জাতির আচার অনুষ্ঠান, রীতি-নীতির মধ্যে যত-কিছু অন্যায় ও যথার্থ দোষ বা পাপ আছে, সেগুলিকেও তিনি গুণ অর্থাৎ—সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য ও অনুকরণীয় বিবেচনা করিতে শিখিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতে গিয়া দেখিলেন—সেখানে পিতা-পুত্র, কন্যা-কলত্র সকলে একত্র পরস্পরের সাক্ষাতে পরিমিত মাত্রায় মদ্যাদি পান করা আদৌ দূষ্য বা গর্হিত গণ্য করেন না; অতএব, সে আচারটিকে তিনি স্বতঃই প্রশংসার চক্ষে দেখিলেন; এবং নিজেও তাঁহাদের দলে মিশিয়া-গিয়া, এই সর্ব্বনাশকর অভ্যাসটিকে আয়ত্ত করিতে লাগিলেন।

বিলাতী সভ্যতার মোহে মুগ্ধ হইয়া তিনি এই-যে ভীষণ অশুভ ও মন্দের অনুরাগী হইলেন, যাঁহারা তাঁহাকে তেমন ভালরূপে চিনিবার অবসর পান নাই তাঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ মনে করেন যে, পরিশেষে ইহাই তাঁহার আকস্মিক অকাল-মৃত্যুর একমাত্র কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু, একথা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। ইহাঁদের এই ধারণার মধ্যে গৌণ-ভাবে কিঞ্চিৎ সত্য নিহিত রহিলেও, ইহাঁদিগকে এটুকু জানাইয়া-দেওয়া প্রয়োজন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল যে-রোগে দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, বহু পূর্ব্বে তাঁহার মাতৃদেবীও ঠিক-সেই রোগে লোকান্তরিতা হইয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত হইতে এদেশে ফিরিয়া-আসার পর, কদাচিৎ দুর্ম্মতি ব্যক্তিদের প্ররোচনায় এক-আধবার মদ্য-পান করিতেন বটে; কিন্তু, তখনও—আমরা বিশেষ অনুসন্ধান লইয়া জানিয়াছি—তিনি পরিমিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া কখনও নিজেকে 'মাতাল' রূপে প্রতিপন্ন হইতে দেন নাই। সে সময়ে ক্বচিৎ-কখন,

'কালে-ভদ্রে' সেই-সব তথাকথিত শিক্ষিত 'ফ্রেণ্ড'-দের 'পাল্লা'য় পড়িয়া, তিনি নৌকা-বিহারকালে কিংবা কোন 'পার্টি'তে অল্প-স্বল্প পান করিতেন মাত্র,—অভ্যাসের বশবর্ত্তী হন নাই। বস্তুতঃ এই ভাবে, তাঁহার প্রিয়তমা, সাধ্বী পত্নী যতকাল জীবিতা ছিলেন ততদিন তিনি একরূপ মদ্য-পান করিতেনই না, বলিতে পারা যায়; কারণ, দেবী সুরবালা এ ব্যাপারের উপরে মর্ম্মান্তিক বিরক্ত ছিলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই সাধ্বী মহিলার পরলোক-গমনের পর, ঐ-সব তথা কথিত 'বন্ধু'দের পরামর্শ ও প্ররোচনার ফলে, তিনি আবার মধ্যে-মধ্যে দু'একদিন একটু-একটু করিয়া সুরা-পান আরম্ভ করেন; এবং শেষে, গয়ায় থাকিতে তাঁহারই কোন সাহেবী ভাবাপন্ন সুহৃদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া, তিনি এই অকর্ম্মটাকে অল্পে-অল্পে কতকটা অভ্যাসেই পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিন বৎসর যাবৎ প্রত্যহ সন্ধ্যার পর একটু-একটু করিয়া,—ঠিক পরিমিত মাত্রায়—মদ্যপান করিতেন সত্য; কিন্তু, আমি ঠিক জানি, শত অনুরোধ পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও, তিনি কদাপি দুই 'পেগে'র অধিক সুরা-সেবন করেন নাই।

পরিমিত মাত্রায় সুরা-পান করার কথা এ দেশে অনেকে হয়ত অসম্ভব বলিয়া মনে করিবেন,—অবশ্য তাহা সহসা বিশ্বাস করাও দুরূহ; কিন্তু, অন্যের পক্ষে যাহা অসাধ্য বা অসম্ভব, দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে তাহা যে খুব সহজ ও স্বাভাবিক ছিল,—তাঁহাকে যাঁহারা জানিতেন, তাঁহার অসাধারণ মনোবলের যাঁহারা বহুবিধ পরিচয় সর্ব্বদা চাক্ষুষ করিয়াছেন,—তাঁহাদের পক্ষে তাহা অকপটে স্বীকার করা কষ্টকর নহে। সচরাচর বহু বিষয়ে সাধারণ মানুষের অপেক্ষা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন যে অনেক স্বতন্ত্র ও শ্রেষ্ঠ স্তরের দুর্লভ পদার্থ ছিল তাহা একটু চিন্তা করিয়া-দেখিলে স্বতঃই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। বিপত্নীক হওয়ার পরেও তিনি বহুকাল অন্যের

অনুরোধ-উপরোধ ভিন্ন মদ্য স্পর্শ করিতেন না, এবং যদিও বা কখনও করিতেন ত' সে নিতান্তই নগণ্যভাবে,—নামমাত্র! তৎকালে 'ক্বচিৎ ভবিষ্যতে' তাঁহাকে যেটুকু পান করিতে দেখিয়াছি, অন্য-কেহ তাহা করিলে,—দুর্নাম হওয়া তো দূরে-থাক্,—হয়ত কেহ তা' 'টের'ও পাইত না। কিন্তু, একে তো দ্বিজেন্দ্রলাল 'নাম-জাদা' যশস্বী লোক, তাহার উপরে তিনি যখন পান করিতেন —একেবারে সমস্ত লোকের চোখের সম্মুখেই গেলাসটা লইয়া-আসিয়া, পান করিতে বসিয়া-যাইতেন; —তাহার মধ্যে তিলার্দ্ধ 'লুকাচুরি', সঙ্কোচ বা কিছুমাত্র গোপনতা থাকিত না। এই দুইটি হেতুবশতঃ, এ সম্পর্কেও তাঁহার যথার্থ যেটুকু দুর্ব্বলতা বা অপরাধ তাহা লোক-রসনায় শত-সহস্রগুণে অতিরঞ্জিত হইয়া বাহিরে রাষ্ট্র হইয়াছিল। ফলতঃ, তিনি যদি লোক-মতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আর একটু সতর্ক হইয়া জীবন-যাপন করিতেন তবে একথা নিশ্চয় যে, অতি-সহজে তিনিও একজন সাধু-মহাত্মা বলিয়া সমাজে পরিকীর্ত্তিত হইতে পারিতেন। কিন্তু, তদ্বিষয়ে তাঁহার তিলার্দ্ধ খেয়াল তো ছিলই না;—বরং, তদ্রূপ আচরণকে তিনি নির্লজ্জ কাপুরুষতার লক্ষণ বলিয়া অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন।

অবশ্য, একদিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এ সংসারে সর্ব্ব বিষয়ে লোক-মুখাপেক্ষী হইয়া, কেহ কোন দিন যথার্থ 'বড়' হইতে পারে নাই। আত্ম-নির্ভর ও স্বানুবর্ত্তিতা ব্যতীত শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধদেব, যিশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীবিজয়কৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ এ জগতের যাঁহারা অবতার ও নায়ক তাঁহাদের কাহাকেও আমরা যে পাইতাম না, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ শৈশব হইতে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি—দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে বহিরন্দর একেবারে অভিন্ন ছিল; সে জীবনে সদর ও অন্দর বলিয়া দুইটি পৃথক্ ভাগই

ছিল না। এ অবস্থায়, অমন সরল ও সম্পূর্ণ 'খোলাখুলি'-ভাবের 'ভোলানাথ' পুরুষের পক্ষে আপনাকে কোন প্রকারে বিন্দুমাত্রও প্রচ্ছন্ন বা গোপন করিয়া-রাখা, নিতান্তই কি অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক হইত না ?

একবার তাঁহার কোন-একটি অল্প-বুদ্ধি বন্ধু তাঁহাকে আসিয়া বলিলেন,—

"আচ্ছা, যদি মদ খেতেই হয়, একটু আড়ালে গিয়ে খেলে কি ক্ষতি হয় ? লোকে যে ভারী নিন্দা কর্‌ছে।"

যেই এই কথা কয়টী বলা অমনই 'দর্পী' দ্বিজেন্দ্রলাল সর্পাহত ব্যক্তির ন্যায় লাফাইয়া-উঠিয়া বলিলেন,—

"কি !—আমায় তোমরা কি মনে ভাব, বল ত ? যদি এমন পাপই করি বলে' আমি বুঝ্‌তাম ত' আমিই কি এটা এক্ষণই ছেড়ে' দিতে পার্‌তাম না ? চুরিও করিনি, রাহাজানিও করিনি,—অত ঢাকা-ঢাকি, ছাপাছাপি কর্‌তে যাব, কি-এমন দায়ে ঠেকেছি ?"

বন্ধুটি এ কথায় একটু যেন দমিয়া-গিয়া, ভয়ে ভয়ে বলিলেন,—

"তা, যা' কর্‌ব—সবই কি বিশ্ব-শুদ্ধ লোককে জানিয়ে, ঢাক পিটিয়ে কর্‌তে হবে ?"

দ্বিজেন্দ্রলাল এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলেন, এখন বসিলেন। পরে, একটু শান্ত স্বরে সেই বন্ধুটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—

"হাঁ, তাই। আমি যা',—আমি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা চাই যে, আমায় লোকে ঠিক সেইভাবে ততটাই জানুক। কোন রকম 'ঢাক্-ঢাক্, গুড়্-গুড়্' আমার ধাতে সয় না! কপট হ'য়ে, মিথ্যে করে' সাধু নাম জাহির করাকে আমি মানুষের নিকৃষ্টতম অধঃপতন বলে' মনে করি। এই ভণ্ডামির মত পাপ আর কিছু নেই। Take me at my worst !—আমার যা' সব-চেয়ে খারাপ তা'ই দেখে' আমায় বিচার কর।"

—এই বলিয়া, তিনি ইংলণ্ডে ক্রম্‌ওয়েল তাঁহার চিত্রকরকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সুবিদিত গল্পটি আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিয়া

পরিশেষে কহিলেন,—'Paint me as I am' (আমি যা' তাই আমাকে চিত্রিত কর।') এই ঘটনারই অব্যবহিত কাল পরে, চটিয়া-গিয়া, তিনি 'আলেখ্যে' প্রকাশিত সেই 'মন্তপ' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটি রচনা করেন।

বাস্তবিক, একটু বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, লোকনিন্দার অতীত হওয়া মনুষ্য-দেহধারীর পক্ষে কোনদিনও সম্ভব হয় নাই, বুঝি তা' হইতেও পারে না। স্বয়ং মহম্মদ, যীশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ—কাহারও জীবনে যাহা কস্মিন্‌কালেও সম্ভবপর হয় নাই, তুচ্ছ দ্বিজেন্দ্রলাল যে তাহাতে চেষ্টা করিলে কৃতকার্য্য হইতেন, এমন মনে করাও কি বাতুলতা নহে? কবি বলিয়াছেন বটে—

'অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকম্
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতাং মহাত্মনাম্।'

কিন্তু, কেবল বিদ্বেষ বা হিংসাবশেই যে মানুষ পর-নিন্দা করে তাহাও তো নহে;—এমনও দেখা যায় যে, অনেকে নিতান্ত অকারণে, নিঃস্বার্থ ও নিষ্কামভাবেও, কেমন-যেন লোকের নিন্দা করিতে একটু ভালইবাসে।

যাহাহৌক্, স্ত্রী-বিয়োগের পরও প্রায় দুই-তিন বৎসর তিনি অন্যের অনুরোধে, একাকী, স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া কখনও সুরা-স্পর্শ করেন নাই। কিন্তু, ইহার পর তিনি ৺গয়ায় বদলী হইয়া গেলে, পূর্ব্বে বলিয়াছি—সেখানেই তাঁহার জনৈক 'উচ্চ-শিক্ষিত,' সাহিত্যিক সুহৃদের সংসর্গে আসিয়া, তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে কাছারী হইতে ফিরিয়া, একটু-একটু করিয়া নিয়মিত পান করিতে আরম্ভ করেন; এবং ক্রমে, এইরূপে তাঁহার অম্লান মনে অল্পে-অল্পে অবশেষে এ বিষয়ে একটা যেন আসক্তিই জন্মিয়া যায়।

অবশ্য এটা ঠিক যে, তিনি মনে-মনে পরিমিত পানকে তেমন দোষ বা অপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। এ কথার প্রধান

প্রমাণ এই যে, তিনি অসঙ্কোচে সকলের সমক্ষে পান করিতেন ; আপনার পূজ্য ও সম্ভ্রমার্হ যে-কোন আত্মীয়, এমন কি—আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরগণের নিকটেও অম্লানবদনে পান করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না। তিনি বলিতেন,—

"যে কাজ করিতে মনে কোনরূপ সঙ্কোচ আসে, সাধারণতঃ তাহাকেই অবৈধ ও অন্যায় গণ্য করিয়া সেসব মোটে না করাই উচিত। আবার, পক্ষান্তরে যা' নির্দ্দোষ বলিয়া নিজের মনে ঠিক বুঝা যায় তাহা আদৌ কাহারও কাছে গোপন করা কর্ত্তব্য নহে।"

এই নীতি তিনি যে কেবল মুখে প্রচার করিতেন তাহা নহে ; পরন্তু, ইহা বর্ণে-বর্ণে স্বীয় জীবনের প্রত্যেক আচরণে পালন করিয়া গিয়াছেন।

অনেক সময়ে এই কু-অভ্যাসের কারণ-নির্দ্দেশ করিয়া আত্ম-প্রতারিত তিনি আমাদিগকে বলিতেন,—

"দেখ, তোমাদের স্ত্রী আছেন, সংসারে অন্যান্য নানারূপ আশ্রয়-অবলম্বন আছে ; কিন্তু, আমার তা'র কি আছে ? কিছুই নাই ! এইজন্য ভয়ানক ঔদাস্য ও অবসাদ আসিয়া যখন আমার দেহ-মনকে অভিভূত করিয়া, জড়াইয়া ধরে তখন—In order to shake off that lethargy, dullness and depression, আমার একটু-একটু পান করা দরকার বোধ করি। ওটা যে আমার পক্ষে শুধু একটা support or strength (অবলম্বন বা বল) তা' নয়,—Necessity'ও (প্রয়োজনও) বটে।"

ঠিক এই কথার সমর্থন করিয়া, 'Evening club' এর অন্যতম প্রবর্ত্তক, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য আমাকে লিখিয়াছেন,—

"পানাসক্তির জন্য কেহ কেহ আমার নিকট নিন্দা করেন। ইহাতে আমার ব্যথা লাগায় আমি তাঁহাকে একদিন স্পষ্ট বলি যে, 'মহাশয় চন্দ্রে কলঙ্ক না থাকিলে সে যে আরও সুন্দর হইত তাহাতে যখন কোন সন্দেহ নাই তখন মহাশয়ের এ দোষটুকু বর্জ্জন করিলেই যে ভাল হয়, ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।"

তাহাতে তিনি বলেন—"খুব সত্য বলিয়াছ। আমি চিরদিনই কিছু এ রকম ছিলাম না। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর শরীর ও মন এত অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, কোন কর্ম্মেই আমি আর মনঃসংযোগ করিতে পারিতাম না। এই সময়ে একজন ডাক্তার বন্ধুর পরামর্শে আমি এই মদ্য-পান আরম্ভ করি; এবং পূর্ব্বে সন্ধ্যার সময়ে আমার কিছুই ভাল লাগিত না, ইহাতে কিন্তু একটু শান্তি পাইতে থাকি। সেই অবধি এটা কতকটা যেন অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, আমি কোনদিনই পরিমিত মাত্রার অতিরিক্ত পান করি না।"

এখানে একথটা স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল এই-যে ডাক্তার-বন্ধুটির পরামর্শ সরল হিতবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে আমরা প্রায়ই দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত অতঃপর একত্র বসিয়া, বেশ 'বিনা খরচায়', ইচ্ছামত মদ্য-পানে মত্ত হইতে দেখিয়াছি। দ্বিজেন্দ্রলাল এক কবিতায় লিখিয়াছিলেন,—

* * * *

"যখন আসে উদাস ভাবটা অথবা হতাশা বড়,
যখন বাদ্‌লায় একা মনের অবস্থাটা গুরুতর
তখন নেশার আশ্রয় নিই,—অবসন্ন হই পাছে।"—ইত্যাদি।

বাস্তবিক, এই ভ্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই, তিনি এই প্রলোভনটাকে ক্রমে প্রয়োজন বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। হায়, বিবেকী মানুষও দুরতিক্রম্য প্রলোভন বা অন্যায়ের অনুবর্ত্তী হইলে, এইভাবেই আত্ম-বঞ্চনার দ্বারা সান্ত্বনা ও তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করে বটে!

অবশেষে, একদিন অনন্যোপায় হইয়া তাহার একজন প্রকৃত বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন,—

"আপনি বলেন যে, মদ খাওয়া দোষের নয়, মদে খাওয়াই দোষের।" ফলতঃ আপনার নিজেরই কিন্তু এখন তদবস্থা হইয়াছে। আপনি যত অল্প,—যেটুকুই কেন খান না, তাহাই ক্রমে আপনাকে এখন 'পাইয়া' বসিয়াছে। আপনার সাধ্য কি যে, আপনি মদ ছাড়িতে পারেন?"

—এই কথা শুনিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল একটু ম্লান হাস্য করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া রহিলেন,—সে কথার কোন উত্তর করিলেন না ; বরং প্রসঙ্গটা যেন নিজে ইচ্ছা করিয়াই চাপা দিলেন বলিয়া আমার বোধ হইল। কিন্তু, যথারীতি সে দিন সন্ধ্যাকালে যখন তাঁহার 'মজলিসে' গেলাম, দেখিলাম—তিনি একাই বেশ বসিয়া-বসিয়া সমবেত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দিব্য গল্প-গুজব করিতেছেন,—সে দিন আর তাঁহার সম্মুখস্থ টেবিলে তদীয় সন্ধ্যা-সঙ্গী সেই সুরার পাত্রটা নাই। ব্যাপারটা মনে-মনে বুঝিলাম, প্রকাশ্যে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করার দরকার হইল না। অন্যের সহিত আলাপ করিতে করিতে, একবার—একবার মাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্যহ যেস্থানে সে পাত্রটি রক্ষিত হইত সেখানে হাত বুলাইয়া, আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। আমিও মনে-মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। ইহার পরে প্রায় ২॥ কি ৩ মাস তিনি একেবারে মদ্য স্পর্শ করেন নাই। তখন, একসঙ্গে এতদিন তাঁহাকে মদ্য-পান করিতে না দেখিয়া আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু, কিছুকাল এইভাবে কাটিলে, একদিন তাঁহার কাছে গিয়া দেখি—সেই-সব 'বিষ-কুম্ভ-পয়োমুখ' বন্ধুদের ২।৩ জন আবার তাঁহাকে ঘিরিয়া, 'আসর জম্‌কাইয়া' বসিয়া আছেন ; আর, তাঁদের সকলেরই সম্মুখে এক-একটা গেলাস বিরাজ করিতেছে ! ধীরে-ধীরে কাছে গিয়া কানে-কানে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আবার এই কি ?" দ্বিজেন্দ্রলাল তদুত্তরে সুস্পষ্টভাবে স্বাভাবিক সুরেই বলিলেন—"কেন ? প্রমাণ তো হয়েই গেল যে, এটা আমার প্রভু নয়। তবু যে খাই, That's only just to pick me up ! (অর্থাৎ "এ শুধু আমার নিস্তেজ ও অবসন্ন মনোবৃত্তিকে একটু তাজিয়ে তোলবার জন্য।"

যাহা হউক, এতদ্দ্বারা সুরা-পান অভ্যাসটা তখনও যে তাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল তাহা বোধ হয়। একটা প্রমাণ—আমি নিজে যাহা

জানিতাম—তাহা তো ঐ উপরে বলিলাম। কিন্তু, তদ্ভিন্ন তিনি যে আরও-কয়েকবার অন্যান্য বন্ধুগণের নিকটেও এবিষয়ে পরীক্ষা দিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি আর মাত্র একটা উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিব। শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইতেছেন,—

"আমার কাছে তাহার কিছু লুকানো থাকিত না—সে লুকাইয়া রাখিতে জানিতও না, বাস্তবিক পারিতও না। মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত সে যখন যেখানে গিয়াছে বা যাহা যাহা করিয়াছে তাহার সব খবরই আমি রাখি। তাঁহার চরিত্রে পরোক্ষভাবেও কোনপ্রকার দোষ বা কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। দোষের মধ্যে—বিলাত যাওয়ার ফলে যে একটু-আধটু সুরা-পান করিত, এই যা! বিপত্নীক হইবার পর তাহার একটু মাত্রাও যেন চড়িয়াছিল, অর্থাৎ—তাহা প্রাত্যহিক নিয়মিত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছিল। এজন্য অনেকবার আমাদের কাছে সে তিরস্কৃত হইয়াছে; কতবার গ্লাসের মদ ফেলিয়া দিয়াছি, মদের বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। অনেকবার মাঝে-মাঝে সে ২।৩ মাস সুরা-পান একেবারে বন্ধও রাখিয়াছে; কিন্তু দু'একটি পিশাচপ্রকৃতির বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর 'সখা' আসিয়া জুটিলে তাহাদের খাতিরে তাঁহাকে আবার বোতল খুলিতে হইত। এইটুকু ছাড়া, সে দেবোপম চরিত্রে আর কোনই কলঙ্ক ছিল না। সে সরল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তেজস্বী ও বন্ধু-সেবক ছিল।" ইত্যাদি।

পাঁচকড়িবাবু ও আমাদের এই-সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক বিবরণের পরেও যদি নিন্দকদের বিষ-স্রাবী, দুরন্ত রসনার উৎসাহ-ভঙ্গ না হয় তবে বলা বাহুল্য—আমরা নিতান্তই 'নাচার'!

তবু, 'বার-বার তিন বার'—এই প্রচলিত বাক্যের অনুসরণ করিয়া, আমরা এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ জীবনের প্রতিবাসী ও নিত্য-সহচর, নাট্যগুরু ৺দীনবন্ধুর সুযোগ্য পুত্র, শুদ্ধ-স্বভাব শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় এ সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সংক্ষেপে আমি এস্থলে মুদ্রিত করিতেছি,—

"অনেকের একটা বিশ্বাস আছে যে, তিনি মদ্য-পানে অত্যন্ত আসক্ত,—যাহাকে বলে 'মাতাল',—তা'ই ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি যে, ইহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না! এমন দিন খুব কমই গিয়াছে যে দিন অন্ততঃ একবার তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা না হইয়াছে। আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, যদিও তিনি শেষে প্রত্যহ নিয়মিত পান করিতেন তথাপি কোনদিন তিনি তাঁহার পরিমিত ও নির্দ্দিষ্ট মাত্রাটি ছাড়াইয়া যান নাই। মদ্য-পান করিয়া তিনি কোনদিন বিহ্বল, আত্মহারা বা উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছেন,—এমন কথা যদি কেহ বলে ত' সে ঘোর বিদ্বেষ-প্রসূত মিথ্যা কথা ছাড়া আর কি বলিব ?"

দ্বিজেন্দ্রলাল স্পর্দ্ধাভরে নিজেও এ সত্য পরোক্ষে প্রচার করিয়া গিয়াছেন,—

'বিপদ্ আছে মদ্য-পানে বলেই সেটা এমন মজা ;
বিপৎটাকে পেড়ে ফেলে উড়িয়ে দিই জয়-ধ্বজা !
আমি দক্ষিণ হস্তে নিয়ে সুরা-পাত্রে, সাম্‌নে ধরি,
বলি তাকে দৃঢ় স্বরে—দেখ, সুরা শুভঙ্করী !
তুমি কাহার হাতে জান ? দেখ, চুপটি করে থাক,—
যতই বল, দু'টি আউন্সের বেশি আমি খাচ্ছি নাক ;
তুমি থাক্‌বে আমার বশে অদ্য এবং পরে নিত্য,
মনে থাকে যেন সুরা তুমি আমার বাঁধা ভৃত্য !
সর্প নিয়ে খেলার মত আমি তোমায় নিয়ে খেলি।
এই কথাটি বলে' তারে ঢ—ক্ করে' গিলে' ফেলি।'

এই কয়েকটি ছত্রে তিনি স্ব স্বভাবের যথাযথ, 'হুবহু' চিত্রটি অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি আরও রাশি-রাশি সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া-দিতে পারিতাম ; কিন্তু, সত্য বলিতে কি—তাহাতে আমার অত্যন্ত ক্লেশ ও দ্বিধা বোধ হইতেছে। শুকতারার ন্যায় অকলঙ্ক ও সুন্দর যাঁহার চরিত্র তাঁহাকে পবিত্র প্রতিপন্ন করার জন্য আজ বাহিরের দশ জনের সুপারিশ ও সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে

হইবে,—একথা ভাবিতে গেলেও যে মনে গভীর ক্ষোভ ও অকথ্য দুঃখের উদয় হয়! যাহা হৌক্, আমরা দেখিলাম—দ্বিজেন্দ্রলাল যদিও শেষ জীবনে কয়েক বৎসর সুরাসক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু, তবু কোনদিনও তিনি তাহার ন্যায্য সীমা বা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা ভ্রমক্রমেও অতিক্রম করেন নাই; এবং সেই নিয়মিত পানও তাঁহার পক্ষে অনিবার্য্য ছিল না, বরং তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছাধীনই ছিল।

অবশ্য, কথা-প্রসঙ্গে বা তর্কের খাতিরে নিজের পক্ষে এই পরিমিত মদ্য-পানকে তিনি যতই-কেন সমর্থন করিতে চেষ্টা করুন না, ভিতরে-ভিতরে তিনিও যে এজন্য কোনরূপ আত্ম-গ্লানি অনুভব করেন নাই,—আমি তাহা মানিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহার মত বুদ্ধিমান্, চরিত্রবান্ ও বিবেচক ব্যক্তির পক্ষে এত-বড় একটা গুরুতর প্রলোভনের অনুরক্ত হইয়া-পড়া, এ যে বড় সুখকর ছিল তাহা কোন মতেও মনে করা যায় না। বরং আমার ধ্রুব বিশ্বাস—তিনি এজন্য নিজের কাছে নিজে বেশ যেন-একটু লজ্জিত ও কুণ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু সেটা তাঁহার সেই প্রতারক, প্রলুব্ধ মন কিছুতেই স্পষ্টতঃ তাঁহাকে ঠিক-মত বুঝিবার অবকাশ দেয় নাই,—বরং, নানাবিধ বাজে যুক্তি দেখাইয়া ও সতত স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া, সে তাঁহাকে মজাইয়া রাখিয়াছিল। ঐ যে তিনি বার বার ডাক্তার বা চিকিৎসকের পরামর্শের দোহাই দিতেন, ঐ যে অবসাদ ও ঔদাস্য-দমনের কারণ দর্শাইতেন, ঐ যে প্রথম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে বলিলেন,—"আমি চিরদিনই কিছু এমনটা ছিলাম না," —এসবের দ্বারা বেশ মনে হয়, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়,—এক-একবার তাঁহার বিবেক যেন ভিতর হইতে বিদ্রোহ-ঘোষণা করিতেছে; আর, তিনি যেন ঐ-সব অযথা যুক্তি ও ব্যর্থ প্রবোধ-বাক্যে তাহাকে কেবলই কোন মতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন! সত্য বটে যে, আত্ম-প্রতারিত তিনি এ কাজটাকে স্পষ্টতঃ তেমন পাপ বা

অন্যায় বলিয়া বুঝিয়া-উঠিতে পারেন নাই। (কেন-না, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় জানি এবং শপথ করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি যেমন করিয়াই হৌক্, তাহা অবশ্য তৎক্ষণাৎ পরিহার করিতেন।) কিন্তু, এত-বড় একটা ভ্রমবুঝিয়াও বুঝিতে-না-পারা,—এই-যে শোচনীয় আত্ম-বঞ্চনা, ইহার মূলে আর কিছুই নহে, ইহার মূলে—ঐ সুরার প্রতি আসক্তিই গোপনে ও নীরবে তদীয় মনের কোণে লুকাইয়া-রহিয়া, তাঁহাকে অসহায়-রূপে অতটা দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছিল! উঃ,—এ কি ভয়ঙ্কর, দুর্দ্দম রিপু,—যাহার কুহক-মোহে পড়িয়া, এমন একজন দৃঢ়-চেতা, বীরপুরুষও ক্রমে এতদূর অন্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন!

মদ্য-পান সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের বিবেক-বুদ্ধি যে তাঁহাকে বিরক্ত করিত, সে সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ এখানে আমি তাঁহারই একখানা পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—পাঠক তাহা হইতে আমার এ ধারণা সত্য কি মিথ্যা, সহজেই স্থির করিতে পারিবেন। পত্রখানি বঙ্গের নব-জাগরণসূচক 'স্বদেশী'-আন্দোলনের সময়ে লিখিত। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশী-আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পরে, প্রথমতঃ কিছুকাল খুলনায় কাজ করিয়া, তাহার পর ৺গয়ায় গিয়া, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ-কাল তথায় স্থায়ীভাবে বাস করেন। আমরা জানি—এই গয়াতেই তিনি নিয়মিত মদ্যপানে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ পত্রখানিও ঠিক সেই সময়ে লিখিত। দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যান্য কথার পরে লিখিতেছেন,—

'লোকেন * বল্লেন, তাঁর পিতা মিঃ টি, পালিত Technical Institute-এর জন্য ১০ লাখ টাকা দিয়াছেন। আমি শুনে লাফিয়ে উঠে বল্লাম, এ দান গোপনে রাখবার নয়,—ঢাক পিটিয়ে জাহির করা উচিত। জমিদারেরা দেখুক যে, একজন খেটে রোজগার করে' আজীবন-সঞ্চিত ধনরাশি মহৎ উদ্দেশ্যে—

* লোকেন—Late Mr. L. Palit, জেলা-জজ ৺লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই-সি-এস্ মহাশয়।

countryর cause-এ ('দেশের জন্য') দিতে পারে। তক্তার উপরে দাঁড়িয়ে 'যেহেতু' বলে' চেঁচালেই স্বদেশহিতৈষিতা হয় না। * * আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী এবার একটা জাত হয়েছে বা হচ্ছে। যার মধ্যে একজনও তার আজন্ম-অর্জ্জিত অর্থ অকাতরে দেশের সেবায় দিতে পারে সে জাতির নিশ্চয় আশা আছে। * * * কথায় কথায় আমি,—কে তাঁর হুইস্কি খাওয়া নিয়ে ব্যঙ্গ করায় তিনি বল্লেন যে, 'আমার ওটা Weakness ; ছাড়্তে পারলে ভাল ছিল, স্বীকার করি। কিন্তু, আমি দেশের জন্যও ভাবি। শুদ্ধ ভাবি না,—তার জন্য দশ হাজার টাকা আজ পর্য্যন্ত ব্যয়ও করেছি।' আমি বল্লাম, তবে আমি আমার ব্যঙ্গ ফিরিয়ে নিচ্ছি। যার একদিকে এতদূর স্বার্থত্যাগ তাহার দুই-একটি এরূপ Weakness (দুর্ব্বলতা) আমি তো অন্ততঃ Weakness বলেই গ্রাহ্য করি না। তোমরা কি বল্তে চাও, জানি না। একটু মদ খাওয়া সম্বন্ধে একজনের যদি বাস্তবিক (এই ধর আমার,—যদিও তর্কে আমি জিতেছিলাম!) †† একটু দুর্ব্বলতাই থাকে, তাই বলে' সেই লোকটাকে কি একদম্ 'Go-to-Hell' ('নরকস্থ') করা উচিত? পিতা ও পুত্র উভয়েরই স্বদেশের জন্য কি সুন্দর স্বার্থত্যাগ! পূজ্য পরিবার বটে! সে দিন আমি সেই মহাতর্কের পর তাঁকে ঐ রকম আক্রমণ না কর্লে হয়ত তিনি নিজের সম্বন্ধে এ কথা আসলে প্রকাশই কর্ত্তেন না।' †

ভরসা করি—দ্বিজেন্দ্রলালের এ চিঠি পড়ার পর আর কাহারও সন্দেহ নাই যে, সুরা-পানকে তিনি তদীয় মানসিক ঔদাস্য-বিনাশের একটা আবশ্যক উপায়বিশেষ বলিয়া সমর্থন করিলেও, এটা যে তাঁহার একটা দোষ বা 'দুর্ব্বলতা' সে সম্বন্ধে তিনিও এ পত্রে স্পষ্টই 'কবুল' করিয়া বসিয়াছেন। পরিমিত পানকে তিনি পাপ বা অপরাধ বলিতেন না বটে, কিন্তু 'দুর্ব্বলতাও' যে মানুষের পক্ষে সর্ব্বথা পরিহার্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

---

†† ইতঃপূর্ব্বে আমার সহিত এ সম্বন্ধে যে তর্ক-যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন এবং যে সংবাদ তিনি তাঁহার 'আলেখ্য'-কাব্যের 'মদ্যপ' নামক কবিতায় জাহির করিয়াছিলেন, সেই কথাই তিনি বলিতেছেন।—গ্রন্থকার

† ইং ১৯০৬ সালের ২২'এ জুলাই, গয়া হইতে লিখিত পত্র—গ্রন্থকার।

আমাদের শাস্ত্র বলেন—'মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্'। দ্বিজেন্দ্রলাল সেই মদ্য ব্যবহার করিয়াছেন; সুতরাং, তিনি যে এ বিষয়ে অপরাধী তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যাহা পাপ অথবা অন্যায়,—অল্প হোক্ আর বেশী হোক্,—সকল রকমে নিঃসন্দেহেই তাহা অবৈধ ও গর্হিত; এবং তাহার অনিবার্য্য বিষময় ফল দোষীকে —আজ হোক্ আর দু'বছর পরেই হোক্—অল্প-বিস্তর কিছু-না-কিছু ভোগ করিতেই হইবে। দ্বিজেন্দ্রলাল অপূর্ণ মানুষ মাত্র। মানুষ মাত্রেই চিরকাল ত্রুটি-প্রমাদ ও নানাবিধ দুর্ব্বলতার অধীন। কিন্তু, তা' বলিয়া, সেই অল্প-স্বল্প দু'একটি ত্রুটি কিংবা অপরাধের জন্য যাঁহারা যথার্থ মহৎ,—অপরাপর বহু বিষয়ে যাঁহারা দেশের ও দশের প্রকৃত পূজ্য বা সম্মানার্হ তাঁহাদিগকে তুচ্ছ, লাঞ্ছিত বা অপদস্থ করা কিংবা তদ্রূপ হইতে দেওয়া, নিতান্তই কি অশোভন, ক্ষতিকর ও দূষণীয় নহে? তাহা সমাজের পক্ষেও যে অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের নিদান! এক্ষেত্রে, দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশী সভ্যতার বিভ্রমকর মোহবশে এই বিষম প্রলোভনকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন; তবু না-হয় তাই, এ সম্পর্কে তাঁহার যাহা হউক্ একটা কিছু-না-কিছু ওজোর ছিল। কিন্তু, তাঁহার এই একটা দোষ যদি অতই অমার্জ্জনীয় গণ্য করিতে হয় তাহা হইলে তৎপূর্ব্বে বা তৎকালে, বিলাতে না গিয়াও যে-সকল প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মারা এই ভয়ঙ্কর শত্রুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই তাঁহাদিগকে এজন্য কি তবে আমরা একেবারে নরকের তিমির-গর্ভেই স্থান-নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হই না? মহাত্মা রামমোহন, দেবোপম রামতনু লাহিড়ী, পুণ্যশ্লোক রাজনারায়ণ বসু, এমন কি—শুনিয়াছি, রাজর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই পাপ-প্রলোভনের মোহে অল্লাধিক পরিমাণে আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু, তাই বলিয়া আমরা কি তাঁহাদের প্রতি স্বপ্নেও কখনও বীতশ্রদ্ধ হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারি? এই কারণেই

বলিতেছিলাম—মানুষ, শত হইলেও, মানুষ। তাহার জীবনে ভাল ও মন্দ,—দুই-ই আবহমান কাল ছিল, এখনও আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। গুণবান্ সাধু-সজ্জনগণের চরিত্রে কোথায় কি তুচ্ছ ত্রুটি-প্রমাদ বা স্খলন-দুর্ব্বলতা রহিয়া-গেল তাহা লইয়া যেন আমরা নির্লজ্জ বাগাড়ম্বর, অশোভন ও অন্যায় আন্দোলন তুলিয়া সেসব সার্থক জীবনের অপর বহুবিধ সদ্-দৃষ্টান্ত ও মহদাদর্শের দুর্লভ, শুভ ফল লইতে অকারণ বঞ্চিত না হই। মহাকবির কথা স্মরণ করুন,—

'একোহি দোষোগুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণে ষ্বিবাঙ্কঃ।'

এই তো গেল প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য। এখন, শেষ জীবনে সংঘটিত, সেই দ্বিতীয় অভিযোগটার বিষয়েও এখানে একটু ভাবিয়া দেখা যাক্। দোষের কথা যখন একটু-আগে উত্থাপিত হইয়াছে, তখন যাহা-হয় এখনই সে বিষয়ের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া-যাওয়া দরকার। দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, রঙ্গালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়ার ফলে, ('খুব-সম্ভব!') দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রে দাগ লাগিয়াছিল।

রঙ্গালয়ের মহল্লায় যোগদান।

'প্রায়শ্চিত্ত' নামক প্রহসনখানা যখন 'ক্লাসিক'-রঙ্গালয়ে অভিনীত হয় তখন যে সব চক্রান্তে পড়িয়া বাধ্য হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সেই রঙ্গালয়ের মহল্লায় ('তালিম' বা 'রিহার্সেলে') প্রথম যোগ দিয়াছিলেন, আমরা ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবাবুর প্রদত্ত বিবরণ হইতে তাহা অবগত হইয়াছি। বেশ জানা যায়—তৎকালে পতিতা রমণীর সাহায্যে থিয়াটারের অভিনয়াদি হয় বলিয়া তিনি বিশেষ বিরক্তি ও আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ও আপত্তি সত্ত্বেও, (অভিনেত্রীগণের ষড়্‌যন্ত্রে পড়িয়া,) সেই প্রথমবার হঠাৎ মহাল্লায় যোগদান করার ফলে তিনি বুঝিলেন যে, অভিনয়াদি শিখাইবার জন্য দু'একবার সেই-সব অভাগীদের সংস্পর্শে আসিলেই

যে কলঙ্ক-পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইতে হয় তাহা নহে। এইভাবে কালক্রমে সঙ্গ-প্রভাবে ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে, এ বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য্যরকম মত-পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পরে, এমন হইল যে, এ দেশের সামাজিক রুচি ও অবস্থানুসারে তখন তিনি আর এ প্রথার বিরুদ্ধবাদী তো ছিলেনই না, বরং, অনেক সময়ে প্রকাশ্যভাবে তিনি ইহার সমর্থনও করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সর্ব্বান্তঃকরণে দ্বিজেন্দ্রলাল স্ত্রীজাতিকে সারাটা জীবন মহীয়সী মাতৃজ্ঞানে যথার্থই শ্রদ্ধা-ভক্তি ও পূজা করিয়া সতত পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু, শুধু তাহা নহে। ভ্রষ্টা নারীকেও তিনি কোনদিন ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে কু-চক্ষে দেখিতে পারিতেন না ;—চিরদিন তাঁহাদের প্রতি মনে-মনে একটা অসীম অনুকম্পা, প্রগাঢ় সহানুভূতি ও অকৃত্রিম করুণার ভাব পোষণ করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে তদীয় 'সাজাহান' নাটকে দারার পুত্র সোলেমানের মুখে তিনি আবেগভরে যে-কয়টি কথা কহিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা তাঁহারই আপন প্রাণের অকপট উক্তি। সোলেমানকে দিয়া তিনি পতিতা নারীর উদ্দেশ্যে কি বলাইতেছেন, শুনুন,—

'১ নারী। সুন্দর যুবা! কে আপনি?

সোলেমান। আমি দারা-সেকোর পুত্র সোলেমান।

১ নারী। সম্রাট্ সাজাহানের পুত্র দারা-সেকো! তাঁর পুত্র আপনি?

সোলেমান। হাঁ, আমি তাঁর পুত্র।

১ নারী। আর আমি কে, তা যে জিজ্ঞাসা কর্চ্ছ না সোলেমান? আমি কাশ্মীরের প্রধানা নর্ত্তকী—রাজার প্রেয়সী গণিকা। এরা আমার সহচরী। এস আমাদের সঙ্গে এই নৌকায়।

সোলেমান। তোমার সঙ্গে?—হায় হতভাগিনী নারী! কি জন্য?

১ নারী। সোলেমান! তুমি এত শিশু নও কিছু। তুমি আমাদের তো জান।

সোলেমান। জানি। জানি বলেই তো আমার এত অনুকম্পা। এই রূপ, এই যৌবন কি ব্যবসার সামগ্রী? রূপ—শরীর, ভালবাসা তার প্রাণ। প্রাণহীন শরীর নিয়ে কি কর্ব্বে নারী?

১ নারী। কেন? আমরা কি ভালবাস্‌তে জানি না?

সোলেমান। শিখ্‌বে কোথা থেকে বল দেখি! যারা রূপকে পণ্য করেছে, যারা হাসিটি পর্য্যন্ত বিক্রয় করে—তারা ভালবাস্‌বে কেমন করে? ভালবাসা যে কেবল দিতে চায়! সে যে ত্যাগীর সুখ!—সে সুখ তোমরা কি করে' বুঝ্‌বে, মা?

১ নারী। তবে আমরা কি কখন ভালবাসি না?

সোলেমান। বাস,—তোমরা ভালবাস কিংখাবের পাগ্‌ড়ী, হীরার আংটি, কার্পেটের জুতো, হাতির দাঁতের ছড়ি। তোমরা হদ্দমদ্দ ভালবাস্‌তে পার—কোঁকড়া চুল, পটল-চেরা চোখ, সরল নাসা, সরস অধর।—আমার এই গৌর-বর্ণ চেহারাখানা দেখেছ কিংবা আমি সম্রাটের পৌত্র শুনেছ, বুঝি তাই মুগ্ধ হয়েছ! এ ত ভালবাসা নয়। ভালবাসা হয় আত্মায় আত্মায়।—যাও মা!

*　　*　　*　　*

১ নারী। * * যুবক! এর প্রতিফল পাবে।

[প্রস্থান।

সোলেমান। ক্রুদ্ধ হও কেন মা? তোমাদের প্রতি আমার কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নাই। কেবল একটা অনুকম্পা—অসীম, অতলস্পর্শ।

*　　*　　*　　*

কি আশ্চর্য্য!—ঐ অপার্থিব রূপ, নয়নের ঐ জ্যোতি, ঐ অপ্সরাসম্ভব গঠন, ঐ কিন্নরকণ্ঠ,—এত সুন্দর, কিন্তু এত কুৎসিত!'

কেবল এই একস্থানেই নয়। 'আলেখ্য' নামক অপূর্ব্ব কবিতা-গ্রন্থে তিনি 'নর্ত্তকী'র প্রতি পুনরায় উজ্জ্বলভাবে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন,—

'এত যে যুবতী, এত যে সুন্দরী,
এত যে করেছ সজ্জা গো,
সবই বৃথা !—নাইক নারীর প্রধান ভূষা
সে নারী-সুলভা লজ্জা গো !
লজ্জাহীনা তুমি, সরে' আস যত
রূপে, চাহনিতে, হাসিতে ;—
আমি সরে' যাই ও সভয়ে পিছাই
পারি না যে ভালবাসিতে।'

*   *   *   *

'আমি অনুবিদ্ধ হচ্ছি কৃপায়,—হেরি'
প্রেমের ঐ জঘন্য নকলে।
নারি ! জান কারে ভালবাসা বলে ?
নহে সে মোটেই ও বর্গীয় ;
নহে সে হাস্য, কি ভঙ্গী, কি কটাক্ষ ;
অন্তরের সে বস্তু—স্বর্গীয় !'

*   *   *   *

'ভালবাসা চাহে ভালবাসা ; আর,
কামী চাহে শুধু কামিনী ;
কামের গোলাম হ'ব, এখনো—রে নারী !
এত নীচে আজো নামিনি।'

*   *   *   *

'তুমি যাচ্ছ যেন রাস্তায় দিয়ে হেঁটে',
দেখ্‌ছ দু'টি ধারে চাহি' রে—
সবাই আছে ঘরে আপন আপন নিয়ে,
শুধু তুমি একা বাহিরে।'

*   *   *   *

'যা হোক কিছু তবু আপন বল্‌তে পারে
সবাই এ বিশ্বমাঝারে ;

কিন্তু তুমি? তোমার যাহা কিছু ছিল
বিকায়ে দিয়াছ বাজারে।'

* * * *

'হা রে নারি! তোমার সজ্জা কান্তি দেখে'
ভাবে সবাই তুমি ধন্য গো;
কিন্তু আমার চক্ষে বিষাদ আসে ছেয়ে'
অভাগিনী তোরই জন্য গো।'

কি ঐকান্তিক অনুকম্পা! পতিতা নারীগণের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের দেব-দুর্লভ, পবিত্র হৃদয়ে এই কৃপা ও অনুকম্পার ভাবটা এত প্রগাঢ় ও বদ্ধ-মূল ছিল যে, উল্লিখিত 'নর্ত্তকী' কবিতাটি রচনার কয়েক মাস পূর্ব্বে, 'প্রবাসী'-পত্রে তিনি আমার লিখিত ঠিক ঐ-ভাবের একটি কবিতা পাঠ করিয়া, অসুস্থ শরীর লইয়াও, একদিন আমার কলিকাতার বাটীতে নিজে হাঁটিয়া-আসিয়া, আনন্দাশ্রু-সিক্ত মুখে আমাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া, সস্নেহে কতই না আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন! হায় রে, তেমন অকৃত্রিম আগ্রহে অপরের সামান্যতম গুণের সমাদর করিতে আর কি কাহাকেও দেখিব!

এইরূপে রমণী মাত্রেরই প্রতি আজন্ম তাঁহার অন্তরে যে কতটা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম সঞ্চিত ছিল তাহা—যাঁহারা তাঁহাকে জানিবার ও চিনিবার তেমন অবকাশ পান নাই তাঁহাদিগকে—আজ সম্যক্ বুঝাইতে-পারাও বাস্তবিক যেন দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছে। এই শ্রদ্ধা-ভক্তির ভাব তন্মধ্যে তো চিরকাল স্বাভাবিক ভাবেই স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; তা'ছাড়া, পত্নী-বিয়োগের পর হইতে এই সম্ভ্রমের মাত্রাটা এত অধিক বাড়িয়া-উঠিয়াছিল যে, বহু সময়ে আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম—তিনি কোন রমণীর সংস্পর্শে আসিতেও যেন বড়-বেশী সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া পড়িতেন। ভিতরে-ভিতরে সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধন রীতিমত আরম্ভ হইয়া, উহা প্রকৃতিগত স্বভাবে

পরিণত না হইলে, কোন সংসারী পুরুষের পক্ষে নারীজাতির সম্বন্ধে এরকম ভয় ও সঙ্কোচ সাধারণতঃ সম্ভব হইতে পারে না। এ বিষয়ে তদীয় জীবনের একটা বিশেষ ঘটনা উদাহরণের হিসাবে এখানে উপস্থাপিত করিলে, আমার এ বক্তব্যটা আরও বেশ সহজে ধরিতে পারা যাইবে। ব্যাপারটা এই,—

পূর্ব্বে বলিয়াছি,—স্ত্রী-বিয়োগের পর, নানা স্থান হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত, তাঁহার পুনর্বিবাহের জন্য নানাবিধ প্রলোভন-প্ররোচনা, অনুরোধ-অনুনয় ক্রমাগত তাঁহার নিকটে আসিতে আরম্ভ করিল। একবার সে সময়ে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘরের কোন-একটি উচ্চ-শিক্ষিতা, সুপরিচিতা কবি-মহিলার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ-প্রস্তাব লইয়া উক্ত রমণীটীর পিতাই স্বয়ং আসিয়া, দ্বিজেন্দ্রলালকে নানারূপে প্রলুব্ধ করিতে প্রয়াস পাইতে থাকেন। মহিলাটি বাল-বিধবা ও অপরূপ রূপবতী। প্রথমতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল এই ভদ্রলোকটির মনোগত অভিসন্ধি বা উদ্দেশ্য ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহার পুনঃ পুনঃ সাগ্রহ আহ্বানে একবার তাঁহার বাড়ীতে একটা নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যান; এবং সেখানে গিয়া, পাশ্চাত্য ভদ্র-রীতি অনুসারে, সম্পূর্ণ সরল মনে উক্ত শিক্ষিতা নারীটির সহিত সাধারণভাবে কিছু আলাপ-পরিচয়ও করিয়া আসেন। ইহার অল্প দিন পরে, ক্রমে এই ব্যাপারের আসল অভিপ্রায়টি যখন তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল, —তিনি যেন কত গুরুতর অপরাধে অপরাধী,—এমনই লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাবে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। উক্ত ভদ্রলোকটি অতঃপর আরও বহুবার কত-না বিবিধ উপায়ে পুনরায় তাঁহাকে তদীয় গৃহে লইয়া-যাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলাল আর সে দিকও কোনমতে মাড়াইলেন না। ভদ্রলোকটি তবু অল্পে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে লইয়া-যাইতে একটু অধিক মাত্রায় 'জেদ্' দেখাইতে 'সুরু' করিলে, একদিন

দ্বিজেন্দ্রলাল একটু রুক্ষভাবে, স্পষ্টতঃ তাঁহার মুখের উপরে বলিয়া দিলেন যে, হাজার যোগ্য পাত্রীই হোক্, আর শত-লক্ষ টাকাই লাভের প্রত্যাশা থাকুক, তিনি প্রাণান্তেও আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিবেন না,—এই তাঁহার অলঙ্ঘ্য, অটল, দৃঢ় সঙ্কল্প। যাহা হউক্, এইরূপে সে ভদ্রলোককে তো তখন বিদায় করা হইল। কিন্তু, একটু 'রঙ্গ' দেখিবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ আত্মীয়-বন্ধুরা তাঁহাকে এত সহজে এ ব্যাপার হইতে 'রেহাই' দিলেন না। তাঁহারা গোপনে করিলেন কি,—না, তাঁহাদেরই পরিবারস্থ কোন-একটি মহিলাকে দিয়া লেখাইয়া, কবিতার ক'এক ছত্রে একখানি প্রেম-পত্র দ্বিজেন্দ্রলালের নামে ডাক-যোগে প্রেরণ করিয়া, নিজেরা বেশ নিরীহ ভাল মানুষের মত নীরবে আসিয়া মজা দেখিতে লাগিলেন। পত্রখানি হারাইয়া গিয়াছে, নতুবা এখানে তাহা তুলিয়া দিতাম। তাহার একস্থানে ছিল,—

'উদাস করিয়া প্রাণ কি যে গেয়েছিলে গান,—
আজো প্রাণে সুর-তান বাজিতেছে তেমনি!'

এপত্রে সেই প্রণয়-প্রার্থিনী, ব্যাকুলা রমণী, যে প্রকারেই হোক্, গোপনে একদিন দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করিয়া 'প্রাণের জ্বালা' মিটাইবেন,—এই রকম একটা ইঙ্গিত ছিল। পত্র পাইয়া তো এদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল উন্মনা, অস্থির ও ক্রমে উদ্দাম হইয়া উঠিলেন। সাক্ষাতের সেই নির্দ্দিষ্ট দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, দ্বিজেন্দ্রলালের মনে আর কিছুমাত্র—সুখ-স্বস্তি রহিল না। ক্রমে সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে দিনমণি তেমনই পূর্ব্ব গগনে আসিয়া উদিত হইলেন। আহা, দ্বিজেন্দ্রলালের সেদিন দুর্গতি দেখে কে—! পাণ্ডু-মলিন মুখ, শঙ্কিত-চঞ্চল দৃষ্টি, অসহায়, আর্ত্ত আকুলতা!—বেলা যতই পড়িয়া-আসিতে লাগিল, তাঁহার উদ্বেগও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। শেষে, যখন সন্ধ্যা হইয়া গেল তখন সে মহিলাটি পাছে

হঠাৎ আসিয়া হাজির হন,—এই ভয়ে, তিনি আপন বাড়ী হইতে পলায়ন পূর্ব্বক অন্যত্র গিয়া রাত্রি-যাপন করিবার জন্য, অত্যন্ত 'ব্যস্ত-সমস্ত' ভাবে, তদনুযায়ী বিলি-ব্যবস্থা ও আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এতক্ষণ ধরিয়া বন্ধুরা তাঁহার এই বিচিত্র আচরণ ও হাস্যকর নারী-ভীতি দেখিয়া, মনে-মনে প্রভূত কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু, এখন এ ব্যাপারটা ক্রমে একটু অধিকদূর গড়াইতেছে দেখিয়া, অবশেষে তাঁহাকে আসল কথা জানাইয়া আশ্বস্ত ও নিরুদ্বেগ করা, আবশ্যক হইয়া পড়িল। দ্বিজেন্দ্রলালও তখন সব কথা শুনিয়া, এতদিন পরে যেন যথার্থই 'হাঁফ' ছাড়িয়া বাঁচিলেন! এখন, এমন-একটা 'ভুয়ো', 'উড়ো' চিঠির প্রভাবে,—একটি স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন—এই আশঙ্কায়, যে-ভদ্রলোক আপন ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এমন অস্থির ভাবে, সত্য সত্যই গৃহ-ত্যাগী হইতে উদ্যত হন,—পরস্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার অন্তরে লেশমাত্রও কুভাবের সঞ্চার হওয়া যে কতদূর স্বাভাবিক তাহা পাঠকগণই একটু বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। পত্রখানার কথা কাহারও কাছে না বলিয়া, ধীরভাবে, অন্ততঃ একটা অভিনব অভিজ্ঞতা লাভের আশায় অথবা এ বিষয়ে কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য তিনি তো আপন গৃহে অনায়াসে শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষাও করিতে পারিতেন! অযথা, এমন-একটা সামান্য চিঠির জন্য এতটা বাড়াবাড়ি, এমন 'ছেলে মানুষী', এতদূর জানাজানি তিনি কেন করিতে গেলেন? এ 'কেন'র উত্তর আমি আর না-হয় না-ই দিলাম!

যাহা হৌক্, এখন আসল অভিযোগ,—সেই মূল আলোচ্য বিষয়টার কথা উত্থাপন করা যাক্। প্রথম-প্রথম রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ ধারণা থাক্ না, শেষ বয়সে আমরা দেখিতেছি যে, তিনি এ-দেশীয় সামাজিক অবস্থানুসারে, এই-সব পতিতা রমণীর দ্বারা অভিনয় করানো, অপরিহার্য্য ও

একহিসাবে উচিত বলিয়াই বিবেচনা করিতেন। তিনি এ সম্পর্কে যাহা বলিতেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম এই যে—,

'আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে এ ব্যবস্থা শুধু যে অনিবার্য্য তাহা নহে,—এই-সব অভাগী রমণীদের পক্ষে যথেষ্ট হিতকরও বটে। সমাজে সকল শ্রেণীর, সকল অবস্থার নর-নারীর মধ্যে ভাল ও মন্দ, দুই-ই আছে। এই-সব অসহায়া পতিতাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃত অনুতপ্ত কিংবা সৎভাবে জীবন-যাপন করিতে ইচ্ছুক ও আগ্রহান্বিত, রঙ্গালয় তাহাদের জীবিকার্জ্জনের একটা উপায় করিয়া-দিয়া বরং অতি-উদার ও সঙ্গত, সাধু কর্ত্তব্যই সম্পন্ন করিতেছে। থিয়েটারে গিয়া যে-সব পাপিষ্ঠদের পতন হইয়াছে বলিয়া লোকে বলে, বাস্তবিক তাহাদিগকে নির্ম্মল রাখিতে হইলে একমাত্র ঘরে তালা-চাবি-বন্ধ করিয়া আবদ্ধ রাখা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই ; কারণ, সে-রকম দুর্ব্বল ও দুষ্ট লোক যে পথে চলিতে-চলিতেও পথ-ভ্রষ্ট ও পতিত হইবে—এ দেশময় তদ্রূপ সমূহ আশঙ্কা সততই বিদ্যমান।'

রঙ্গালয়ে গিয়া পণ্যা স্ত্রীদের দেখিয়া কাহারও যে পতন হইতে পারে, দ্বিজেন্দ্রলাল আসলে তাহাই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি স্বীয় জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন,—

'বরং থিয়েটারে গিয়া, 'ভাল বই'এর অভিনয় দেখিলে লোকের মন তাহাতে উন্নত ও পবিত্র হয়। আমি নিজে ভুক্তভোগী ; তাই, এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারি।—'চৈতন্যলীলা', 'বিল্বমঙ্গল', 'নন্দবিদায়', 'প্রহ্লাদ-চরিত্র', 'প্রফুল্ল', 'স্বর্ণলতা', 'বলিদান' প্রভৃতি দেখিয়া-আসিয়া আমার নিজের মন যে কত মার্জ্জিত, পবিত্র ও উন্নত হইয়াছে তাহা মনে করিলে আজও আমার উপকার হয়। তবে, 'বাজে', যা'র-তার-লেখা, কুরুচিপূর্ণ নাটক অথবা * * * এই-যত জঘন্য অশ্লীল 'ফার্স' প্রভৃতি দেখিলে যে চিত্ত-বিকার আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ? সে-সব বই কেবল কি অভিনয় দেখাই দোষ ? সে-সব কি ঠাকুর-ঘরে বসিয়া পড়িলেও মন খারাপ হয় না ? তবে, আর ঐ বেচারী বেশ্যাদের বা থিয়েটারের

কি দোষ হইল? থিয়েটারে গিয়া যাহারা স্খলিত হইয়াছে শোনা যায়, নিশ্চয় পূর্ব্বেই কোন-না-কোন রকমে তাহাদের চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছিল! কলুষিত মনের পক্ষে সব স্থানই সমান,—'ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভাণে'।

রঙ্গালয়ে গিয়া বারনারী দর্শনে কাহারও পক্ষে পতিত বা কলঙ্কিত হওয়ার কল্পনা পর্য্যন্ত করা যে মহানুভব ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ অসম্ভব ছিল, প্রকৃতপক্ষে যিনি তদ্রূপ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন, সেই দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে ঘনিষ্ঠভাবে আসিয়া, প্রৌঢ় বয়সে 'হয়তো বা' পথ-ভ্রান্ত হইয়াছিলেন,—এমন হাস্যকর কথা যাহারা ভাবে বা উচ্চারণও করে তাহাদের মত নীচ-চেতা, হতভাগ্য বাস্তবিক কৃপার পাত্র নয় তো কি? যাঁহারা সেই উদার-মনা পুণ্যাত্মাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে জ্বলন্ত সূর্য্যকে কৃষ্ণাভ-মলিন, নদীকে স্থাণু-নিশ্চল, প্রস্তরকে তরল-স্বচ্ছ ও বায়ুকে কুলিশ-কঠিন ধারণা করাও বরং সম্ভবে তথাপি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে কোনরূপ কলঙ্ক-লাঞ্ছিত, হীন কল্পনা করা, সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন,—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

প্রত্যুতঃ, আমরাও দ্বিজেন্দ্রলালের কায়-মনের সহিত সম্যক্ পরিচিত হওয়ায় বলিতে পারি,—উক্ত শ্লোকের মর্ম্মমত দ্বিজেন্দ্রলালকে 'মিথ্যাচার' বলিবার উপায় নাই। শুধু তাঁহার এই কর্ম্মেন্দ্রিয় বা দেহই যে শুদ্ধ, স্বচ্ছ, পবিত্র ছিল তাহা নহে; তাঁহার মনও একেবারেই নিষ্পাপ, অমলিন ও পুণ্যোজ্জ্বল ছিল। কার্য্যতঃ তিনি কোনরূপ পাপাচরণ তো করেনই নাই, অর্থাৎ—সে পুণ্য প্রভাদীপ্ত

দেহ তো গ্লানি-ক্লেদহীন ছিলই,—পরন্তু, তাঁহার চিন্তা, কল্পনা ও মনও কখনও নিম্নগামী ও কলুষিত হয় নাই।

বিলাত হইতে এদেশে ফেরার পর তিনি যখন যাহা করিয়াছেন তাহা আমরা বিশেষভাবে জানি; সুতরাং, সে পক্ষে আমাদের সমবেত সাক্ষ্যই প্রচুর। কিন্তু, আর এ বিষয়ে আমার নিজের কোন কথা না বলা ভাল; কারণ, দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলিতে গেলে,—এ সম্বন্ধে আমার 'যাহা বক্তব্য তাহা অবক্তব্য, কারণ সেটা একটা স্তবের মত শোনাবে।' তবে, তাঁহার অন্যান্য অন্তরঙ্গ বন্ধুদের বক্তব্যগুলি আর-একবার এখানে পাঠকগণকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। ইতিপূর্ব্বে আমি এই 'নৈতিক বল' শীর্ষক প্রস্তাবেই আরও তাঁহার ক'একটি বন্ধুর এ সম্পর্কীয় মন্তব্যাদি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছি। দেশে ফিরিয়া তাঁহার যে কখন কোনই অবনতি ঘটে নাই সে তো সর্ব্ব-বিদিত সত্য কথা; সে সম্বন্ধে আর-কিছু বলাও নিতান্ত বাহুল্য। কিন্তু, বিলাতে থাকিতে, সেই অবিবাহিত নবীন যুবার স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল, আর-একবার সেইটুকু আমাদিগকে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। সেখানে তাঁহার স্বদেশী সুহৃদ্‌বর্গের মধ্যে 'বঙ্গবাসী' কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া এক-কথায় আমাকে জানাইয়াছেন,—

"সেখানেও দ্বিজুর চরিত্র অতি পবিত্র ও নির্ম্মল ছিল।"

তারপর, এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া, দ্বিজেন্দ্রলালের সেই প্রবাসের সহবাসী বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) মহাশয় যে-কয়টি কথা বলিয়াছিলেন তাহা ইতিপূর্ব্বে যদিও একবার পাঠকবর্গকে উপহার দিয়াছি তথাপি, বাহুল্য হইলেও, আংশিক ভাবে তাহা আবার-একটু এখানে না বলিয়া পারিতেছিনা। তিনি বলিয়াছেন,—

* * ওকে যদি মানুষই বল্‌তে হয় ত' জান্‌বেন ও এই আজকালকার এ যুগের কেউ না,—ও সেই ভীষ্ম-টিষ্মর মত একজন অদ্বিতীয় জিতেন্দ্রিয় পুরুষ।"

দ্বিজেন্দ্রলালের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে আমি মনীষী ৺লোকেন্দ্র নাথ পালিত (L. Palit, I. C. S.) মহাশয়কে তাঁহার স্মরণার্থ শোক-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য যে পত্র লিখি, তিনি তদুত্তরে আমায় অন্যান্য কথার পর লিখিয়াছিলেন,—

"বিলেত থেকে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ। ক্রমে যে আমরা এতদূর ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম, আপনি তা' দেখেছেন। অথচ আশ্চর্য্য এই যে এতকালের আলাপের মধ্যেও আমি কখনও তাঁহার চরিত্রে বা মনে কোনরকম গলদ্ দেখতে পাইনি। এ কি সামান্য কথা? * * * বন্ধু ব'লে প্রাণ খুলে মিশেছি; কিন্তু যতই রঙ্গ-বিদ্রূপ বা ঠাট্টা-তামাসা ক'রে থাকি, মনে মনে তাঁকে আমি সম্মান—বলিব কি, ভক্তিও করিতাম। * * His was indeed an ideal character;—('বাস্তবিক তিনি একজন আদর্শ চরিত্রের মানুষ ছিলেন।')

ইহার পরেও কি আর কোন কথা বলার বিন্দুমাত্রও আবশ্যক আছে?

এখন যা' লইয়া আমাদের এই এত কথা হইতেছে সেই প্রধান অভিযোগটা সম্পর্কে, অর্থাৎ—রঙ্গালয়ের মহাল্লায় যাওয়ার দরুণ দ্বিজেন্দ্রলালের কোনরূপ স্খলন-পতন ঘটিয়াছিল কিনা, এখন আমাদের তাহাই মুখ্য বিচার্য্য। এ বিষয়ে তদীয় অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত পাঁচকড়িবাবু আমায় বলিয়াছেন,—

"এইখানে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, দ্বিজু পরে থিয়েটারের সংশ্রবে ঘনিষ্ঠভাবে আসিলেও তাঁহার সে অনাবিল চরিত্রে কোন ত্রুটি বা দোষ কখনই ঘটে নাই। থিয়েটার সংক্রান্ত সকলে—স্বয়ং গিরিশচন্দ্র হইতে সামান্য একটা অভিনেত্রী পর্য্যন্ত প্রত্যেকে—তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-সম্মান করিত। সে যখন থিয়েটারের পরিচালকগণের আগ্রহাতিশয্যে তাহার নাটকের রিহার্সালে যোগ দিতে যাইত তখন সেখানে যারা যারা উপস্থিত থাকিত সকলেই তাহাকে বাঘের মত ভয় করিত, আর দেবতার মত ভক্তি করিত।"

আমরা জানি—পাঁচকড়িবাবুর এই বিবরণের একটি বর্ণও বাজে কথা নহে। তিনি যতদিন, যতবার এই 'রিহার্সালে' যাইতেন তাহার প্রায় প্রত্যেক বারেই তাঁহার সঙ্গে-সঙ্গে ঠিক ছায়াটির ন্যায় আমাদের রসিক 'দাদামহাশয়'টি তাঁহার অনুগমন করিতেন। এই পুনঃ পুনঃ রাত্রি-জাগরণ ও অনিয়মের ফলে, শেষে আমাদের এই 'অশেষ গুণের গুণনিধি,' বৃদ্ধ 'দাদামহাশয়ে'র জীর্ণ-শীর্ণ দেহখানি তো অল্পে-অল্পে ভাঙ্গিয়াই পড়িল ;—এজন্য, ভিতরে ভিতরে, দ্বিজেন্দ্রলালের শরীরও যে অত্যধিক ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াছিল, এমন মনে করিবার কোন কারণ পাই না। কিন্তু, বঙ্গীয় রঙ্গালয়কে অভিনয়-নৈপুণ্যে সম্পূর্ণ নিখুঁৎ করিয়া-তুলিবার দিকে, শেষ বয়সে দ্বিজেন্দ্রলালের এমন-একটা আন্তরিক আগ্রহ,—'ঝোঁক্' বা 'রোখ্'—দাঁড়াইয়া-গেল যে, অবশেষে আমাদের বিশেষ নিষেধ সত্ত্বেও, যেই থিয়েটার হইতে তাঁহাকে নিয়া-যাইতে গাড়ী আসিত অমনি তিনি "উঠুন দাদামহাশয়, চলুন"—বলিয়া, ঘর-ভরা 'মজ্‌লিস্' ভাঙ্গিয়া-দিয়া, দাদামহাশয়কে লইয়া, রঙ্গালয়ে চলিয়া যাইতেন। থিয়েটারের যাত্রীরা আজ এই-যে গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র দানীবাবু, (সুরেন্দ্র ঘোষ), প্রিয়বাবু, সুশীলা প্রভৃতি অভিনেতৃগণের অত সুখ্যাতি করেন, আসল তাহার মূলে কিন্তু একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের অপূর্ব্ব শিক্ষানৈপুণ্য বিদ্যমান! উপর্য্যুপরি কিছুদিন এইভাবে মহাল্লা (রিহার্সাল) হইতে গভীর রাত্রে গৃহে ফিরিয়া, পরিশেষে এমন হইল যে, রক্ত উঠিয়া মাথা অত্যন্ত গরম হইয়া-যাইত বলিয়া, এ সময়ে প্রায়ই তাঁহাকে অনিদ্রা-জনিত অকথ্য যাতনা ও উৎপাত সহিতে হইত। রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া এবং রঙ্গালয়ের কল্যাণার্থ নিজেরই আন্তরিক আগ্রহের ফলে, হায়,—এমনই করিয়া, বুঝিয়া-শুনিয়াও, দ্বিজেন্দ্রলাল অল্পে-অল্পে আপন স্বাস্থ্য ও জীবনী শক্তির অপচয় ঘটাইতে লাগিলেন। কে বলিবে—

এই অনিয়মিত অত্যাচারই শেষে তাঁহার সেই মারাত্মক সন্ন্যাস-রোগের সূত্রপাত করিল কিনা !

'ক্লিওপেট্রা'-নাট্যকার, দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রমথ ভট্টাচার্য্য বলেন,—

'আমি তাঁহার সহিত বহুবার রঙ্গালয়ে মহাল্লা দেওয়াইবার জন্য গিয়াছি ; কিন্তু, সেখানে একমাত্র কাজের কথা ছাড়া অভিনেত্রীগণের সহিত কখনও বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে দেখি নাই। এক সময় আমার একটি বন্ধুর চাকুরী যাওয়ায় বড়ই কষ্টে পড়েন। * তিনি সখের সম্প্রদায়ের একজন খুব সুদক্ষ অভিনেতা এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও ** তাঁহার সমকক্ষ কেহ আছেন কিনা সন্দেহ করি। ইনি কষ্টে পড়িয়া অগত্যা থিয়েটারের চাকুরী পাইলেও করিতে পারেন এরূপ ভাব আমাদের নিকটে প্রকাশ করায়, আমি দ্বিজুবাবুকে তাঁহার কোন সুবিধা করিয়া দিতে পারেন কিনা জিজ্ঞাসা করি। তদুত্তরে তিনি বলেন—'সে ত সংসারী, তাহার এরূপ সর্ব্বনাশ আমার দ্বারা হইবে না। ও চাকরী করিয়া তাহার সংসার প্রতিপালন হইবে কিনা বলিতে পারি না ; যত বেতন পাইবে তাহার অধিক অপব্যয়ের আশঙ্কা আছে। সুদক্ষ অভিনেতা হইলেই অভিনেত্রীগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে এবং উহা হইতেই পতনের সম্ভাবনা।'

এই সামান্য কয়েকটি কথা হইতেও রঙ্গালয় সম্বন্ধে তিনি যে কত সতর্ক ছিলেন তাহা বুঝিতে পারা যায়। 'রিহার্সালে'র নিত্যসহচর, আমাদের দাদামহাশয় প্রসাদদাসবাবু লিখিয়াছেন,—

'ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, যে দ্বিজেন্দ্র ছিদ্রান্বেষীদিগকে দুই এক কথা বলিবার অবসর দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না ; সেই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। দ্বিজেন্দ্র যেরূপ অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন, তিনি যদি একটা ধর্ম্মের ভান করিয়া বেড়াইতে পারিতেন তাহা হইলে অনায়াসে স্থল বিশেষে বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়া লোকের চক্ষে ধূলি দিতে পারিতেন। কিন্তু কপটতা কি, তাহা তিনি একেবারেই জানিতেন না। অনেকের ধারণা, স্ত্রী-বিয়োগের পর দ্বিজেন্দ্র চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। এটি তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল। সত্য বটে

দ্বিজেন্দ্র প্রায়ই থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে এবং অভিনয়ের শিক্ষা দিতে যাইতেন এবং এই উপলক্ষে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের সহিত নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কহিতেন; কিন্তু সে কথাবার্ত্তা গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের ন্যায় একেবারে নির্দ্দোষ। যাহাকে যেটুকু শিক্ষা দিবার প্রয়োজন, তাহাকে সেই-শিক্ষা দিতেন, অন্য কোন দূষিত ভাব তাঁহার মনেও উদয় হইত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সিংহের ন্যায় স্বীয় আসনে বসিয়া থাকিতেন এবং সকলে তাঁহাকে রীতিমত ভয় ও মান্য করিত। যাহারা বিপত্নীক সম্বন্ধে এরূপ ভাবের ধারণা করিতে পারে না তাহারা ইহাতে অন্যরূপ মনে করিতে পারে, কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি, দ্বিজেন্দ্রের মন অনেকের মন অপেক্ষা এ বিষয়ে অনেক উচ্চ ছিল। আমি যতদূর জানি তাহাতে আমার দৃঢ় ধারণা এবং সত্যনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রের মুখেও শুনিয়াছি, যে তিনি আপন বিবাহিতা পত্নী ভিন্ন অন্য কোনও স্ত্রীলোকের প্রতি কখনও আসক্ত ছিলেন না। বিবাহের পূর্ব্বে বিদেশে কোন রমণীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও পরামর্শে যখন সে বিবাহ অকর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন তখন হইতে সে রমণীর সহিতও আর কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা করেন নাই। কিন্তু পণ্যা স্ত্রী সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা ছিল তাহা তাঁহার 'পরপারে' নাটক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আর অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।'

অনাবশ্যকভাবে, অকারণ আর আমিও এ সম্বন্ধে বেশি-কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। তবে, উপসংহারে শুধু আমি এ বিষয়ে আর একটামাত্র মোটা কথা বলিব; আশা করি—সুবুদ্ধি পাঠক তাহা একটু বিবেচনা করিয়া-দেখিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কথাটা এই,—বাঙ্গ্লায় একটা প্রবাদ আছে যে, 'যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত।' এ কথা কেবল মানুষের বহির্দ্দেহ সম্বন্ধে নহে—অন্তর্জ্জীবন সম্পর্কেও সম্পূর্ণ খাটে। মানুষের আভ্যন্তরীণ চরিত্রে যেখানে কোন ক্ষত বা দৌর্ব্বল্য থাকে, হাজার চেষ্টা করিলেও, মানুষ সেখানে একটু ঢাকা-চাপা না দিয়া,--গোপন না করিয়া, কোনমতে থাকিতে পারে না। সাধারণ মানব-মনের এই-যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম,—এটা কি

কেবল ঐ দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনেই ভিন্ন মূর্ত্তি বা বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছিল? তাহাই যদি না হইবে তবে আমাদের অত অনিচ্ছা ও বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও, তিনি নিজের শরীরের অনিষ্ট করিয়া, অমন অসঙ্কোচে ও সদর্পে রঙ্গালয়ের মহাল্লায় নিয়মিত গমন করিতেন কি করিয়া? যদি সেখানে তাঁহার প্রকৃত কোন দৌর্ব্বল্য বা 'গলদ্' থাকিত তাহা হইলে, এজন্য নিন্দকলোক তাঁহার দুর্নাম রটাইতেছে জানিয়া-শুনিয়াও, কি তিনি অতটা প্রকাশ্যভাবে, অমন সমুচ্চ স্বরে উপেক্ষার হাসি হাসিতে-হাসিতে, 'দাদামহাশয়ে'র হাত ধরিয়া, যথাকালে, থিয়েটারের গাড়িতে গিয়া চড়িয়া-বসিতে তিলার্দ্ধও সঙ্কোচ বা দ্বিধা বোধ করিতেন না? এই অত্যন্ত শাদা-সিধা, মোটা কথাটাও যাঁহাদের 'নিরেট্' মাথায় প্রবেশ করে না, যাঁহারা সত্যকে স্বীকার তো করিবেনই না,—সাধারণ যুক্তি ও কাণ্ড-জ্ঞানের (Common Sense' এর) মস্তকেও পদাঘাত করিতে কৃত-সঙ্কল্প তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা আজ দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বাধ্য হইয়াই বলি,—এ সব

'লোকের কথায় কোরো না প্রত্যয়,
—তারা কিনা বলে!'

বাজে লোকের এ সকল অশ্রাব্য অভিযোগে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অবশ্য কর্ণপাত করিবেন না; কিন্তু, যাঁহারা কিছু জানেন না বা ভাবেন না,—সহজেই লোক-নিন্দায় আস্থা-স্থাপন করিতে উৎসুক,—বাহিরের সেই সব সহজ-বুদ্ধি লোকেরা পাছে এরূপ অন্যায় অপবাদ শুনিয়া, সেই দেব-চরিত্রের প্রতি কোনরূপ সন্দিহান হন,—শুধু এই আশঙ্কাবশেই, আজ আমাদিগকে সময় ও শ্রমের এতটা অপব্যয় করিতে বাধ্য হইতে হইল। সজ্জনগণ এজন্য আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য— 'সাহিত্যের সেবা।' পত্নীহারা হইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের উদাস মন নিয়ত এই একই লক্ষ্যে তন্ময় রহিয়া, নিয়তির নানাবিধ নির্য্যাতন, সংসারের 'শত-শত' দুর্ব্ব্যবহার অতি-সহজেই বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইয়াছিল।

৩

দেশাত্মবোধ।—

'স্বদেশী' আন্দোলন ও তন্ময়তা।

'প্রতাপসিংহ' নামক সর্ব্বজন-প্রিয় নাটকখানি প্রকাশিত হওয়ায় শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে দ্বিজেন্দ্রলালের নাম সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতে লাগিল। এই নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল দেশাত্মবোধের যে মহিমান্বিত আদর্শখানি সমাজ-সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরিলেন তাহার ফলে, এদেশে তৎকালে যথার্থই যেন-একটা অভিনব চেতনার বিচিত্র স্পন্দন অনুভূত হইতে আরম্ভ করিল। বিধি-বরে ঠিক আবার এই-একই সময়ে এদেশে অকস্মাৎ এমন-একটি ঘটনা ঘটিল যাহাতে বঙ্গের আবালবৃদ্ধ-বনিতা —সকলেই একটা আকস্মিক, প্রচণ্ড আঘাতে সহসা সজাগ হইয়া-উঠিয়া, স্বদেশের দুঃখ-দৈন্য বিমোচনের জন্য উদ্দামভাবে অস্থির হইয়া পড়িলেন, এই অভাবিত, অদম্য ভাব-বন্যা বঙ্গের 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। আজ আমরা স্বদেশ-প্রেম বা দেশাত্মবোধ বলিতে যাহা বুঝি, ঠিক এই ধরণের দেশানুরাগ আমাদের এদেশে পূর্ব্বে ছিল কিনা, বিশেষ সন্দেহ। একটু ভাবিয়া-দেখিলে ইহার অনেকগুলি হেতু বুঝিতে পারা যায় ; তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেটা প্রধান এস্থলে তাহার একটু উল্লেখ করিয়া, আমরা এ বিষয়ে খুবই সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিতে মনোযোগী হইব।

'প্রতাপসিংহ' নাটক প্রকাশ।

ভারতবাসী যতকাল যাবৎ অন্য-কোন দেশ বা জাতির সংস্পর্শে

আসে নাই ততদিন পর্য্যন্ত এদেশে এই স্বার্থমূলক জাতীয়তা বা দেশাত্মবোধের ভাবটি উন্মেষিত হইবার কোন সুযোগ ঘটে নাই। 'পর'কে না জানিলে যেমন 'আপন' স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞান জন্মে না তেমনই অপর দেশীয়দের সংশ্রবে না আসিলে স্বদেশ-সত্তার বা স্বাদেশিকতারও স্ফূর্ত্তিলাভ ঘটে না। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতে যখন ভিন্ন-দেশবাসীর আম্‌দানী আরম্ভ হইল,—আমরা যখন অন্য জাতির সংসর্গে আসিতে 'সুরু' করিলাম, মূলে ঠিক-সেই তখন হইতে আমাদের অন্তরে স্বদেশের বিশেষত্ব, স্বজাতীয়ের প্রতি বিশিষ্ট প্রকারের এবংবিধ প্রীতি-বোধ অল্পে অল্পে বিকশিত হইয়া উঠিল। ফলে, অজ্ঞাত 'কুল-শীল', শক, হুন প্রভৃতি বিবিধ জাতির সমাগমে স্বর্ণ-গর্ভা ভারতের আদিম সন্তান সেই উদার-মতি আর্য্যজাতির মনেও এই অভিনব মমত্ব-বুদ্ধি ধীরে-ধীরে উন্মেষিত হইতে লাগিল। কিন্তু, তখনও এই চেতনার আভাস বা অঙ্কুরই মাত্র দেখা দিল,—অখণ্ড ভারতের ঐক্যমূলক দেশাত্মবোধ তখনও বোধ করি, তাহাদের মধ্যে সঞ্জাত হইবার তেমন সুযোগ পায় নাই। ক্রমে, মুসলমানের আমলে এদেশ যে পরিমাণে তাঁহাদের দ্বারা অধিকৃত হইয়া এক শাসনাধীনে আসিতে লাগিল সেই পরিমাণে এই মহত্ত্ব-জ্ঞান ও স্বাদেশিকতাও আমাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিল। বলা বাহুল্য—এই সময়ে, ইহারই পরিণতিরূপে, রাণা প্রতাপ, রাজসিংহ, শিবাজী প্রভৃতি দেশপ্রাণ মহাবীরবৃন্দের অভ্যুদয়ে প্রপীড়িতা, ভয়াতুরা ভারতমাতা কিছু-দিনের জন্য যেন একটু আশ্বস্ত ও আশান্বিত হইবার অবসর পাইয়াছিলেন। কিন্তু, তখনও ইহাঁরা খণ্ডেই তৃপ্ত,—অর্থাৎ, শুধু আপনাদের সীমাবদ্ধ দেশটুকুর ভিতরে স্বীয় গণ্ডীবদ্ধ জাতিটির উন্নতি-সাধনেই সমুৎসুক ও উদ্‌যোগী ছিলেন। এই বিরাট্ ও অখণ্ড ভারতের সকলেই যে এক মা'র পেটের

'স্বদেশী' আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সমশোণিতজীবী জাত-ভাই, এ ভাবটা তখনও তাঁহারা তেমন ভাবে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

সর্ব্ব-সমন্বয়মূলক জাতীয়তা বা একত্ব-জ্ঞান—এই অখণ্ড ভারত-ব্যাপী দেশাত্মবোধ বা স্বাদেশিকতার উপলব্ধি, খুব সম্ভব আমাদের প্রাণে প্রথম দেখা দিল—বর্ত্তমান ইংরাজ-আমলের পর হইতে। একচ্ছত্র রাজত্বের অভাবে এবংবিধ অখণ্ড ভারতের ঐক্য-বোধ ইতিপূর্ব্বে আর কখন হয়ও নাই, বুঝিবা হওয়ার আর-কোন উপায়ও ছিল না। একবার মাত্র সেই সুদূর অতীতে,—রাজর্ষি অশোকের সময়ে এই সমগ্র ভারত-ভূখণ্ড তাঁহার একাধিপত্যের অধীনে আসিয়াছিল বটে ; কিন্তু, নিরবধি অনন্ত কালের তুলনায় সেই-যে ক্ষণস্থায়ী রাজত্ব—এদেশের ধর্ম্ম, স্বাস্থ্য ও শান্তি-সংস্থাপনেই তাহা দেখিতে-দেখিতে ফুরাইয়া গেল ; কাজেই, তখনও এ সঞ্জীবন-চেতনা ও মহামিলনাকাঙ্ক্ষা আমাদের অন্তরে আদৌ সঞ্জাত বা সঞ্চারিত হওয়ার তাদৃশ কোন অবকাশ পাইল না।

বস্তুতঃ, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের এই একচ্ছত্র, বিপুল সাম্রাজ্যে তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত, এই পার্থিব বোধ-বিধায়ক, বাহ্যিক স্বাধীনতার উদ্দীপক, স্বার্থমূলক পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁহারই সম্মোহক প্রভাবে আমাদের মনে ক্রমশঃ এই সার্ব্বজনীন জাতীয়তামূলক দেশাত্ম-বোধ ধীরে-ধীরে অতি স্পষ্ট ও উজ্জ্বলরূপে আজ এভাবে উদ্ভাসিত, বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু, বিলুপ্ত-স্মৃতি সেই কোন্ অতীত যুগ হইতে এই স্বভাব-দুর্ব্বল বঙ্গদেশ পরবশতার কঠিনতম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া-থাকায়, নির্জ্জীবতা ও অবসাদ তাহার এত স্বাভাবিক ও মজ্জাগত হইয়া-পড়িয়াছিল যে, তাহার স্বাধীন চিন্তা ও স্বাবলম্বনের শক্তি একেবারে যেন একরূপ বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য, যে-সময়ে বাঙ্গালী শুধু অন্ধ অনুকরণের মোহে নির্ব্বিচারে আপনার ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ,—

এককথায় আপন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, পরানুগ্রহ-লাভের নিমিত্ত লালায়িত ও উন্মুখ রহিয়াছে, সে-সময়ে ওদিকে দেখিতে পাই—আপনাদের অনতিদূর অতীত-কীর্ত্তি ও শৌর্য্যের গৌরব স্মরণ করিয়া, এই ভারতের দক্ষিণ ভূ-ভাগে বীর্য্যবান্ মহারাষ্ট্রজাতি অমিত-দর্পে, অকৃত্রিম স্বদেশীভাবে আত্মস্থ ও প্রবুদ্ধ রহিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে স্বজাতির বহুবিধ উন্নতি-বিধান করিতেছে! এমনই করিয়া, এতটা বিপ্লবালোড়ন বা 'ঝড়-ঝাপট্টা'র ভিতরেও তাই, ঐ মারাট্টা জাতি চিরদিন স্বদেশী তন্ত্রের উপাসক থাকিয়া, আপনাদের ধর্ম্ম ও জাতিগত সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যই যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখিয়া আসিয়াছেন।

যাহাহৌক্, এক্ষণে প্রধান আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদের কথ্যটুকু লিপিবদ্ধ করা যাক্। ঠিক নির্দ্দিষ্ট কোন্ সময়ে যে আমাদের এই বঙ্গদেশে বর্ত্তমান 'স্বদেশী'র আবির্ভাব ঘটে তাহা নিরূপণ করা এক্ষণে আর তাদৃশ সহজ নহে। তবে, মোটের উপরে যতদূর জানা যায়, তাহাতে রাজর্ষি রামমোহন রায়ের সময় হইতেই বোধ হয়—লুপ্ত বৈভবের পুনরুদ্ধারের প্রতি এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সেই সর্ব্ব-প্রথম সাগ্রহ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করে। এই কারণে, সম্যক্ নিরপেক্ষভাবে ভাবিয়া-দেখিলে, অকপটে একথা আজ স্বীকার করিতে হয় যে, এই অসাধারণ মনস্বী পুরুষের পূর্ব্বে আর কেহই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার সেই সর্ব্বগ্রাসী প্রভাবের প্রবল ও দুর্ব্বার দুর্গতি-রোধ করার জন্য, সাহস করিয়া, তৎপ্রতিকূলে তেমনভাবে দণ্ডায়মান হইতে অগ্রসর হন নাই। অত্যুঙ্গ হিমালয়ের ন্যায়, দিব্য জ্যোতির্দীপ্ত, দীর্ঘায়ত দেহখানি লইয়া, যুগ-প্রবর্ত্তক রামমোহন যখন পাশ্চাত্য-প্রভাবের সম্মোহক যাদু-মন্ত্রে গড্ডলিকা-প্রবাহপ্রায় পরিচালিত, তৎকালীন শিক্ষিত-সমাজের মধ্যে তাঁহার সেই দক্ষিণ করের তর্জ্জনীটি তুলিয়া, অতি-ধীর ও প্রশান্ত পাদ-বিক্ষেপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন তখন তাঁহাকে দেখিবামাত্রই সকলে

সহসা যেন বিস্মিত, স্তম্ভিত ও কতকটা চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িল। অন্যান্য বহুবিধ উন্নতি-বিধানের সঙ্গে-সঙ্গে এই অদ্বিতীয় মহাজন এদেশের বিলুপ্ত-প্রায় মমত্ব-জ্ঞান ও আত্ম-বোধকে এই ভাবে, একক, অশ্রান্ত চেষ্টায়, সর্ব্বপ্রথম পুনরায় সঞ্জীবিত ও জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু, সেইসঙ্গে একথাও এখানে বলা দরকার যে, রামমোহন রায়ের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেশবাসীকে আত্মস্থ হইতে উদ্বুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু, তাঁহার শক্তি সে সময়ে আমাদের নীতি ও ধর্ম্মের দিক্ দিয়া যতটা সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, সমাজের অন্যান্য বিভাগে তাদৃশ সফল ও কার্য্যকর হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধুনিক শিক্ষার একান্ত বহির্ম্মুখ বাহ্য-চাক্চিক্যে দেশের শিক্ষিত-সমাজ তখন এমনই মুগ্ধ ও মোহ-মত্ত যে, ব্যবহারিক জীবনের অধিকাংশ আচারানুষ্ঠানে ইংরাজের অনুকরণ করাটাই তাঁহারা তৎকালে প্রকৃত সভ্যতার একমাত্র আদর্শ ও লক্ষণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। সুতরাং, ঋষি-পন্থানুবর্ত্তী রাজার আবির্ভাবের পর হইতে ধর্ম্মের জন্য ততটা আর পর-মুখাপেক্ষী না রহিলেও, বহির্জীবনের 'চাল-চলন' বা অন্যান্য ব্যাপারে আমরা আগেও যেমন ছিলাম এখনও প্রায়-তদ্রূপই অনুকরণের মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া, আমাদের এই অতুলন জাতীয় বিশেষত্বকে উপেক্ষা করিতে থাকিলাম।

কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে রামমোহন রায়ের পরে, ভাব-রাজ্যে তাঁহার পরিত্যক্ত আসনে অতঃপর যিনি আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন, সেই দেবতুল্য ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যময় প্রাণে এই রক্ষণশীল জাতীয় ভাবটি আরও কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপে মূর্ত্তি ধরিয়া ফুটিয়া-উঠিল। দেবেন্দ্র-নাথ যদিও প্রচলিত ধর্ম্ম-সংস্কার ও সেই সঙ্গে হিন্দুসমাজকেও একরূপ পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রাজর্ষি রামমোহনের শিষ্যরূপে তিনি স্বদেশের শাস্ত্রকেই আমাদের ধর্ম্মোন্নতির একমাত্র উপায় বোধে

ভক্তিভরে তাহা মাথায় তুলিয়া লইলেন। ফলে, 'তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা'র সাহায্যে তিনিই বোধ হয়, সর্ব্ব-প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষায় মোহান্ধ ও আত্মবিস্মৃত, সেই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বেদোপনিষৎ প্রভৃতি আলোচনার যথোচিত পন্থা প্রবর্ত্তন করিয়া, বিজাতীয় ভাব হইতে স্বভাবে, অর্থাৎ—বিদেশী ধর্ম্ম হইতে স্বধর্ম্মে এবং বিদেশী ভাষা হইতে মাতৃভাষায় আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সমাজকে অব্যর্থ ভাব-সঞ্চারণে মজাইয়া, মাতাইয়া, চেতাইয়া-তুলিতে,—অনুপ্রাণিত, উদ্দীপ্ত বা উত্তেজিত করিতে,—যে দুর্লভ ঐশী শক্তি অনিবার্য্যই আবশ্যক, জননায়ক হইবার সেই-সব বিচিত্র গুণ দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে যথোচিত পরিমাণে না থাকায়, তিনি মূল উৎসস্বরূপ, অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অন্তরালে রহিয়া, মনস্বী রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্র—ইহাঁদের এই দুইটি জীবন-ধারায় ক্রমাগত ভিতর হইতে ভাবের 'যোগান' দিতে লাগিলেন; এবং ইহাঁরা সেই-প্রথম এদেশকে স্বদেশী ভাবের সঞ্জীবন প্রভাবে জীবন্ত ও জাগ্রত করিতে যত্নবান্ হইলেন। দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যে, তৎপ্রতিষ্ঠিত আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে 'জাতীয় পত্র' ('National Paper') নামে একখানি 'নূতনতর' সংবাদপত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল; এবং আমার যতদূর মনে হয়—তাহাতেই সর্ব্বাগ্রে এই আধুনিক দেশাত্মবোধের প্রাণোন্মাদী, উদাত্ত শঙ্খনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সংবাদপত্রের পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন ৺নবগোপাল মিত্র মহাশয়। ইংরাজী ভাষায় বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তিবলে তিনি অভিনব ভাব-তরঙ্গে নব্যশিক্ষিত সমাজকে সচেতন ও উদ্দীপিত করিয়া-তুলিতে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। পরানুগ্রহের লজ্জাকর হীন লালসা এবং মর্য্যাদা-বুদ্ধিবর্জ্জিত, জঘন্য ভিক্ষা-বৃত্তি হইতে হতভাগ্য দেশবাসীকে প্রাণপণ প্রযত্নে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য মিত্রমহাশয় অশ্রান্ত উৎসাহে লেখনী-চালনা করিয়াছেন। কিন্তু, বাক্যেই

যে তিনি শুধু শিক্ষিতগণের মনে এমন ভাবে ভাবের স্রোত বহাইতে-ছিলেন,—(যদি তৎকালের পক্ষে কেবলমাত্র তাহাও বড়-তুচ্ছ আবশ্যক ছিল না!) বস্তুতঃপক্ষে এমন কথা বলিলে সত্যের অপলাপ ঘটিবে। কারণ, ধন্য তিনি কীর্ত্তিমান্,—যাঁহার প্রভূত প্রয়াস ও উৎসাহের ফলে, ইংরজী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, সেই সব-প্রথম এই বঙ্গদেশে 'স্বদেশী মেলা' বা 'হিন্দু মেলা' নামে স্বদেশ-জাত দ্রব্য-সম্ভারের একটি শিল্প-প্রদর্শনী সংঘটিত হইয়াছিল! অবশ্য এ ব্যাপারে দেবেন্দ্র-নাথের সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথও বহূপায়েই নবগোপালের আনুকূল্য করিয়াছিলেন। এই প্রাণ-শূন্য অসাড় ও স্থবির দেশে তৎকালীন সেই পর্ব্বত-প্রমাণ, পুঞ্জীভূত অবসাদ, প্রভূত ঔদাস্য, উপেক্ষা ও অসংখ্য অসুবিধার মধ্যে এতবড় একটা বিরাট্ ব্যাপার সফল ও সম্ভব করিয়া-তোলা, সে কি-যে অসামান্য উৎসাহ ও অদম্য অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রকৃতপক্ষে তাহা চিন্তা করিয়া-দেখিলে, আমরা বিস্মিত হইতে বাধ্য হই।

একদিকে যখন মাতৃভাষা-বিদ্বেষী, ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে নবগোপাল মিত্র মহাশয় স্বাদেশিকতার উদ্বোধন করিতে লাগিলেন, অপরদিকে তখন আবার পুণ্যাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দেশে 'জাতীয় গৌরবেচ্ছাসঞ্চারিণী সভা' সংস্থাপনের এক প্রস্তাব পুস্তিকাকারে প্রচারিত করিয়া দিলেন; এবং স্বয়ং একাকী, অনন্যসহায়ে, কার্য্যতঃ এই ভাবের একটি সভাও অচিরে সংস্থাপিত করিয়া, দেশের বিলুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন। মাতৃভাষায় প্রণীত, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে তিনি যে-সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, বলিতে আনন্দ হয়—ক্রমশঃ আজ আমরা তাহা অল্পাধিক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিয়া আপনাদিগকে ধন্য গণ্য করিতেছি। এ দেশে যাহাতে অবিলম্বে শিল্প, ব্যায়াম, পুরাতত্ব এবং বিদেশী ভাষার পরিবর্ত্তে স্বদেশী সাহিত্যের, অর্থাৎ মাতৃভাষার

বহুল চর্চ্চা প্রচলিত হয়;—দেশবাসী যাহাতে পরবশতার দৈন্য-দুর্গতি হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া প্রকৃতপক্ষে স্বাবলম্বী ও আবার আত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া-ওঠে তাহার জন্য মহাপ্রাণ রাজনারায়ণ আগ্রহাকুল, উচ্চ কণ্ঠে আমাদিগকে পুনঃপুনঃ উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে আজ বোধ করি—এ কথা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, খ্যাতি-নিরপেক্ষ, নীরব-কর্ম্মীর আন্তরিক আগ্রহ ও প্রবল উদ্দীপনা সে-সময়ে এই হৃত-বৈভব ও লুপ্ত-গৌরব, দুর্ভাগ্য দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষিত-সমাজের মনে আত্মোন্নতি-সাধন সম্পর্কে একটা অভিনব আকাঙ্ক্ষা ও সঞ্জীবনী চেতনার তড়িৎবেগ সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন (ইংরাজী ১৮৭১ কি ৭২ সনে) তৎকালীন 'জাতীয় সভা'য় 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' সম্পর্কে তিনি একটি অপূর্ব্ব, সুচিন্তিত ও অকৃত্রিম আন্তরিকতাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাটি যথাকালে মুদ্রিত হইয়া যখন দেশের সর্ব্বত্র সমধিকভাবে প্রচারিত হইল তখন সমগ্র বঙ্গদেশে ইহা লইয়া একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব 'হৈ-চৈ' পড়িয়া গেল, এবং শতকণ্ঠে ও সমস্বরে সকলেই ইহাকে 'ধন্য-ধন্য' করিতে লাগিল। এই স্মরণীয় সন্দর্ভটি সম্বন্ধে নমস্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিতেছেন,—

'দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'সোমপ্রকাশে' লিখিলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছিল, রাজনারায়ণ বাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন; 'সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মরক্ষিণী সভা'র সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে 'হিন্দুকুল-শিরোমণি' বলিয়া বরণ করিলেন; কেহ কেহ তাঁহাকে কলির ব্যাস বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন; সুদূর মান্দ্রাজ হইতে 'ধন্য-ধন্য' আসিতে লাগিল; এবং ইংলণ্ডে 'টাইমস্' পত্রিকাতে ঐ বক্তৃতার সারাংশ ও তাহার অশেষ প্রশংসা বাহির হইল। রাজনারায়ণ বাবু বঙ্গবাসীর চিত্তে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিলেন।'

এইভাবে মহাত্মা রাজনারায়ণ দেশের শিক্ষিত সমাজের ভিতরে

প্রভূত প্রভাব, যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক, স্বদেশ-শুভার্থ মনস্বী রাজনারায়ণ ও তেজস্বী নবগোপাল এ দেশের ভাব-রাজ্যে আমাদের গন্তব্য পন্থানির্ণয়ার্থ যে দিব্য চেতনার অপার্থিব দীপ-শিখা প্রজ্বলিত করিয়া-দিলেন, বিশেষভাবে, আজও তাহার অম্লান আলোকে আমরা আপনাদের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সাধ্যমত তৎসাধনে ব্রতী রহিয়াছি।

রাজনারায়ণ বাবুর উক্ত 'হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' শীর্ষক বক্তৃতা যে বৎসর প্রদত্ত ও প্রচারিত হয় তাহার এক বৎসর পরে, যখন ঐ প্রবন্ধোল্লিখিত ভাব-সুপথ্য এদেশবাসীর অন্তরে জীর্ণ হইয়া ক্রমে তাহা স্থায়ী অনুভূতিতে পরিণত হইল, তখন, ওদিকে আবার সাহিত্য-সম্রাট্, অমর বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত করিয়া, তমসাবৃত বঙ্গের পূর্ব্ব-গগন হইতে উষারুণের অপরূপ দ্যুতিচ্ছটা চারিদিকে বিচ্ছুরিত করিতে লাগিলেন। বঙ্কিম-প্রবর্ত্তিত এই-যে অভিনব সাহিত্য, প্রত্যক্ষভাবেই ইহাদ্বারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্য, মোহ-ভ্রান্ত নয়ন-পথে ধীরে-ধীরে অতীতের পুণ্যগরিমান্বিত, অনুপম চিত্রগুলি একে-একে উজ্জ্বলরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠিল; ফলে, অল্প কাল মধ্যেই তাঁহাদের অবসাদ-নির্জ্জীব অন্তরে মমত্ব-বোধের—স্বাদেশিকতার এই অনাস্বাদিতপূর্ব্ব, প্রীতিকর উন্মাদনা অতি সহজ-সুন্দর সুকৌশলে সঞ্চারিত হইতে থাকিল। সাহিত্যসহায়ে দেশ-হিতবিধান শুধু যে একা বঙ্কিমই করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে। মহাত্মা ভূদেবচন্দ্রের সন্দর্ভগুলিও এদেশের অশেষ কল্যাণকর, অবিনশ্বর, অমূল্য-সম্পৎ। তা'ছাড়া, একটু বিভিন্ন উপায়ে হইলেও, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ, দীন-বন্ধু, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে সংস্কৃত-চর্চ্চালোচনার পথ অত্যন্ত প্রশস্ত ও সুগম করিয়া-দেওয়ায়, এ দেশবাসীর সমক্ষে এক মহান্ ও অমূল্য ঐশ্বর্য্য-সম্ভারের অনন্ত ও অক্ষয় ভাণ্ডার-দ্বার

অকস্মাৎ উদ্‌ঘাটিত হইয়া-পড়িল। যে বিপুল অধ্যবসায় ও প্রচুর ধৈর্য্য না থাকিলে, স্মরণাতীত কাল হইতে সযত্ন-সঞ্চিত ভারতের সর্ব্বস্ব-ধন,—এই সংস্কৃত-সাহিত্যে আদৌ প্রবেশাধিকারই অসম্ভব ছিল, ঈশ্বরানুগ্রহে আজ তাহা এ-হেন সহজ-লভ্য হওয়ায়, এখন হইতে এ দেশের অনেকেই আবার সেই গরিমময় অতীত-গৌরবের সন্ধান ও অনুধ্যানে পুলকিত ও সঞ্জীবিত হইয়া-উঠিবার অব্যাহত অবকাশ লাভ করিতে লাগিলেন।

রাজনারায়ণ, ভূদেবচন্দ্র ও সাহিত্য-যাদুকর বঙ্কিমচন্দ্র এদিকে স্বদেশী সাহিত্যসাহায্যে যেরূপ দেশমধ্যে দেশাত্মবোধের চেতনা-সঞ্চার করিতেছিলেন, ওদিকে তেমনই আবার নবগোপাল মিত্র মহাশয় পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী ইংরাজীনবিশদের মধ্যে ইংরাজী ভাষাতেও সেই-একই ভাব ভিন্ন উপায়ে প্রচারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে, এ ক্ষেত্রে আমাদিগকে আর-এক দেশপ্রাণ মহানুভবের নামোল্লেখ করিতে ভুলিলে চলিবে না,—তিনি আমাদের সেই শূর-কবি হেমচন্দ্র। শুভক্ষণে কবিবর হেমচন্দ্রও দূর হইতে ইহাঁদের মহদুদেযাগে আসিয়া দৈব বলের ন্যায় যোগ দান করিলেন; এবং অকস্মাৎ বঙ্গবাসী উন্মুখ আগ্রহে তাঁহার সেই অশ্রুতপূর্ব্ব, হৃদয়োন্মাদী, গভীর-গম্ভীর দুন্দুভি-নিনাদ শ্রবণ করিয়া, স্বদেশ-প্রেমের বিচিত্র উন্মাদনায় যথার্থই যেন প্রমত্ত হইয়া-উঠিল!

ইহাঁদের এবংবিধ অক্লান্ত সাধনায়, পরিণামে আমরা দেখিতে পাই—এ দেশে অতি-অল্প কালের মধ্যে ক্রমশঃ হরিশ্চন্দ্র, রাম-গোপাল, কৃষ্ণদাস, শিশিরকুমার, উমেশচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, লালমোহন, নরেন্দ্রনাথ, মনোমোহন, আনন্দমোহন, রমেশচন্দ্র, কালীচরণ, মতিলাল, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ ভারতের ঐকান্তিক হিতার্থী সুসন্তান-সমূহ একে-একে আসিয়া এই মহাযজ্ঞে সম্মিলিত হইলেন। কালক্রমে ইহাঁদের মধ্যে কয়েকটি কৃতী ব্যক্তির চেষ্টায় অচিরে

ভারতের রাজধানী কলিকাতা-মহানগরীতে একটি 'ভারত-সভা' (Indian Association) নাম্নী সমিতি সংস্থাপিত হওয়ায়, এ দেশের রাজ-নৈতিক আলোচনা ও আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষাও একটা নিয়মিত, স্থায়ী পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতে আরম্ভ করিল। এ সময়টাকে আমরা—কেবল এই বঙ্গদেশ বলিয়া নহে,—সমগ্র ভারতেরই পুনর্জীবন-সূচনার, উদ্বোধন-জাগরণের প্রারম্ভ-যুগ বলিয়া গণ্য করিতে পারি। এই সময়ে দেখিতে-দেখিতে এ দেশের চারিদিকে নানাবিধ দেশ-হিতকর সভা-সমিতি, কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি উদ্‌গত ও উদ্‌ভূত হইতে আরম্ভ করিল।

তদ্ভিন্ন, ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাস্‌কী ও অলকটের হিন্দুশাস্ত্রসম্মত 'থিয়োজফি', তর্ক-চূড়ামণি শশধরের হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যান, সিদ্ধযোগী রামকৃষ্ণের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়মূলক, সর্ব্বলোক-সুবোধ্য ধর্ম্মোপদেশ, এবং 'রামকৃষ্ণ-পদাশ্রিত' 'স্বামী' বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের মূল-মন্ত্র, সার্ব্বজনীন সাম্য, সহানুভূতি ও 'দরিদ্র-নারায়ণে'র সেবন-ধর্ম্ম,—এককথায় ভারতের বৈশিষ্ট্য-বর্দ্ধক এই-সব ভাব একে-একে ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইতে-লাগিল ; এবং সর্ব্বান্তঃকরণে সহজেই আমরা তখন ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, আত্ম-দোষে আজ আমরা যতই-কেন অধঃপতিত হই না,—একদিন এই-আমরাই মানবের চরম সাধনা ও উন্নতির উচ্চতম শিখরশীর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য পদবীতে অধিষ্ঠিত ছিলাম। এইরূপে ধীরে-ধীরে, আবার আমাদের ভিতরে আত্ম-মর্য্যাদা, আত্ম-নির্ভর ও আত্ম-বিশ্বাসের চেতনা ঈশ্বরেচ্ছায় স্ফূরিত ও উন্মেষিত হইয়া-উঠিল ; এবং ক্রমশঃ আবার আমরা জাগ্রত ও জীবন্ত হইয়া, সেই-সব 'হেলায় হারাণো' অমূল্য বৈভবরাশি পুনর্লাভের নিমিত্ত লালায়িত হইতে লাগিলাম।

পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত, উল্লিখিত যুবকদল 'ভারত-সভা',

কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সের মধ্য দিয়া যেমন একদিকে আমাদের পার্থিব উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার উপায় চিন্তনে অবহিত হইলেন, অন্যদিকে তেমনই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব—অপার্থিব আধ্যাত্মিক উন্নতি ও আভ্যন্তরীণ শক্তি-সন্দীপনের জন্য রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দ প্রমুখ মহাপুরুষ ও ধর্ম্মবীরবৃন্দ আমাদিগকে সংযত, সমাহিত ও অন্তর্ম্মুখী করিতে—সেই চিত্তপ্রসাদকর, ভূমানন্দদায়ী, চিরন্তন সাধন সুরধুনী একান্তভাবেই প্রবহমান রাখিলেন। বলা বাহুল্য—ভাগ্য-হত ভারতের পুনর্জীবন ও প্রকৃত কল্যাণার্থ দেশব্যাপী এই-যে ঐকান্তিক ও বিরাট্ আয়োজন, একটু অনুদ্বিগ্ন মনে চিন্তা করিলে, আমরা ইহার মধ্যে সেই অনাথ-শরণ, পতিতপাবন দীনবন্ধুরই অপরিসীম, অপার কৃপা এবং বিচিত্র প্রেম-লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া, বিস্ময়ানন্দে বস্তুত: স্তম্ভিত হইয়া যাই।

নগণ্য ও অত্যল্প হইলেও, এসময়ে শুধু কথায় নহে—কর্ম্ম-ক্ষেত্রেও আমরা বাঙ্গালীর কর্ম্ম-জীবনের একটা প্রয়াস-স্পন্দন বা মৃদু-ক্ষীণ 'সাড়া' অনুভব করি। প্রধানতঃ এই কলিকাতা-শহর এবংবিধ স্বাদেশিকতার আদি জন্মস্থান বটে ; কিন্তু, কার্য্যতঃ, যে কারণেই হৌক্, তাহার সার্থকতা বা সাফল্য আমরা মফস্বলেই সমধিকরূপে দেখিতে পাই ; এবং এ সময়েও বাঙ্গালী যে সকল অনুষ্ঠানে শক্তি-নিয়োগ করিল তাহার অধিকাংশই কলিকাতার বাহিরে। কাগজের কারখানা, দীয়াশলা'এর কল, তারকেশ্বরের রেল-গাড়ী,—এই সব ব্যবসায়-ব্যাপারে বাঙ্গালী এক্ষণে হস্তক্ষেপ করিল ; এবং সুদূর পূর্ব্ববঙ্গের এই বরিশাল-জেলায় আমার পিতৃদেব, পরমারাধ্যপদ ৺রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় ও সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অজস্র অর্থব্যয় করিয়া, নিজেরাই পৃথক্-পৃথক্‌রূপে স্বদেশী ষ্টিমার পর্য্যন্ত চালাইতে আরম্ভ করিলেন। অবশ্য অনভিজ্ঞ চেষ্টার ফলে যাহা অবশ্যম্ভাবী, এসব

উদ্যোগ-অনুষ্ঠানের পরিণামও পরে তাহাই হইল, অর্থাৎ—এগুলির প্রায় সকলগুলিই 'ফেইল',—নিষ্ফল হইল। কিন্তু, দশ বার পড়িয়া না গেলে যেমন শিশু চলিতে বা দাঁড়াইতে শেখে না,—এসব বিফলতাও যে তেমনই আমাদিগকে ভাবী উন্নতি ও পরিণতির পথে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর করাইয়া-দিয়া গিয়াছে, কৃতজ্ঞ অন্তরে, আজ আমরা তাহা শতবারই স্বীকার করিতে বাধ্য। এই অনুষ্ঠানগুলির বহু বর্ষ পরে, কলিকাতায় জোড়াশাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের উৎসাহে 'স্বদেশী-ভাণ্ডার' নামে স্বদেশজাত দ্রব্যাদির একটি দোকান খোলা হয়, এবং এইরূপে তৎপূর্ব্বে আরও কেহ-কেহ বিদেশের অনুকরণে এদেশে নানাবিধ দ্রব্যাদির 'ছোট-খাটো' বহুতর কারবার করিতে আরম্ভ করেন।

যাহাহৌক্, বিধি-বরে যখন এইরূপে দেশবাসীর মন মমত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া, আপনাদের ভিতরকার যত-কিছু আবর্জ্জনা-জঞ্জাল, বিরোধ ও পার্থক্য বিদূরিত করিয়া-দিয়া, অচ্ছেদ্য প্রীতি ও সাম্য-বন্ধনে আপনাদিগকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করিয়া, দেশ-হিতে নিয়োজিত হইতে উৎসুক ও যত্নশীল হইল; পর-দ্বারে পদে-পদে লাঞ্ছিত, অবজ্ঞাত ও নিরাশ হইয়া, যখন দেখিল—এ নিখিল বিশ্ব-সংসারে তাহাদের ন্যায় অন্তঃসারশূন্য, অসহায় ও ঘৃণ্য জীব বুঝিবা আর কোথায়ও নাই; এবং ক্রমে, এমনই করিয়া যখন তাহারা নিঃসংশয়রূপে মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিল যে, আজ এত-বিচ্ছিন্নভাবে তাহারা যতই-কেন তুচ্ছ, হেয় ও নগণ্য হৌক্ না,—'অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা',—তাহারাই অখণ্ডভাবে আবার অসীম শক্তির অফুরন্ত, অক্ষয় আধার তখন তাহারা শুনিল,—সে-কোন্ অতীতের স্বপ্ন-লোক হইতে গুরু-গম্ভীর জলদ-নির্ঘোষে, কে যেন বারংবার তাহাদের চিদন্তরে এই মহামন্ত্র ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছেন,—

'সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্' !

কিন্তু, ঠিক তৎকালে কূটমতি, কর্ম্মবীর, ভারতের রাজপ্রতিনিধি, লর্ড কার্জ্জন এদেশবাসীর ইচ্ছা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সদর্পে, শতমতে পদ-দলিত করিয়া, ভারতকে বহূপায়ে ব্যতিব্যস্ত ও বিধ্বস্ত তো করিলেনই,—অধিকন্তু সমবেত বঙ্গবাসীর সার্ব্বজনীন অনিচ্ছা ও প্রবলতম প্রতিবাদ সত্ত্বেও, এ বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত ও খণ্ডিত করিয়া-দিয়া, তাহাদের জাতীয় ঐক্য লাভের পথে এক বিষম ও দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আনিয়া উপস্থাপিত করিলেন। বহুদিনের সেই স্নেহ-পালিত, যত্ন-সঞ্চিত আশার সাফল্য-সাধন পক্ষে অকস্মাৎ এই অভাবিত প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়ায়, অসহায় বাঙ্গালী বড়-দুঃসহ আঘাতে প্রথমে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। কিন্তু, পরক্ষণে,—অগৌণেই এ অন্যায় পীড়নের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল; এবং হুঙ্কার করিতে-করিতে তখন বাঙ্গালীর সেই আহত অন্তরের যাতনা হইতে সহসা এক ভীষণ, জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল মন্যু (Indignation) জন্মগ্রহণ করিল। এইবার সেইকথাই বলিব।

মানুষ যত-বড় শক্তিমান্ হৌক্ না এবং যতই-কেন অহঙ্কার করুক না, গোপনচারী অদৃষ্ট-শক্তির অদম্য গতি নিরুদ্ধ করার ক্ষমতা তাহার তিলার্দ্ধও নাই। কার্জ্জন ভাবিয়াছিলেন,—বঙ্গ-বিভাগ ব্যাপারে তিনি বাঙ্গালীর বর্দ্ধমান বলপুঞ্জকে ছিন্ন-ভিন্ন, বিলুপ্ত করিয়া-দিয়া, তাহাদের একান্ত কাম্য ঐক্যের সম্ভাবনাকেও স্বপ্নবৎ অলীক ও অসম্ভব করিয়া তুলিবেন। কিন্তু, যে-আশায় তিনি একাজ করিলেন, পরিণামে কিন্তু তাহার বিপরীত ফল ফলিল; এবং আমাদের ধারণা, অনতিদীর্ঘকাল পরে তাঁহাকেও মনে-মনে, মাইকেলেরই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে-হইয়াছিল—'আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিনু হায়, তাই ভাবি মনে!' বাঙ্গালীর জাতীয় বন্ধনকে ছিন্ন করার জন্য তাহার অঙ্গে যে প্রচণ্ড আঘাত

প্রদত্ত হইল, পরিণামে তাহারই ফলে, সমবেদনায় সমগ্র বঙ্গবাসী একান্ত ঘনিষ্ঠ-ভাবে আরও অধিকতর একতাবদ্ধ হইয়া, লর্ড কার্জ্জনের এই নব-বিধানের বিরুদ্ধে অতি-তীব্র ও প্রচণ্ড আন্দোলন করিতে বদ্ধ-পরিকর ও কৃত-সঙ্কল্প হইল। বাঙ্গালীর এই-যে অভূতপূর্ব্ব, ভীষণ আন্দোলন, ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ইহাই 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এই জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, বিদেশী—(বিলাতী, বিশেষতঃ ইংরাজী)—যাবতীয় দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন বা বহিষ্কার, (অর্থাৎ—'বয়কট্') ; দ্বিতীয়তঃ, স্বদেশী-গ্রহণ, অর্থাৎ—শুদ্ধমাত্র স্বদেশ-জাত দ্রব্যাদি দ্বারাই আমাদের সর্ব্ববিধ অভাব-পূরণ।

বঙ্গ বিভাগ ও 'স্বদেশী' আন্দোলন।

বঙ্গবিভাগ সম্পন্ন ও বিধি-বদ্ধ হইলে, তদ্বিপক্ষে কলিকাতা-'টাউন-হলে' সর্ব্বপ্রথম সেই-যে 'রাক্ষসী' সভার ('Monster meeting'এর) অধিবেশন হয় তাহাতে সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে, উক্ত মর্ম্মের দুইটি 'সঙ্কল্প' (Resolution) উদ্দাম উৎসাহ ও অকপট আগ্রহের সঙ্গে স্থিরীকৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে, এই সভার কর্ত্তব্যনির্ণয়ের জন্য আমাদের নেতৃগণের যে একটি গুপ্ত পরামর্শ-বৈঠক বসে তাহাতে উল্লিখিত দ্বিতীয় প্রস্তাবটি (অর্থাৎ—'স্বদেশী' গ্রহণ) সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত না থাকিলেও, অপর প্রস্তাবটির বিষয়ে খুব একটা মত-ভেদ ও অনৈক্য দেখা গিয়াছিল। একদলের মুখপাত্র স্বরূপ, জন-নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান অবস্থায় (অন্ততঃ বঙ্গচ্ছেদ-আইন রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত) আমাদের পক্ষে 'বয়কট্' বা বিদেশী পণ্যবর্জ্জন যে অপরিহার্য্য আবশ্যক এবং তদ্ব্যতীত যে অন্য প্রস্তাবটিরও কার্য্যতঃ কোন সাফল্য লাভের সম্ভাবনা নাই,—এই অভিমত ব্যক্ত করেন। পক্ষান্তরে, অন্য দলের

মুখপাত্র হইয়া বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি দু'একজন সুরেন্দ্রনাথের এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, এরূপে সাময়িক বিদ্বেষ-বুদ্ধি-চালিত হইয়া, 'বয়কটে'র ভঙ্গুর ভিত্তির উপরে এই স্বদেশী-আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করিলে, কালে বাঙ্গালীর এ সঙ্কল্প কিছুতেই চিরস্থায়িত্ব-লাভে সমর্থ হইবে না ; অতএব, এক্ষেত্রে গোড়াতেই সতর্ক হইয়া, এ প্রস্তাবটা আদৌ দেশের সমক্ষে উপস্থিত না করাই উচিত ও বাঞ্ছনীয়। পরামর্শ-সভায় এইভাবে কিছুক্ষণ মত-বিরোধ বা বাদানুবাদ চলিল বটে ; কিন্তু, বাঙ্গালীর মন তখন ইংরাজ-বিদ্বেষে এতই জর্জ্জরিত যে, বিরুদ্ধবাদীদের সে-সব প্রতিকূল যুক্তি অনেকে শুনিতেও পাইলেন কিনা সন্দেহ,—অল্পকালের মধ্যেই অধিকাংশের সাগ্রহ সমর্থনে সুরেন্দ্রনাথের উত্থাপিত ঐ প্রস্তাব দু'টিই পরবর্ত্তী 'টাউন-হলে'র সভায় সঙ্কল্পে পরিণত করা সর্ব্বথা আবশ্যক ও উচিত বোধে সাব্যস্ত হইয়া গেল। অতঃপর, যথাকালে 'টাউন-হলে'র সেই স্মরণীয় সভা হইল। সে-যে কি ব্যাপার,—কি-যে অগণ্য লোক-সংঘট্ট, কি-যে উদ্দাম উত্তেজনা ও উৎসাহ,—যাঁহারা তাহা চক্ষে না দেখিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকে তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। বাঙ্গালী তখন বেদনা ও অভিমানে বাস্তবিকই বিহ্বল ; উত্তেজনা ও উৎসাহে উদ্দাম-অধীর ; ভাবের অদম্য উন্মাদনায় যথার্থই যেন অনন্যমনে উন্মত্ত! সভাক্ষেত্রে জলদ গর্জ্জনের-ন্যায়, অগণ্য কণ্ঠের 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রে, অভাবিত উৎসাহ ও ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে সঙ্কল্পদ্বয় যথারীতি স্থিরীকৃত হইলে, তড়িৎ-গতির ন্যায় চকিত বেগে, তাহা লইয়া এ বাঙ্গালার নগরে, বন্দরে, গ্রামে, পল্লীতে, পথে, ঘাটে, হাটে, মাঠে, এমন-কি,—গণ্য-নগণ্য প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে-ঘরে পর্য্যন্ত,—কত-সব আলোচনা ও আন্দোলন চলিতে-থাকিল ; এবং অনিবার্য্য দৈব শক্তিতে চালিত হইয়া, বাঙ্গালী এই উভয়বিধ সঙ্কল্প অসামান্য

ও অকৃত্রিম দৃঢ়তার সঙ্গে কার্য্যে পরিণত করিতে ধৃত-ব্রত হইল।

যাহাহৌক্, আমরা যে বিষয়-প্রসঙ্গে কথায়-কথায় এতদূর আসিয়া-পড়িয়াছি, এখন আবার সেই মূল বক্তব্যে ফিরিয়া-যাওয়া যাক্। বলিতেছিলাম যে, এই 'স্বদেশী-আন্দোলনে'র সূচনার পূর্ব্ব হইতেই দ্বিজেন্দ্রলালের 'প্রতাপসিংহ' বা 'রাণা প্রতাপ' * নাটক সহসা এক শুভ মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তে, উজ্জ্বল জোতিষ্কের মত বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সমুদিত হইয়া, দেশাত্মবোধ ও স্বার্থ-ত্যাগের অনাবিল পুণ্যাদর্শে বাঙ্গালীর প্রাণ-শক্তিকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করিয়া-তুলিয়াছিল। স্বদেশী ভাব-বন্যা যখন দেখিতে-দেখিতে সারা বাঙ্গালা-দেশটাকে অতীব-তীব্র বেগে আলোড়িত ও পরিপ্লাবিত করিয়া-ফেলিল তখন 'দেশাত্মবোধের পরম পুরোহিত' দ্বিজেন্দ্রলাল এই ভাব-প্রবাহ-ধারার উৎপত্তি-কেন্দ্র 'খাস' কলিকাতাতেই বাস করিতেছিলেন,—পাঠক এ কথা পূর্ব্বে জ্ঞাত হইয়াছেন। দীর্ঘাবকাশের সুযোগে, এই সময়ে কলিকাতায় থাকিয়া, সেই দিব্য ভাবের বিপুল বন্যাস্রোতে নিত্য-নিয়ত দেশবাসীকে স্নাত, সঞ্জীবিত ও পরিশুদ্ধ হইতে-দেখিয়া, তিনি যে কি অসীম সন্তোষ ও আত্ম-প্রসাদ সম্ভোগ করিতেছিলেন, এবং সকলের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি নিজেও যে তৎকালে কতদূর তন্ময় ও মাতোয়ারা হইয়া-গিয়াছিলেন,—সাধারণের অবগতির নিমিত্ত,—মোটামুটি কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়া, আমি সাধ্যমত, এস্থানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিতে চেষ্টা করিব।

সে সময়ে প্রায় প্রতিদিনই 'হরেক' রকমে, 'নানান' বেশে, বিচিত্র ভাবে ও বিবিধ 'ঢঙ্গে', কত-সব বিপুল আয়োজন সহকারে কলিকাতার ইতর-ভদ্র, সংখ্যাতীত, উন্মত্ত জনসংঘ মনমাতানো স্বদেশী সঙ্গীত গাইতে-গাইতে, শহরময় পথে-পথে পরিভ্রমণ করিয়া-বেড়াইত; আর, সেই

দ্বিজেন্দ্রলালের তন্ময়তা।

* কলিকাতায়-'ষ্টার' রঙ্গালয়ে এই নামে অভিনীত হইয়াছিল। —গ্রন্থকার।

নয়নরঞ্জন, মনঃপ্রাণ-মোহন, অপূর্ব্ব শোভা-যাত্রার দৃশ্য দেখিয়া, দেশ-প্রাণ কবি-আমাদের তখন আপন উদ্বেলিত অন্তরের উদ্দাম ভাবাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, কখনও এতটুকু বালকের মত 'আহ্লাদে আট্‌খানা' হইয়া, ছুটিয়া-আসিয়া স্বজন-বন্ধুদের জড়াইয়া-ধরিতেন ; কখনও উৎসাহভরে, উচ্চকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' বলিয়া আনন্দে হাতে তালি দিতে-দিতে, ঐ-সব সঙ্গীতের সঙ্গে-সঙ্গে নৃত্য করিতে থাকিতেন ; আবার কখনও বা বাষ্পসিক্ত লোচনযুগল ঊর্দ্ধপানে উন্মুক্ত করিয়া, প্রেমাকুল প্রাণে, 'মা, মা' বলিয়া, যথার্থই যেন কাহার অপার্থিব ধ্যানে বিভোর হইয়া যাইতেন! এ-সব অবস্থায় তাঁহার সেই হর্ষোজ্জ্বল, রক্তিম মুখে কিংবা উল্লাস-বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ে উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনার যে-এক জ্বলন্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ বিকীর্ণ হইতে-থাকিত,—না দেখিয়া, আজ কাহারও সাধ্য নাই যে, সে শোভা আংশিকরূপেও অনুমান কি কল্পনা করিতে পারে। 'স্বদেশী'-সভায় বক্তৃতা দিয়া লোক মাতাইতে দ্বিজেন্দ্রলাল কোনদিন আসরে নামেন নাই সত্য ; কিন্তু, উক্ত আন্দোলনের পূর্ব্ব হইতেই তিনি যে এ-দেশবাসীর মন নির্ম্মল-মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত, ভাব-সমৃদ্ধ ও শুভপ্রসূ করিয়া-তুলিয়াছিলেন,—এমন অকৃতজ্ঞ কে আছে যে, সেকথা আজ অস্বীকার করিবে? তৎকালে মাতৃপ্রেমে মাতোয়ারা দ্বিজেন্দ্রলাল আপন আন্তরিক অসীম আগ্রহেই বাঙ্গালীর এই দেশব্যাপী 'স্বদেশী'-আন্দোলনের অতি-বড় উৎসাহী অনুবর্ত্তক, সমর্থক ও প্রচারক হইয়াছিলেন। তাই বলিতেছি,—যে রাজনৈতিক বা রাষ্ট্র-নৈতিক কারণে এ দেশে এই আন্দোলনের আবির্ভাব, যদিচ তাহার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন-কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না তবু, মূলে এই দেশাত্মবোধ বা স্বদেশী ভাব সকলের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া জাগাইয়া-দিতে তিনি আমাদের যথেষ্ট উপকার করিয়া-গিয়াছেন।

'টাউন হলে'র প্রথম 'স্বদেশী' সভায় নেতৃগণের প্রস্তাবিত সেই সঙ্কল্প (Resolution) দুইটি যে-ভাবে নির্দ্দিষ্ট ও গৃহীত হইল,—দূরদর্শী দ্বিজেন্দ্রলাল তদ্বিষয়ে ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে কয়েকখানা পত্র লেখেন। প্রচণ্ড মন্যুপ্রভাবে ক্ষিপ্তপ্রায় সেই বাঙ্গালীর একজন হইয়া, এই প্রলয়ঙ্কর জাতীয় বিপ্লবের ঠিক কেন্দ্র-কক্ষ কলিকাতাতে বাস করিয়া, এবং সর্ব্বোপরি নিজেও অমন-একজন দেশ-ভক্ত, ভাব-প্রবণ কবি হইয়া, তৎকালে কি করিয়া যে তিনি তেমন-সব চিঠি আমাকে লিখিয়াছিলেন, এখন তাহা মনে ভাবিলেও বিস্মিত হই। এবিষয়ে মাত্র একখানি পত্র আমি তুলিয়া-দিলাম। পাঠক, পড়িয়া-দেখুন, বুঝিবেন,—কতদূর স্থির-প্রজ্ঞ, প্রশান্ত-মতি ও সুনিপুণ বিবেচকের পক্ষেই এ ধরণের পত্র সে সময়ে লেখা সম্ভব ছিল।

পত্রখানি * এই,—

'আজ নবজীবনের উন্মাদনায় আমরা আত্মহারা তন্ময় হইয়া গিয়াছি। বাঙ্গালীর জীবনে আজ এ কি অপূর্ব্ব অমৃতের আস্বাদ! যাহা স্বপ্নের অগোচর, কল্পনারও অতীত ছিল, আজ সেই বিচিত্র স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন আমার ধন্য সার্থক হইল, প্রাণ আমার স্নিগ্ধ শীতল হইয়া জুড়াইয়া গেল! এত সুখও যে আমাদের অদৃষ্টে ছিল তাহা কে জানিত ভাই! ধন্য সুরেন্দ্রনাথ। সার্থক তোমার জীবন-ব্যাপী একাগ্র সাধনা! কিন্তু এত আনন্দের ভিতরেও একটা কথা যখন আমার মনে হয়, তখন আমি আশঙ্কায় উদ্বেগে কিছু ভীত ও চঞ্চল হই। মাকে আমার ভালবাসিব, সেবা করিব, অভিনব সুন্দর সাজ-সজ্জায় নিয়ত অলঙ্কৃত করিব, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি-প্রেমকুসুমে সতত পূজা করিয়া চিত্ত-প্রাসাদে ডুবিয়া থাকিব,—আমার এই যে সাধ, এই যে আশা, এ ত অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি! সুসন্তানের স্বভাবতঃ এ ইচ্ছা হইয়া থাকে; আর যার তা না হয় সে হতভাগ্য, কুলাঙ্গার—নরাধম! কিন্তু, এই যে সব সাধ ও আকাঙ্ক্ষা, এর জন্য আমি বাহিরের সুযোগ বা অবকাশের সন্ধান করি কেন?

* কলিকাতা, ১৯০৪ সনের ৭'ই (মাসের নাম অস্পষ্ট, বোধ হয়) নভেম্বর।

আর এ সব ভাবোদ্রেকের জন্য আমরা এমন বাহিরের দশটা কারণ ও অবস্থার উপরেই বা নির্ভর করিতে চাই কেন? স্বাভাবিক মনের আবেগে যদি আমার মাকে 'মা' বলিয়াই পূজা না করি, যদি পরের দ্বারা অনাদৃত আহত না হইলে আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া মাকে মর্য্যাদা দিতে না চাই, যদি আন্তরিক অকৃত্রিম ভক্তি ও ভালবাসার টানেই মার দৈন্য-ক্লেশ দূর করিতে না পারি তবেই ত ভয় হয়,—বুঝিবা আমাদের এ পূজা আন্তরিক নহে; তবেই ত ভয় হয়,—হয়ত বা আমাদের এ অবস্থা ও ইচ্ছা স্থায়ী নয়, স্বাভাবিক নয়,—এসব পদ্মদলের বারিবিন্দুসম চপল ও ক্ষণস্থায়ী!

"এখানে এখন প্রত্যেক দিন দু'টি বেলাই আমার সঙ্গে বন্ধুদের ভীষণ তর্কযুদ্ধ হয় যে, যে ভাবে এই স্বদেশী আরম্ভ হইল তা' বাস্তবিক আমাদের দেশে স্থায়ী ও মঙ্গলজনক হবে কি না। সকলেই আমার বিপক্ষে, আমি একা। কিন্তু, 'একা লব সমকক্ষ শত সেনানীর!' আমি বলি, এই বিদ্বেষমূলক বয়কটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্ব্বনাশ হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনো মতেও সম্ভব নয়। এদেশ যদি আজ পর-প্রসঙ্গ ও বিজাতি-বিদ্বেষ ভুলিয়া, প্রকৃত আত্মোন্নতি—নিজেদের কল্যাণ-সাধনে তৎপর হয় তবে এমন কোন শক্তিই নাই যে তাহার সে বল-দৃপ্ত গতি রোধ করিতে পারে। কিন্তু অযথা এ আস্ফালন ও যাহারা আমাদের শিক্ষা-গুরু—যাহাদের কৃপায় ও ইচ্ছায় আমাদের আজ এই কিছু উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে—তাহাদের প্রতি আমাদের এরকম অন্ধ বিদ্বেষ যতদিন সম্যক্ তিরোহিত না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উদ্ধারের সহজ কোন উপায় আমি দেখি না।"

বিচার বুদ্ধি ও ভাব-প্রবণতার সামঞ্জস্য।

মনস্বী দ্বিজেন্দ্রলাল তখনকার সেই-অত উত্তেজনার মধ্যেও, বাঙ্গালীর এই জাতীয় আন্দোলনের গোড়ায়, ইহারএই-যে মারাত্মক ভ্রান্তি ও 'গলদে'র নির্দ্দেশ করিয়া এমন আন্তরিক আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—ভুক্তভোগী, হতভাগ্য আমরা,—আজ তাহার শোচনীয় পরিণাম বর্ণে-বর্ণে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার দূরদর্শী বিচারণার অকপট 'তারিফ্' না করিয়া পারি না। একটা কথা একটু পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়া

গিয়াছি। মূলে, যে-কারণে দেশে এই আন্দোলন 'সুরু' হইল, (অর্থাৎ—ঐ বঙ্গচ্ছেদ বা পার্টিশান,') দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম হইতে তাহার একরূপ পক্ষপাতই দেখাইতেছিলেন ! 'গোটা' দেশের সমস্ত লোক যে-সম্বন্ধে এতটা 'জেদে'র সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, একা দ্বিজেন্দ্রলালকে সে সম্বন্ধে এমন ভিন্ন-মতাবলম্বী দেখিয়া খুবই অবশ্য আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় ; কিন্তু, যাঁহারা তাঁহাকে তেমন 'যাচাইয়া' জানিতেন তাঁহাদের পক্ষে ইহাতেও তত বিস্ময়-বোধের কারণ ছিল না। একটু মনোযোগ ও অভিনিবেশের সঙ্গে যাঁহারা এ গ্রন্থের এতদূর পর্য্যন্ত পড়িয়া-আসিয়াছেন তাঁহারা বোধ হয়, এটুকু অন্ততঃ এতক্ষণে বুঝিয়াছেন যে, এই অনন্যসাধারণ জীবনের সর্ব্ববিধ চিন্তা ও আবরণের মধ্যে একটা অসামান্য স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিত্ব চিরটাকালই অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। 'দশ জনে এটা বলে ; অতএব, এটা ঠিক',—এই-যে এক ধরণের গতানুগতিক মত তাহা তাঁহার মোটে ছিল না। ছোট-বড়, তুচ্ছাতুচ্ছ সকল ব্যাপারে, সকল রকমের অবস্থাতে একমাত্র যুক্তি ও বিচারকেই তিনি অনন্য অবলম্বন বা একমাত্র আশ্রয় বিবেচনা করিতেন ; এবং সর্ব্বদা এই বিচার-বুদ্ধির সাহায্য ব্যতিরেকে তিনি কোন বিষয়ের সত্যাসত্য ও কর্ত্তব্য-নির্ণয় করিতে জানিতেন না,—বুঝিবা পারিতেনও না ! বিচার-বুদ্ধিকে তিনি মানবের চরম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অমূল্য অধিকার বলিয়া মনে করিতেন। এতটা যুক্তি ও বিচারের আনুগত্যও যে প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ঐ প্রকৃতিগত সত্যনিষ্ঠারই পরিণাম তাহা না বলিলেও বোধ হয়, পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন। কিন্তু, সময়ে-সময়ে তাঁহার এই যুক্তিবৃত্তি বা বিচার-প্রবৃত্তি আপন ন্যায্য সীমা এমনই উল্লঙ্ঘন করিয়া-যাইত যে, তখন সত্য বলিতে কি,—আমাদেরও তাঁহাকে নিতান্ত নীরস ও শুষ্ক-প্রকৃতির অদ্ভুত মানুষ বলিয়া বোধ হইত ; তখন সাধ্য কি যে কেহ কল্পনাও করে যে, এই লোকই

আবার অমন-একজন অসাধারণ ভাব-প্রবণ, ‘বড়-দরে’র কবি! দিবসের বুকে দিন ও রাত্রি যেমন অভেদ্য সখ্যে আবদ্ধ রহিয়া নির্বিরোধ শান্তিতে কাল কাটায়, বস্তুতঃ ঠিক-তেমনই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনেও বিরস-শুষ্ক বিচার-বুদ্ধি ও ভাব-প্রবণ সহৃদয়তার অতি-আশ্চর্য্য, শোভন ও দুর্লভ সামঞ্জস্য আমরণ সমভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল।

কিন্তু, মধ্যে-মধ্যে এই যুক্তি-প্রবণতা যখন আপন উচিত গণ্ডীও উল্লঙ্ঘন করিয়া অনধিকার-চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইত, সে-সব অশুভক্ষণে তিনি তাঁহার গুণগ্রাহীদের কাছেও সাময়িকভাবে অপ্রিয় ও বিরক্তিকর হইয়া উঠিতেন। এই কারণে, অত-বড় শক্তিমান্ কবির প্রতিভা-প্রসূত হইয়াও তাঁহার বহুৎ কবিতা ও রস-রচনা ভাব-বৈষম্য ও বিরোধাভাস-দোষে বিরস-বিশ্রী হইয়াছে; এবং তদ্দারা পাঠকের উপভোগেরও অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখন এই ‘পার্টিশান’ বা বঙ্গ-বিভাগের কথাটাই মনে করা যাক্। দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যে বঙ্গ-বিভাগের অপকারিতা সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত ও শঙ্কিত হইয়া-উঠিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল ধীরভাবে তাহারই বহু গুণ ও কল্যাণকর পরিণাম, নিঃসংশয় দৃঢ়তার সঙ্গে, অনুকূল যুক্তিবলে প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়া-পড়িলেন। তাঁহার এই বিচিত্র আচরণ তখন আমাদের এতই বিসদৃশ ও বিরক্তিকর বোধ হইত যে, সেই প্রবল উত্তেজনার মুখে, এজন্য কখনও-কখনও আমরা ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া, যা-মুখে-আসিত তা'ই বলিয়া, অত্যন্ত অশোভন-ভাবে তাঁহাকে গালি দিতেও দ্বিধা করি নাই। কিন্তু, মহাপ্রাণ বন্ধু-আমার আমাদের সে সকল উদ্ধত ব্যবহারে একটিবারের তরেও কোনদিন অসন্তুষ্ট বা রাগান্বিত হন নাই বরং,—আজ সে-সব কথা মনে হইলেও কান্না পায়—তিনি কতই-না স্নেহপূর্ণ, সুমিষ্টস্বরে, ধীরে ও প্রশান্তভাবে, আমাদিগকে আপন যুক্তিপূর্ণ কথাসমূহ একে-একে বুঝাইয়া-বলিতে কি চেষ্টা ও যত্নই না করিতেন! ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে

যখন একবার এই বঙ্গ-বিভাগ রহিত হওয়ার একটা 'গুজোব' রটে তখন ৺গয়া হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল আমায় একপত্রে * লিখিলেন,—

"Partition (বঙ্গ-বিভাগ) রদ হওয়ার উপক্রম হয়েছে শুন্‌ছি। কিন্তু, বেহারের সঙ্গে আবার বিচ্ছেদ হবে নাকি? বেহারীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের তেমন মনের মিল—সদ্ভাব নাই সত্য; কিন্তু ক্রমে একদিন তাহাদেরও সহানুভূতি ও সাহায্য যে পাওয়া যেত এবার তাহলে সে আশাও গেল! Partition' এর (বঙ্গ-ভঙ্গের) সময়ে আমি বলেছিলাম যে, এর একটা খুব Bright side (উজ্জ্বল দিক) আছে। তোমরা তো তখন আমার উপরে খড়্গ-হস্তই ছিলে! সে ভালোর দিক্‌টা এই যে,—একদিকে বাঙ্গালী আসামীদের শিক্ষিত করুক্, আর এক দিকে বেহারীদের শিক্ষিত করুক্। নইলে একা বাঙ্গালীর আর বল কতটুকু?"

ইহার অল্পকাল আগে, মুর্শীদাবাদ জেলার কাঁদী সব্-ডিভিশন হইতে আমাকে এ বিষয়ে আর-এক পত্রে † লিখিয়াছিলেন,—

"বাঙ্গালীরা আপনাদের মধ্যে যদি একতা রাখে, Partition'এ (বঙ্গ-বিভাগে) তা ভাঙ্গিতে পারিবে না।

"বাঙ্গালীরা আপনাদের মধ্যে যদি একতা রাখে, Partition'এ (বঙ্গ-বিভাগে) তা ভাঙ্গিতে পারিবে না। বাঙ্গালীর আপনাদের মধ্যে একতা-স্থাপন করিতে চেষ্টা করার পূর্ব্বে, তাহাদের মনের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতা, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, দূর করিতে হইবে। বঙ্গচ্ছেদ রদ করিয়া তাহা সাধিত হইবে না।"

সেই উদ্দাম আন্দোলন-উদ্দীপনার সময়ে স্থির-প্রজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রলাল এই যে-সব মন্তব্যাদি প্রকাশ করিয়া-গিয়াছেন, আজ এতকাল পরে দেশের অনেকে সে-সব কথার অভ্রান্ত যৌক্তিকতা প্রকাশ্যেও স্বীকার করিয়া থাকেন। আজ সেই বিভক্ত বঙ্গ আবার তো আমাদের ইচ্ছামতই সংযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু, ইচ্ছা ও 'জেদ্' বা লোকমতের জয়-লাভ ব্যতীত, কেবলমাত্র এই কারণে পূর্ব্ব বা পশ্চিম বঙ্গের আর-যে

* ২৭'এ জুন' ০৩।

† ৯ই জুন' ০৩।

বিশেষ কোন আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা বহু বিবেচক ব্যক্তিই মানিয়া-লইতে প্রস্তুত নহেন। এখন বরং অনেকে আবার এমনও বলেন শুনি যে, বঙ্গচ্ছেদের ফলে তখন আমাদের মধ্যে—যে কারণেই হোক না কেন,—যতটুকু আত্মোন্নতি ও ঐক্যসাধনের আগ্রহ ও যত্ন দৃষ্ট হইয়াছিল, প্রজাবৃন্দের দেহ-মনের উৎকর্ষ-বিধানের পক্ষে,—ইচ্ছায় হোক্, আর অনিচ্ছায় হোক্—গাভর্ণমেণ্টও তখন যতটা উদ্‌যোগ ও যত্ন-তৎপরতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন আর তাহার কোন লক্ষণ খুঁজিয়া-পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেও আমরা 'যে তিমিরে' ছিলাম, আজ যেন আবার আমরা 'সেই তিমিরে'ই ধীরে-ধীরে, অবসন্ন ও নির্জীব-ভাবে নিমজ্জিত হইয়া-পড়িতেছি।

কবিবর তখন কলিকাতা ৫ নং সুকীয়া ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। একদিন প্রাতে আমরা অনেকে তাঁহার বসিবার ঘরে নানারূপ গল্প-'গুজোব' করিতেছি, (অবশ্য 'স্বদেশী' সম্পর্কেই কথা হইতেছিল, কেননা, তখন তা' ছাড়া অন্য আলোচ্য আর বড়-কিছু ছিলনা;) সহসা দূর হইতে সাগর-কল্লোলের মত একটা গদ্‌গদ-গভীর স্বর-সুর আমাদের কাণে ভাসিয়া-আসিল। বলা-বাহুল্য—'স্বদেশী' ভাবে তখন এদেশ ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লাবিত;—পথে-ঘাটে, ঘরে-বাহিরে নগরে-প্রান্তরে, পল্লীতে-পল্লীতে, সর্ব্বত্রই তখন নব-জাগরণের বিপুল-বন্যা অপ্রতিহত ভাবে প্রবহমাণ। কল-কোলাহল-ধ্বনি ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে, আমরা আগ্রহাকুল, কম্পিতবক্ষে সকলে উঠিয়া, বাহিরের পথিপার্শ্বস্থ বারেন্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, সংখ্যাতীত যুবকবৃন্দ,—পরিধানে পীতবাস, হস্তে বিবিধ মন্ত্রাঙ্কিত (Motto-আঁকা) গৈরিক পতাকা,—দল-বদ্ধ হইয়া সেই বিরাট্ 'প্রোসেশানে'র (শোভাযাত্রার) পুরোভাগে মাতৃনাম গায়িতে-গায়িতে চলিয়াছেন; আর, সেই সঙ্গে অগণ্য লোক মন্ত্রমুগ্ধ চিত্তে সে মহাগীত-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহ-সমক্ষে

আসিয়া, (তাঁহাকে দেখিয়াই হৌক্, অথবা অন্য যেহেতুতেই হৌক্,) সহসা সেই অসংখ্য জনসঙ্ঘ সংক্ষুব্ধ ও গতিহীন হইয়া পড়িল। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল সে ভাব-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া, একেবারেই প্রকাশ্য রাজপথে নামিয়া-আসিয়া, স্বয়ং সে-গানে যোগদান করিলেন ; এবং উর্দ্ধবাহু হইয়া, মেঘ-মন্দ্রবৎ, মুহুর্ম্মুহু 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রে অকস্মাৎ অম্বরতলে ভাব-রোমাঞ্চ সঞ্চারিত করিয়া-দিলেন। সেদিন, শরতের সেই স্বচ্ছ-সুন্দর, অম্লান প্রভাতে তদীয় রক্তিম মুখমণ্ডলে দিব্য ভাব-সমারোহের যে জ্বলন্ত জ্যোতির্ব্বিভা দেখিয়াছিলাম,—আমার এ বিরহ-দগ্ধ হৃদয়-পটে চিরকাল তাহা অলোপ্য স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়া-গেল। প্রকাশ্য পথ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, মাতৃভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সেই পরুষ-গম্ভীর কণ্ঠে সেদিন যে মহাসঙ্গীত-সুধা শত-শত 'সন্তান'-কর্ণে বিতরণ করিয়াছিলেন, আর এ দুর্ভাগ্য দেশ সে গান শুনিতে পাইবে না! হায়রে—আজ সে গভীর-গম্ভীর স্বরলহরী চিরতরেই স্তব্ধ হইয়া-গিয়াছে!

আর-এক দিনের ঘটনা বলিব। সে দিন ১৬ই অক্টোবর, ৩০এ আশ্বিন,—বাঙ্গালীর সেই চিরস্মরণীয় 'অরন্ধন' ও 'রাখী বন্ধনে'র পুণ্যাহ। সেদিন সকাল বেলায়—৯॥ কি দশটা বাজিয়াছে এমন সময়ে,—'কুন্তলীনের' ৺হেমেন্দ্র বসু (এইচ্ বোস) মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে আসিয়া 'ব্যস্তসমস্ত'-ভাবে তাঁহাকে বলিলেন, —"আজ বিকালে গোলদিঘীতেও একটা প্রকাণ্ড সভা হবে। সেখানকার জন্য একটা গান লিখে দিন। এখনই চাই,—ছাপ্‌তে হবে।" বসু মহাশয়কে বিদায় দিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল তদ্দণ্ডেই আমার সম্মুখে বসিয়া, অনধিক দশ-পোনেরো মিনিটের মধ্যে একটি 'আশ্চর্য্য রকমের উৎকৃষ্ট,' অগ্নি-গর্ভ গান—ঠিক যেন খেলার ছলে—রচনা করিয়া-ফেলিলেন ; এবং তৎক্ষণাৎ উহা 'কুন্তলীন'-প্রেসে পাঠাইয়া-দেওয়া হইল। অপরাহ্ণ কালে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং একটি দলের নায়ক

হইয়া, বাগবাজার পশুপতিবাবুর সুবিশাল গৃহ-প্রাঙ্গণে গমন করিলেন ; এবং সেই সম্মিলিত, প্রমত্ত জনসমুদ্রের মধ্যে স্ব-রচিত সঙ্গীত-সুধার সঞ্জীবনী স্রোতোধারা প্রবাহিত করিয়া-দিলেন। সেদিন তাঁহাকে তদবস্থায় যাহারা একবার দেখিয়াছে, ইহজীবনে কখনও তাহারা সে স্বর্গীয় দৃশ্য বিস্মৃত হইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। নগ্ন-পদ, 'আলুথালু', চির-রুক্ষ কেশরাশ, মল্লকচ্ছ-পরিহিত, মাতৃপ্রেমে বিভোর, বাল-স্বভাব দ্বিজেন্দ্রলাল ঠিক-যেন শিশুটির মত, হেলিয়া-দুলিয়া, গানের তালে-তালে হাত নাড়িতে-নাড়িতে যখন আবেগভরে গান গাইতে-ছিলেন ; মাঝে-মাঝে চৌদিকস্থ গায়কগণকে 'বন্দেমাতরম্'-মন্ত্রে মাতাইয়া-তুলিতেছিলেন ; আর, আপনিও উৎসাহ দমন করিতে না পারিয়া, নিম্ন-গভীর স্বরে 'মাগো, মা-আমার'—বলিয়া চোখ মুছিতে-ছিলেন তখন সে-যে কি সৌন্দর্য্যই দেখিয়াছিলাম,—এভাবে আজ কেমন করিয়া, আমি তাহা বাহিরের দশ জনকে বুঝাইয়া বলিব !

পশুপতি বাবুর 'ময়দান' হইতে ভাবোন্মত্ত দ্বিজেন্দ্রলাল যেই আসিয়া শ্যামবাজারের ট্রাম-গাড়িতে চড়িলেন অমনই তাঁহার পিছনে-পিছনে বহুসংখ্যক লোক (তিনি কোথায় যাইতেছেন জানিয়া-লইয়া,) কেহ পদ-ব্রজে, কেহ বা ট্রামে গোলদিঘী অভিমুখে ছুটিয়া-চলিল। কবি যখন গোলদিঘীতে গিয়া পৌঁছিলেন, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থামত, তখন তথায় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত কাশী ঘোষাল মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত সেই গানটি শেষ করিয়া, একটা 'কেরাসিন' তেলের কাঠের বাক্সর উপরে দাঁড়াইয়া, খুব প্রমত্ত বেগে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতঃপর, দ্বিজেন্দ্রলাল সেখানে আর বেশি বিলম্ব না করিয়া ধীর-মন্থর গতিতে গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। পথে যাইতে-যাইতে, গদ্‌গদ-আর্দ্র কণ্ঠে, সহগামী জনৈক বন্ধুর গলায় সহসা হাত দিয়া, আপনার কাছে টানিয়া-আনিয়া বলিলেন,—"আজ একি দেখ্‌লাম,—য়্যাঁ ? এতটা যে কোনদিন

ভাবাও যায় নি। তবে, কি এখনও সত্যিই আশা আছে নাকি ?"

জননী-জন্মভূমিকে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কি চক্ষে দেখিতেন,—স্বদেশ-প্রেমে তাঁহার সারাটা প্রাণ যে কিরূপ তন্ময় হইয়া গিয়াছিল তাহার শুধু একটু আভাসমাত্র দেওয়ার জন্য এস্থলে আর একটি সামান্য ঘটনার কথা বলিয়া আমি এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এসম্পর্কিত আমার সকল স্মৃতি-কথার যথোচিত বিবৃতি করিতে-হইলে, শুধু সেই প্রসঙ্গেই একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিত হইতে পারে। নিম্নোক্ত ঘটনাটি নগণ্য বা তুচ্ছ হইলেও, এতদ্দ্বারা পাঠক এটুকু অবশ্য বুঝিতে পারিবেন যে, দেশাত্মবোধ এই ক্ষণজন্মা পুরুষের কিরূপ মজ্জাগত স্বভাবে বা ঐকান্তিক স্বধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। ঘটনাটি এই,—

দ্বিজেন্দ্রলালের জনৈক বন্ধু একদিন তাঁহাকে লইয়া বঙ্গের কোন-এক গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মাঝে মাঝে দাঁত-খোঁটার অভ্যাস ছিল। পল্লী-পথে চলিতে-চলিতে তিনি পথি-পার্শ্বস্থ এক জীর্ণ পর্ণকুটিরের চাল হইতে দাঁত খোঁটার জন্য একগাছি তৃণ টানিয়া লইলেন। এজন্য তখনই সে কুটীর হইতে এক বৃদ্ধা বাহির হইয়া-আসিয়া, কর্কশ ভাষায় তাঁহাকে অত্যন্ত গালি দিতে আরম্ভ করিল। প্রথমটা উপহাসের ভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল সে সব তিরস্কার হাসিয়াই উড়াইয়া-দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, বারংবার শেষে যখন বৃদ্ধা বলিতে লাগিল,—

'এ যে আমার ঘর, এ যে আমার একমাত্র সম্বল, এখানেই যে আমি মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া আছি। ওগো, আমার আর যে কিছু নাই, কোন উপায় নাই,—এটুকু গেলেই যে আমার সব যায়!'

তখন দ্বিজেন্দ্রলাল সহসা গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয় আর্দ্র হইয়া আসিল। ক্ষণকাল মৌন রহিয়া, পরে গাঢ়, গদ্গদকণ্ঠে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুকে বলিলেন,—

'আহা! এই অসহায়া বৃদ্ধা ছোট্ট এই কুড়ে ঘরখানিকে যেমনভাবে নিজস্ব,

আপনার সর্ব্বস্ব বলে' জেনেছে, আমরা যদি এই ভারতবর্ষকে ঠিক তেমন্‌ই-ধারা অন্তরের সঙ্গে আমাদের নিজস্ব, সর্ব্বস্ব বলে বুঝ্‌তে পার্‌তাম তবে আর ভাবনা কি ছিল! হায়, তা' পারলাম না,—এই বড় দুঃখ।'

তুচ্ছ তৃণগাছির জন্য নগণ্য এক ভিখারিণীর তীব্র তিরস্কার শুনিয়াও মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের মনে অণুমাত্র বিরক্তি, ক্রোধ বা অন্য-কোন চিন্তার উদয় হইল না;—পরন্তু, আপন স্বভাব-সিদ্ধ সেই-এক দিব্য চেতনায় তখনই তাঁহার চিত্ত সংক্ষুব্ধ ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল,—দেশ-প্রেমে তাঁহার পবিত্র প্রাণ পূর্ণ ও পরিপ্লুত হইয়া গেল!

কলিকাতায় থাকিতে এই সময়ে তিনি যে অতি-সুন্দর, মর্ম্মহারী, কতিপয় ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন সেগুলি, বিশেষ কারণবশতঃ বাধ্য হইয়া, ভয়ার্ত্ত আত্মীয় বন্ধুদের পরামর্শে, তিনি অল্প কাল পরে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। যদি সেগুলি আজ কোনমতেও রক্ষিত হওয়ার উপায় থাকিত, আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি—তাহাহইলে 'আমার দেশ' ও 'আমার জন্মভূমি'র আরও অন্ততঃ দু'তিনটি তুল্য-মূল্য সঙ্গীত জাতীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য্য ও গৌরব বর্দ্ধন করিত। সুহৃজ্জনের আগ্রহে ও অনুরোধে কবি যখন একে-একে, স্বহস্তে সেই-সব অনুপম সঙ্গীত অগ্নি-সংযোগে দগ্ধ করিতেছিলেন তখন ক্রন্দনোন্মুখ-কম্পিত কণ্ঠে তিনি যে-কয়টি কথা বলিয়াছিলেন, আজ এতদিনেও তাহা আমি ভুলিতে পারিলাম না! আহত অভিমানভরে, মলিন হাস্য করিয়া, বাষ্প-স্পন্দিত স্বরে দ্বিজেন্দ্রলাল কহিলেন,—'দেখ্‌ছ? কেমন জ্বলে' যাচ্ছে, দেখ্‌ছ? এ আগুন বাইরে যতটা জ্বলছে তার কি দশগুণও অন্ততঃ (বুকে হাত দিয়া) এই—এখানে জ্বল্‌ছে না?' বলা বাহুল্য—দেখিতে দেখিতে সর্ব্বভুক্ বহ্নি সেই মহামূল্য কাগজের খণ্ডগুলি তখনই ভস্মশেষ করিয়া ফেলিল; এবং শেষ পর্য্যন্ত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন।

৪

বন্ধু-বাৎসল্য, 'পূর্ণিমা-মিলন', বন্ধু-বিচ্ছেদ, 'দুর্গাদাস' নাটক প্রণয়নের উদ্দেশ্য, কলিকাতা ত্যাগ ও বিদায়-সম্বর্দ্ধনা।

তত স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও পাঠক বোধহয়—এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন যে দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় থাকিতে তাঁহার স্বজন-সুহৃদ্বর্গের প্রাত্যহিক মিলন-মন্দির ছিল—সেই হাস্য-মুখর, আনন্দময় আবাস-গৃহখানি। শরীর অপটু, মন অবসন্ন, হৃদয় সংসারের বিবিধ দুঃখ-নিষ্পেষণে ম্রিয়মাণ, ব্যথিত ও বিক্ষত; গৃহে মন টেঁকে না, বাহিরেও কোন আকর্ষণ নাই, কোন দিকেই আর কিছু ভাল লাগিতেছে না;—চল 'দ্বিজালয়ে',—দ্বিজেন্দ্র-সহবাসে। বড়-বেশী সময় নহে, কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া থাক; দেখিবে,—তোমার মন সরস ও প্রফুল্ল হইবে; হৃদয় বিবিধ ভাব-তরঙ্গে নৃত্য করিয়া-উঠিবে, জীবন আবার স্বাদু ও উপভোগ্য বোধ করিবে; আর, শরীরের কোন অসুখ, কোনরূপ গ্লানি বাস্তবিক কিছুই যে তোমার আছে,—অন্ততঃ সেটুকু সময়ের জন্য—তাহা তোমার মনেও থাকিবে না। এমনই আশ্চর্য্য সে স্থান-মাহাত্ম্য,—সে সৎসঙ্গের এমনই সন্তাপহর, সঞ্জীবন প্রভাব! এ যে আমি কোন অত্যুক্তির সাহায্যে বাজে গল্প বলিয়া আমার প্রাণ-প্রিয় সুহৃত্তমের অযথা মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিতেছি,—কেহ যেন ভ্রমেও তাহা মনে করেন না। সরলতা ও প্রীতির অফুরন্ত, অম্লান উৎস,

দ্বিজেন্দ্র-সঙ্গ।

সুহৃদন্তপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের সান্নিধ্য বা সঙ্গ সত্য-সত্যই কি যে অসামান্য তৃপ্তিকর, আনন্দময় ও সর্ব্বরকমেই জ্ঞানপ্রদ ও স্বাস্থ্যকর ছিল,—যাঁহাদের তাঁহার সহিত তদ্রূপ একান্ত ঘনিষ্ঠতার অবকাশ ঘটে নাই, আজ তাঁহাদের কাছে তা' বলিতে-গেলেও ভয় হয়,—পাছে সে-সব বিবরণ কেহ অবিশ্বাস্য বা কাল্পনিক ভাবিয়া, হাসিয়া উড়াইয়া-দেন ! স্বর্গীয় জেলা-জজ্ কবি-বন্ধু বরদাচরণ মিত্র মহাশয় একদিন প্রাতঃকালে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে-আসিয়া, প্রায় একপ্রহর কাল সেখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঐরূপ হাস্যকৌতুক, সাহিত্যিক বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া, উঠিয়া-যাইবার সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন,—

'হিংসা হয় মহাশয় ! সাধ যায়—এ ছাই চাকুরী ছাড়িয়া আপনাদের দলে আসিয়া ভিড়ি'। আপনারা কি সুখেই আছেন ! এ দৃশ্য দেখিলে আনন্দ হয়, উৎসাহ হয়, পুণ্যও হয়। দ্বিজুবাবুর এ আড্ডায় আমি যদি মাসে অন্ততঃ দশটা দিনও আসিয়া এক-একবার বসিয়া যাইতে পারিতাম ত' আমার জীবনী শক্তি নিশ্চয় দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইত।'

সে-সব দৈনন্দিন বৈঠকে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, স্বদেশী ও বিদেশী বিবিধ অবস্থাদির নানারূপ আলোচনা তো হইতই ;—তা-ছাড়া, সঙ্গীতালাপ, (দেশী ও বিলাতী) কাব্য ও গদ্য গ্রন্থপাঠ, রঙ্গ-রহস্য বিদ্রূপ-কৌতুক, ধূম-পান, চা-পান, জলযোগ এবং গোলযোগ—অতি দুর্ব্বার বেগে অবিরামই চলিতে থাকিত।

এই-সব মজলিসে যাঁহারা একদিনও আসিয়াছেন তাঁহারা জানেন—দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন, যুবক-বৃদ্ধ, জ্ঞানী ও অজ্ঞান—সকলেই সমান ব্যবহার প্রাপ্ত হইতেন।

'ভোলানাথ' প্রকৃতি।

'কেতা-দুরস্ত' লোকাচার বা রীতি-নীতির (ইংরাজীতে এক-কথায় যাহাকে Conventionality বলে তাহার) তিনি বড়-একটা ধার

ধারিতেন না ;—খোলাখুলি, শাদা-সিধা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবের, 'উদোমাদা' ধরণের মানুষ ছিলেন। উচ্চ-নীচ ভেদ নাই, আত্ম-পর জ্ঞান নাই ;—সকলকেই সমান আদর, সমান যত্ন, সমান মর্য্যাদা! আমি যেই হই না কেন, তাঁহার বাড়িতে গেলাম ;—সেখানে আমিই যেন তখন সে-গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্তা!—বসিলাম, গল্প করিলাম, আলাপালোচনায় ইচ্ছামত যোগ দিলাম, নিজের আবশ্যক ও 'মর্জ্জি'-মত চাকরকে যখন যা' চাই,—কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া—হুকুম করিলাম, তামাক টানিলাম, চুরুট ফুঁকিলাম ; আবার, যখন ইচ্ছা হইল, চলিয়া আসিলাম। সে-যে আমার নিজের বাড়ি নয়,—আর কাহারো গৃহে গিয়াছি, কাহার সাধ্য সেখানে গিয়া তাহা কল্পনাও করিতে পারে! এমনই তিনি সদাশয় ও 'ভোলানাথ' ধরণের, এক অদ্ভুত প্রকৃতির পুরুষ ছিলেন! বাহ্যিক 'চাক্‌চিক্যময়, 'ফিটফাট্', আমাদের এই আত্ম-সর্ব্বস্ব ও অস্বাভাবিক সমাজে দ্বিজেন্দ্রলাল যে এই-আমাদেরই মত দশ জনের একজন ছিলেন,—আজ তাঁহার অভাবে, সে কথা মনে হইলেও আমি অবাক্ ও আকুল হইয়া-উঠি!

কিন্তু, কেবলমাত্র পরিণত বয়সেই যে তাঁহার হৃদয়-মনের এইসব বিচিত্র গুণে তিনি তাঁহার স্বজন-সুহৃদ্বর্গ বা পরিচিতগণের মনোহরণ করিয়াছিলেন তাহা নহে,—চিরদিন তাঁহার স্বভাবেই এরূপ একটা অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি ছিল। এতদুপলক্ষে তাঁহার অন্যতম গুণমুগ্ধ বন্ধু, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর বরপুত্র, (বেহার ও ওড়িষ্যা প্রদেশের বর্ত্তমান 'গাভর্ণার') বিশ্ব-বিখ্যাত, ('রাইট-অনারেবল্,') 'মহামান্য' লর্ড শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে আমাকে অল্পের মধ্যে যেটুকু লিখিয়া-পাঠাইয়াছেন তাহা এস্থলে মুদ্রিত করিয়া দিলাম। লর্ড সিংহ লিখিতেছেন,—

'আমরা উভয়ে যে সময়ে ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতাম সেই সময়ে আমি প্রথম

তাঁহার সঙ্গে পরিচিত হই। তিনি তখন সিসিটারে কৃষি-বিদ্যালয়ে এবং আমি লণ্ডনে 'লিংকল্‌ন্‌স্‌ ইনে' পড়িতাম। আমাদের উভয়ের অনেক বন্ধু সেখানে ছিলেন; এবং ছুটি উপলক্ষে তিনি লণ্ডনে আসিলে, প্রায়ই খুব ঘন-ঘন আমরা মিলিত হইতাম। তাঁহার সেই চিত্তহারী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি আমাদের সকলেরই পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। আজও আমার খুব স্মরণ হয়—আমাদের সেই সব ভারতীয় সম্মিলনে তাঁহার সঙ্গীত,—বিশেষতঃ তাঁর সেই কীর্ত্তন-গান আমাদের কি অপরিসীম সন্তোষ বিধান করিত! তৎকালে ইংলণ্ডে ভারতবাসীদের সংখ্যা এখনকার মত এত বেশী ছিল না; তন্মধ্যে আবার তাঁর তুল্য সঙ্গীতবিশারদ ব্যক্তির সংখ্যা তো আরও খুবই অল্প ছিল। কিন্তু, এতদতিরিক্ত, মিষ্টার রায় যতটা সময় আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গদান করিতে পারিতেন তাহার সমস্তক্ষণই তাঁর সেই আমোদপ্রদ রসিকতা ও পরিহাসপটুতা আমাদের মধ্যে হাসির লহর ছুটাইয়া দিত! আজ এই প্রায় ৪০ বৎসর পরে, তাঁর সঙ্গে দেখা হইলে তখন যে আমাদের কিসব কথা-বার্ত্তা হইত, তাহা অবশ্য এখন বলা শক্ত; কিন্তু এটুকু আমি বেশ বলিতে পারি যে, যখনই তিনি আমাদের কাছে থাকিতেন,—আমাদের স্পষ্টই বোধ হইত, যেন আমরা বঙ্গদেশেই বাস করিতেছি!

'অতঃপর, স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, আমাদের উভয়ের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র যদিচ (আমার ইচ্ছার চেয়েও অনেক অধিক পরিমাণে) আমাদের মধ্যে ব্যবধান আনিয়া ফেলিয়াছিল তবু যখনই তাঁহার পত্নী ও তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ-সুখ ঘটিত তখনই আবার ঠিক সেই আগের মতই আমরা নানা গল্পগুজোবে প্রবৃত্ত হইতাম; এবং আমার এখনও মনে পড়ে—সুদীর্ঘ কাল, সেই অতগুলি বর্ষ অতীত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁহার জীবনের প্রায় অন্তিম সময় পর্য্যন্ত তিনি কেমন যুবজনোচিত তারুণ্য ও নবীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন!

'আমার দেশবাসী অপরাপর সকলের ন্যায় তাঁহার সঙ্গীত, বিশেষতঃ তাঁহার সেই হাসির গানগুলি, আমার পক্ষে চিরন্তন সন্তোষের উৎস-স্বরূপ হইয়া আছে; এবং ইহা আমি সর্ব্বদাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি যে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ন্যায় অমন একজন অপূর্ব্ব প্রতিভান্বিত ব্যক্তি জীবিত কালে তাঁহার দেশবাসীদের

নিকট হইতে যেটুকু সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছেন তদপেক্ষা বহুল পরিমাণেই সমধিক মর্য্যাদা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ছিল।'

যাহাহৌক্, ঐ সহৃদয়তা, অমায়িকতা ও বন্ধুবাৎসল্য সম্বন্ধে এ স্থলে অল্পের মধ্যে তাঁহার দু'চার জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিলে বোধ হয়, কাহারও অপ্রীতিকর হইবে না।

বন্ধু-বাৎসল্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম স্নেহাস্পদ সুহৃৎ হেম মিত্র মহাশয় লিখিতেছেন,—

'তিনি চিরকাল সকলের সহিত সমানভাবে মিশিতেন। বিদ্বান্-মূর্খ, ধনী-নির্ধন, বালক-বৃদ্ধ, তাঁহার কাছে সকলেই সমান আদৃত হইত। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, উহার মধ্যে আবার সকলেরই যথাযথ মান-সম্ভ্রম তিনি দিতে ভুলিতেন না।'

বাঙ্গালা-সরকারী দপ্তরের সহকারী 'কর্ম্মকর্ত্তা', অর্থাৎ—বাঙ্গলা-গাভর্ণমেন্টের অস্থায়ী 'Under-Secretary',—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নারায়ণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন,—

'তিনি বন্ধুবান্ধবদের প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার সংস্রবে একবার আসিলে কেহই তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। তিনি কলিকাতায় আসিলে তাঁহার বাটি একটি 'ক্লাব' (Club) স্বরূপ গণ্য হইত। এই Club'টি আমাদের অত্যধিক আকর্ষণের বিষয় ছিল। তাঁহার বাটি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে যাওয়া একটা যেন নেশার মতই হইয়াছিল। না গেলে আমাদের ভাত হজম হইত না। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সে-সব সুখ চিরদিনের মতই ফুরাইয়া গিয়াছে!'

সাহিত্যরথী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইয়াছেন,—

'তার তুল্য বন্ধু এযুগে আর বোধ হয় জন্মাইবে না। তার নিজের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না; বন্ধুদের কাছে সে আপনাকে একেবারেই বিনামূল্যে বিকাইয়া দিয়াছিল। তার গৃহ আমাদের জুড়াইবার ঠাঁই ছিল, তার আসবাবপত্র আমাদের ব্যবহারের বস্তু ছিল, তাহার চুল্লী আমাদের চা ও

রসনা-তৃপ্তির নানারূপ রসদ যোগাইত, তার হৃদয় আমাদের বিলাসের কাম্য কানন ছিল। সে যে কি ছিল তা শুধু আমরাই জানি ; আর কেহ তা জানিবে না, বুঝিবা বুঝিতেও পারিবে না!'

পাঁচকড়িবাবু এই অল্প-কয়েকটি কথায় যা' বলিয়াছেন ইহার পর আর কোন কথা না কহিলেও ক্ষতি নাই। এ উক্তিগুলির প্রতি অক্ষর উজ্জ্বল সত্যে আমাদের এ হৃদয়ের পরতে-পরতে 'জ্বল্-জ্বল্' করিয়া জ্বলিতেছে!

যাহাহৌক্, এইভাবে প্রত্যহই তাঁহার নিজ গৃহে সাহিত্যিকগণের বৈঠক বসিলেও, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া, এ সময়ে আবার এক নূতন প্রস্তাব-উত্থাপন করিলেন। আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না, একাকী ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া-বেড়াইতে-ছিলাম। প্রস্তাবটি স্থিরীকৃত হইলে, দ্বিজেন্দ্রলাল এই অভিনব অভিপ্রায় সম্বন্ধে আমাকে তৎক্ষণাৎ এক পত্রে লিখিয়া-পাঠাইলেন,—

'পূর্ণিমা-মিলন' প্রতিষ্ঠা।

'* * এক নূতন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে। পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনের জন্য এই পত্র পাওয়া মাত্র, ঐ 'লক্ষ্মীছাড়া', 'ভবঘুরে' বৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে এখানে চলিয়া আসিবে। 'ব্যাপারটা কি?—না, এই যে, আমি (অর্থাৎ আমরা) ইচ্ছা করিয়াছি, প্রতি পূর্ণিমায় দেশশুদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করিয়া, এক-এক স্থানে এক-একবার প্রতি 'পূর্ণিমা' উপলক্ষে 'মিলন' করা যাইবে। নাম হইবে 'পূর্ণিমা-মিলন'। ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদায় সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলা-মেশা, ভাব-বিনিময়, প্রীতি-বর্দ্ধন ও পরিচয়াদি হইবে ; আর তাহার সঙ্গে সেখানে (যেখানে যখন হইবে) গৃহস্বামীর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যানুসারে, অল্প কিছু জলযোগ,—এই ধর যেমন চা, সরবৎ প্রভৃতি ও চুরুট-তামাকের (সিগারেটেরও !!) ব্যবস্থা থাকিবে। আগামী দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় প্রথমে আমার গৃহে এই মিলন। তারপর প্রতি পূর্ণিমায় (যদি কেহ চান ত' তাঁর বাড়িতে, নইলে আমারই এখানে) মাতৃভাষার সেবকগণ অর্থাৎ আমাদের সতীর্থ জাতভাইরা—একত্র হইবেন।

এ প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমার যে দ্বিমত নাই তা আর লিখিয়া জানাইয়া সময় নষ্ট করার দরকার নাই। তুমি এখনই বিনা-খবর আসিয়া দর্শন দেহ! 'এস এসহে' ইত্যাদি—(রবিবাবু)।"

অতঃপর, যথাকালে দ্বিজেন্দ্রলালের ৫নং সুকীয়া ষ্ট্রীটের বাস-ভবনে, (১৩১১ সালের দোল-পূর্ণিমার সায়াহ্নে,) প্রথম 'পূর্ণিমা-মিলনের' বৈঠক বসে। এই অধিবেশনে কলিকাতার প্রায় সকল 'নাম-জাদা' সাহিত্যসেবীরাই হাজির হইয়াছিলেন; এবং ইহার অল্প পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত রবিবাবুর মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়া-থাকিলেও, এক্ষেত্রে কবীন্দ্রও সশরীরে হাজীর ছিলেন। সেবার প্রাণ খুলিয়া আলাপ-পরিচয়, গল্পগুজোব, রঙ্গ-ব্যঙ্গ, সঙ্গীতালাপ ও কবিতা-পাঠ প্রভৃতি হয়; এবং সব-শেষে অল্পাধিক পরিমাণে সকলে মিষ্টমুখ করিয়া, গৃহে ফিরিবার পূর্ব্বে, পরমোল্লাসে 'ফাল্গুনের সে ফাগের খেলা'ও যথারীতি সম্পন্ন করেন। এ খেলায় সমাগত সকলে সাগ্রহে যোগ দিয়াছিলেন; এমন কি, রবীন্দ্রনাথের সেই শুভ্র-সুন্দর পরিচ্ছদও এই ফাগরাগে একেবারেই 'লালে-লাল' হইয়া গিয়াছিল—এ বিষয়ে একটু বক্তব্য আছে। বহুক্ষণ ফাগ-খেলার পর একে-একে যখন সকলে রঞ্জিত হইয়া-উঠিলেন তখন দ্বিজেন্দ্রলাল দেখেন,—রবিবাবু সে খেলায় যোগ না দিয়া, বেশ-একটু পাশ কাটাইয়া, দূর হইতে শুধু দর্শকভাবেই সে দৃশ্য উপভোগ করিতেছেন;—তাঁহার গায়ে তখনও কেহ ফাগ দেন নাই। ইহা যেই নজরে পড়া অমনই দ্বিজেন্দ্রলাল মুঠো-মুঠো ফাগ লইয়া-গিয়া রবিবাবুর আপাদ-মস্তক একেবারে রঞ্জিত করিয়া-দিলেন; এবং তাহাতে রবিবাবুও যেন সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার সেই স্বভাব-কোমল মধুকণ্ঠে, মৃদু-মৃদু হাসিয়া, অনুরাগ-স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন,—"আজ দ্বিজুবাবু শুধু যে আমাদের মনোরঞ্জনই করেছেন তা নয়,—তিনি আজ আমাদের সর্ব্বাঙ্গ-রঞ্জন কর্‌লেন"! এই অধিবেশনে রবিবাবু

'সে যে আমার জননীরে' নামক তাঁহার করুণ-মধুর সঙ্গীতটি স্বয়ং গান করিয়া সমাগত সকলকে আপ্যায়িত করেন।

ইহার পর হইতে পূর্ণ এক বর্ষকাল আমাদের এই বড়-সাধের 'পূর্ণিমা-মিলন' যথানিয়মে প্রতি পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। বাহুল্যভয়ে এ-সকল মিলনের পূর্ণ বিবরণ বা 'প্রতিবেদন' (Report) না দিয়া, মাত্র তাহার একটা মোটামুটি হিসাব—সাহিত্যিকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য—এখানে দাখিল করিয়া দিতেছি।—

(২) মধু-পূর্ণিমা (১৩১২ সালে)।—নাট্যগুরু ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের 'দীন-ধাম' নামক কলিকাতাস্থ ভবনে সম্পন্ন হয়; শুদ্ধ-স্বভাব, পিতৃ-ভক্ত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এই মিলনের আহ্বান করেন।

(৩) মাধবী-পূর্ণিমা।—ফুল-দোলের দিন সার ডাঃ কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের গৃহে তদীয় আমন্ত্রণে সুসাধিত হয়। এই মিলনে সর্ব্ব-প্রথম দ্বিজেন্দ্রলাল নিম্নোক্ত সঙ্গীতটি (আমাদের মত ২।৪ জনকে লইয়া) সমবেত কণ্ঠে গান করেন। গানটি পূর্ণিমা-মিলন উপলক্ষেই রচিত।—

"এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ।
(হেথা) আছে কিছু জলযোগ, আর চা'এর মাত্র আয়োজন॥
(আজ) সাহিত্যিক সব ছোট-বড়, এইখানেতে হ'য়ে জড়,
আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে কর্ত্তে হ'বে কাল-হরণ।
(হোক্ না) ধনী-গরিব, ছোট-বড়,—সবার হেথা একাসন॥
(হেথা) রবেনাক ঐতিহাসিক গবেষণার কোন ক্লেশ,
(হেথা) হবেনাক বক্তৃতা কি যুক্তিশূন্য উপদেশ;
(আমরা) আসিনিক জারিজুরি কর্ত্তে কোন বাহাদুরী;
আসিনিক কর্ত্তে বিফল রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন।
(হেথা) নাইক করতালির মধ্যে কারো আত্ম-নিবেদন॥
(যাঁদের) আছে কিছু ভায়ের প্রতি, মাতৃভাষার প্রতি টান,
(তাঁদের) কর্ত্তে হবে পরস্পরে প্রীতি-দান ও প্রতিদান।
(হেথা) অহ্তুচ্ছ কলরবে মেলা-মেশা কর্ত্তে হ'বে।

(শুনুন) এটা হচ্ছে—'সাহিত্যিকী পৌর্ণমাসী সম্মিলন।'
—(দোহাই) ধর্ব্বেন না কেউ, হ'ল একটু অশুদ্ধ যা ব্যাকরণ॥"

এখানে নাট্টাচার্য্য গিরিশচন্দ্র মহাকবি মাইকেল-রচিত 'সীতা ও সরমার কথোপকথন' কবিতাটির আবৃত্তি করেন।

(৪) আষাঢ়-পূর্ণিমা।—ঔপন্যাসিক ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার অনুষ্ঠাতা, এবং তাঁহারই গৃহে সাহিত্যিকবর্গ সম্মিলিত হন। দামোদরবাবু ইহাঁদের প্রীত্যর্থ প্রচুর অর্থ-ব্যয় করিয়াছিলেন।

(৫) রাখী-পূর্ণিমা।—'রসরাজ' অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিমন্ত্রণে 'ষ্টার'-রঙ্গমঞ্চে এই অধিবেশন হয়। এই মিলনে সাহিত্যিকগণ পরম প্রীতির সহিত রাখী-বন্ধনোৎসব নির্ব্বাহিত করেন।

(৬) ভাদ্র-পূর্ণিমা।—সাহিত্য-পরিষদের তৎকালীন সভাপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের ভবনে নির্ব্বাহিত হয়; এখানে কবি ৺রজনীকান্ত ও তদীয় 'গুরুদেব' * দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেদের রচিত হাস্য ও গম্ভীর রসাত্মক কয়েকটি গান করেন।

(৭) কোজাগর লক্ষ্মী-পূর্ণিমা।—'বঙ্গবাসী' কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের গৃহে নিষ্পন্ন হয়, এই মিলনে সেই সর্ব্ব-প্রথম দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদিগকে লইয়া সমবেত স্বরে 'আমার দেশ' সঙ্গীতটি গাহিয়া সমবেত শ্রোতৃগণকে সঞ্জীবিত, চমৎকৃত, ও মন্ত্র-মুগ্ধ করেন।

(৮) রাস-পূর্ণিমা।—৪১ নং সুকীয়া ষ্ট্রীটের বাড়িতে সম্পন্ন হয়। মহারাজ ৺যতীন্দ্রমোহন, মহারাজ ৺সূর্য্যকান্ত, নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র, বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, দেবোপম সার্ গুরুদাস, সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র প্রমুখ প্রায় সার্দ্ধ-শতাধিক সাহিত্যিক উপস্থিত হন, এই মিলনে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তদীয় অনুজ রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটির আবৃত্তি-করেন; দ্বিজেন্দ্রলাল সপুত্রকন্যা 'ইরাণ দেশের কাজী' 'সাধে কি বাবা বলি' প্রভৃতি গান গাহেন এবং আরও অনেকে নানা রকম গুণপনার পরিচয় দেন।

---

* কান্ত-কবি রজনীকান্ত দ্বিজেন্দ্রলালকে 'গুরুদেব' বলিয়া ডাকিতেন ও তদ্রূপই সম্মান করিতেন —গ্রন্থকার।

স্থানাভাব বশতঃ সে-সব কিছু বলিব না। ঐ সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় ছিলেন না,—খুলনায় বদ্‌লী হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমময় বন্ধু-আমার সেখান হইতে, অর্থ-ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার করিয়াও, শুধু আমার এই নিমন্ত্রণ-রক্ষা করার জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

(এই সময়ে, অর্থাৎ—দ্বিজেন্দ্রলালের অবর্ত্তমানে 'সাহিত্য'-পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, সুহৃদ্বর সুরেশ সমাজপতি মহাশয়কে সকলে মিলিয়া 'পূর্ণিমা-মিলনের' সম্পাদক মনোনীত করেন; এবং তদনুসারে তাঁহারই নাম তৎকালে প্রতি আমন্ত্রণ-পত্রে সম্পাদকরূপে মুদ্রিত হইত।)

(৯) হৈমন্তিকী-পূর্ণিমা।—দ্বিজেন্দ্রলালের 'বড়-কুটুম্ব,'—অর্থাৎ সম্বন্ধী বা শ্যালক,—বিখ্যাত ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের গৃহে এই বৈঠক বসিয়াছিল।

(১০) পৌষ-পূর্ণিমা।—সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা, অক্লান্তকর্ম্মী ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের গৃহে এই সম্মেলন সুসাধিত হয়।

(১১) মাঘী-পূর্ণিমা। মনস্বী সুলেখক, প্রসিদ্ধ দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ ইহার অনুষ্ঠান-কর্ত্তা। এখানে সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺গঙ্গাগোবিন্দ বাবুর হাসির গান ও বহুবিধ অভিনয়াদি হইয়াছিল।

(১২) দোল-পূর্ণিমা—শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীটের নন্দলাল দে মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁহার ভবনে এ উৎসব নির্ব্বাহিত হয়। এখানেও দোললীলা উপলক্ষে আবির-খেলা হইয়াছিল।

পরবৎসর পূর্ণিমা-মিলনের প্রথম অধিবেশন আবার স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল আহ্বান করেন, এবং তজ্জন্য যথাকালে তিনি কর্ম্মস্থল হইতে কলিকাতায় আসেন। এই মধু-পূর্ণিমার সুমধুর পুনর্ম্মিলনোৎসব ডাক্তার সার কৈলাস বাবুর ভবনে সম্পন্ন হয়! বলা বাহুল্য—সেবারে বহু দিন পরে আবার দ্বিজেন্দ্রলালের আগমনে সাহিত্য-সমাজ হর্ষোল্লসিত হইয়া-ওঠেন।

ইহার পর—যেমন বাঙ্গালীর সব কাজেই হইয়া-আসিতেছে,—প্রতিষ্ঠাতা দ্বিজেন্দ্রলালের অবর্ত্তমানে, এই মিলনানুষ্ঠানও অল্পে-অল্পে

অনিয়মিত হইয়া-পড়িল। ফলে, তাঁহার বন্ধুদের মধ্যেও (এক ললিতবাবু ভিন্ন) এ বিষয়ে আর-কেহই তেমন মনোযোগী না হওয়ায়, অতঃপর আরও বছর দুই 'পূর্ণিমা-মিলন' মধ্যে-মধ্যে আহূত ও অনুষ্ঠিত হইয়া, কালক্রমে তাহা একেবারে বন্ধই হইয়া-গেল। এ দুই বৎসর যাঁহাদের আগ্রহ ও ইচ্ছানুসারে মধ্যে-মধ্যে 'পূর্ণিমা-মিলন' সম্পন্ন হইয়াছে, নিম্নে তাঁহাদিগকে একবার স্মরণ করা যাক্।—শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র মিত্র, কবিবর প্রমথনাথ, যতীশচন্দ্র মিত্র, রসময় লাহা, প্রসাদদাস গোস্বামী, আর 'প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব' নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। ইহা ভিন্ন মিনার্ভা থিয়েটারে, অমূল্য বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের 'এডওয়ার্ড ইনসটিট্যুশানে', সাহিত্যসম্রাট ৺বঙ্কিম বাবুর ও আমার গৃহেও এক-একবার 'পূর্ণিমা-মিলন' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

'পূর্ণিমা-মিলন' যখন বন্ধ হইবার উপক্রম হইল তখন দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত আক্ষেপ করিয়া আমাকে লিখিলেন,—

"পূর্ণিমা-মিলন ত উঠে যাব-যাব কর্চ্ছে। গত দু'তুবার কেহ ডাকে নাই। এটার অস্তিত্ব Short but sweet, (ক্ষুদ্র হইলেও সুমধুর)—কবি কিট্‌সের জীবনের ন্যায়। অমৃত বোস ঠিকই বলেছিলেন যে অত ব্যয় করলে ক্রমে এটি অসাধ্য ও দুর্ভার হয়ে দাঁড়াবে,—টিক্‌বে না। কেহ বৎসরান্তেও ১০০৲ টাকা শুদ্ধ সাহিত্যিকেদের মিলনার্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত,—এই রকমই আমাদের দেশ বটে! মেয়ের বিয়েতে বরপক্ষের তাই দেঁড়েমুষে টাকা আদায় করা উচিত।—আদায় করে' না নিলে এ জাতি ব্যয় কর্ব্বে না। কিম্বা সাহিত্যের প্রতিই আদর-মর্য্যাদা নাই, সাহিত্যিকদের সঙ্গে মেশবার ইচ্ছা নাই। নৈলে কল্‌কাতায় এরূপ সাহিত্যিক বা শিক্ষিত সাহিত্যানুরাগীর কি এতই অভাব—যাঁরা বৎসরান্তে একশত টাকাও এই উদ্দেশ্যে ব্যয় কর্ত্তে পারেন? পূজা-আর্চ্চা ত উঠে গেল,—সেসব 'বাজে খরচ' বেঁচে গেছে। এদিকে এই সব সামান্য খরচ কর্ত্তেও কুণ্ঠিত। হা অভাগা বঙ্গজাতি! তুমি সত্যই প্রাণহীন,—কোন-দিকেই তোমার উৎসাহ নাই, অধ্যবসায় নাই, ধৈর্য্য নাই, মনোবল নাই!

বাড়ীতে শুয়ে-শুয়ে তামাক-টানা, আর প্রাণপণে বংশ-বৃদ্ধি করাই তোমার শোভা পায়।" *

আজ আর ইহার অস্তিত্ব নাই। কিন্তু, সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয় তদবধি বহু বৎসর মধ্যে-মধ্যে, (তদীয় পিতৃদেব নাট্য-গুরু দীনবন্ধুর শ্রাদ্ধাহে,) প্রতি রাস-পূর্ণিমায়, কলিকাতার যাবতীয় সাহিত্যিকগণকে সম্মিলিত করিয়া পিতৃভক্তি ও বন্ধু-প্রীতির সার্থক পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। গত ১৩১৯ শালের রাস-পূর্ণিমায় তদীয় ভবনে যে অধিবেশন হয় তাহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং স্ব-রচিত 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে'—এই অপূর্ব্ব গঙ্গা-স্তোত্রটি 'ইভনিং ক্লাবে'র সভ্যগণের সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে গান করিয়াছিলেন। এই সভায়, জানি না কি অজ্ঞাত অনুপ্রেরণায় প্ররোচিত হইয়া পূতচরিত ললিতচন্দ্র সমবেত সাহিত্যিকগণের প্রতিনিধিরূপে দ্বিজেন্দ্রলালের গল-দেশে ফুল-হার পরাইয়া-দিয়া, নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করিয়া তাঁহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধিত করেন! আশ্চর্য্য এই যে, ইহার পর বৎসর আর দ্বিজেন্দ্রলাল 'পূর্ণিমা-মিলনে' উপস্থিত হইলেন না,—তৎ-পূর্ব্বেই তিনি এই নশ্বর ধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্ত পথের যাত্রী হইয়াছেন। ললিতবাবুর কবিতাটি পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়া আমরাও এ প্রস্তাবের এখানে উপসংহার করি।—

'সাত বৎসরের কথা।—দোল পূর্ণিমায়,
সাহিত্যিক বন্ধুগণে হইয়া বেষ্টিত,
মধুময় হাসি-গানে, ফাগের খেলায়
এ মধু মিলন তুমি কর প্রতিষ্ঠিত।
ভায়ের স্নেহের যেই মন্দাকিনী-ধারা
তব পুণ্য অনুষ্ঠানে ছিল প্রবাহিত,
আজি স্রোতস্বতী রূপে বঙ্গদেশে সারা,—
ত্রিদিব-কল্লোল তান তরে নিনাদিত।

---

* গয়া, ৮'ই জুলাই', ০৩।

এমনি চাঁদিনী রাতে, চাঁদের কিরণে
বাণী-পুত্রগণ-সেবা কিবা সুশোভন!
মুরলীর সুললিত তাল-লয়ে সনে
গায়কের কণ্ঠে যথা সঙ্গীত-স্ফুরণ!
ধন্য হোক বঙ্গে তব এ পুণ্য পার্ব্বণ—
সাহিত্যিক-সেবা ব্রত—'পূর্ণিমা-মিলন।'

রবীন্দ্রনাথের সহিত মনোমালিন্য ও বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদ।

কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রায় বর্ষদ্বয় পূর্ব্বে, অর্থাৎ—সেই ভরপূর্ 'স্বদেশী'র 'মরশুমে',—দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত বিশ্ব-বন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথের মনোমালিন্যের প্রথম সূত্রপাত হয়। উপলক্ষ্য -হিসাবে, প্রত্যক্ষভাবে যে ঘটনায় এই শোচনীয় বিরোধের আরম্ভ, বলা বাহুল্য—তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে রবিবাবুর কোন-কোন লেখা সুনীতির পরিপন্থী বলিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের মনে অতি অকাট্য ও বদ্ধমূল ধারণার উদ্রেক হওয়ায়, বহুদিনের বন্ধুত্ব সত্ত্বেও, তিনি রবিবাবুর প্রতি কতকটা যেন বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া-পড়িতেছিলেন। যাহাহৌক্, এই সময়ে 'বঙ্গবাসী'-কার্য্যালয় হইতে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'বঙ্গভাষার লেখক' নামক একখানা বই নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের হস্তগত হয়। কৌতূহলাক্রান্ত দ্বিজেন্দ্রলাল বইখানা প্রাপ্তিমাত্র উহার আদ্যন্ত পড়িয়া-ফেলেন, এবং যে আগুন এতদিন তাঁহার মনের কোণে অল্প-অল্প ধোঁয়াইতেছিল তাহা সহসা এই উপলক্ষ্যে 'দপ্' করিয়া জ্বলিয়া-ওঠে। এই পুস্তকে বঙ্গসাহিত্যের জীবিত ও মৃত বহু সাহিত্য-সেবীর জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে; আর সেই জীবিতগণের মধ্যে কেহ-কেহ আবার অনুরুদ্ধ হইয়া, আপনাদের জীবন-কথা নিজেরাও লিখিয়া দিয়াছেন। গ্রন্থখানি পড়িবার সময়ে, তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্ব-লিখিত আত্ম-জীবনী দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টিপথে পতিত হয়; এবং উহা পড়িয়া তিনি

অভাবিতরূপে বিরক্ত, উত্যক্ত ও উত্তেজিত হইয়া-উঠেন। কিন্তু, তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলাল এ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব কাহারও কাছে কিছুমাত্র ব্যক্ত না করিয়া, গোপনে 'খোদ্' রবিবাবুকে বিশেষ তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিয়া একখানা পত্র লেখেন ও তাহাতে তিনি জানিতে চাহেন যে, যথার্থই তল্লিখিত সেই আত্মজীবনীর মর্ম্মানুসারে রবিবাবু তাঁহার সকল রচনা সম্পর্কেই প্রত্যক্ষভাবে Divine Inspiration (ঐশ্বরিক প্রেরণা বা অনুপ্রাণনা) দাবী করেন নাকি; এবং করিলে, বস্তুতঃ তিনি উহার কি ভাবে ব্যাখ্যা করিতে চাহেন। রবিবাবু এ পত্র পাইয়া বিশেষ বিরক্ত ও অধীর হইয়াও তদুত্তরে বেশ-একটু উগ্রভাবেই লেখেন যে, যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহাই তিনি লিখিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিতে তত উৎসুক নহেন; আর, যাহারা এভাবে কোন গূঢ় অভিসন্ধি বা মৎলব (Motive) লইয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে-আসেন তাঁহাদের কাছে তিনি কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিতেও প্রস্তুত নহেন। পত্রখানা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমটা গোপনই করিয়াছিলেন; কিন্তু, শেষে যখন বিচ্ছেদটা 'পাকাপাকি'-রকম দাঁড়াইয়া-গেল তখন বহুদিন পরে তিনি ইহা তাঁহার জনকয়েক বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আত্মীয়কে একবার দেখিতে দেন। উত্তরটা পাইয়া আগুনে আহুতি পড়িল মাত্র, ফল মোটেই ভাল হইল না। দ্বিজেন্দ্রলাল এ জবাবে নিরস্ত না হইয়া, আবারও রবীন্দ্রনাথকে আর-একখানা পত্রে স্পষ্ট জানাইলেন যে, তিনি যদি তাঁহার দুর্নীতিমূলক ও লালসাপূর্ণ লেখাগুলি সম্পর্কেও ঐরূপ Inspiration (দৈবী প্রেরণা) দাবী করিতে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত না হন তবে প্রকাশ্যতঃ, সত্যের খাতিরে, তিনিও ইহা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিবেন যে, সে সকল রচনা দৈব শক্তির স্বাভাবিক অপার্থিব অভিব্যক্তি তো নহেই, বরং—ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহার উত্তরে রবিবাবু

আর-কিছু লিখিয়াছিলেন কিনা জানিতে পারি নাই ; তবে, লিখিয়া-থাকিলেও নিশ্চয়ই এমন-কিছু লিখিয়াছিলেন যাহাতে দ্বিজেন্দ্রলাল—নরম হওয়া তো দূরে যাক্,—বরং আরও যেন গরমই হইয়া-উঠিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেন যে, বন্ধুভাবে, একান্ত গোপনে, তিনি সরলভাবে প্রথম যে চিঠিখানা লেখেন, রবিবাবু তদুত্তরে ঐরূপ অসাধু অভিসন্ধির আরোপ (Motive ascribe) করায় তাঁহার অন্তরে অতি দুঃসহ ও প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছিল। যাহাহৌক্, পরিণামে কিন্তু এই তুচ্ছ কারণ হইতেই তাঁহাদের উভয়ের আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা ও প্রীতি-সম্পর্কের অকস্মাৎ অবসান হইয়া-গেল ; এবং পরে, যদিও সাক্ষাৎমতে মৌখিক আলাপাদি কোনদিন বন্ধ হয় নাই তবু এ কথা নিশ্চয় যে, আর কোনদিনও তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্ব প্রীতি ও সদ্‌ভাব পুনঃস্থাপিত হইবার সুযোগ ঘটে নাই।

'দুর্গাদাস' নাটক-প্রণয়নের সঙ্কল্প ও উদ্দেশ্য।

পাঠক জানেন—দ্বিজেন্দ্রলাল এক বৎসরের অবসর লইয়া কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে সে অবকাশ-কাল উত্তীর্ণ হওয়ায়, সরকারী আদেশে প্রথমে তাঁহাকে খুলনা শহরে বদ্‌লী হইয়া-যাইতে হয়। কলিকাতা ছাড়িয়া-যাওয়ার অল্প কয়েকদিন আগে, কথায়-কথায় একদিন তিনি অতঃপর কোন্ বিষয়ে নাটক লিখিবেন, সে সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষিত সুহৃদ্‌গণের কাছে পরামর্শ-প্রার্থী হইলেন। নানা জনে নানান্ বিষয়ের উল্লেখ করিলেন ; কিন্তু, তাঁহার মনঃপূত হইল না। তখন আমার মামাতো ভাই, ডাক্তার-শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এম্‌-এ ; ডি-এস্ সি ; বার-য়্যাট্‌-ল,—লণ্ডন,) মহাশয় তাঁহাকে রাঠোর-বীর দুর্গাদাসের চরিত্রাবলম্বনে একখানি নাটক লিখিতে উপদেশ দেন ; এবং তাঁহার সে পরামর্শ সর্ব্বথা সমীচীন বিবেচনায়, দ্বিজেন্দ্রলাল অতঃপর সেই আদর্শ জীবন অবলম্বনেই নাটক লিখিতে মনঃস্থ করিলেন।

দীর্ঘ এক বর্ষ কাল এই দেশব্যাপী বিরাট্ আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিকরূপে জড়িত রহিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝিয়াছিলেন যে, কেবলমাত্র সঙ্কীর্ণ স্বদেশী ভাব ও বিজাতিবিদ্বেষে দেশোদ্ধার হইতে পারে না।—অক্ষুণ্ণ, আন্তরিক উদারতার সহিত ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা প্রতি জীবনে রক্ষিত হওয়া চাই; অনাবিল নৈতিক নিষ্ঠা অকৃত্রিম ধর্ম্ম-ভাব ও অচপল চরিত্র-বল চাই; ভাব ও কর্ম্মের নির্ব্বিরোধ ঐক্য বা একান্ত সুসঙ্গত সামঞ্জস্য চাই। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন ও বুঝিলেন যে, দেশ-ভক্তি ও স্বজাতি-প্রীতি মানুষের যত-বড়ই কেন উচ্চাঙ্গের সদ্ভাব হৌক্ না, কেবলমাত্র অন্ধ উত্তেজনা, সঙ্কীর্ণ আত্মাভিমান ও অসার 'গোঁড়ামি' জাতীয় জীবনের স্বাস্থ্য ও উন্নতি-বিধানের অনুকূল সহায় নহে। সমাজে ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্মের অপ্রতিহত, উদার প্রতিষ্ঠা,—এককথায় ব্যক্তিগত জীবনে প্রকৃত নৈতিক নিষ্ঠা ও চরিত্র-বল সংস্থানের দ্বারাই এ অধোগত, পতিত জাতির অদম্য অভ্যুত্থান এখনও সম্ভব। এই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের অনুগামী হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার পূর্ব্ব-প্রকাশিত প্রতাপ-চরিত্র অপেক্ষা এই পূত-শুদ্ধ দুর্গাদাস চরিত্রের অপূর্ব্ব আদর্শই এ দেশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী বলিয়া, এক্ষণে তদ্বিষয়ে নাটক-প্রণয়নে নিবিষ্ট হইলেন।

কলিকাতা-ত্যাগ ও বিদায়সম্বর্দ্ধনা।

বঙ্গাব্দ ১৩১২ শালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রারম্ভে দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতা ছাড়িয়া খুলনায় গমন করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার কলিকাতাবাসী স্বজন-বন্ধুরা সার্ ডাঃ কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয়ের সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়িতে একটা বিদায়-ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। দীর্ঘ-কাল যাবৎ প্রত্যহ দু'টি বেলা, যাঁহার আনন্দময় সহবাসে আমরা কতই-না জ্ঞানার্জ্জন, প্রীতি ও হর্ষ সম্ভোগ করিতেছিলাম, আজ তাঁহাকে ছাড়িয়া-দিতে আমাদের প্রাণে যে কি অকথ্য দুঃখ-বোধ হইতেছিল

তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝানো অসম্ভব। সংসারের এই দুঃখ-দুর্গতি, অভাব-অভিযোগের বিবিধ বিরক্তি ও অশান্তি যাঁহার পুণ্য-সুন্দর, সতত হাস্যোজ্জ্বল, প্রেমময় মুখখানি দেখিবামাত্র আমরা নিমেষমধ্যে সকলই ভুলিয়া-যাইতাম, আজ আমাদের সেই প্রাণ-সখা আমদের ছাড়িয়া চলিলেন,—এই চিন্তাও তৎকালে আমাদের পক্ষে নিদারুণ যন্ত্রণার কারণ হইয়াছিল। এই আসন্ন বিয়োগ-ব্যথায় আমরা আপনাদিগকে অত্যন্ত অসহায় ও নিরাশ্রয় বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। কিন্তু, 'একহাতে তো তালি বাজে না'! আমরাই যে শুধু এজন্য বিমর্ষ ও মুহ্যমান হইলাম তাহা নহে; আয়োজনোদ্‌যোগে শত ব্যস্ত থাকিয়াও, দ্বিজেন্দ্রলাল যাত্রার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে-লাগিল ততই যেন চঞ্চল ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সকল আয়োজনের মধ্যে, সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অবকাশে, থাকিয়া-থাকিয়া তাঁহার মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ও কাতর-করুণ দৃষ্টি আমাদের অন্তরে বেদনার আগুন আরও জ্বালাইয়া-তুলিল। যাত্রার পূর্ব্বদিন, (যেদিন সেই বিদায়-ভোজের ব্যবস্থা) আমার বেশ মনে পড়ে—তিনি আমাদের কাহারও সঙ্গে বড়-একটা কথা কহিলেন না;—গমনোদ্‌যোগের নানারূপ ব্যস্ততার ছলে, সারাটা দিন কেবল তিনি দূরে-দূরে ঘুরিয়া-বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার এই বিচিত্র ব্যবহার দেখিয়া, সহৃদয় বন্ধু ৺মন্মথনাথ সেন আমায় ডাকিয়া চুপে-চুপে বলিলেন,—"কি রকম চালাকী করে' মনের ভাব গোপন কর্‌ছেন, দেখ্‌ছ? এই বলিতে-বলিতে কবি-বন্ধু আমার, হঠাৎ বালকের মত আমার স্কন্ধে মুখ রাখিয়া, ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া-ফেলিলেন; আর, আমি তাঁর চোক মুছাইতে গিয়া নিজেকেও আর সাম্‌লাইতে পারিলাম না,—ভাঙ্গিয়া পড়িলাম!

যথাকালে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা কৈলাসবাবুর দোতালার সজ্জিত কক্ষে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালকে ঘিরিয়া-বসিয়া একে-একে কবিতা ও

সঙ্গীতের সাহায্যে হৃদয়ের ভাব নিবেদন করিতে লাগিলাম। প্রথমে প্রেমাস্পদ বন্ধু কবিবর প্রমথনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিম্নোক্ত সঙ্গীতটি আমরা কয়েকজনে মিলিয়া সমবেত-কণ্ঠে গাইলাম,—

"বিদায় চাও যে ওহে কবি, তোমায় বিদায় দেয় কে আর?
তোমার উদার হৃদয়পুরে মোদের অবাধ অধিকার।
নও তো শুধু হাসির কবি,— তোমার হাতের গভীর ছবি
দীনা বঙ্গভাষার অঙ্গে অবিনাশী অলঙ্কার।
তোমার কাছে আস্‌তাম যদি কালো মুখে, ভারি বুকে,—
হাসির সুধায়, রসের স্রোতে ডুবে ফির্‌তাম হাসিমুখে।
হওনা যতই গুণী-জ্ঞানী,— তোমার মধুর হৃদয়খানি
তুলনা নাই, তুলনা নাই, তুলনা নাই কোথাও তার!"

গানটি গীত হইলে প্রথম আমার ডাক পড়িল। আমার তখন কথা বলিবার মত অবস্থা নয়। আপন দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া, কোন-মতে দুই চারি ছত্রের মধ্যে যা'-হৌক্-কিছু বলিয়া-দিয়া, মানে-মানে বসিয়া-পড়িবার চেষ্টায় ছিলাম;—এমন সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল আমায় জড়াইয়া-ধরিয়া, কি-যেন বলিতে যাইতেছিলেন,—কাঁদিয়া-ফেলিলেন! ইহার পর সুকবি ৺মন্মথনাথ সেন মহাশয় স্ব-রচিত এই কবিতাটি কম্পিত কণ্ঠে পড়িলেন,—

"তুমি শিখায়েছ কবি লাঞ্ছিত জীবনে
নির্দ্দোষ সরল হাস্য সঞ্চারে কেমনে
নব শক্তি, নব সুখ, প্রীতিফুল্ল প্রাণ।
তোমায় প্রতিভা-লক্ষ্মী করিয়াছে দান
যে অপূর্ব্ব সম্পদের অক্ষয় ভাণ্ডার,
সম্পূর্ণ সার্থক তাহা। অন্তরও তোমার
কি মধুর স্নেহে ভরা, কি উচ্চ, উদার,
সেই জানে—বন্ধু বলি' ডাকি' একবার

গৌরবের আলিঙ্গন দিয়াছ যে জনে,
—প্রণয়ের তীর্থসম তব পূত মনে।
সেই তুমি দূরে যাবে ; ক্ষণিকেরও তরে
এ চিন্তায় চিত্ত মাঝে ব্যথা উঠে ভরে'।
হে বরেণ্য, হে সুহৃৎ, স্মরিও প্রবাসে
তোমায় অযুত ভক্ত কত ভালবাসে!"

অতঃপর, রসিক কবি রসময় লাহা মহাশয় নিম্নোক্ত পত্র-খানা পাঠ করিয়া কবিবরকে একটি দর্পণ উপহার দিলেন। পত্রখানি এই,—

'হে বিদগ্ধ* কবীশ,

আমি আপনার বিদায়-উৎসবের ভোজটুকু হইতে স্বতঃই বঞ্চিত। কিন্তু উৎসবটির সঙ্গে আমার যে আন্তরিক যোগ আছে তাহার সামান্য নিদর্শন স্বরূপ এই কবিতাটি লিখিলাম :—

আমি, সারা দিনরাত তোমারে লভিতে—রহিব হেলিয়া দেয়ালে ;
তুমি, ঘুম-ভাঙ্গা চোক মুছিতে-মুছিতে—মুখ দেখে যেও দেয়ালে।

কবিতাটি একটু দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়্‌ল—না ? সুতরাং ইহার সহিত টীকাও† পাঠাই। গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। মনে রাখিবেন, কবিরা হৃদয়ের সহিত মুকুরের তুলনা করিয়া থাকেন।

অনুরক্ত, শ্রীরসময় লাহা।'

এতক্ষণে, ক্রমাগত উল্লিখিত ঐ-সব ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীত ও কবিতার পরে, হঠাৎ সার্থকনামা রসময়ের এই 'বিদগ্ধ' পত্র ও উপহার সভাস্থলে একটু বৈচিত্র্য বিধান করিল। উপস্থিত ব্যক্তিরা কেহ এই অদ্ভুত কবিতা ও গদ্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারুন আর না পারুন, সকলেই যে সাময়িক ভাবে খানিকটা অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া-গিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝা যায় ;—তাঁহারা এই সুযোগে

* বিদগ্ধ=রসিক (অভিধান দ্রষ্টব্য।)—গ্রন্থকার।

† টীকা=একখানি দেওয়ালে টাঙ্গাইবার আর্‌সি—গ্রন্থকার।

একটু যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়াও বাঁচিলেন। কিন্তু, ইহার পরক্ষণে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল উঠিয়া, যখন আবেগভরে এই-সব অভিনন্দনের উত্তরচ্ছলে স্ব-রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন * তখন সকলের অন্তরই আবার উদ্বেলিত হইয়া-উঠিল।

যাহাহৌক্, পরিশেষে সকলে মিলিয়া যথাকালে সেই বিদায়-ভোজের কিন্তু যথেষ্টই সদ্ব্যবহার করিলেন; এবং ঘরে ফিরিবার সময়ে একে-একে তাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালের সাগ্রহ অলিঙ্গন লাভে ধন্য হইলেন।

ইহার পরদিনই দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতা ত্যাগ করেন।

* বহু সন্ধানেও অমন কবিতাটি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।—গ্রন্থকার।

পঞ্চম পর্য্যায়

সাফল্য বা পরিণতি

দেশাত্ম-বোধ
বরিশালে 'যজ্ঞ-ভঙ্গ', স্বদেশ-প্রেম
তৎসম্বন্ধে মতামত,
ও
রাজ-ভক্তি।

স্বদেশী-আন্দোলনে বরিশাল।

দ্বিজেন্দ্র-বিরহিত হইয়া কলিকাতায় বাস করা আমাদের অনেকের পক্ষে ক্লেশকর হইল। আমি কয়েক দিন পরেই আমার নয়নাভিরাম, 'সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্য-শ্যমলা', জন্মভূমি বরিশালের 'বিরাম'-কুঞ্জে চলিয়া-আসিলাম।

'স্বদেশী'-আন্দোলনের কেন্দ্র-কক্ষ বরিশাল তখন ভাব-বন্যায় টল্‌মল্ করিতেছে। জেলার সর্ব্বত্রই তখন বহিষ্কারনীতির চরম সাফল্য লাভ ঘটিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-বদ্ধ-প্রণোদিত হইয়া, একান্ত নিষ্ঠায় তখন কায়-মনোবাক্যে 'স্বদেশী'র অনুধ্যানে তন্ময়, আত্মহারা। এ জেলার নিভৃততম পল্লী-কোণেও তখন বিদেশী দ্রব্যের চিহ্নমাত্রও পরিলক্ষিত হইত না। বরিশালের 'স্বদেশ-বান্ধব সমিতি' শাখা-প্রশাখা-উপশাখায় তখন সারাটি জেলা সম্পূর্ণরূপে আছন্ন করিয়া-ফেলিয়াছে। স্বদেশের এই অভিনব, বিচিত্র, অপরূপ মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া, বিস্মিত-বিমুগ্ধ চিত্তে, আমি দেশের সেই আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা দ্বিজেন্দ্রলালকে সগর্ব্বে, বিস্তৃতরূপে জ্ঞাপন করিলাম। খুলনা হইতে তদুত্তরে তিনি লিখিলেন,—

'* * পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলাম, বরিশালই একাগ্র-সাধনায় 'স্বদেশী' ভাবকে স্বভাবে পরিণত করিয়াছে। আজ তোমার পত্রে সে কথার বিস্তৃত বিবরণ জানিয়া আমার যে কত আনন্দ হইল তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। বরিশালবাসী আজ সমগ্র ভারতের আদর্শ, শিক্ষক, নমস্য। ওখানে কার্য্যতঃ তোমরা যে আদর্শ দেখাইতেছ তাহা কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিয়া এই দূর হইতেও আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি। * * এই যত-সব বাক্য-সর্ব্বস্ব, কপটাচারী নেতাদের কাণে ধরিয়া বরিশালে নিয়া দেখাইয়া দাও—কেমন করিয়া কাজ করিতে হয়, স্বার্থত্যাগ করিতে হয়; দেশের যথার্থ যে প্রাণ-শক্তি, অর্থাৎ—এই আমাদের অশিক্ষিত, অগণিত চাষা ও গ্রামবাসীদের মধ্যে আপনাদিগকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়া, কি করিয়া তাহাদিগকেও দেশভক্তির এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও দৃঢ়-ব্রত করিয়া তুলিতে হয়। কাজের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই,—শুধু কেবল বক্তৃতা, বক্তৃতা, আর বক্তৃতা! এই সৌখীন নেতা বা বক্তাদের (একসঙ্গে দুটো শব্দই বলিলাম; কারণ, বক্তা না হইলে এখন আর যে দেশের নেতা হওয়া যায় না!) উপরে আমার তো এখন ঘৃণাই জন্মিয়া গিয়াছে। এখন কি উপায়ে এই সব আত্ম-সর্ব্বস্ব,'নাম-কা-ওয়াস্তে' নেতাদের হাত থেকে দেশবাসীকে, বিশেষতঃ আমার ভবিষ্যৎ-ভরসাস্থল, আশা-কল্পতরু, সোনার চাঁদ ঐ যুবকদিগকে রক্ষা করা যায়, তাই আমি অনেক সময় ভাবি। তা নইলে ত আমি আর মঙ্গল দেখি না। এঁদের পাল্লায় পড়িয়া পরিণামে আমাদের দেশের যে নানারকম দুর্গতির একশেষ হইবে আমি তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। † নেতা যদি তেমন কেহ থাকেন, তিনি তোমাদের—ঐ অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়। দীর্ঘজীবী হউন তিনি! তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার দিও। হোন না তিনি কায়স্থ;—আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি। তাঁহাকে বলিও—তিনিও যেন আবার ঐ কপটমতিদের চক্রান্তজালে আপনাকে জড়াইয়া না ফেলেন। তাহ'লে তাঁহারও সকল শ্রম, সব আশা পণ্ড হইবে এবং তিনি নিজেও পরে বিপদে

† পাঠক মনে রাখিবেন—তখনও কিন্তু দেশের কোথাও গুপ্ত হত্যা, 'রাজনৈতিক' ষড়্যন্ত্র বা চুরি-ডাকাতি আরম্ভ হয় নাই। ছেলেরা তখন কেবল ইংরাজ-বিদ্বেষ-বুদ্ধি সঞ্চয় করিতেছিল মাত্র।—গ্রন্থকার।

পড়িবেন। * * এসব নেতারা কেবল পরের দোষই দেখিতে মজ্‌বুদ! পূর্ব্ববঙ্গের ভাইদের এতকাল তাঁরাও অবজ্ঞা করিতেন,—এখন তবুও যদিবা প্রকাশ্যে ততটা না করুন, মনে মনে ও কার্য্যতঃ যে তাঁহাদের তত আমল দিতে রাজী নন, এটা কিন্তু বেশ বোঝা যায়। (বাঙ্গাল্‌রা ত কোনদিনই 'কুছ কাম কা নেহি'!) অথচ তাঁদের নিজেদের যে 'সর্ব্বাঙ্গে ঘা ওষুধ দিই কোথা'-অবস্থা, তা তাঁরা একটিবার ভুলেও ভাব্‌বার অবকাশ পান না। মাথায় থাকুক আমার 'বাঙ্গাল' ভাই-সব,—তাঁরাই তো মানুষ! জয় বরিশালবাসীর জয়,—জয় আমার 'বাঙ্গাল' ভাইদের জয়!'*

'যজ্ঞ-ভঙ্গের' যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ

সেইবারেই বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির (Bengal Provincial Conference'এর বৈঠক বসিবে, স্থির ছিল। বরিশালের তৎকালীন অন্যতম নেতা, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ-গুপ্ত (এম্‌-এ, বি-এল্‌) ও আমার পরমারাধ্য অভিভাবক, আদর্শ-চরিত্র, পর-হিতব্রত ৺রজনীকান্ত দাশ মহাশয়ের উৎসাহে, আমি সেই সঙ্গে-সঙ্গে, এই বরিশালেই সেবারে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন' আহ্বান করিয়া-ফেলিলাম। মহোৎসাহে এই উভয় সম্মিলনের জন্য বিপুল পরিশ্রমে বিবিধ আয়োজন ও উদ্যোগ আরম্ভ হইল, বঙ্গদেশের দিকে-দিকে অজস্র নিমন্ত্রণ-পত্রাদি প্রেরিত হইল; এবং চারিদিক্‌ হইতে দেশের যাবতীয় গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও নেতৃবৃন্দ সে আহ্বানে বরিশালে আসিতে সম্মত হইয়া, আমাদের উদ্যম শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়া-তুলিলেন। সুহৃত্তম, সাহিত্যরথী দ্বিজেন্দ্রলালকে এই সম্মিলনে যোগদান করার জন্য আমি বারংবার বিশেষভাবে জেদ্‌ করিতে লাগিলাম। প্রথমে তিনি আসিতে একবার স্বীকৃতও হইয়াছিলন; কিন্তু, সম্মিলনের অব্যবহিত পূর্ব্বে, দৈহিক অসুখ ও

* খুলনা হইতে লিখিত পত্র, তাং—১৩ জানুয়ারী, '১৬। পত্রখানি প্রকাশ করা হয় তো আমাদের নির্ব্বুদ্ধিতা হইল। কিন্তু, নির্জ্জলা সত্য-কথা বা 'হক কথা' কহিতে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কোনদিনও দ্বিধা করেন নাই,—পত্রখানা সে বিষয়ের একটা প্রমাণ বটে।—গ্রন্থকার।

বিশেষভাবে সাংসারিক অসুবিধা বশতঃ, আসিতে না পারিয়া লিখিলেন,—

'হাঁ, আমি বরিশালে যাব বৈ কি! তা আর যাব না? আমার বাড়িতে আমরা মেলা লোক! রসুই-বামুনের কাছে মণ্টু-মায়াকে* রেখে গেলেই হল! কেমন? * * আমার কি?—ঘরে বাইরে চারিদিকেই আত্মীয়-জ্ঞাতি-কুটুম্ব! তা আর যাব না? বরিশালে এই তুমুল ব্যাপার,—আমার না গেলে হয়? তা মণ্টু-মায়াকে নিয়েও যেতে পারি,—কেমন? খুবই সহজ! তাই ভাল। কবে যেতে হবে?'

পাঠক দেখিবেন এ পত্রেও ‡ দ্বিজেন্দ্রলাল তদীয় স্বভাব-সিদ্ধ ব্যঙ্গের আবরণে কিরূপ হতাশা ও অসহায় ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাহৌক্, আন্তরিক সহানুভূতি সত্ত্বেও, তাঁহার আসা হইল না, এবং সম্মেলনের নির্দ্ধারিত তারিখে তাঁহার এক 'তার' আসিয়া পঁহুছিল ; তাহাতে লেখা—

"Indisposed. Can't come. Excuse. Wish thorough success and prosperous future of Literary conference"†

আসিলেন না বলিয়া তখন যতই-কেন নিরাশ হইয়া থাকি না, দু'দিন পরে কিন্তু আহত অন্তরে ভাবিতে বাধ্য হইলাম যে, এত কষ্ট করিয়া এ দুর্ভাগ্য শহরে যাঁহারা না আসিয়াছেন তাঁহারাই বাস্তবিক বুদ্ধিমান্।

বরিশালের প্রাদেশিক সমিতি ও সাহিত্য-সম্মিলনের বিস্তারিত বিবরণ বা ইতিহাস লিখিতে বসি নাই ; সুতরাং, একান্ত কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও, সে-সব কথা বিস্তৃতভাবে এখানে বলিয়া অকারণ এখন আমার কাল-ক্ষেপ করার কোন কারণ নাই। এখানে

---

* দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র-কন্যা।

‡ খুলনা হইতে, ২৩এ মার্চ্চ, '১৬।

† "অসুস্থ। আসিতে অক্ষম। ক্ষমা চাই। সাহিত্য-সম্মিলনের পূর্ণ সাফল্য ও ভবিষ্যৎ ক্রমোন্নতি কামনা করি।"

শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ছলে-বলে-কৌশলে, নানাপ্রকার সামাজিক শাসন (স্থানে-স্থানে নির্য্যাতনও) করিয়া, যে-ভাবে, যেরূপেই হৌক্‌,—'যেন তেন উপায়েন'—'বহিষ্কার' বা 'বয়কট্' চালাইবার চেষ্টার ফলে, সুযোগ পাইয়া ক্রমে গভর্ণমেন্টও—পীড়িত ও বিপন্নের উদ্ধার রাজারই অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য—এই বলিয়া, দেশব্যাপী বিদ্বেষ-বুদ্ধি-জাত এই 'স্বদেশী' আন্দোলনকে সর্ব্বপ্রযত্নে দমন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন ; আর, সেই উদ্দেশ্যেই তখন 'লায়ন-সার্ক্যুলার' প্রভৃতি নানারূপ আইন ও অনুশাসন বিধি-বদ্ধ ও প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিল ! যতদূর জানি ও মনে পড়ে—এই 'লায়ন সার্ক্যুলারে' দল-বদ্ধ হইয়া, সমবেত-কণ্ঠে কোন সভায় অথবা প্রকাশ্য স্থানে 'বন্দেমাতরম্' শব্দটি পর্য্যন্ত উচ্চারণ করা অবৈধ বলিয়া নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। ফলতঃ এইজন্যও 'স্বদেশী'-প্রচারকদের মধ্যে কেহ-কেহ বলপূর্ব্বক ও অন্যায় উপায়ে 'স্বদেশী'-প্রচার করায়, জেলে যাইতে বাধ্য হইলেন ; এবং তাই, দেশে তখন নূতন করিয়া আবার ভয়ানক অসন্তোষ ও রাজ-বিদ্বেষের ভাব জাগিয়া উঠিল। কলিকাতায় 'কার্জ্জন'-রঙ্গালয়ে এসময়ে এক বিরাট্ সাধারণ সভা আহূত হইল। তাহাতে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতারা গভর্ণমেন্টের এই-সব কঠোর বিধানের বিপক্ষে জ্বালাময়ী বক্তৃতা তো করিলেনই,—তা' ছাড়া যাঁহারা স্বদেশী-প্রচারের জন্য জেলে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে দেশের পক্ষ হইতে 'সুকৃতির স্মরণ-চিহ্ন স্বরূপ' এক-একখানি পদকও প্রদত্ত হইল !

দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন এইরূপ ঠিক-তখন এদিকে আবার বরিশালে আমরা এই-দুই সম্মেলনের আয়োজন করিলাম। কাজেই, তৎকালে প্রাদেশিক সমিতিতে যোগ দেওয়ার জন্য যে-সব প্রতিনিধিরা বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া-মিলিলেন তাঁহাদের মানসিক অবস্থা যে কতদূর বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত ছিল তাহা অনায়াসেই

অনুমেয়। একে-একে, দেশের সকল দলের অধিকাংশ নায়কবর্গ যখন আসিয়া উপনীত হইলেন তখন উপস্থিত কর্ম্মে প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য দাঁড়াইল এই যে, এক্ষেত্রে—ঐ সর্ব্ববিরাগের হেতুভূত 'লায়ন-সার্কুলার' আমাদের পক্ষে মানিয়া চলা আবশ্যক ও সঙ্গত কিনা। প্রচুর বাদ-বিসংবাদ, তর্ক-বিতর্কের পর, কলিকাতা হইতে সমাগত শীর্ষস্থানীয় নেতৃগণের 'জেদ'ই শেষে জয়ী হইল; স্থির হইল যে, এ আদেশ একেবারেই 'বে-আইনী ও অন্যায়'। অতএব, বর্ত্তমান ব্যাপারে এ নিষেধ গ্রাহ্য না করিয়া, তাঁহারা সমস্বরে ও অকুণ্ঠ কণ্ঠে মাতৃনাম,—এই প্রাণোন্মাদী বন্দেমাতরম্-মন্ত্র—অবশ্যই সর্ব্বত্র ধ্বনিত করিয়া তুলিবেন।

যতই সংক্ষেপে ও অল্পে হৌক্ না,—আমাদের এই উভয়বিধ সম্মিলনের আয়োজন প্রধানতঃ কি-কি কারণে ও কি যে ভাবে ব্যর্থ হইল, পাঠককে তাহার একটু পরিচয় না দিলে চলিবে না। কারণ, এ-সব ঘটনা উপলক্ষে তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে যে-কয়েকখানি অতি-মূল্যবান্, উপদেশপূর্ণ ও চিন্তাগর্ভ পত্র লেখেন সেগুলির সম্যক্ রসাস্বাদ করিতে-হইলে আসল ব্যাপারটা অল্পের মধ্যে একটু জানিয়া-লওয়া আবশ্যক।

সমাগত প্রতিনিধিগণের একান্ত ইচ্ছা ও উত্তেজনাক্রমে এদিকে যেমন স্থির হইল যে, সরকারী হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া 'বন্দেমাতরম্' বলিতেই হইবে, ওদিকে আবার সে সংবাদ শুনিবামাত্র স্থানীয় তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট্ বা ভাগ্য-নিয়ন্তা, এমার্সন সাহেব 'শান্তি-রক্ষার উদ্দেশ্যে' এক নূতন আদেশ জারি করিলেন যে, প্রকাশ্য রাজপথে কোন জনতা অথবা 'প্রসেশান' (শোভাযাত্রা বা 'মিছিল') হইতে পারিবে না। 'হুলস্থূল' পড়িয়া গেল। এই উপলক্ষে, অধিবেশনের দিন প্রাতঃকালে বহুক্ষণব্যাপী আর-একটি পরামর্শ-সভার বৈঠক বসিল; এবং তাহাতে অধিকাংশ প্রতিনিধির সম্মতি ও

আইনজ্ঞ কতিপয় নেতার পরামর্শক্রমে ঠিক হইল,—এই আদেশও 'অবৈধ'; অতএব, এ হুকুমও না মানাই বৈধ, ন্যায়-সঙ্গত ও পুরুষত্বের পরিচায়ক।—এইরূপে কর্তৃপক্ষের উক্ত উভয় আদেশই লঙ্ঘনীয় সাব্যস্ত হইলে, যথাকালে, অতঃপর নগর-মধ্যবর্ত্তী 'রাজাবাহাদুরের হাবেলী'র প্রশস্ত প্রাঙ্গণ হইতে স্বেচ্ছাসেবকগণ শ্রেণীবদ্ধ শৃঙ্খলায় কতিপয় প্রধান-প্রধান ব্যক্তির নেতৃত্বে, এক বৃহৎ শোভাযাত্রা বাহির করিলেন, এবং তাঁহারা ধীর-মন্থর পাদ-বিক্ষেপে প্রাদেশিক সমিতির 'প্যাণ্ডাল' বা সভা-মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইতে-লাগিলেন।

সম্পূর্ণ 'প্রসেশান'টা তখনও বাহির হইতে পারে নাই,—কয়েক শ্রেণী মাত্র কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া-গিয়াছে;—এমন সময়ে পথি-মধ্যে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প বিস্তর সশস্ত্র ফৌজসহ সেখানে আসিয়া, প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত আদেশ প্রদর্শন পূর্ব্বক শোভাযাত্রা তদ্দণ্ডেই ভঙ্গ করিতে বলিলেন; কিন্তু, তাহাতেও যখন কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত মাত্র করিল না তখন সেই দল-বদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকগণের উপরে অবিরাম পুলিশের লগুড়াঘাত চলিতে-লাগিল। নেতাদের মধ্যে অনেকে তখন শোভাযাত্রার অগ্রভাগে অনেকটা দূরে চলিয়া-গিয়াছেন; সুতরাং, মাত্র ২।৩ জন ছাড়া তাঁহাদের মধ্যে আর কাহারও কোন আঘাত সহিবার সুবিধা ঘটে নাই। যাহাহৌক্, অনতিবিলম্বে তাঁহারা এই প্রহারের সংবাদ ও কোলাহল শ্রবণমাত্র যথাস্থলে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং অন্য কে কি করিলেন তাহা তখন ঠিক না জানিতে-পারিলেও, দেখা গেল,—গর্ব্বোন্নত বক্ষে, বর্ষীয়ান্ সুরেন্দ্রনাথ একাকী কেম্পের নিকটে অগ্রসর হইয়া বলিতেছেন,—

"এ-সব যুবকেরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ; অতএব, অকারণ ইহাদের দেহ হইতে রক্তপাত করিও না। আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ,—এজন্য দায়ী একমাত্র আমিই,—আমাকে তোমার যাহা-ইচ্ছা, করিতে পার।"

সুরেন্দ্রনাথের এই বীরোচিত বাক্য শুনিয়া কেম্প-সাহেব তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন পূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেটের পরোয়ানা দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলেন। ততক্ষণে পুলিশ সেই প্রলয়ঙ্কর সংহার-মূর্ত্তি সংবরণ করিয়া-লইয়াছে।

এদিকে জন-নায়ক সুরেন্দ্রনাথকে তো ধরিয়া-লইয়া গেল ; কিন্তু, তবু, এই প্রচণ্ড প্রহার সত্ত্বেও, আসল অনুষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। ধীরে-ধীরে, যথাসময়ে সভা-মণ্ডপে সকলে উপস্থিত হইলে, উদ্দাম ও প্রবলতর উত্তেজনার সহিত প্রাদেশিক সমিতির কার্য্য যথারীতি অগ্রসর হইতে থাকিল।

সুরেন্দ্রনাথকে ঐ ভাবে ধরিয়া-নিয়া যাইবার সময়ে আমাদের অশ্বিনীবাবু প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন ; উদ্দেশ্য—জামিনে খালাস করিয়া আনিবেন কিংবা আবশ্যকমত সাহায্যাদি করিবেন। কিন্তু, ম্যাজিষ্ট্রেটের 'কুঠী'তে সুরেন্দ্রনাথকে বন্দী করিয়া লইয়া-গেলে, এমার্সন সাহেব তাঁহাকে জামিনে অব্যহতি দেওয়া তো দূরের কথা, নিজের সমক্ষে দাঁড় করাইয়া-রাখিয়া, তদ্দণ্ডেই, অতিমাত্র বিচলিত ও ব্যস্তভাবে, 'সরাসরি' বিনা-বিচারে তাঁহাকে চারিশত টাকা জরিমানা করিয়া-ফেলিলেন! যাহাহৌক্, অচিরে সে অর্থগুলি প্রদত্ত হইল, সুরেন্দ্রনাথও মুক্ত হইলেন। তখন সভাস্থলে আসিয়া তিনি উপনীত হওয়া-মাত্র, তাঁহাকে দেখিয়া, সমবেত সেই সপ্ত সহস্র ব্যক্তি এককালে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রমত্ত বিক্রমে, সমস্বরে, ঘন-ঘন 'বন্দেমাতরম্' মহামন্ত্র ধ্বনিত করিয়া, অম্বরতল আলোড়িত ও প্রকম্পিত করিয়া-তুলিলেন।

অতঃপর, শতগুণ বর্দ্ধিতোৎসাহে, যথা-নিয়মে সভার কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে এমন সময়ে, অকস্মাৎ অসংখ্য সশস্ত্র সৈন্য কর্তৃক সেই বৃহৎ মণ্ডপটি পরিবেষ্টিত হইল ; এবং পুনর্ব্বার কেম্প-সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের আর-এক পরোয়ানা হাতে লইয়া, কম্পিতপদে,

ধীরে-ধীরে বক্তৃতা-মঞ্চে আসিয়া আরোহণ করিলেন। সহসা এইভাবে অস্ত্রধারী শিখ ও গুর্খাসৈন্য পরিবৃত হইয়া ও আবার আদেশ-লিপি-হস্তে কেম্পকে সভাস্থলে আসিতে-দেখিয়া সেই বিপুল জন-সমুদ্র অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় ও দুর্দ্দম ক্রোধে অতিমাত্র সংক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া-উঠিল। ক্ষণেক পরে সভাপতি, মৌলভী রসুল-সাহেবের অনুমতি লইয়া, মিঃ কেম্প যখন বিবর্ণ বদনে, অত্যুচ্চ স্বরে তাঁহার সেই পুনরাবির্ভাবের জন্য সকলের কাছে মার্জ্জনা চাহিয়া, এমার্সনের এই নূতন আদেশটি পাঠ করিলেন তখন সভাস্থ কাহারও জানিতে আর বাকি রহিল না যে, তৎক্ষণাৎ সেই বড়-সাধের সভাটি ভঙ্গ করিয়া 'যে যাহার আপন আবাসে' প্রস্থান না করিলে, অস্ত্রধারী সৈন্যগণ, যে উপায়েই হৌক্, তাঁহাদিগকে ছত্র-ভঙ্গ করিয়া দিবে। বলা বাহুল্য—অভাবিতরূপে, পুনরায় সহসা এই সমূহ বিপত্তির সম্মুখীন হইয়া, সভাস্থ অনেকে তখন আপনাপন আত্মীয়-পরিজনগণের পরিণাম হিত-চিন্তায় অতিমাত্র ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া-পড়িলেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য!—তখনও, সে অবস্থায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি কতিপয় অসমসাহসী ব্যক্তি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দুরন্ত মন্যু (Indignation) প্রভাবে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া-উঠিয়া, কিছুতে সে সভাস্থল ছাড়িয়া-যাইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু, বড় বেশিক্ষণ তাঁহাদিগকেও আর দ্বিধান্বিত থাকিতে হইল না ;—কেম্প তখনই আবার উঠিয়া, দৃঢ়স্বরে স্পষ্ট কহিলেন যে, যদি ম্যাজিষ্ট্রেট্-বাহাদুরের আজ্ঞামত সহজে সকলে সে স্থান পরিত্যাগ করেন, ভালো ; অন্যথা, আবশ্যক বুঝিলে, আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্যের ন্যায়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তজ্জন্য শক্তিপ্রয়োগও করিতে হইবে। কেম্পের এই কথার পর আর সভা টিকিল না,—অল্পে অল্পে, সেই বিশাল সভামণ্ডপটি পরিত্যক্ত ও জনশূন্য হইয়া-পড়িল। কৃষ্ণবাবু কিন্তু তখনও তাঁহার আসন ছাড়িয়া ওঠেন নাই।

কিন্তু, শেষে যখন সভাপতি ও স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথও আসন ছাড়িয়া উঠিয়া-দাঁড়াইলেন তখন আহত অভিমানে ও অন্তরের অনিবার্য্য ক্ষোভে, শুক্লকেশ, বর্ষীয়ান্ মিত্র-মহাশয় এতটুকু ছোট বালকের মত, দুঃখ ও নৈরাশ্যে বিহ্বল হইয়া, একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিলেন।

প্রাদেশিক সমিতি এইভাবে তো ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু, তখনও আমাদের ভগ্নোদ্যম মনে তবু-একটু আশার পরিক্ষীণ রশ্মিরেখা দেখা যাইতেছিল,—ইহার পরেও, আমাদের সেই 'অরাজনৈতিক' (non-political) সাহিত্য-সম্মেলন হইতে কোন বিঘ্ন-বাধা ঘটিবে না। সেদিন অপরাহ্নে দেব-প্রাণ নেতৃবর ৺রজনীকান্ত দাশ মহোদয়ের গৃহে আবার এক পরামর্শ-সভার বৈঠক বসিল ; এবং বলিতে আজও কষ্ট হয়—সেখানে যখন এমার্সনের এই নূতন 'পরোয়ানা'টা সকলের সমক্ষে পড়া হইল তখন জানা গেল যে, শুধু রাজনীতিক নহে—সর্ব্ববিধ সভা সম্পর্কেই ম্যাজিষ্ট্রেটের এ নিষেধাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। হায়—এইরূপেই 'উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে পতিতানাং মনোরথাঃ!' সংবাদ শুনিয়া আমাদের অবনত মস্তকে অকস্মাৎ যেন সত্যই তখন অশনি-সম্পাত হইল! দেশ-দেশান্তর হইতে বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ কত অসুবিধা, কত ক্লেশ ও কত অর্থ-ব্যয় করিয়া, আমাদের সাদর আহ্বানে এই এতদূর আসিয়াছেন ;—সহসা হায়, এ কি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দৈব!

সেদিন সন্ধ্যার পরে পুনরায় সাহিত্য-সম্মিলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি রবীন্দ্রনাথের বসতি-বজ্‌রায় * কর্ত্তব্য-নির্ণয়ার্থ সমাগত সাহিত্যিকগণের আর এক বৈঠক হইল। বহুক্ষণ ব্যাপিয়া বহুবিধ বাদানুবাদের পর সেখানেও স্থির হইল—বর্ত্তমান এই অশান্তি, উদ্বেগ ও বিরক্তিকর অবস্থায় বরিশালে আর কোনরূপ অধিবেশন

* রবীন্দ্রনাথের থাকিবার জন্য নদী-বক্ষে একটি 'বোট' বা বজরা নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছিল। 'ডাঙ্গায় বড় কিচিমিচি' বলিয়া, কবি চিরকালই নদীর বুকে নীড় বাঁধিতে ভালবাসেন।—গ্রন্থকার।

হওয়া একটুও বাঞ্ছনীয় নহে। বিশেষতঃ, যে ব্যক্তি 'অকারণ' সমগ্র বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ ও প্রতিনিধিগণকে পুনঃ-পুনঃ এভাবে কষ্ট ও লাঞ্ছনা দিতেছেন সেই 'অবিবেচক' এমার্সনের কাছে অনুগ্রহ-প্রার্থীরূপে সাহিত্য-সম্মিলনের জন্য আবার করুণা ভিক্ষা করিতে-যাওয়া, এক্ষেত্রে কোনক্রমেই পৌরুষ ও আত্মমর্য্যাদার অনুকূল নহে। তদ্ভিন্ন, এতটা অবনতি স্বীকার করিয়া, এই মর্ম্মে অনুমতি-ভিক্ষা করিলেও, যেরূপ অবস্থা তাহাতে তিনি যে এ-বিষয়ে সহজে সম্মত হইবেন তৎপক্ষেও যখন কোন নিশ্চয়তা নাই (কারণ, সাহিত্য-সম্মিলনের সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন,) তখন অযথা যাঁচিয়া আর-একবার অপমানিত হইতে না যাওয়াই সর্ব্বথা শোভন ও সুপরামর্শ। পরদিন দিনমণি রবির আবির্ভাবের পূর্ব্বে, অতি প্রত্যূষেই, ব্যর্থকাম হইয়া সাহিত্যাকাশের সেই সমুজ্জ্বল সূর্য্য কবীন্দ্র রবীন্দ্র ও অপরাপর মনস্বিবৃন্দ একে-একে আমাদিগকে কাঁদাইয়া চলিয়া-গেলেন। আর, আমরা তখন যে যা'র কক্ষ-কোণে বসিয়া, কপালে কর-প্রহার ও অকারণ আক্রোশে নিষ্ফল আস্ফালন করিয়া, নিভৃতে সময়ের যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতে-থাকিলাম!

যাহাহৌক্, প্রাদেশিক সমিতি ও সেই সঙ্গে সাহিত্য সম্মিলনের এই-সব শোচনীয় ঘটনার কথা অসম্পূর্ণভাবে সংবাদপত্রাদিতে পাঠ করিয়া, সুদূর মুর্শীদাবাদ হইতে এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে যে-সব পত্র লেখেন—প্রকৃত ব্যাপার না জানার দরুণ, অজ্ঞানজনিত অনেক ভ্রান্ত মত ব্যক্ত হইয়া-থাকিলেও,—তন্মধ্যে এমন বহুৎ অমূল্য কথাও ছিল যাহা তৎকালে দেশ-হিতকাম ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে বিশেষ বিবেচ্য রূপেই গণ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল দেশের কথা যে কত গভীর ভাবে, সারাটা প্রাণ দিয়া চিন্তা করিতেন তাহার আংশিক

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশ-হিত-চিন্তা ও 'স্বদেশী' সম্পর্কে মতামত।

পরিচয়, পাঠক এগুলি পাঠ করিলে এখনও অবশ্য অবগত হইতে পারিবেন। সংবাদপত্রের ভ্রান্ত, আংশিক ও অস্পষ্ট 'রিপোর্ট' (বা 'প্রতিবাদ') পাঠ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল এক পত্রে * লিখিতেছেন,—

"প্রিয়তমেষু—ভাই দেবকুমার! বরিশালের ব্যাপার সম্বন্ধে চিঠিতে কিছু মীমাংসা হবার নয়। তুমি ব্যথিত, ক্রুদ্ধ হয়েছ আমার মত শুনে; আমিও ব্যথিত, বিরক্ত হয়েছি এ ব্যাপার দেখে (কাগজে পড়ে' এবং কিছু কিছু তোমার কাছে শুনে।)

"শান্তি-রক্ষা ম্যাজিষ্ট্রেটের একটী প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে। তাঁর যদি এরূপ বিশ্বাস হয় (আর তা বরিশালের মত জায়গায় হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়—অন্ততঃ দূর থেকে যতটা বুঝ্‌তে পার্চ্ছি,) যে, ঐ রকম Procession ('শোভা-যাত্রা') ও বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি শান্তিভঙ্গ কর্ত্তে পারে, তা হলে তিনি কি তার প্রতিকার পূর্ব্ব হতেই কর্ত্তে বাধ্য নন?

* * *

"একটা কথা কিন্তু ওরি মধ্যে আমার ভারি ভাল লেগেছে,—আর যে জন্যে আমি মনে মনে একটা গর্ব্ব অনুভব কচ্ছি,—সেটা এই যে, সুরেন্দ্রবাবু ছেলেদের ও আর সকলের অপরাধ নিজের ঘাড় পেতে নিয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে এই একটু আলোর ক্ষীণ রেখা। এ ছাড়া আরও ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট Apologise ('ক্ষমা-প্রার্থনা') করতে বলায় তিনি যে তা করেননি, এও একটা সাহসের পরিচয় দিয়েছেন বটে।

"ছেলেদের কায্যাবলির বিরুদ্ধে আমার কিছুই বক্তব্য নেই। নিরীহ ব্যাচারীরা তাঁদের নেতাদের দোষে মার খেয়েছেন। তাঁরা সংসারে প্রবেশ করেননি,—তাঁদের উদ্যম আছে, সাহস আছে, মনুষ্যত্ব আছে। আমি কি এর পূর্ব্বেও শতবার সহস্রবার বলিনি যে, যা-কিছু স্বার্থ-ত্যাগ বা মহত্ত্ব দেখ্‌লাম এ দেশে, তা শুদ্ধ এই এঁদেরই? * * * দেখ,—আমার একটা কথা (বার বার মনে হ'য়ে হ'য়ে শেষে) আজ বদ্ধমূল বিশ্বাসেই পরিণত হয়েছে,—তা এই যে, বাস্তবিক আমাদের এ জাতটাকে আবার জীয়িয়ে জাগিয়ে তুল্‌তে হ'লে দেশের আবার উন্নতি ও উদ্ধার-সাধন কর্ত্তে হলে, একদল সচ্চরিত্র ও উৎসাহী

* কাঁদী হইতে, (বহরমপুর-জিলা) ২।৫।০৬।

যুবকের আজীবন অবিবাহিত থেকে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ কর্ত্তে হবে। Social Philosophers ('সমাজ-নৈতিক দার্শনিকেরা') বিয়ের যতই গুন-ব্যাখ্যা করুন না, আমি জানি, বিশেষরূপেই বুঝেছি, বিয়ে কর্লেই মানুষ সংসারের দাসত্বে নিজেকে বিকিয়ে দেয়, ভাসিয়ে দেয় বা জড়িয়ে ফেলে ; তার তখন মন সঙ্কীর্ণ হয়, দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হয়, চিন্তা গণ্ডীবদ্ধ ও ভারাক্রান্ত হয়, আর কল্পনা—বুঝিবা তা বিলুপ্ত হয়ে যাবারই উপক্রম করে। অবারিত উদ্যম ; অদম্য ইচ্ছা-শক্তি ; উন্মুক্ত নির্ম্মল ও উদার মন ; প্রাণময়ী চিন্তা ও জ্যোতির্ম্ময়ী কল্পনা,—এ সবের উপায়, যদি কিছু থাকে ত আমার বিশ্বাস, সে হচ্ছে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য ! এই এক ব্রহ্মচর্য্যের বলেই একদিন আমাদের এই স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি অত সহজে, অমন অনায়াসে, স্বাভাবিক শক্তিবলে এ বিশ্বসংসারে জগদ্গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। আর আজ যদিও সে পদানত, নির্জ্জীব, অসহায় ও নিঃস্ব, তবু ঐ একটি মাত্র উপায় অবলম্বন কর্লে এখনও সে নিশ্চয়ই আবার সেই শূন্য সিংহাসনে গিয়ে ধীরে ধীরে উপবেশন কর্ত্তে পার্‌বে। আমি সেই শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছি। আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি,—যে যাই বলুক, যতই কেন আমাদের হেয় ও নগণ্য ভেবে উপেক্ষা করুক না,—আমরা আবার জাগব, উঠ্‌ব, মানুষ হব। এ আঁধার চিরদিন কখনও আমাদের ছেয়ে থাক্‌বে না, থাক্‌তে পারে না।—এ স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, অযথা প্রলাপ বা শূন্য অহঙ্কার নয়।—'আসিবে সেদিন আসিবে !' আমি 'দেশ' চিনি না, বিদ্বেষ মানি না ; আমি চাই শুধু ঐ বীর্য্যবল—ব্রহ্মচর্য্য ; চাই শুধু ঐ সত্যনিষ্ঠা ; চাই শুধু আসল, খাঁটি, ধ্রুব ও নিটোল ধর্ম্ম-বল, আর ঐ এক কথায়—মনুষ্যত্ব ! ইতি, তোমার অনুরক্ত দ্বিজদা।

"পুঃ।—একটা কথা মনে রেখো দেবকুমার, যে, কোম্পানীর কোন একটা চাকর যদি কোন অন্যায়ই করে তা হলে আমাদের অন্যায়টাও ন্যায় হ'য়ে যায় না। যেমন, For instance, (উদাহরণতঃ) এমার্সন আমাদের দেশপূজ্য জন-নেতা সুরেন্দ্রনাথকে Seat ('বসিবার আসন') না দেওয়ায় অত্যন্ত ছোট লোকের মতই কাজ করেছেন।"

কাল-ধর্ম্ম অপরিহার্য্য। সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের এমন-যে চিঠিখানি, ইহা পাইয়াও তাঁহার প্রতি আমার রাগের মাত্রা যেন

বাড়িয়াই উঠিল, কমিল না। তখন আমাদের মনে সরকারী কর্ম্মচারীর সেই-সব নিষ্ঠুর আঘাতের প্রতিক্রিয়া পূর্ণমাত্রায় প্রবল; সুতরাং, ভালো কথা থাকা সত্ত্বেও, এসব পত্র পড়িয়া যে তখন কতদূর উত্যক্ত হইয়াছিলাম তাহা আর বলিবার নহে। পত্র পাইয়া, রাগে ইহার আমি আর কোন উত্তর দিলাম না;—আপন মনে, ঘরে বসিয়া, রাগে ও দুঃখে নিজেই জ্বলিতে-লাগিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল আমার সে মনোভাব সহজে বুঝিয়া-লইয়া, ইহার দিন দশেক পরে আবার আমাকে লিখিলেন, * —

"ছোট ভাইটি আমার! রাগ করিয়া পত্র লেখা বন্ধ করিয়াছ, না? তা আমি বেশ বুঝিতেছি। তা তোমাদের রাগ হওয়া অসম্ভব বলি না। অত সাধে জলাঞ্জলি দিতে হইলে, অত উৎসাহের মুখে এমন একটা বাধা পাইলে রাগ না হওয়াই বরং আশ্চর্য্য,—অস্বাভাবিক। আমিও যদি ওদলের একজন হইতাম বা ঐ সময়ে ওখানে থাকিতাম তা' হইলে আমার পক্ষেও এসব হিতাহিত বিচার-ক্ষমতা কিছুতে সম্ভব হইত না। তার উপরে ত তুমি আমার বয়সে ঢের ছোট।

"আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে যে সব কথা বলিয়াছি তাহা অপ্রিয় হইলেও, আমি বাহির হইতে বিষয়টাকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতেছি এবং তাহারই ফলে যাহা যাহা বলিয়াছি তাহা ভ্রান্ত বা অসার বলিয়া একেবারেই উড়াইয়া দিও না। আমি যা' চাই, যেমনটি চাই,—এ দেশের নেতারা আজও ততদূর যে যোগ্য হইতে পারেন নাই তাই আমার এই যত দুঃখ, ক্ষোভ ও ব্যঙ্গ। আমি যে সহানুভূতি বা দেশের প্রতি আমার অনুরাগের অভাবে ঐ রকম কথা বলি না, তা কি আজ তোমাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে?

"বরিশালের ঘটনা সম্বন্ধে অবশ্য তোমাদের মতই গ্রাহ্য। কেননা তোমরা উপস্থিত ছিলে, আমি উপস্থিত ছিলাম না। আমার বক্তব্য এইটুকু যে শান্তি-রক্ষার জন্য যদি Procession (শোভা যাত্রা) ও বন্দে-মাতরম্ ধ্বনি নিবারণ করা প্রয়োজন হয় ত ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা করিতে বাধ্য এবং তাহা বে-আইনী

* কাঁদী (বহরমপুর) হইতে। তাং—১৩।৫।০৬

নহে। অবশ্য এটা Question of fact ('অবস্থা বা ঘটনা-ঘটিত প্রশ্ন')। যদি পিতা-মাতাকে প্রণাম করিলেও শান্তি-ভঙ্গের সম্ভাবনা মনে করেন ত District Magistrate (ম্যাজিষ্ট্রেট্) তা'ও করিতে বাধ্য। একটা মস্‌জিদের কাছে রাম-নাম করিলে যদি একটা দাঙ্গা বাধে ত মসজিদের কাছে রাম-নাম করা নিষিদ্ধ। বরিশালে পূর্ব্বে গোলযোগ বাধিয়াছে—সামান্য কারণে, বরিশালে সামান্য কারণে গুর্খা পুলিশ রাখিতে হইয়াছিল। ঢাকায় ময়মনসিংহে তাহা হয় নাই। বরিশালের সমস্ত লোককে Disarm ('নিরস্ত্র') করিতে হইয়াছে। (তেজস্বী দেশ এই বরিশাল!) তাতে হয়ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ ভয় পাইয়াছিলেন যে, সাত-আট হাজার লোক গোলযোগ করিলে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে। নহিলে বরিশালেই এই সব কাণ্ড হয় কেন? আর কোন জায়গায় ত এতদিন হয় নাই।

"তারপর, এই সৌখীন বন্দেমাতরম্ ধ্বনির উপর ক্রমে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। এর সঙ্গে যে Sincerity (সারল্য বা অকৃত্রিমতা) নাই, Feeling ('অনুভূতি') নাই, তাহা আমি বলি না। কিন্তু সে Feeling (অনুভূতি) ঐ বন্দেমাতরমেই নিঃশেষ হইয়া যায়; কাজ হয় না। কেবল ভাবপ্রবণতা, উত্তেজনা বা Feeling—কবির কাজ হইতে পারে, Patriot ('স্বদেশ-প্রেমিক') কর্ম্মীর কাজ নহে। Patriot'এর (দেশভক্তের) কাজ স্বার্থত্যাগ, উৎসর্গ, সেবা। Principle' এর (জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের) জন্য কয়জন দেশে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে? দেশ-উদ্ধার সন্ন্যাসীর কাজ, ত্যাগীর কাজ; ভোগী বা বিলাসীর কাজ নয়। আমাদের সেই ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। * * 'হ্যাট্'টি পরিত্যাগ করিতে পারেন না, * * সভাপতি না হইলে অহঙ্কারে কোন সভাতে পদার্পণ পর্য্যন্ত করেন না,—বলি, এসব কি দেশ-হিতৈষণা? এঁদের কি দেশের যথার্থ Leader ('চালক বা নায়ক') বলিয়া মানিব? কিছু ছাড়িতে চাও না, দেশ-উদ্ধার করিবে Conference (সভা) করিয়া? ধিক্!

"ইংরাজ বিদেশী রাজা। তাহাদের সংখ্যা অল্প। * * * তাদের এই আতঙ্ক উদ্বেগ স্বাভাবিক, সুতরাং ক্ষমার্হ। কিন্তু বাঙ্গালী 'বেআইনী' কাজ করিবে, অথচ শাস্তি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়;—এইটেই আশ্চর্য্য। বাঙ্গালী বলুক, 'আন্তরিক ভক্তি-প্রীতিভরে মায়ের নাম করিব; পরশ্রীকাতরতা বিজাতি-বিদ্বেষ ছাড়িয়া, সহজ স্বাভাবিক অকৃত্রিম আগ্রহে মায়ের সেবা করিব;

তাহাতেও যদি তোমাদের আপত্তি থাকে, তাতেও যদি তোমাদের চোখে আমরা অপরাধী হই—বেশ তো জেলে দিতে হয়, দাও'।—এই বলে' সব সদর্পে জেলে যাক না দেখি! কিন্তু চোক রাঙ্গিয়ে, তার পরেই চাবুক খেয়ে পড়ে গিয়ে, উড়ে বেয়ারার মত এই কান্না, High Court'এ (হাই কোর্টে) আপিল, —এক হুজুরের কাছে থেকে আর এক হুজুরের কাছে আবেদন ও দরবার,—এই যদি শেষে Martyr এর কাজ হয় ত কাজ নেই বাবা! তার চেয়ে চাবুকের পরিধি থেকে আগে হ'তেই সরে' দাড়ানো ঢের ভালো।

"ইংরাজের অত্যাচার বলিয়া যে চেঁচাই, সে চেঁচাইবার অধিকারটা আমাদের দিয়াছে কে? আজ যে এই চারিদিক্ থেকে ফুলার লাটের উপর অশ্রাব্য ভাষায় গালি বর্ষিত হইতেছে, আর ক্ষমতা সত্ত্বেও ফুলার যে তাই নীরব হয়ে বসে বসে' শুন্‌ছেন—এটা দেখেও কি ইংরাজ জাতটার উপর একটা শ্রদ্ধা হয় না? ইচ্ছা কর্লেই ত টুঁটি টিপে খবরের কাগজগুলিকে মেরে ফেল্‌তে পারে। আমরা যে Justice Justice ('বিচার বিচার') বলে চেঁচাচ্ছি, সেরূপ ন্যায়-বিচারের idea আপনাকে (থুড়ি তোমাকে!) এযুগে কে দিয়েছে? এই Conference ('সমিতি') জিনিষটাও ত খাঁটি বিদেশী জিনিষ।

"তবে যেখানে বিদ্রোহের আশঙ্কা, বৃথা রক্তপাতের আশঙ্কা, ভারত-রাজ্য হারাণোর আশঙ্কা সেখানে ইংরাজ বল-প্রয়োগ করে বটে। তাও যদি না করিবে তা হলে আগে থেকে লাগাম বাঙ্গালীর হাতে দিয়ে তাদের সরে পড়াই উচিত। * * * তাহাদের এরাজ্য রাখিতেই হইবে * *। তারা ঋষি নহে, পার্থিব মানুষ, বণিক্, ব্যবসায়ী মাত্র। আমরা চটি কেন? কারণ, আমরা ভাবি, বুঝি তারা বাস্তবিক অমানুষ, ঋষি কিংবা দেবতা গোছেরই কিছু। এইরূপ ভাবিয়াই আমরা এত অশান্তি, এত বিরাগ, এত অসন্তোষ সঞ্চয় করিতেছি এবং এই ধারণার ফলে নিজেদেরও সর্ব্বনাশ করিতেছি।

"এখনও ইংরাজের কাছে অনেক শিখিবার ছিল। তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। তাহাদের সহানুভূতি হারাইতেছি। তাহারা Native Industry ('দেশীয়-শিল্প') জাগাইতেছিল, বাঙ্গালীকে Volunteer করিতেছিল *

* সৌভাগ্যক্রমে মহাপুরুষদের আশীর্ব্বাদে, মেঘ কাটিয়া-গিয়া আবার আজ এ ভারত-গগনে—'নবীন তপন নূতন কিরণ করে বরিষণ!' য়ুরোপের ঐ প্রলয়ঙ্কর বন্যা-ঝড়ের প্রভাবে এদেশে আবার অল্পে অল্পে আজ স্বাস্থ্যের অনুকূল বায়ু বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।—গ্রন্থকার।

ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা বুদ্ধিদোষে, কপাল দোষে সব নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি।

"তুমি ত বলিলে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো ভাল। কিন্তু দাঁড়াবে কি? পঙ্গু যে! এখনো হাত ধরে' তুলতে হয়। 'হাঁটি হাঁটি পা-পা' কর্ত্তে হয়। এখনই উঠ্‌বে কি? উপর দিক্ থেকে প্রতিকূল শক্তি চেপে ঘাড় ধরে বসিয়ে দেবে।

"* * * তথাপি আমার বিশ্বাস যে, ইংরাজের সভ্যতার 'চক্ষুলজ্জা' আমাদিগকে এ আবর্ত্তের মধ্যেও রক্ষা করিবে। * *

আমার বিশ্বাস কি, জান ভাই? যত দিন আমাদের বিবাহ-প্রথা, †—(শুধু বিবাহ-প্রথা কেন,) সামাজিক অনেক প্রথাই—উঠিয়া না যায়, অর্থাৎ, সময়ানুরূপ সংস্কৃত না হয় ততদিন আমাদের Politically এক হওয়া অসম্ভব। * * * যদি অস্বীকার কর, বিচার কর্ব্বে, তর্ক কর্ব্ব। কিন্তু বোধহয় অস্বীকার কর্ব্বে না।"

* * *

"রবি বাবুকে সাহিত্যিক সম্মিলনের সভাপতি করায় 'বঙ্গবাসী' তোমার উপরে অত নারাজ হইয়া চটিয়া উঠিলেন কেন, জানি না। আমি যদিও রবিবাবুর ঐ সব লালসা-মূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী তবু এ কথা আমি মুক্ত কণ্ঠেই মানি যে, বর্ত্তমান সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি এবং তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না।‡

"অবশ্য সে বিষয়েও যে ঘোর মতভেদ আছে তা বলাই বাহুল্য। তবে এ সম্বন্ধে আমার যা মত, জানিতে চাহিয়াছ বলিয়াই লিখিলাম। কিন্তু তবু শুধু এই সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি সম্বন্ধে যদি শুধু আমার মত জিজ্ঞাসা করিয়া থাক তা হইলে আমি বলি—শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু অথবা নবীনচন্দ্র সেনকে রবিবাবুর আগে সভাপতি করা উচিত ছিল, তিনি যত বড় সাহিত্যিকই হৌন না, ইহাঁদের অপেক্ষা তাঁহার বয়স অল্প। সুতরাং

† এখানে বাল্য বিবাহের কথাই বলিতেছেন।

‡ পাঠক এ মন্তব্যটুকু স্মরণ রাখুন,—পরে কাজে লাগিবে।—গ্রন্থকার।

ইহাঁদের দাবীকে অগ্রগণ্য না করায়, আমার মতে অবিবেচনা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে কেহই তো আর চিরজীবী নন। Seniority ('বয়োবার্দ্ধক্য') একেবারে অগ্রাহ্য করিতে নাই,—'পাকাচুলে বুদ্ধি খুলে,'—বুঝিলে? তা ছাড়া ইহাঁদের মধ্যে যোগ্যতায়ও কেহ তুচ্ছ নন। 'বঙ্গবাসী' এ হিসাবে তোমায় গালি দিয়া থাকেন, বেশ হইয়াছে, খুব হইয়াছে, ঠিক হইয়াছে! এখানেই আজ ইতি। তোমার দ্বিজ্‌দা।"

পাঠক দেখিবেন—এই তৃতীয় পত্রখানিতে অতি অল্পের মধ্যে মনস্বী দ্বিজেন্দ্রলাল কি উদারতা, নিরপেক্ষ বিচার ও প্রখর রাজনৈতিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। জীবনব্যাপী আন্তরিকতার সহিত স্বজাতির শুভ-চিন্তা যিনি না করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে, সেসময়ে এমন অল্পে ও সহজে, এ-হেন সূত্রাকারে দেশবাসীর চরিত্রগত দৌর্ব্বল্য ও রোগের নিদান আবিষ্কার করা কোনক্রমেও যে সম্ভবপর নহে, সে কথা আমার বোধ হয় না বলিলেও চলে। কথায় কথায় এ গ্রন্থ-কলেবর যেরূপ ক্রমশঃ বাড়িয়া-চলিল তাহাতে, এ-সব বিষয়ে আরও বহু বিজ্ঞাপ্য বক্তব্য থাকিলেও, পাঠকের ধৈর্য্য-চ্যুতি ও বাহুল্যভয়ে, আমি অগত্যা এইখানেই এ সম্পর্কে নীরব হওয়া শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলাম।

কিন্তু, প্রসঙ্গটা সমাপ্ত করার পূর্ব্বে, উপসংহার হিসাবে, একটি মাত্র কথা আরও-একটু বিশদ ও স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া বলা আবশ্যক। সত্য বটে যে, সেসময়ে পার্থিব প্রতিষ্ঠা-সম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া নশ্বর জীবনের তুচ্ছ স্বার্থ-চিন্তা বহুল পরিমাণে বিস্মৃত হইয়া, একান্ত তন্ময় সাধনায় স্বদেশের অকৃত্রিম কল্যাণ-কামনা করিতে এই বঙ্গদেশে তাঁহার মত অতি অল্প লোকেই সমর্থ ছিলেন; এবং ইহাও নিঃসন্দেহ যে, তাঁহার দেশভক্তির বিষয় একটু চিন্তা করিলে, শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকে আজও সাহিত্য-শূর, সুহৃদ্বর সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের কথিত

দেশাত্মবোধের বৈচিত্র্য বা বিশেষত্ব।

নিম্নোক্ত কথাগুলির সঙ্গে সর্ব্বান্তঃকরণেই 'সায়' দিতে বাধ্য হইবেন যে,—

'দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি নন, হাস্য-রস-সমুজ্জ্বল, মধুর গানের রচয়িতা নন ;— তিনি আমাদের জাতীয়তার পুরোহিত। তিনি বাঙ্গালীর পথ-প্রদর্শক, তিনি 'স্বদেশী' তন্ত্রের মহাকবি। তিনি একনিষ্ঠ ভগীরথের মত বাঙ্গালীর অবদান-হিমাচলে অধিষ্ঠিত দেশাত্মবোধ-মহাদেবের জটাজুট হইতে দেশভক্ত ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া কোটী কোটী ভারতসন্তানের জীবন্মুক্তির সাধন দান করিয়া দিয়াছেন। এ ঋণ কি জাতি কখন পরিশোধ করিতে পারিবে ?'—

এ সকল বাক্য অনেকাংশে সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু, ঐ সত্যেরই অনুরোধে সেইসঙ্গে আমাদের এটুকুও আবার বলিয়া-রাখা ভাল যে, যাঁহারা স্বদেশ-প্রেম বা দেশাত্মবোধ অর্থে—'আমাদের দেশের সবই সুন্দর, সকলই ভাল, আর বিদেশের সবই বিশ্রী, সকলই অশুভ,' অথবা বিদেশের ঠাকুরে ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরে'র মর্য্যাদা করা বোঝেন তাঁহাদের কাছে দ্বিজেন্দ্রলালের এ দেশাত্মবোধ বা স্বাদেশিকতার তাদৃশ সমাদরের সুদূরতম সম্ভাবনাও নাই। দেশকে সারাটা প্রাণ ঢালিয়া অনন্যমনে ভালবাসিতেন বলিয়া, তিনি কেবলমাত্র এই আপন দেশটুকুর গণ্ডী বা সীমার মধ্যেই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বজনীন চিরন্তন ধর্ম্মকে,—'সত্য, শিব ও সুন্দর'কে— সংস্কার বা আচারের ঠুলি চোখে আঁটিয়া—'চোক-ঢাকা বলদের মত',—নিতান্ত 'খাটো' ভাবে ও মন-গড়া মূর্ত্তিতে, 'যা-নয়-তাই' করিয়া, দেখিতে জানিতেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল আমরণ দেশ, কাল ও পাত্র নির্ব্বিচারে,—সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের ও সকল জাতিরই ভিতর হইতে—নিরপেক্ষ ঐকান্তিক উদারতার সহিত, সযত্নে অনুসন্ধান করিয়া, তদীয় জন্মজাত স্বাভাবিক সত্য-নিষ্ঠার ফলে 'সত্য, শিব, সুন্দরে'র যে অবিনশ্বর, অনিন্দ্য ও সনাতন আদর্শটি সন্ধান করিতে পারিলেন, আপন প্রাণাধিক দেশবাসিগণকে তিনি কায়মনোবাক্যে

তাঁহারই তন্ময় আরাধনায় অবহিত হইবার জন্য আকুল প্রাণে, শতমতে, নিয়ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া-গিয়াছেন। অবিচার আনুগত্য ও যুক্তিহীন অন্ধ অনুরাগের তিনি কোনদিনও পোষকতা করেন নাই;—তাঁহার যুক্তিপ্রিয় মন চিরটাকালই তাঁহাকে সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির উপরে 'হাড়ে চটা' বা অত্যন্ত বিরক্ত ও বীতস্পৃহ হইতে বাধ্য করিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ-ভক্তি বা দেশাত্মবোধের ভিত্তি ছিল—সার্ব্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও মঙ্গলেচ্ছায়। এ দেশ-ভক্তির পরম পরিণতি—কেবল স্বদেশ ও স্বজাতির নহে,—দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিচারে এই সমগ্র বিশ্বেরই চিরন্তন ও নিরবচ্ছিন্ন শুভেচ্ছায়! এই কারণে সে দেশাত্মবোধ কখনও কোন জাতি বা দেশের প্রতি তিলার্দ্ধও বিদ্বেষ বা ঘৃণার উদ্রেক করে না। তাহা অতি নিবিড়রূপে বিশ্ব-প্রেমের সঙ্গে সর্ব্বথাই সমসূত্রে গ্রথিত, এবং তাহার চরম উদ্দেশ্য বা মুখ্য লক্ষ্য শুধু ভারতোদ্ধার নহে,—এ বিশ্ব-রাজ্যে সেই বিশ্বেশ্বরের, মঙ্গলময় পরমেশের, 'সত্য-শিব-সুন্দরে'র ধ্রুব ও চিরন্তন, অনির্ব্বাণ প্রতিষ্ঠা!

দেশাত্মবোধ অর্থাৎ—দেশের প্রতি মমত্ব-বোধ তাঁহার জীবনে আমরা সেই বাল্যাবধি চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। আমরণ

রাজ-ভক্তি।

এ দেশের প্রতি তাঁহার এমনই অনুরাগ ছিল সত্য; কিন্তু, তা' বলিয়া, ইংরাজ-রাজের বা ইংরেজজাতির প্রতি তিনি বিদ্বিষ্ট ক্রোধান্ধ ছিলেন না। অকৃত্রিম রাজ-ভক্ত রহিয়াও যে ভারতবাসীর পক্ষে স্বদেশ-প্রেমে তন্ময় হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে—দ্বিজেন্দ্রলাল স্বীয় জীবনের আদর্শ দ্বারা তাহার এক বিচিত্র সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। দেশের হিতানুধ্যানে তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন, মানি; কিন্তু, দেশকে ভালবাসিলেই যে, ইংরাজজাতির প্রতি বীতরাগ ও অন্ধভাবে বিদ্বিষ্ট হইতে হইবে,—তদীয় বাক্যে, কর্ম্মে ও চিন্তায়—এরূপ মতের

তিনি তিলার্দ্ধও পোষকতা করিয়া যান নাই ; মাতৃভূমি ও আপন 'জাত ভাই'দের মঙ্গলের প্রতি অপলক লক্ষ্য রাখিয়া, শাসকগণের অবৈধ, উদ্ধত ও অন্যায় কার্য্যের তিনি যখন প্রতিবাদ করিতে-থাকিতেন তখন সন্দেহ হইত—বুঝিবা মূলে তিনি মনে-মনে ইংরাজ-রাজের প্রতি বড়ই বেশী বিদ্বেষ-পরায়ণ। কিন্তু, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছেন তাঁহারা জানেন—তিনি আসলে এ রাজত্বের কতদূর গুণগ্রাহী ও হিতার্থী ছিলেন, এবং যখন তিনি ঐরূপ কোন প্রতিকূল মন্তব্য উত্তেজিত আগ্রহে ব্যক্ত করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তখনও কিন্তু সর্ব্বথা এই রাজ্যের ভাবী ও স্থায়ী কল্যাণই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকিত। দেশবাসীরা যাহাতে পরানুগ্রহের জন্য লালায়িত না রহিয়া, ক্রমে এখন 'আপন পায়ে' আপনারা 'ভর করিয়া দাঁড়াইতে' শেখে,—স্বজাতি ও মাতৃভূমির সর্ব্ববিধ শুভ-সাধনে, আত্মোন্নতি বিধানে তাহারা যাহাতে একান্ত মনে অবহিত হয়, এজন্য তিনি নিত্য-নিয়ত, স্বতঃপরতঃ নিতান্তই চিন্তান্বিত ও যত্নবান্ ছিলেন ; এবং সত্য বলিতে কি—ঠিক সেইজন্য,—যতদিন আমরা স্বরাজ্য লাভে যোগ্য ও সমর্থ না হই ততদিনের জন্য—তিনি এই বৃটিশ-রাজত্বেরও উন্নতি ও স্থায়িত্ব সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন ; ইংরাজের আগমন যে এ-দেশে আমাদের এই বহুবিধ উন্নতির মূল ; আর, এই উদারনৈতিক রাজত্বের উপরে যে আপাততঃ আমাদের যা-কিছু মঙ্গল, যত-কিছু উন্নতি,—এমনকি, প্রত্যুতঃ, আমাদের জাতীয় জীবন-মরণও একরূপ নির্ভর করিতেছে, ইহাই তাঁহার অকপট ধারণা বা বদ্ধ-মূল বিশ্বাস ছিল, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, সেই স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে অত উদ্দাম উত্তেজনার মধ্যেও, আমরা দেখিয়াছি—তিনি ঐ বৈর-বুদ্ধি-সঞ্জাত বিদেশী-বহিষ্কার বা 'বয়কটের' বিপক্ষে অমন তীব্র অভিমত প্রচার করিয়া, তাঁহার একান্ত অনুরাগী ও পরম গুণগ্রাহীদের কাছেও তৎকালে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইতে বাধ্য

হইয়াছিলেন। কোন-কোন দুর্ম্মতি ও কূটনৈতিক রাজ-কর্ম্মচারীর অন্যায্য আচরণ, অন্যায় উৎপীড়ন বা 'খাম-খেয়ালি' অত্যাচারের দরুণ, সময়ে-সময়ে তিনি গভর্ণমেণ্টের প্রতি খুবই বিরাগ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, জানি ; কিন্তু, তজ্জন্য তিনি সেই-সব শাসকদিগকেই শুধু দোষী সব্যস্ত করিয়া, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের প্রতিই রুষ্ট হইয়াছেন,—আসলে ব্রীটিশ রাজত্বকে তজ্জন্য তিনি দায়ী করেন নাই, তাহার প্রতি বিরক্ত বা বীতশ্রদ্ধও হন নাই ; স্বদেশীর সময়ে একবার এক পত্রে তিনি আমাকে অন্যান্য অনেক কথার পর লিখিয়াছিলেন,—

"আজ যদি ধর,—ইংরাজ-রাজ এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়াই যায় তা' হইলে আমাদের যে কি ভয়াবহ ও শোচনীয় অবস্থা দাঁড়ায়, আমি তা' কল্পনা কর্ত্তেও শিউরে উঠি। শৃগাল-কুকুরের অবস্থাও সে দিন আমাদের দুর্দ্দশার কাছে বোধহয় হার মানে।"

তাঁহার এ ধারণা সত্যই হৌক্ আর ভ্রান্তই হৌক্, যাহা আমি জানি,—যথাযথ ভাবে সে সকল সত্য কথা আমাকে ব্যক্ত করিতেই হইবে ; সুহৃত্তমের সহিত আমার এসব বিষয়ে সর্ব্বাংশে মতের ঐক্য না থাকিলেও, এ কথা আমি আজ মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে পারি যে, সত্য-নিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলাল কোন বিষয়েই কোন কালে একদেশদর্শী বা 'একচোখো' ছিলেন না ;—সমস্ত বিষয়ই তিনি বিচারপূর্ব্বক 'তন্ন-তন্ন' করিয়া 'যাচাই' করিয়া-লইতেন ; আর তাই, সকলেই পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছেন যে আপন বুদ্ধি-বিবেচনামত দোষকে দোষ বলিয়া ঘৃণা ও নিন্দা করিতে তিনি যেরূপ অদম্য ও দুর্ব্বার ছিলেন, গুণকে গুণ বলিয়া মর্য্যাদা ও সম্মান-প্রদর্শনেও তিনি ঠিক তেমনই অকুণ্ঠ ও মুক্তকণ্ঠ ছিলেন।

তিনি চাহিতেন—ইংরাজই এখন আরও কিছুকাল আমাদের উপরে রাজত্ব করুক, প্রভুত্ব করুক,—শাসন-কর্ত্তা থাকুক ; তবে, সে

রাজ্য যেন আমাদের অভিপ্রায় ও স্থবিধানুসারে, সর্ব্বতোভাবে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণ-কল্পেই নিয়োজিত হয়; উদ্বেগ, অসন্তোষ ও ভয়ের পরিবর্ত্তে, এ রাজ্যের অচল-অটুট ভিত্তি যেন আমাদের শান্তি, শুভেচ্ছা ও প্রীতির উপরেই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ রহিয়া আমাদিগকে পরিণামে যোগ্য ও সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া-তুলিতে সমর্থ হয়। বলা-বাহুল্য—অবিমিশ্র, অবাধ স্বাধীনতাই অবশ্য তাঁহার দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তার চরম কাম্য ছিল, এবং স্বাধীনতা যে মানবমাত্রেরই জন্মস্বত্ব, তিনি বিশেষ ভাবেই তাহা বারংবার বুঝিতেন ও বলিতেন।

কিন্তু, ব্রীটিশ-রাজ্যের এমন যথার্থ শুভৈষী ও 'রাজভক্ত' প্রজা হইয়াও এ দুর্ভাগ্য দেশে তিনিও যে গুপ্ত পুলিশের জঘন্য চক্রান্ত ও নির্য্যাতনের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। বিজাতীয় শাসকগণ তাঁহাকে না বুঝিয়া, না চিনিয়া,—জানিবার চেষ্টাও না করিয়া,—এই-সব স্বার্থলোলুপ, নিষ্ঠুর, অনৃতবাদী ও কল্প-কুশল পুলিশ-কর্ম্মচারীর গুপ্ত প্রতিবেদনে (Report'এ) আস্থা-স্থাপন করিয়া তাঁহার ও তল্লিখিত রচনাবলীর প্রতি বহু সময়ে অযথা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক বড়ই আক্ষেপের সহিত বলিতে হয়—প্রধানতঃ এই একটা বিষম দোষ বা ভ্রমের দরুণ এতকাল আমাদের সঙ্গে একত্র বসতি করিয়াও, রাজপুরুষেরা এখনও আমাদের অন্তরের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা যদি আমাদের সঙ্গে একটু প্রাণ খুলিয়া, আমাদিগকে মানুষ জ্ঞানে, প্রীতি ও সরলতার সহিত মেলা-মেশা করিতেন, একটু সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদিগকে চিনিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করিতেন; বেতন-ভুক্ এই-সব যত-রাজ্যের গুপ্ত পুলিশের কথায় কর্ণ-পাত না করিয়া, দেশের শিক্ষিত-সজ্জন ও চরিত্রবান্, বিশ্বস্ত জন-নায়কগণের পরামর্শ ও সাহচর্য্য গ্রহণে এ দেশের শাসন-সংরক্ষণ করিতেন তাহা হইলে এতদ্দিনে এই অধোগত ভারতবর্ষের কতই না

উন্নতি ও পরিতৃপ্তি সম্ভব হইত। কিন্তু, আমাদের আন্তরিক আগ্রহ ও সনির্ব্বন্ধ অনুনয়-অনুরোধ সত্ত্বেও, তাঁহারা আমাদের কোনরূপ সাহায্য লওয়া তো দূরে থাক্, এতকাল আদৌ এ-দেশবাসীর সঙ্গে মিশিতেই লজ্জা, ঘৃণা ও অসম্মান বোধ করিয়া-আসিয়াছেন ; আর, তাই, তাহার ফলও তাঁহাদের পক্ষে যতদূর শোচনীয় ও অকল্যাণকর হইবার তাহাই ক্রমে হইয়া-পড়িয়াছে ! যে দেশের জন-সাধারণ, —ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলে—ইংরাজ রাজ-পুরুষের অতি-তুচ্ছ একটু হাসি-মুখ দেখিবার জন্য একদা নিয়ত উন্মুখ ও লালায়িত ছিল ; শুধু ঐ শাদা মুখের দু'টো মিঠা বুলি শুনিলেই এই আসমুদ্র-হিমাচল, সুবিশাল, প্রকাণ্ড ভূ-খণ্ড নিমেষেই গলিয়া জল হইয়া-যাইত,—সেই অতি-মাত্র কৃতজ্ঞ, শান্তিপ্রিয় রাজ-ভক্ত দেশে আজ যে রাজ-দ্রোহ-সূচক বিবিধ ষড়্‌যন্ত্রেরও নানারূপ লক্ষণ এখানে-ওখানে ফুটিয়া-উঠিল ভাবিয়া-দেখিলে—এজন্য অবশ্য আমরা এই-সব অদূরদর্শী শাসকগণকেই সম্যক্‌রূপে দায়ী ও অপরাধী গণ্য করিতে বাধ্য হই। জ্ঞান ও সভ্যতার আদিমতম কেন্দ্র ও লীলা-ক্ষেত্র এই-যে ভারতভূমি—যাহার ক্রোড়ে একদা এ মরবাসী, নশ্বর মানব চরমোন্নতি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশের অভাবিত বা কল্পনাতীত অবস্থায় উপনীত হইয়া, মায়া-মোহান্ধ, তমসাছন্ন বিশ্ববাসীকে চিরন্তন, চরম সত্যের অনির্ব্বাণ আলোকে জ্যোতিষ্মান্ ও অমরত্বের অধিকারী করিয়া-গিয়াছে,—সেই, দেব-বন্দিত দিব্যধামের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়া, আজিও যে শূন্য-গর্ভ গর্ব্ব ও অশ্রদ্ধার আতিশয্যে শাসক-সম্প্রদায় আমাদের প্রকৃত পরিচয়টুকুও পাইলেন না,—এ দুঃখ, এ ক্ষোভ, এ আক্ষেপের কি আর অবধি আছে !

তবু, আজ বুঝিবা—নানাবিধ শোচনীয় অভিজ্ঞতার ফলে ও বর্ত্তমান প্রলয়ঙ্কর মহাসমরের পরিণামে—স্বার্থের খাতিরেই রাজকুলের কথঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইয়াছে। তাই, দেখিতে পাই—আজ তাঁহারা

আমাদের সুখ-দুঃখের সমভাগী হইতে তবু-যেন একটু ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিতেছেন; এবং ক্রমে আজ তাঁহারা—যে-ভাবেই হোক্ আর যতটুকুই হোক্—আমাদের সঙ্গে অল্লাধিক পরিমাণে যেন মিলিতে মিশিতেও প্রয়াস পাইতেছেন। মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে কোন ঘটনাই কখনও অমিশ্র অশুভকর হইতে পারে না।

বস্তুতঃ উক্ত হেতুবশে, রাজ-ভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল আন্তরিক দুঃখে, শাসকগণের নির্ব্বুদ্ধির অমন নিন্দা করিতেন। আমি জানি—গুপ্ত পুলিশের জঘন্য চক্রান্তে অকারণ একবার যখন বাধ্য হইয়া, সরকার-বাহাদুরের কাছে তাঁহাকে তাঁহার কোন-কোন রচনা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে হয় তখন তিনি আন্তরিক আক্ষেপ ও অপরিহার্য্য অভিমানভরে বলিয়াছিলেন,—

"সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও গভর্ণমেণ্টের যথার্থ শুভার্থী শিক্ষিত-সজ্জনের প্রতি এই রকম অন্যায় সন্দেহের ফলে এদেশের মজ্জাগত স্বস্তি ও শান্তি অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিবে; এবং আমি আজ বলিয়া রাখিলাম—দেখিও, একদিন এমনই-সব কারণে এ দেশবাসীর মনে ক্রমশঃ ব্রীটিশরাজ্যের প্রতি অনাস্থা এমন কি, ক্ষোভ আক্রোশ ও বিদ্বেষের ভাবও সঞ্চারিত, হইতে-থাকিবে। শেষে, ইহার পরিণাম-ফল কি হইতে কিসে যে কি হইয়া দাঁড়ায় তাহা কে বলিবে?"

এই কথা বলার পর, আশ্চর্য্য এই যে, বড়-বেশি দিন আর বিলম্ব ঘটিল না;—দ্বিজেন্দ্রলাল জীবিত থাকিতে-থাকিতেই, দৈব বিড়ম্বনায় তাঁহার এবাক্যের যথার্থ্য চারি দিকে অতি শোচনীয়রূপে সপ্রমাণ হইয়া-গেল। তৎকালে তাঁহার কোন-কোন রচনা সম্পর্কে আদিষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকটে তিনি যে কৈফিয়ৎ প্রেরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি মাত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে তিনি যেরূপ অকুতোভয়ে, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া, অতি নিপুণ ও অকাট্য যুক্তি প্রয়োগে তাঁহার প্রতিকূলে উত্থাপিত অভিযোগগুলি

একে-একে অবলীলাক্রমে খণ্ডন করিয়া-দিয়াছেন তাহা দেখিলে সম্ভ্রম-বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। (এ কৈফিয়তের কোথাও) পরোক্ষ কিংবা আভাসেও তিনি গভর্ণমেণ্টের বিন্দুমাত্রও তোষামোদ বা 'মন-রাখা' কথা বলেন নাই; অথচ, ইহার সর্ব্বত্র অন্তর্ব্বাহী ফল্গু-ধারার ন্যায়, ব্রীটিশ জাতির ন্যায়পরতার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক বিশ্বাসের ভাবটি কেমন শোভনরূপে স্পষ্ট হইয়া-উঠিয়াছে! এ-সব অভিযোগ ও তাঁহার এই কৈফিয়ৎটি সরকারী 'গোপনীয় বিভাগের' অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং (Official Secrets Act' এর ভয়ে) আইনতঃ ইহা সাধারণের গোচরার্থ এস্থলে লিপিবদ্ধ করার উপায় নাই। কিন্তু, যদি কোনমতে এটুকুও ছাপান সম্ভব হইত, পাঠক বেশ সহজেই বুঝিতেন—সরকার-বাহাদুরের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল মনে-মনে কি ভাব পোষণ করিতেন।

ব্রীটিশ ন্যায়পরতার প্রতি তিনি কতখানি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন, অল্পের মধ্যে তদ্বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের স্নেহাস্পদ, 'ক্লীওপেট্রা'-নাটকের রচয়িতা, শ্রীযুক্ত প্রমথ ভট্টাচার্য্য আমাকে যেটুকু লিখিয়াছেন তাহা আমারও বেশ মনোমত হইয়াছে। প্রমথবাবু লিখিতেছেন,—

"তাঁহার স্বদেশ-প্রেমের জন্য কোন কোন রাজপুরুষ তাঁহাকে ভুল বুঝিয়া তাঁহার রাজ-ভক্তিতে সন্দিহান হন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি অনেকবার আক্ষেপ করিতেন যে নিম্নতম পুলিশ-কর্ম্মচারী তাঁহার লেখা বুঝে না, অথচ তাহা হইতে কাল্পনিক কূট অর্থ বাহির করিয়া রাজপুরুষদের কান ভারি করে। তাঁহার রচিত নাটকের অনেক স্থানে আছে যে, প্রতিষ্ঠিত কল্যাণকর কোন রাজশক্তির বিরুদ্ধে যাহারা অযথা অস্ত্র-ধারণ করে তাহারা কেবল শান্তি ও ধর্ম্মের শত্রু নহে, —তাহারা দেশের ও দশের শত্রু। বাস্তবিক ইহাই তাঁহার রাজনীতির মূল মন্ত্র ছিল। তিনি আরও বলিতেন যে, স্বদেশভক্ত লোকও যে রাজভক্ত হইতে পারে—ইহা যাহারা না বুঝে তাহাদের উপরে দয়া হয়।"

বাস্তবিক রাজভক্তি ও দেশভক্তির এমন বিচিত্র সমন্বয়, আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই কম লোকের জীবনে সংঘটিত হইতে দেখা যায়। সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড যখন সেবারে মারা গেলেন তখন দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, যে গুণগ্রাহী শোক-সঙ্গীত রচনা করেন তাহা পাঠ করিলেও তাঁহার রাজ-ভক্তির অকৃত্রিম আন্তরিকতা উপলব্ধি হয়। শুধু যে তিনি সে গানটি রচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে ; তদীয় নেতৃত্বে পরিচালিত 'ইভ্নিং ক্লাবে'র সভ্যগণের সহযোগে, 'বহু যন্ত্রাদির সাহায্যে' তিনি সে গানটি গাহিয়া, কলিকাতার বিভিন্ন পথে পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন।—

———

৫

কর্ম্মোপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে ; দাস্যে বিতৃষ্ণা ; সাহিত্য-চর্চ্চা ; 'আমার দেশ' প্রভৃতি সঙ্গীত-রচনা ; বহুমুখী বিদ্যা ; সঙ্গীতানুরাগ ইত্যাদি।

খুলনায়।

কলিকাতা ছাড়িয়া দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে খুলনায় গিয়া কয়েক মাস ফৌজদারী বিচার-বিভাগে কার্য্য করেন ; এবং সেখানে পৌঁছিবার এক মাসের ভিতরেই তিনি প্রস্তাবিত 'দুর্গাদাস' নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তিনি আমায় এক পত্রে† লিখিতেছেন,—

"তোমার কালদাদার * প্রস্তাব আমার যে কত উপকার করিয়াছে তা আমিই জানি। 'দুর্গাদাসের' জীবন, অমূল্য, অতুল্য, অসাধারণ। এ চরিত্র এত মহান্ যে, আমার সত্য সত্য ভয় হইতেছে, পাছে আমার এ অযোগ্য লেখনী তাঁর সে স্বর্গীয় চরিত্রাঙ্কনে অক্ষম হইয়া কোন প্রকারে তাঁহার মহত্ত্ব ও গৌরবের লাঘব ঘটায়। কিন্তু বিষয়টি চমৎকার বটে। পারিব কি না, জানি না। তবে আজ এই মাত্র তাহার ভিত্তি পত্তন করা গেল বটে।"

নাটকাভিনয়।

খুলনায় থাকিতে সেখানকার বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকদের একান্ত আগ্রহোৎসাহে তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া একবার তাঁহার দেশ-বিশ্রুত প্রতাপসিংহ নাটকখানি অভিনয় করেন এবং তাহাতে স্বয়ং শক্তসিংহ সাজিয়া অসামান্য অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। এতদ্ভিন্ন পরবর্ত্তী কালে আরও

† খুলনা, ডিসেম্বার, ০৫। পত্রে তারিখ ছিল না ; খামের উপর ডাক ঘরের যে অস্পষ্ট মোহর ছিল তাহাই এখানে নির্দ্দিষ্ট হইল। ডিসেম্বারের কোন্ তারিখ তা' ঠিক করার উপায় নাই।—গ্রন্থকার।

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, ডি-এস্-সি, (লণ্ডন), বার-এট-ল্য।

কয়েকবার তিনি এই অভিনয়-নৈপুণ্যে দর্শকমণ্ডলীকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতার 'সঙ্গীত-সমাজে' 'ইভ্নীং ক্লাবের' পক্ষ হইতে স্ব-রচিত 'সীতা' নামক নাট্য-কাব্যে মহর্ষি বাল্মীকির ভূমিকা (Part) অভিনয়-কালে যেরূপ বিচিত্র দক্ষতা ও অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেন তাহা বিশেষভাবেই স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই।

বহরমপুরে।

খুলনা হইতে তিনি অল্প কয়েকমাস পরে সুদূর বহরমপুরে (মুর্শীদাবাদে) বদ্লী হইয়া যান, এবং সেখানেও সামান্য কয়েক দিন থাকিতে না থাকিতে সেই জেলারই কাঁদী নামক সব্-ডিভিজনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এইভাবে, ঘন-ঘন তাঁহাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বদ্লী হইতে-হওয়ায়, দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যধিক বিব্রত ও উত্যক্ত হইয়া-পড়িলেন। এসময়ে বহরমপুর হইতে তিনি আমায় লিখিতেছেন।—

"ক্রমাগত এই Transfer (বদ্লী) আমাকে যথার্থ ই যেন অস্থির করে' তুলেছে। এত বদ্লী কর্চ্ছে কেন জান ? আমার বিশ্বাস—স্বদেশী-আন্দোলনে যোগদান আর ঐ প্রতাপসিংহ নাটকই তার মূল। কিন্তু, কি বুদ্ধি! এমনি একটু হয়রাণ কর্লেই বুঝি আমি অমনি আমার সব মত ও বিশ্বাসকে বর্জ্জন কর্ব্ব ? * *"

বহরমপুরের কর্ম্মে যোগ দিতে না দিতে আবার যখন কাঁদীতে বদ্লী করিল তখন সেখানে গিয়া লিখিলেন,—

"সঙ্গ অভাবে ও তর্ক কর্ত্তে না পেরে নিদারুণ মনঃকষ্টে মুষ্ড়ে পড়েছি। আমার এখানে এসে Colic (শূল-ব্যথা) ও পরে জ্বর হয়েছিল! আজও বড় দুর্ব্বল আছি। শরীর ও মনের অবস্থা এখন অত্যন্ত শোচনীয়। চারিদিকেই পুঞ্জীভূত অসুবিধা। একত্রে এতগুলি অসুবিধা বোধ হয় জীবনে আর কখনও হয় নাই। মেঘ কাটিয়া যাইবার অপেক্ষা করিতেছি! দীর্ঘ ছুটির আবেদন করিলাম।"

খুলনা, বহরমপুর ও পরে কাঁদীতে থাকিতে, অত অশান্তি-অসুবিধার মধ্যেও, তিনি 'দুর্গাদাস' নাটকের প্রায় চৌদ্দআনা রকম লিখিয়া-ফেলিয়াছিলেন। তা'ছাড়া, কাঁদীতে গিয়া, সেই বিজন প্রবাসে তিনি মধ্যে-মধ্যে কাব্য-লক্ষ্মীর সঙ্গেও বিশ্রম্ভালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। কাঁদীর প্রাকৃতিক দৃশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের বড় চিত্তাকর্ষক বোধ হইয়াছিল। কিন্তু, এই নির্জ্জন প্রবাস তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশকর ও দুঃসহ হওয়ায়, সে অঞ্চলের দৃশ্য-সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর কথা বলিয়া তিনি যে কত রকমে কতবার তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকে তথায় যাইবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছেন তাহার ঠিক নাই। তবে, একবার মাত্র একখানা পত্রে* তিনি বলিতেছেন,—

কাঁদীতে।

"এখানে এখন থাকার মধ্যে আছেন—স্থবিরপ্রায়, বৃদ্ধ সাহিত্যিক মনস্বী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। সেদিন অনুগ্রহ করিয়া আমার এখানে আসিয়াছিলেন। আলাপ হইল। বহুদিন পরে একজন নামজাদা বিদ্বান্ ব্যক্তির সঙ্গ পাইয়া, নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁর সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু, সে জ্ঞানগর্ভ (?) গম্ভীর মুখ হইতে বাক্যের পরিবর্ত্তে অধিকাংশ সময়েই মৃদু হাস্য অর্থাৎ—শুধু 'দশন-কৌমুদী'র স্ফুরণ মাত্র হইতে থাকিল। সুতরাং, আমারও 'সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল'—তর্ক হইল না। অহো—দগ্ধ অদৃষ্ট!! * * বড় ধীর ও শান্ত মানুষটি; দেখিতে কতকটা কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্ব্বোধের মত হইলেও, বিদ্যার জাহাজ। কিন্তু তর্ক যখন করেন না, বুঝিলাম—বে-রসিক; এবং আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরে খুব খাওয়াইলেন অতএব বুঝিলাম—উদারমনা মহজ্জন!

কাঁদীতে থাকিতে নানা অসুবিধা ও অশান্তির দরুণ, তিনি যে পুনর্ব্বার এ সময়ে অবকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। কিন্তু, শত চেষ্টা সত্ত্বেও, যে কারণেই হৌক্, গভর্ণমেণ্ট সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন না। বরং, কাঁদীতে কিছুকালের

* কাঁদী, ৮ই জুন, '০৩।

মত স্থায়ী হইয়া থাকিবার আশায় তিনি যখন তদনুযায়ী উদ্যোগ-ব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হইলেন, সহসা সেই সময়ে আবার তাঁহাকে ৺গয়াধামে যাওয়ার জন্য সরকারের এক জরুরী পরওয়ানা আসিয়া হাজির হইল! যাহাহৌক্, কাঁদী হইতে বিদায় লওয়ার দু'সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি 'প্রবাসে' শীর্ষক একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেন। বহুদিন পরে এ কবিতাটি লিখিয়া তাঁহার এত তৃপ্তি হইয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মপ্রসাদের আধিক্য বশতঃ আমাকে এক কার্ডে লিখিলেন,—

"ভায়া, আমি কলিকাতায় যাচ্ছি ছেলেমেয়ে আন্‌তে। আমার শরীর এখন ভালো। * * এখানে ভালো বাসা পেয়েছি,—অবশ্য 'ভালবাসা' নয়! * * আজ একটা দীর্ঘ কবিতা লিখ্‌লাম। চমৎকার কবিতা, সমালোচকের ভাষায়—'অতি সুন্দর, মনোহর, অপূর্ব্ব! এমন কবিতা বোধ হয় ভূ-ভারতে কেউ আর কক্‌খনো লিখেছে কিনা সন্দেহ।' শীঘ্‌ঘির এখানে চলে এস। এখানে এলেই দেখাব; বলা বাহুল্য—দেখিবামাত্র তোমার পথ-শ্রম ও সমস্ত অর্থ-ব্যয় সম্পূর্ণ সার্থক হবে। * * আমিও 'ঋষি' হচ্ছি নাকি? ঐটেই কিন্তু ভয়!"

সরলতার প্রতিমূর্ত্তি দ্বিজেন্দ্রলাল আপন জনের কাছে এমনই শিশুর মত অকপট ছিলেন! মনের কোন ভাব,—এমন কি নিতান্ত গোপনীয়, আত্ম-প্রসাদ, এতটুকু গর্ব্ব বা অহঙ্কারও তিনি কখনও আমাদের কাছে গোপন করিতে পারিতেন না। একা-একা সেই দূর দেশে বাস করিতে বড়-কষ্ট হইত বলিয়া, আমাদিগকে কাছে পাইবার জন্যই মধ্যে-মধ্যে এইরূপ তিনি এক-একবার এক-একরকম প্রলোভনের ফাঁদ পাতিয়াছেন; কিন্তু, পাঠক দেখিবেন—কত-বড় সরল-সুন্দর সে প্রকৃতিটি যাহার ফলে, অমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ ও দেশমান্য ব্যক্তি হইয়াও, তিনি এমন-সব চিঠি সচরাচর আমাদের কাছে লিখিতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই!

ছুটি মঞ্জুর হইল না। ফলে এই নৈরাশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে অতিমাত্র বিরক্তির কারণ হইল। চাকুরীর উপরে একে তো তাঁহার আন্তরিক বিরাগ ও বিদ্বেষ ছিলই, তার উপরে এই ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া-উঠিলেন। কাঁদী হইতে হঠাৎ যখন আবার গয়ায় বদ্‌লী করিল, দ্বিজেন্দ্রলাল আমায় লিখিলেন,—*

দাস্যে বিতৃষ্ণা।

"* * চাকরী সম্বন্ধে কি আর বলিব? এর জন্য আমার জীবনটাই বৃথা হইতে বসিয়াছে। মানসিংহের ‡ সহিত আমিও বলিতে বাধ্য—'মনে কর কি এই দাসত্বভার আমি বড় সুখে বহন কর্চ্ছি?' কিন্তু, কি করিব? অন্য কোন উপায় নাই যে! এ চাক্‌রীর প্রতি, অন্তর্য্যামী যদি কেহ থাকেন ত তিনি জানেন—আমার অণুমাত্রও মায়া নাই। আজ যদি আমায় এক শ' টাকা পেন্সন দিয়া গভর্ণমেণ্ট আমায় গল-হস্ত প্রদান করে' বিদায় দেন, আমি কোম্পানীকে বহুৎ বহুৎ সেলাম করে' এখনই অবসর লই। একটি বছর অর্দ্ধ বেতনে ছুটির দরখাস্ত করিয়াছিলাম, তা সে দরখাস্তও বরখাস্ত হইয়াছে। জানো, যেদিন সে সম্বাদ পাইলাম সেদিন সত্যই এ সম্বন্ধ-রজ্জু ছেদন করিয়া তফাৎ হইতে উদ্বেগকর, দুরন্ত ইচ্ছা হইল। এখনো সে ইচ্ছা বলবতী আছে। আমার জন্য একটা 'পোষ্ট্' দেখ না!—মন্দই বা কি? যৎসামান্য বেতন ও একটু ভদ্র ব্যবহার পাইলেই আমার এ বাকি দিন কয়টা কোন মতে কাটিয়া যাইবে।"

এই পত্র কাঁদী হইতে লেখার পরে তাঁহাকে (১৯০৬ সনের জুলাই মাসের প্রথম ভাগে) ৺গয়ায় যাত্রা করিতে হয়। অপরিচিত নূতন স্থানে গেলে প্রথম-প্রথম বাসোপযোগী ব্যবস্থাদি করিয়া-লইতে যে-সব উদ্বেগ ও অসুবিধা-ভোগ অনিবার্য্য তাঁহাকেও অবশ্য সেখানে গিয়া প্রথমটা সে-সব ভুগিতে হইয়াছিল। কিন্তু, শেষে, মোটের উপরে গয়াধামে তাঁহার জীবন অপেক্ষাকৃত বেশ সুখেই

* কাঁদী, ৯ই জুলাই, '০৬।

‡ 'প্রতাপসিংহ নাটক দ্রষ্টব্য।

কাটিয়াছিল, মনে হয়। কিন্তু কথায় বলে,—'তুমি যাবে বঙ্গে, তোমার বরাত্ যাবে সঙ্গে',—দ্বিজেন্দ্রলালের অদৃষ্টেও তা'ই ঘটিল। গয়াতে বছর খানেক থাকিতে-না-থাকিতে সহসা হুকুম হইল—গয়া-জেলার অধীন জাহানাবাদ 'সবডিভিজনে'র কর্ম্মভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে! হঠাৎ আবার এই অপ্রত্যাশিত উৎপাতের আবির্ভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল এবার একেবারে ধৈর্য্য-চ্যুত হইলেন। দাস্য-বৃত্তি তাঁহার পক্ষে যে কি বিষম বিরক্তিকর ছিল সেইটুকু জানাইবার জন্য আমি এখানে পুনর্ব্বার তাঁহার অপর-এক পত্রাংশ পাঠকগণকে দেখিতে দিব।—

"গত বুধবার রাত সাড়ে দশটার সময় পালিত * ও আমি 'ডিনার' খেয়ে আমার এখানে বসে আছি, এমন সময় কালেক্টর সাহেবের কাছ থেকে এক চিঠি এসে উপস্থিত যে, জাহানাবাদ সবডিভিজন্যাল অফিসার অত্যন্ত পীড়িত, আমার তদ্দণ্ডেই গিয়ে তাঁকে ছুটিতে যেতে দিতে হবে। আমি রাতেই সাহেবের ওখানে গিয়ে এর অনেক প্রতিবাদ কর্লাম; এখানে তো আরও ঢের 'ঢোঁড়া'টি বা ডেপুটি র'য়েছেন—একা আমারই উপরে এতটা অনুগ্রহ কেন? ফল হ'ল তো ছাই,—এই স্থির হ'ল যে, পর দিন বিকাল থেকে কিছু দিনের জন্য এখন এই জাহানাবাদের কাজ আমাকেই কর্ত্তে হবে। সে-'কিছু-দিন' সম্ভবতঃ এক মাস বা দেড় মাস। তারপর আবার সবই কোম্পানীর হাত! অতএব, যেহেতু আমি কোম্পানীর চাকর, আমি সেই থেকে জাহানাবাদের পুরাদস্তর সবডিভিজন্যাল অফিসার! হা—অদৃষ্ট * * এমন করে' তো ভাই আর পারা যায় না। এযে শৃগাল-কুকুরেরও বেহদ্দ দুর্দ্দশা। এমন কি কেউ নেই যে, আমাকে অন্ততঃ ২০০৲।১৫০৲ টাকা মাইনে দিয়েও একটু আরামের চাকরীতে বহাল করে? আমার কি এতটুকু যোগ্যতাও নেই যে, ২০০৲ টাকা কোথাও আমি গোলামি স্বীকার কর্লেও পেতে পারি? জীবনটা যে বৃথা হ'য়ে গেল; আর এ যন্ত্রণা সত্যই সহ্য হয় না।"

বস্তুতঃ এই দাস্য-বৃত্তির দরুণ তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ

* ৺লোকেন্দ্রনাথ।

লাভেরও যে বিষম ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, অন্য পন্থাই বা কি ছিল? যেরূপ শোনা যায়, তাহাতে এদেশে যত-রকমের গোলামী আছে তন্মধ্যে নাকি বাঁধা নিয়মের সরকারী চাকুরীই অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব বা নিরাপদ্। কিন্তু, তাহাতেও যখন দ্বিজেন্দ্রলালের এত অতৃপ্তি তখন তিনি যে আর কোথাও দাস্য-কর্ম্মে সন্তুষ্ট থাকিতেন তাহারই বা কি সম্ভাবনা ছিল? আসল কথা—অত-বড় তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা লোকের পক্ষে আদৌ কোন চাকুরীতে প্রবেশ করাই উচিত হয় নাই। চাকুরী না করিয়া যদি কোন স্বাধীন ব্যবসায় গ্রহণ করিতেন, নিশ্চয় তাহাতে তিনি অনেকটা সুখী হইতেন। আর চাকুরীই যদি করিলেন ত' শিক্ষা-বিভাগে অধ্যাপনায় ব্রতী হইলে তবু তাঁহার পক্ষে কতক মানাইত। দ্বিজেন্দ্রলালের গুণমুগ্ধ, বাঙ্গালা-গভর্ণমেণ্টের সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ (Under-Secretary) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ মিত্র এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"তাঁহার জীবনের প্রধান ভুল হইয়াছিল সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করা। বঙ্কিমবাবু যেমন বলিতেন—'My wife was a blessing and my service was a curse of my life'* দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় বলিতেন,—'তুমি ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে তোমার বেতনের দশগুণ উপার্জ্জন করিতে পারিতে।' কিন্তু আমার বিশ্বাস—তাঁহার প্রকৃতি ভাল ব্যারিষ্টার হওয়ার পক্ষেও অনুকূল ছিল না; যে লোক ভুলেও জীবনে কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই তিনি যে পশারওয়ালা ব্যারিষ্টার হইতে পারিতেন, এরূপ বোধ হয় না। সুতরাং সে হিসাবে Bar তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে পারিত না। যদি কেবল সাহিত্য-চর্চ্চাতেই তিনি জীবন উৎসর্গ করিতে পারিতেন তবেই এবং একমাত্র তাহাহইলেই তিনি নিজের ও দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেন। শিশুদিগের পাঠ্যপুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া যখন যাহা তিনি লিখিয়াছেন তাহাই সাহিত্য হিসাবে সবিশেষ আদৃত হইয়াছে।"

* 'আমার জীবনে পত্নী ছিলেন আশীর্ব্বাদ, আর চাকুরী ছিল অভিশাপ।'

কিন্তু, এখন আমরা যতই যাহা বলি না, এসব আলোচনা বাতুলের প্রলাপমাত্র। মুখে আমরা যত জয়-ঘোষণাই করি না, একটু ভাবিয়া-দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায়—জীবনে 'যাহা হইবার তাহা হইয়া রহিয়াছে'। আমরা ভাবি—জীবনের সব কাজ আমাদেরই স্বাধীন ইচ্ছায় সম্পন্ন হইতেছে; কিন্তু, ঐসব কর্ম্মের জননী যে ইচ্ছা, মূলে তাহাও যে দৈবাধীন নহে তাহাই বা কে জানে? কি লক্ষ্যে, কত আশায়, কি ভাবে প্রথমে এ জীবনের আরম্ভ হইল; আর ক্রমে কোথা দিয়া, কি হইতে, আজ এ-যে কি হইয়া দাঁড়াইল,—এ-সব কথা একটু চিন্তা ও বিচার করিয়া-দেখিলে আমাদের সকল দর্প, সব দম্ভ, সকল অহমিকাই ধূলিসাৎ হইয়া যায়! আমরা তখন আপন অজ্ঞাতসারে স্বতঃই দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিতে বাধ্য হই—'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্'! যে জীবন-যাত্রার, যে নশ্বর ভবলীলার আরম্ভ আমি করি নাই,—জন্ম-গ্রহণ আমার ইচ্ছাধীন নহে,—সমাপ্তিও আমার শক্তিসাধ্য নহে, সেই চির-রহস্যময় জীবন যে আমার কর্ত্তৃত্বে,—আমারই প্রভাবে সম্যক্ পরিচালিত হইতেছে,—আমাদের এ সিদ্ধান্ত ব্যবহারিক ভ্রান্ত সংস্কার বা 'মায়ার খেলা' ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যাহাহোক্, তবু প্রত্যক্ষ বিচারে বলিতে হয় যে, যে ভ্রমজালে দ্বিজেন্দ্রলাল আপন ইচ্ছাক্রমে জড়িত হইয়াছিলেন, শত চেষ্টা ও তীব্র ইচ্ছা সত্ত্বেও,—কোন-এক অজ্ঞাত, অনির্দ্দিষ্ট, 'অদৃষ্ট' কারণে—শেষে আর তাহা হইতে কিছুতে নিজেকে নির্ম্মুক্ত করিতে পারিলেন না। চিরজীবন 'স্ব-খাত সলিলেই' নিমগ্ন রহিতে হইল।

৺গয়াধামে পহুঁছিয়া তিনি আমাকে প্রথমে যে পত্র * লেখেন সেখানি এই।—

গয়ায় পৌছিয়াছি তবু গয়া-প্রাপ্তি ঘটে নাই! তোমাকে এবার অনেক দিন পত্র লিখি নাই। কি কর্ব্ব বল? কাঁদী থেকে গয়া গয়ায়। বড় বিষম পাল্লা! জিনিষপত্র গোছানো, 'প্যাক' করা,

* গয়া।—৮।৭।০৬।

টানা হেঁচ্ড়া, বাসা ঠিক করা,—নূতন লোকজনের সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজনীয় দেখা-সাক্ষাৎ করা—এ সবে বহুৎ সময় নষ্ট হয়। বদ্‌লী হয়ে এখানে আস্‌বার পত্রে একবার কল্‌কাতায় গিয়েছিলাম। সেখানে তোমার মামাতোভাই প্রমথবাবু, ললিত, যতীন বাগ্‌চী, পাঁচকড়ি, মন্মথ সেন, সুরেশ, রসময় প্রভৃতি অনেকের সঙ্গেই দেখা হইয়াছিল। এখানে এসে বৃহদাকার এক শ্যাম শ্রীমান্, নূতন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি আমার জন্যে বাসা প্রভৃতি ঠিক ক'রে দিলেন। বেশ পরোপকারী লোক। তোমাকেও চেনেন, দেখা যাচ্ছে। নাম বল্‌ব না;—বল তো ইত্যাকার 'কে বটে হে?' এখানকার দৃশ্য বাঁকুড়া জেলার চেয়েও সুন্দর, বড় মনোরম। সহরের মধ্যে পাহাড়, বাহিরে পাহাড়, পদতলে সেই চিরপরিচিত ফল্গু নদী। এস না চট্ ক'রে' একবার এখানে! আমার 'দুর্গাদাস' শেষ হ'ল। ছাপাতে দিয়েছি। কল্‌কাতায় একবার এটা ললিতবাবুবর্গকে কোন মতে তাড়াতাড়ি পড়ে শুনিয়েছি। তাঁরা বলেন, প্রতাপ সিংহের মত Diction হয়নি বটে, তবে Fiction (গল্প) হিসাবে মন্দ হয় নি। আমার বোধ হয় প্রতাপসিংহে স্ত্রী-চরিত্রগুলি ফুটেছে ভালো। দেখা যাক্।"

দ্বিজেন্দ্রলাল এ পত্রে যে ভদ্রলোকটির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে আমার পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। ইহাঁর নাম—শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ। গয়ায় বাঙ্গালী প্রবাসিগণের মধ্যে নন্দবাবুদের পরিবার সেখানকার প্রাচীন অধিবাসী। দ্বিজেন্দ্রলাল তথায় এই নূতন নন্দলালের সদ্ব্যবহারে তৎপ্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাঁদের প্রথম সাক্ষাতাদি সম্বন্ধে নন্দবাবুর প্রেরিত বিবরণ হইতে এখানে একটু তুলিয়া দিলাম,—

"১৯০৬ সালের ৩রা ডিসেম্বার, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহোদয় ৺গয়াতে আগমন করেন। তিনি বিখ্যাত হাস্য-রসিক, মহাকবি ও সুলেখক,—এসব কথা বহুৎ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম ও তজ্জন্য তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আমার অত্যন্ত বাসনা জন্মে। ** তিনি বিলাত-ফের্ত্তা, উচ্চদরের লেখক, অত-বড় কবি, গায়ক, আমার সহিত কথাই বলিবেন কিনা, কিরূপ ব্যবহার করিবেন—এই-সব

চিন্তা করিতেছিলাম। * * যাহাহৌক্, সাহস করিয়া তাঁহার কাছে গিয়ে যাহা দেখিলাম বাস্তবিকই তাহা আমার চিন্তার অতীত। ভাবিয়াছিলাম, সাহেবী পোষাকে, সাহেবী ভাবে দেখিব। আমি ওখানে উপস্থিত হইয়া, চাপরাশীর দ্বারায় একখানি কার্ড তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলাম,—তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি অর্দ্ধেক সিঁড়ি উঠিতে না উঠিতে দেখি, থান ধুতি-পরা, একটা লংক্লথের পাঞ্জাবী গায় দিতে দিতে, ব্যস্তভাবে আমাকে তিনি অভ্যর্থনা করিতে আসিতেছেন। আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। (আমি নিজে সাহেব সাজিয়া তাঁহার কাছে দেখা করিতে গিয়াছিলাম !!) অতি যত্নের সহিত তিনি আমাকে ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। * * মূল কথা, আমি আলাপ-পরিচয়ে জানিলাম, অতি মহৎ, সদাশয় পুরুষ ! কথায় কথায় বলিলেন, 'আমার এ বাড়িতে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। অনুগ্রহ করে' আমায় যদি একটা বাসা ঠিক করিয়া দেন, বড় বাধিত হই।' তৎপরদিন ৮টার সময়ে আমি নিজের গাড়ি করিয়া তাঁহার কাছে গেলাম এবং বলিলাম—চলুন, বাড়ি ঠিক করিয়া দিই। গোলবাগিচার পুলিশ 'আউট পোষ্ট' এর নিকটবর্ত্তী প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ি তাঁহাকে দেখাইতে লইয়া গেলাম, বাড়িটা দেখিবামাত্র তাঁহার পছন্দ হইল। উক্ত বাড়ি হইতে প্রকৃতির শোভা বড়ই সুন্দর দেখা যায়। দ্বিতলের একটি কক্ষ হইতে সম্মুখেই রামশিলার পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্য। তিনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের বাসা পরিত্যাগ করিয়া এই বাড়িতে উঠিয়া আসিলেন এবং ঐ দ্বিতল ঘরটি তাঁহার পাঠাগার নির্দ্দিষ্ট হইল। এইখানে বসিয়াই তিনি 'দুর্গাদাস' * ও 'নুরজাহান' গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।"

পরিণামে গয়া-প্রবাস দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাস্থ্যের পক্ষে অন্য এক কারণে অত্যন্ত অনিষ্টকর হইলেও, এখানে আসিয়া তদীয় গুণমুগ্ধ বন্ধু, অসাধারণ বিদ্বান্, জেলা-জজ, মনস্বী লোকেন্দ্র পালিত মহাশয়ের প্রাত্যহিক ঘনিষ্ঠ সহবাসে তৎকালে সেই অবসন্ন ও বিষণ্ণ-মনের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল। ৺গয়া হইতে লিখিত তাঁহার তৃতীয় পত্রে আমরা জানিতে পাই,—

* 'দুর্গাদাস' পূর্ব্বেই প্রেসে গিয়াছিল। সুতরাং নন্দবাবুর এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তবে অংশত 'মেবার পতন' ও সম্পূর্ণভাবে 'নুরজাহান' নাটকখানি এইখানেই রচিত হয় বটে।—গ্রন্থকার।

"* * এখানে সাহিত্যিক-মণ্ডলীর পরিধি বড়ই অল্প। এক লোকেন পালিত। তবে সে একাই এক শ'। অন্য বাঙ্গালীদের মধ্যে কেহই বড় একটা বাঙ্গলা বই পড়েন নি। খুল্‌নায়ও অনেক লোক পেয়েছিলাম, যাঁরা বাঙ্গলা রীতিমত পড়েন। এখানে বাঙ্গালী Officers, Pleaders (কর্ম্মচারী, উকীল) ইত্যাদি আছেন ঢের ; কিন্তু বাঙ্গালী হয়েও তাঁরা বাঙ্গলা পড়েন না।

* * অগত্যা মাঝে মাঝে লোকেনের বাড়ি গিয়ে তর্ক করি, লোকেনের সংস্কারগুলি একটু অদ্ভুত ধরণের। কিন্তু কি অগাধ পাণ্ডিত্য! এক একটা তর্কে কতই যে জ্ঞান লাভ করি, শিক্ষা করি তা বলে শেষ করা যায় না।"

গয়ায় যাওয়ার কয়েক দিন পরে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত ৺প্রিয়নাথ সেন ও তাঁহার পুত্র ৺কবি মন্মথনাথ সেখানে গিয়া কিছু দিন দ্বিজেন্দ্রলালের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে প্রিয়বাবু ও পালিত 'সাহেব'—এই দুই মহাপণ্ডিতের মিলনে দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহস্থ সাহিত্যিক 'মজ্‌লিশ'টা কিছু দিন বেশ 'সর্‌গরম' হইয়া ওঠে। কিন্তু, স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ের জন্য সেখানে গিয়াও প্রিয়বাবু আপন অপটু শরীরের কথা ভুলিয়া, বুদ্ধির দোষে হঠাৎ এমন-একটি অকর্ম্ম করিয়া ফেলিলেন, যাহার ফলে অচিরেই তাঁহাকে আরও অধিকতর অসুস্থ হইয়া, কলিকাতায় পলাইয়া আসিতে হইল। এবিষয়ে ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শী নন্দবাবু জানাইতেছেন,—

"তিনি (দ্বিজেন্দ্রলাল) তখন গয়ার In-charge Magistrate (ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্)। কোলি সাহেব বিদায় লওয়ায় তাঁহার স্থলে কার্য্য চালাইতেছেন। পূজার ছুটি উপলক্ষে সেবার দ্বিজেন্দ্রলালের বহু বন্ধুবান্ধব গয়ায় আসিয়াছিলেন। 'দাদামহাশয়' প্রসাদদাস গোঁসাই, গিরিশ শর্ম্মা, প্রিয়নাথ সেন ও তাঁহার পুত্র মন্মথ সেন, রসময় লাহা প্রভৃতি মহাশয়গণ এসময়ে গয়ায় আসিয়া হাজির হন। প্রিয় সেন মহাশয় কেবলই বলিতেন,—'কৈ নন্দবাবু, গয়ায় পাখী তো কৈ কিছুই খাওয়াইলেন না!" তদুত্তরে একদিন আমি বলিলাম—"এখানে এক রকম পাখী পাওয়া যায়, তার নাম 'ওয়াক্'।

তা কি আপনি খাবেন?” তিনি বলিলেন—‘বেশ তো! আনুনই না। খাই না খাই দেখেই নেবেন।” অতঃপর আমি কতকগুলি ‘ওয়াক্’ পাখী আনাইয়া পাঠাইয়া দিলাম। সরকারী দাদামহাশয় খুব পরিপাটির সঙ্গে তাহা রন্ধন করিলেন এবং প্রিয়বাবু প্রাণ ভরিয়া তদ্দ্বারা উদর পূর্ণ করিলেন। কিন্তু ইহার পরিণাম বড় সুবিধাজনক হইল না। ‘ওয়াক্’ খাইয়া পরদিন প্রায় সকলেই ‘ওয়াক্’ ‘ওয়াক্’ শব্দে উদ্বমন করিতে লাগিলেন এবং প্রিয়বাবু তাহাতে এমন অসুস্থ হইলেন যে সত্বরই তাঁহাকে লইয়া মন্মথবাবু কলিকাতায় পলাইয়া পরিত্রাণ পাইলেন।”

প্রিয়বাবু এইরূপে অল্প দিনের মধ্যে চলিয়া-আসায় দ্বিজেন্দ্রলাল আক্ষেপ করিতেছেন,—

“প্রিয়বাবু ও মন্মথ চলে’ গেলেন, তাদের শরীর এখানে সার্‌ল না। অত অনিয়ম * * কর্‌লে কখনও শরীর সারে? * * তিনি চলে যাওয়ায় আমাদের সাহিত্যালোচনা, বিচার-বিতর্কের বড় ক্ষতি হ’ল। লোকটা গ্রন্থকীট,—সারাজীবন কি পড়াই পড়্‌ছেন,—বই নিয়েই আছেন আর কি! ধার করে’ বই কেনা, এক আজকাল এই প্রিয়বাবু ছাড়া আর কারো সম্বন্ধে শুনতে পাও? আধুনিক কালের বিশ্ব-সাহিত্য সম্বন্ধে লোকটি একটা Mine of information (‘খবরের খনিবিশেষ’)। এত শীঘ্র তাঁকে ছাড়্‌তে হবে ভাবিনি। বড় অভাব বোধ কচ্ছি।”

অতঃপর, কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে, পর বৎসর (অর্থাৎ ’০৭ সনের জুন মাসে,) গয়াতে ভারত-গৌরব, বিজ্ঞানাচার্য্য সার জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্ব পরিচয়টা একটু ঘনিষ্ঠ হইয়া-ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিবিধ সঙ্গীত ও রচনাবলী বসু মহাশয়কে বড় আনন্দ দান করে; এবং বোধকরি—এই সময় হইতেই তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ ক্ষমতার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধান্বিত হন। এ বিষয়ে ক্ষণ-জন্মা জগদীশচন্দ্র অতি-সংক্ষেপে আমাকে এইটুকুমাত্র লিখিয়া-পাঠাইয়াছেন,—

‘আমার দেশ’ প্রভৃতি সঙ্গীতের জন্ম-কথা।

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার গয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁহার কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা, সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে ভাষার করুণ ধ্বনিতে মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিলেন, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য্য ও মরণের আলিঙ্গন-ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।

"ধরণী এক্ষণে দুর্ব্বলের ভার-বহনে প্রপীড়িতা, রুদ্র সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে বীর্য্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম্ম নাই। কে মরণ-সিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে? ধর্ম্ম-যুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্র-ধ্বনিতে ঘোষণা করিতেছেন।"

তৎকালে, ২৫'এ জুন তারিখের পত্রে দ্বিজেন্দ্রলালও আমায় জানাইতেছেন,—এই বিষয়ে আমি পরে দ্বিজেন্দ্রলালের নিজ মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা এই,—কথা প্রসঙ্গে সে দিন দ্বিজেন্দ্রলালের কয়েকটি গান শুনিয়া জগদীশবাবু বলেন,—

"আপনি রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির অনুপম চরিত-গাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহারা, বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙ্গালীকে দেখাইতে হইবে—যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্ম-শক্তিতে আস্থাবান্ হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাঙ্গলাদেশের আব্‌হাওয়ায় জন্মিয়া, আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া-উঠিয়া, সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন,—যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন ত' একবার সেই আদর্শ এ বাঙ্গালী জাতিকে দেখাইয়া, আবার তাহাদিগকে জীয়াইয়া, মাতাইয়া তুলুন।"

বলা বাহুল্য—মাতৃভূমির সুসন্তান, দেশ-ভক্ত জগদীশচন্দ্রের এই অমূল্য উপদেশ কবির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া তখন এক অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন উপস্থিত করিল; এবং কিয়দ্দিন পরে তাহারই

ফলে, মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল সেই দেশাত্মবোধের মহান্ সঙ্গীত—'আমার দেশ' রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রকৃতই সমৃদ্ধ ও উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

এই স্মরণীয় ঘটনার মাস তিনেক পরে, পূজার সময়ে, আমি সেবারে গয়ায় গিয়া কিছুকাল আমার সুহৃত্তমের অতিথি হইয়াছিলাম। সে সময়ে এই অযোগ্য লেখক সর্ব্বদা তাঁহার সহিত একত্র বসবাস করিবার অবসর পাইয়াছিল। এক দিন—বোধ হয় অষ্টমী পূজার দিন—দুপুর বেলায় আহারান্তে দু' জনে 'চুপচাপ্' বসিয়া-আছি, কবিবর হঠাৎ বলিয়া-উঠিলেন—'দেখ, আমার মাথার মধ্যে একটা গানের কয়েকটা লাইন আসিয়া ভারি জ্বালাতন করিতেছে। তুমি একটু বোসো ভাই,—আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি।' অর্দ্ধ ঘণ্টা বা তাহারও কিছু অধিক কাল একাকী বসিয়া-রহিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন দূর হইতে হাত-তালি দিয়া, 'গুণ্-গুণ্' করিয়া গাইতে-গাইতে, আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং আমাকে সজোরে একটা 'ধাক্কা' দিয়া কহিলেন,—'উঃ, কি চমৎকার গানই লিখেছি! শুন্‌বে?—শুন্‌বে নাকি? আচ্ছা, তবে শোন।' এই বলিয়া গাহিয়া-উঠিলেন,—

'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ!'
—ইত্যাদি।

শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। তখন, বলিতে লজ্জা হয়,—পাষণ্ড আমি, আমারও চোখে জল আসিয়াছিল। নীরবে, নত শিরে, স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তখন কি-যেন একটা অপার্থিব অনুভূতির আবেগে,—আনন্দে, উৎসাহে, গৌরবে ক্ষণকালের জন্য যেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া-পড়িয়াছিলাম। গান শেষ করিয়া বন্ধু বলিলেন,—'কি? কেমন?' আমি বলিলাম—'ধন্য আপনি!' বাল-স্বভাব দ্বিজেন্দ্রলাল একবার—শুধু একবার আমার মুখের

দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। পরে, আর কিছু না বলিয়া, হাত তালি দিতে-দিতে, সারাটা ঘরময় ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, নাচিয়া-নাচিয়া, আবার গাহিতে-লাগিলেন,—

'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ ?
সপ্ত কোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ !'

সে রাতে যথারীতি বন্ধু-বৎসল লোকেন্দ্র পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের আবাসে আসিয়া, এই বজ্র-গর্ভ গানটি শুনিয়া উল্লাস ও উৎসাহে ঠিক-যেন প্রমত্ত হইয়া-উঠিলেন। পালিত সাহেব গান গাইতে পারেন না, তাল-বোধও তথৈবচ ; তথাপি, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় লাফাইয়া-উঠিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে, তাঁর পিছনে-পিছনে সতেজে সে কক্ষময় পাদ-ক্ষেপ করিয়া-বেড়াইলেন, এবং সঙ্গীতের ভাবানুযায়ী দ্বিজেন্দ্রলালের অনুকরণে নানাবিধ অঙ্গ-ভঙ্গি করিতে-লাগিলেন। 'আমার দেশ' গানটি শুনিয়া, প্রৌঢ় পালিত সাহেবের সেই-যে অপূর্ব্ব উন্মাদনা দেখিয়াছি, এজীবনে তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিবনা।

এই সঙ্গীত-রচনার পরদিবস প্রাতে, রাজ-কার্য্যোপলক্ষে জেলা-জজ, সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সহসা আসিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের অতিথি·হইলেন। সেদিনও সন্ধ্যার সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের অনুরোধে, দাঁড়াইয়া-উঠিয়া, সেই জলদ-গম্ভীর স্বরে, তেমনই দর্পিত ভাব-বিন্যাস সহকারে, আবার সে গানটি আমাদিগকে গাহিয়া শুনাইলেন। স্বদেশ-প্রাণ শ্রোতৃদ্বয় তাহা শুনিয়া, বিস্ময়ে, আনন্দে, অপূর্ব্ব-গর্ব্বে ও অকৃত্রিম দেশ-ভক্তিতে যথার্থই একেবারে স্তব্ধ ও অভিভূত হইয়া গেলেন। গান শেষ হইয়া গেল ; তবু, বহুক্ষণ তাঁহাদের কাহারও কোন বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না,—তাঁহারা উভয়েই সম্মুখস্থ, মুক্ত গবাক্ষ-পথে সেই নীলাভ-ধূসর, অনন্ত অম্বর পানে একদৃষ্টে চাহিয়া-রহিলেন। কতক্ষণ এভাবে কাটিল, বলিতে পারি

না ; শেষে সহসা উন্মত্ত উৎসাহে পালিত মহাশয় কবির করদ্বয় উভয় হস্তে সবেগে মর্দ্দন করিতে-করিতে কহিলেন,—

"Oh! how wonderful—how magnificent! Let me confess, my dear Dwiju, it's undoubtedly the very—very—very best and noblest national song that I've ever heard or read in my life. It's indeed a Divine inspiration!"

এই উচ্ছ্বসিত, অযাচিত প্রশংসার প্রত্যুত্তরচ্ছলে দ্বিজেন্দ্রলাল হাসিতে গিয়া, অকস্মাৎ মুখখানা দু'হাতে ঢাকিয়া-ফেলিলেন। তখন তাঁহার এই বিহ্বলতা দেখিয়া, কবি বরদাচরণ কোন কথা না বলিয়া, দ্বিজেন্দ্রলালকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়া, পার্শ্বস্থ আসনে বসাইয়া-দিলেন। গানটা রচনার সময়েই যে মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাতে তাঁহার সারাটা হৃদয় ঢালিয়া-দিয়াছিলেন শুধু তাহা নহে,—গাইবার কালেও ইহাতে তাঁহার মনঃপ্রাণ একান্তে নিমজ্জিত করিয়া-দিতেন, এবং অদম্য ভাবাবেগে তিনি তখন প্রকৃতই তন্ময় ও আত্মহারা হইয়া-যাইতেন। এই একাগ্র উত্তেজনা ও তন্ময় ঐকান্তিকতা, দেশের দিক্ দিয়া যতই-কেন কল্যাণ-প্রসূ হোক্ না, তাঁহার নিজের পক্ষে পরিণামে ইহা যে সর্ব্বনাশকর, সমূহ অনর্থের সূত্রপাত করিয়াছিল,—পাঠক তাহা ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক 'নূরজাহান' সম্পূর্ণ করিয়া 'মেবার-পতনের' সংক্ষিপ্ত-সার (Synopsis) প্রস্তুত করিতে-ছিলেন। নাটকের দৃশ্যাদি-বিভাগ করার সঙ্গে-সঙ্গে, তাঁহার মনে যখন যে ভাবের প্রাবল্য অনুভূত হইত, অবস্থানুসারে সময়ে-সময়ে তিনি (মূল নাটক লেখার পূর্ব্বেই) সে-সকল ভাব একটি গানে সন্নিবদ্ধ করিয়া-রাখিতেন। ইহা চিরদিন তাঁহার নাটকীয় সঙ্গীত-রচনার একটা 'বাঁধা-ধরা' নিয়ম ছিল। মেবারের গৌরব-ভাস্কর

যখন ভারতাকাশে প্রদীপ্ত, মুসলমানসম্রাট্ জাহাঙ্গীর যখন সে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ-তাপে প্রপীড়িত ও ম্রিয়মাণ, রাজপুত-শৌর্য্যের সেই চরম সৌভাগ্যের দিনে, মেবারের মহিমা ও স্মৃতিতে প্রবুদ্ধ হইয়া, কবি

'মেবার পাহাড় শিখরে যাহার রক্তপতাকা উচ্চ-শির'—

ইত্যাদি যে গানটি লেখেন, আমি তখন তাঁহার পার্শ্বেই উপবিষ্ট ছিলাম। দু'এক ছত্র লিখিতেছেন, আর আপন মনে তাহা নিজেকেই নিজে আবৃত্তি করিয়া-শুনাইতেছেন,—এমনি ভাবে সে গানটা লিখিতে ঘণ্টাখানেক কি হয় ত তাহারও কিছু-বেশি সময় লাগিল। গানটি আদ্যন্ত গ্রথিত হইলে, কোন্ সুর ইহার ঠিক ভাবানুগ ও 'লাগ্‌সৈ' হইবে, তাহা লইয়া অনেকক্ষণ ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-তামাসা, চেষ্টা ও চিন্তার পর, ইংরাজী-ভাঙ্গা এখনকার-এই সুরটি কতক পরিমাণে মনঃপূত হওয়ায় তাহাই অগত্যা নির্দ্দিষ্ট হইল। অতঃপর, দেশের যথার্থ অবস্থার সহিত মিলাইয়া, আমি 'মেবারের পতন' সম্পর্কেও আর-একটা যোগ্য গান তখনই তাঁহাকে রচনা করিতে বলিলাম। তদনুসারে, সেদিন কাছারী হইতে বাসায় ফিরিয়া, কক্ষ-কপাট রুদ্ধ করিয়া লিখিলেন,—

'ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপনের ঘোর,
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার!
এ মহা শ্মশানে, ভগ্ন পরাণে,
আজি মা কি গান গাহিব আর?'

—ইত্যাদি।

সুর-সংযোগে দুইটি গানই তখন গাহিয়া-শুনাইলেন। হায়! —আর এ জীবনে সে কণ্ঠ শুনিতে পাইব না! বুঝি—তেমন গানও আর এ দেশে রচিত হইবে না!

৺লোকেন্দ্র পালিত মহাশয় তৎকালে গয়ায় জজিয়তি করিতেন।

মধ্যমশ্রেণীর উচ্চ-পদবীস্থ রাজ-পুরুষেরা দৈনিক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া স্থানীয় ক্লাবে প্রতি সন্ধ্যায় সমবেত হইতেন। কিন্তু, পালিত-'সাহেব', তাঁহাদের একান্ত আগ্রহ সত্ত্বেও, সেখানে না গিয়া, কাছারীর পর, দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গ-সুখ সম্ভোগের জন্য, ঠিক সন্ধ্যা হইলেই তাঁহার কাছে আসিয়া হাজির হইতেন। পালিত সাহেব বিলাতি মেম বিবাহ করিয়াছিলেন। একদিন সেই সাধ্বী ইংরাজ-মহিলা স্বামীর উক্তবিধ অসামাজিক আচরণে একটু-যেন বিমর্ষ ও বিরক্ত হইয়া, দ্বিজেন্দ্রলালকে আসিয়া অভিযোগের কণ্ঠে বলিলেন,—

৺মিষ্টার লোকেন পালিতের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও সাহিত্য-চর্চ্চা।

"আপনি তো কিছু বলেন না, বুঝিয়াও যে বুঝেন না; কিন্তু, মিষ্টার পালিত এই-যে একদিনও ক্লাবে না গিয়া, কেবল আপনারই কাছে আসিয়া পড়িয়া-থাকেন, ইহাতে সকলে যে উহাঁকে অহঙ্কারী ও অসামাজিক বলিয়া মনে করে, এ বিষয়ে কি কোন প্রতিকার করা উচিত নহে?"

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সরলা, গুণময়ী বন্ধু-পত্নীর এবংবিধ অভিযোগ শুনিয়া, পালিত সাহেবকে সে দিন সন্ধ্যাকালে বিশেষভাবে সকল কথা বুঝাইয়া-বলিলেন, এবং মধ্যে-মধ্যে এক-একদিন ক্লাবে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আজ অকারণ অকস্মাৎ দ্বিজেন্দ্রলালকে এইরূপ অনুরোধ করিতে দেখিয়া, হাসিতে-হাসিতে পালিত বলিলেন—

"আমি দেখ্‌ছি, তোমরা আমার বিপক্ষে এ একটা ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র করেছ। আমার সেই 'দুষ্টু' (naughty) স্ত্রীটি নিশ্চয়ই তোমাকে আসিয়া এই-সব জানাইয়া-গিয়াছেন,—কেমন, ঠিক কিনা? কিন্তু, কেন যে আমি ক্লাবে যাই না, কারণ শুন্‌বে? সেখানে যতগুলি ইংরাজের দল নিয়ত জমায়েৎ হন তাঁদের না আছে বিদ্যা, না আছে তেমন সদ্‌বুদ্ধি, না আছে সারল্য, না আছে হৃদয়। কেবল এক-একটা যেন প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড অহঙ্কারের শূন্যগর্ভ, ফাঁপা

উই-ঢিবি! সেখানে গিয়ে, শুধু যত-রাজ্যের বাজে কথা কও, অসার ও ফিঁকে রসিকতা কর; আর, তা না হয় ত' তাস বা বিলিয়ার্ড খেল। এই-সব দলে মিশে' শুধু-শুধু আমি যদি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে না করি ত' তাতেই কি আমার যত অপরাধ হ'ল? মাসে মাসে, বরাত দোষে, ২।৪ বার করে' যে তাঁদের পেট-পূর্ত্তি করি, সেই ঢের; আর, তার বেশি আমার তাঁদের কাছে 'সামাজিক' হ'য়েও কাজ নেই। তোমার দশ ভাগের এক ভাগ বিদ্যা বা যোগ্যতাও যদি তাঁদের মধ্যে এক জনের থাক্‌ত, আমি তাঁকে নিয়ে দিনরাত মাথায় করে' রাখ্‌তে পারতুম। কিছুই খবর রাখ না, শুধু শুধু আমার দোষ দিলেই হ'ল?"

পালিত মহাশয় যখন এ কথাগুলি বলেন, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। যাহাহৌক্, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের বাসায় আসিয়া, সেই পাঠাগারে বা বসিবার ঘরে গিয়া বসিতেন; আর, পুস্তক-পাঠ, আবৃত্তি, সাহিত্যিক বিতর্ক-বিচারে ঘন্টার পর ঘন্টা যে কোথায় দিয়া বহিয়া-যাইত তাহা দু'জনের একজনও বুঝিতে-পারিতেন না। অবশেষে, কক্ষস্থ নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখার অশিষ্ট দুর্ব্ব্যবহারে, অতি-গম্ভীর নিশীথে (কোন-কোন দিন বা শেষ রাত্রে) সেই সাহিত্য-বৈঠক বাধ্য হইয়াই ভাঙ্গিয়া-যাইত।

সাহিত্যানুরাগ ও অধ্যয়ন-স্পৃহা।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যানুরাগ ও অধ্যয়ন-স্পৃহা যে কিরূপ প্রগাঢ় ও প্রবল ছিল, নিম্নোক্ত এই-একটা ঘটনা হইতে পাঠক তাহা কতকটা জানিতে পারিবেন। একদিন সন্ধ্যার সময়ে পালিত মহাশয় আসিয়া হাজির হইলে, তাড়াতাড়ি দ্বিজেন্দ্রলাল যৎসামান্য, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া-লইয়া, তাঁহার কাছে আসিয়া, চেয়ার টানিয়া-নিয়া বসিলেন; এবং তাঁহাদের নিয়মিত সাহিত্যালোচনা আরম্ভ হইল। দেখিলাম,—ঘন্টার পর ঘন্টা বহিয়া-যায়,—দু'জনের এক জনেরও সেদিকে কোন

লক্ষ্য নাই,—বিচার-বিতর্ক, পাঠ ও আবৃত্তি অতি তুমুলবেগে চলিয়াছে। এইভাবে, রাত যখন-প্রায় সাড়ে-বারোটা আমি আর সেখানে অপেক্ষা করিতে অশক্ত হইয়া, নীরবে আসিয়া শয্যা-গ্রহণ করিলাম। কতক্ষণ নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলাম, জানি না; হঠাৎ, একটা কোলাহলের মধ্যে জাগ্রত হইয়া, বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া-আসিয়া দেখি, রাত্রি তখন প্রায় ২॥'টা উত্তীর্ণ হইয়া-গিয়াছে;—দ্বিজেন্দ্রলাল তখনও সেই সমভাবেই, উচ্চ কণ্ঠে বায়রণ হইতে আবৃত্তি করিয়া-যাইতেছেন; আর, পালিত-সাহেব তাঁহাকে মধ্যে-মধ্যে বিশ্রামের অবকাশ দিয়া, শেলী হইতে পড়িয়া-পড়িয়া শুনাইতেছেন! এম্‌নই করিয়া, কেবল দু'এক রাত্রি নহে,—প্রত্যহ প্রতি রাত্রে এই পুরুষশ্রেষ্ঠ অবিমিশ্র সদালাপ, সৎচিন্তা ও সৎকর্ম্মে তাঁহার জ্ঞান-গর্ভ, দিব্য-পূত জীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য—মৃত্যু-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তদীয় প্রকৃতিগত এবংবিধ স্ব-ধর্ম্মের আমরা অণুমাত্রও কোন ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখি নাই।

এ সময়ে সুহৃত্তমের লিখিত পত্রগুলির মধ্যে এমন প্রায় একখানিও নাই—যাহাতে পালিত সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু একটু উল্লেখ না আছে। শ্রেষ্ঠ নাট্য-সাহিত্যের স্বরূপ বা লক্ষণ সম্বন্ধে, পালিতের সংশ্রবে আসিয়া, দ্বিজেন্দ্রলালের ধারণা ও চিন্তার মূল ধারাটা এখন হইতে রূপান্তরিত হইয়া, পৃথক্ ভাবে, সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল। ফলে, আমরা দেখিতে পাই, —গয়ায় আসিবার পূর্ব্বে তদীয় 'প্রতাপসিংহ,' 'দুর্গাদাস,' 'পাষাণী' প্রভৃতি নাটক যে-আদর্শে রচিত হইয়াছিল, গয়ায় থাকিতে ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে লিখিত, অন্য নাটকগুলি তাহা হইতে সম্যক্ পৃথক্‌রূপে, অন্য আদর্শে কল্পিত ও বিরচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে মহান্, উচ্চাদর্শ-সৃষ্টির দিকে দ্বিজেন্দ্রলালের মনের একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা ও প্রবণতা ছিল। কিন্তু, পালিত মহাশয় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

নাট্যকারগণের 'নজীর' দেখাইয়া, তাঁহাকে বুঝাইয়া-দিলেন যে, কেবল মহৎ ভাব-প্রচার বা 'নিখুঁৎ' চরিত্রাঙ্কনই উচ্চাঙ্গের নাট্য-সাহিত্যের লক্ষণ নহে ; পরন্তু, সর্ব্ব বিষয়ে সূক্ষ্ম অভিনিবেশ ও মানবমনের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রভৃতি প্রদর্শনেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সমধিক কৃতিত্ব প্রতিপন্ন হয়। বহুকাল যাবৎ গয়ায় মনস্বী পালিত মহাশয়ের সহিত অবিরাম ভাব-বিনিময় ও একান্ত ঘনিষ্ঠতার ফলে, পরিণামে দ্বিজেন্দ্রলাল এ সম্বন্ধে সর্ব্বথা তাঁহারই মতাবলম্বী হন ; এবং প্রত্যুতঃ, তদবধি তিনি পালিত-প্রদর্শিত পন্থাবলম্বনে তদীয় সর্ব্ববাদিসম্মত, শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি (অর্থাৎ—'নূরজাহান,' 'সাজাহান,' 'পরপারে', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি) রচনা করিয়া, পরমারাধ্যা মাতৃভাষাকে এ বিশ্বের অবিনশ্বর সাহিত্য-সম্পদের সমকক্ষ ও তুল্য-মূল্য করিয়া-তুলিতে যত্নবান্ হইলেন।

৺লোকেন্দ্র পালিত মহাশয়ের সাহিত্য-রসগ্রাহিতা ও পাণ্ডিত্যের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল কতখানি আস্থাবান্ ছিলেন, প্রসঙ্গতঃ এস্থলে তাহার একটু উল্লেখ করা আবশ্যক। গয়া হইতে লিখিত পত্রাবলীর ভিতর হইতে এখানে মাত্র একখানি পত্রের অল্প একটু অংশ উদ্ধৃত করিয়া-দিব। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন,*—

"লোকেনের কাব্য বোঝারও আশ্চর্য্য—অসীম ক্ষমতা! Byron অনায়াসে বুঝ্‌তে পারেন। Shelley প্রভৃতি ত জলের মতই বোঝেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন Byron আর Shelley নিয়ে ঘোর তর্ক হ'ল। আমি Manfred পড়্‌তে লাগ্‌লাম। তিনি না তাই খানিকটা শুনে' চেয়ার থেকে হঠাৎ উৎসাহে লাফিয়ে উঠে' বল্‌লেন—"Oh, maddening! আর না,—আর না,—আর প'ড়ো না। আমায় ভাব্‌তে দাও।" এই বলে, গম্ভীর ভাবে প্রায় এক 'কোয়ার্টার' কাল মগ্ন হ'য়ে রইলেন। কি সমজ্‌দার লোক! এঁরাও মানুষ, আমরাও মানুষ। বাঙ্গালী তিন লাইন 'মন্দ মন্দ গন্ধবহ' লিখেই অস্থির ; ভাবে 'কি কবিই হনু'!

---

*গয়া,—১৪।৬।০৭।

হয়ত ক্ষীণজীবী হতভাগা বাঙ্গালীর পক্ষে তাই যথেষ্ট। কিন্তু জগতের কাব্য-সাহিত্যে তা স্থান পাবার যোগ্য হতে পারে না। ভাল লিখ্‌তে হ'লে নির্ব্বিকার প্রসন্ন মনে তার জন্য একান্ত সাধনা চাই, রীতিমত শিক্ষালাভ দরকার, যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জ্জন করা আবশ্যক। Shelley, Byron, Keats, Shakespeare, আমাদের বৈষ্ণব কবিরা, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, Hugo,—এই সব বড় বড় কবির লেখা একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে না পড়্‌লে, বড় কবি এখন কেবল আর 'ফুস্‌ মন্তরের চোটে' হওয়া যায় না। সেই সব Force of diction, force of thought, ideas, দেখে', পড়ে', ভেবে', শেখা—আয়ত্ত করা দরকার। * * হয়ত ৪টি ঘণ্টায় কুড়িটি লাইনের অধিক লিখ্‌তে পার্‌বে না, কিন্তু সে শ্রম নিশ্চয়ই সফল, সার্থক হবে। হায়—তোমাদের মত যদি আমার সময় থাক্‌ত!"

পাঠক, এই কয় ছত্র পড়িয়া একবার ভাবিয়া-দেখুন—সাহিত্য-সেবা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের কি অপরিসীম সাধনা ও অধ্যবসায়ের ব্যাপার ছিল। এমন আন্তরিক নিষ্ঠা ও অচপল চেষ্টা না থাকিলে কি আর দ্বিজেন্দ্রলাল—দ্বিজেন্দ্রলাল হইতে পারিতেন! এমন একাগ্র সাধনা বা অধ্যবসায়ের শক্তি,—সেও যে পরম সুকৃতির ফল!

বিদ্যা ও জ্ঞানের ব্যাপকতা।

তাঁহার গভীর জ্ঞান ও বিদ্যা শুধু যে সুকুমার সাহিত্য ও ললিত কলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে।—দর্শন, বিজ্ঞান, অঙ্ক ও সঙ্গীত-শাস্ত্রেও তাঁহার অভিজ্ঞতা ও অভিনিবেশ ছিল। বিস্তৃতরূপে এসব কথার যথোচিত পরিচয় দিতে-হইলে বিভিন্ন-রুচি পাঠকবর্গের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিতে পারে। কাজেই, এখানে কেবল দু'একটা দৃষ্টান্ত দিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। গয়ার পূর্ব্বোক্ত নন্দবাবু জানাইতেছেন,—

"একদিন দেখিলাম, ভূতপূর্ব্ব 'ষ্টেটস্‌ম্যান্‌' পত্রের বিখ্যাত সম্পাদক রেট্‌ক্লিফ সাহেব, জেলার জজ আমাদের পালিত সাহেব, ও দ্বিজুবাবু, হঠযোগ ও রাজযোগ সম্বন্ধে ভয়ানক তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন। অনেকক্ষণ তর্কের পরও মিঃ পালিত কোন কিছু মীমাংসা করিয়া Ratcliff সাহেবকে বুঝাইতে না

পারিয়া, দ্বিজেন্দ্রবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। দ্বিজুবাবু তখন এমন সরলভাবে তাঁহাদিগকে এই-সব অতি কঠিন ও জটিল বিষয় বুঝাইয়া দিলেন যে, আমরা উপস্থিত সকলেই অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি যে কেবল বড় কবি ও নাট্যকার ছিলেন তাহা নহে, সকল বিষয়েই তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল।"

আর একদিনের কথা নন্দবাবু লিখিতেছেন,—

"সন্ধ্যার সময়ে গিয়া শুনিলাম, হনুমান্ দাসের গান ও ভেলু বাবুর (যোগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর) এস্‌রাজ বাজ্‌না হইবে। যথাসময়ে খুব গান বাজ্‌না হইল। কিছুকাল পরে, সব শেষে কথা-প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠিল—'হাম্বির' রাগিণীর কোথা হইতে উৎপত্তি হইল, উহার কি রূপ?—ইত্যাদি। গায়ক প্রভৃতিরা কেহ এই প্রশ্নের কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না, এমন কি—স্বয়ং ওস্তাদজী অবধি উত্তর দিতে 'হিম্‌সিম্' খাইয়া গেলেন। কিন্তু দ্বিজুবাবু এমন সহজে ও পরিষ্কারভাবে তাঁহাদের সকলকে এই সব রহস্য বুঝাইয়া দিলেন যে, সকলেই মোহিত ও আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। আমরা এইরূপে সেদিনও জানিলাম—লোকটি কি শক্তিশালী ও সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী।"

এ প্রসঙ্গে আর-একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। গয়া হইতে চলিয়া-আসার কয়েক বৎসর পর, একদিন কলিকাতায় (তাঁহার নন্দকুমার চৌধুরীর লেনের নূতন বাড়ি) 'সুরধামে' গিয়া দেখি—বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় বেদবিদ্ পণ্ডিত, আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ও দ্বিজেন্দ্রলাল—ইহাঁরা দু'জনে বসিয়া বৈদিক যুগের আচার-পদ্ধতি ও সমাজ-বিন্যাসাদি বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। প্রায় এক প্রহর ধরিয়া এইভাবে তাঁহাদের আলাপালোচনা চলিল। কিন্তু, আশ্চর্য্য এই দেখিলাম যে, আজীবন বেদ-বিদ্যার অনুশীলন করিয়াও সামশ্রমী মহাশয় যে-সকল অবস্থা ও তথ্যাদির সম্বন্ধে তেমন-কোন লক্ষ্য বা খোঁজ রাখেন নাই, বন্ধুবর অনায়াসে প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় সেই-সব অপূর্ব্ব সংবাদ তাঁহাকে শুনাইতে-লাগিলেন; এবং গুণগ্রাহী পণ্ডিতমহাশয়ও তাঁহার এই

অসাধারণ সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া, বহুবার তাঁহাকে 'সাধু সাধু,' 'ধন্য ধন্য' বলিয়া অকপটে প্রশংসা করিলেন। এইরকম আরও কত সময়ে কত ঘটনাতেই যে আমরা তাঁহার বিচিত্র জ্ঞান ও বহুল অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়াছি, আজ কি তাহা এভাবে,—এত সহজে বলিয়া শেষ করা যায়?

'দুর্গাদাস', 'নূরজাহান' ও 'আলেখ্য'-গ্রন্থ।

গয়ায় থাকিতে তাঁহার 'দুর্গাদাস' ও 'নূরজাহান' নাটকদ্বয় এবং 'আলেখ্য' কাব্যখানি সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। 'দুর্গাদাস' ছাপাইতে 'সুরু' করিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল যখন 'নূরজাহান' রচনার সঙ্গে-সঙ্গে 'মেবার-পতনে'র Synopsis (সংক্ষিপ্ত-সার) প্রস্তুত করিতেছিলেন তখনই আমি গয়ায় গিয়া কিছুদিন তাঁহার সহিত একত্র ছিলাম।

সঙ্গীতানুরাগ।

গয়ায় প্রায়ই তাঁহার বাসায় নানারূপ গীত-বাদ্যের 'মজ্‌লিশ' বসিত। তখনও সেখানে সঙ্গীত-শাস্ত্রে গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির অভাব ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহে এই-সব সুগায়ক ও বাদকবৃন্দ মিলিত হইয়া, মুহুর্ম্মুহু সুর-সঙ্গীতের হর্ষ-হিল্লোলে যখন সেই স্তব্ধ-শ্রান্ত নৈশ গগনে রোমাঞ্চ-সঞ্চার করিতেন তখন আহূত অভ্যাগতগণের অন্তরে আনন্দের অবধি থাকিত না। আমার তথায় অবস্থানকালে ক্রমান্বয়ে এইরূপ দুইটি গানের বৈঠক বসিয়াছিল। এক রাত্রির বিবরণ এখানে বলিলেই যথেষ্ট হইবে। সে 'মজ্‌লিশে' লোকেন্দ্রনাথ ও বরদাচরণ—এই দুই জেলা-জজ, নন্দবাবু, ডাক্তার ৺চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উকীল উপেন্দ্রবাবু প্রভৃতি 'বাছা-বাছা' কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত-নিপুণ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও হনুমান্ দাসজী শাস্ত্র-সম্মত কয়েকটি রাগ-রাগিণীর আলাপ করিলে, হনুমান্ দাসের যোগ্য পুত্র 'শনিং'এর হার্ম্মনিয়ম বাজনা আরম্ভ হইল। ইতিপূর্ব্বে বহুবার দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে ইহাঁর বাদন-দক্ষতার 'বহুৎ'

সুখ্যাতি শুনিয়াছিলাম,—আজ এতদিনে চক্ষু-কর্ণের সেই কলহ-ভঞ্জন হইল। 'শনিং' কি রাগিণীটি বাজাইলেন, মনে পড়িতেছে না ; কিন্তু কিছুক্ষণ বাজাইতে-না-বাজাইতে আমরা এত বিহ্বল ও তন্ময় হইয়া-গেলাম যে, তখন আমাদের বোধ হইতে লাগিল, যেন সত্যই কোন্-এক অপার্থিব, সুদূর, স্বপ্নময় কল্প-লোক হইতে প্রেমাবেশে এক মায়াময়ী বিরহিণী অজানিত দয়িতের উদ্দেশে আপন অন্তরের কম-করুণ আবাহন-বেদনার একখানি বিপুল জাল ঐ আকাশময় বুনিয়া-বুনিয়া বিছাইয়া দিতে-লাগিল। চিত্রার্পিতের মত বহুক্ষণ নিস্পন্দভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল সেই সুর-স্রোতে নিমজ্জিত হইয়া-রহিলেন ; শেষে, সহসা যখন সে সঙ্গীত স্তব্ধতায় ঝরিয়া-পড়িল, চাহিয়া-দেখিলাম—তখনও দ্বিজেন্দ্রলাল তেমনই ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে, যুক্তকরে, স্থিরভাবে বসিয়া আছেন ; আর তাঁহার গণ্ড বহিয়া বিন্দু-বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে! কি অতল-গভীর, এই ঐকান্তিক অনুভূতি! —কি আশ্চর্য্য, এই তন্ময় আনন্দ-সম্ভোগ! যাহাহৌক্, এ বাজ্না বন্ধ হইলে, অতঃপর যোগেনবাবু,—যাঁহার ডাকনাম 'ভেলু'বাবু,—ধীরে-ধীরে তাঁহার এস্রাজটি সাদর-সোহাগে কোলে তুলিয়া-নিলেন, এবং কিঞ্চিদধিক প্রায় দেড়টি ঘণ্টা ধরিয়া তিনি অমিশ্র শুধু একটি মাত্র রাগিণীই আলাপ করিতে লাগিলেন। কি বলিব—সে কি ব্যাপার! এমন ভাষা নাই, আমার এমন শক্তিও নাই যে, সেই অপূর্ব্ব কর-কম্পন-জাত, সুধা-স্বপ্নময় সুর-লহরীর বিহ্বলকরা, মন-মাতানো মাধুরী-লীলার বিন্দুমাত্রও বর্ণনা বা আভাস দেওয়া সম্ভবে। সেই উদ্দাম অথচ নিয়মিত, প্রচণ্ড অথচ প্রশান্ত, গদ্‌গদ্ অথচ গম্ভীর স্বর-নির্ঝরে কেবল যে আমাদের মনঃপ্রাণ মাতোয়ারা হইয়া-উঠিল তাহা নহে, সে সঙ্গীত-প্রপাতের আঘাতে-আঘাতে যেন সকলের চেতনা বা অস্তিত্বই অল্পে-অল্পে, ক্রমে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলিয়া-মিশিয়া, বিলীন হইয়া-গেল। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল এই

মাধুরী-বন্যায় পরিস্নাত হইলেন ; তারপর, হঠাৎ 'ওঃ ! অসহ্য অসহ্য !' বলিতে-বলিতে, সেখান হইতে পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে উঠিয়া-গেলেন। যাহাহৌক্, প্রহরার্দ্ধ কাল পরে, বিরহী এস্রাজ ঐরূপ কাঁদিয়া-কাঁদিয়া শেষে ঘুমাইয়া-পড়িলে, আমরাও যেন সেই সঙ্গে মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া, আবার এ মিলন-কঠোর মর্ত্ত্যধামে নামিয়া-আসিয়া, মনে-মনে অকস্মাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম ! দ্বিজেন্দ্রলাল এতক্ষণ এ ঘরে আর আসেন নাই ; এখন নীরব-স্তব্ধ, সেই হাহাকারে-ভরা কক্ষে ফিরিয়া-আসিয়া, ধীরে-ধীরে আবেগকম্পিত-কণ্ঠে নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করিলেন। বলা বাহুল্য—এটি তিনি তখনই সদ্য-সদ্য রচনা করিয়াছিলেন।

এস্রাজ

"সভাতলে সকরুণ মৃদুল এস্রাজে
বেহাগ-খাম্বাজ রাগে কি সঙ্গীত বাজে,—
কি গাঢ় বেদনাপ্লুত অতৃপ্ত পিপাসা
উচ্চারি'! প্রগাঢ় তার কি গদ্‌গদ্ ভাষা
বুঝিতে না পারি ; তবু, তার সেই তানে
নিহিত অসীম ব্যথা ! বুঝি, তার প্রাণে
বাজিয়াছে কোন্ গূঢ় যন্ত্রণা অপার
—যাহা নহে পৃথিবীর ; যেই যন্ত্রণার
নাহি ভাষা বুঝিবার। বুঝাইতে চাহে—
যেন কোন্ দেশ হ'তে প্লাবন-প্রবাহে
মর্ত্ত্য-দ্বীপে আসি' ভাসি' কোন্ বিদেশিনী
তাহার প্রাণের কোন্ করুণ কাহিনী
মর্ম্ম-ব্যথা। তবু, নাহি বুঝাইতে পারে,
উঠি' কম্প্র মূর্চ্ছনায়—নামে শতধারে
শতধা বিদীর্ণ তার নিষ্ফল প্রয়াস !
—ঢাকে মুখ শেষে নারী ফেলি' দীর্ঘশ্বাস !"

গয়াতে তিনি প্রায় তিন বৎসর যাপন করেন। তাঁহার দেব-দুর্লভ উদার ও সরল চরিত্র-গুণে তিনি সেখানে ইতর-ভদ্র, ছোট-বড়—সকল শ্রেণীর সমস্ত লোকের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিলেন। নন্দবাবু বলেন,—

গয়া-ত্যাগ।

"সকলের সঙ্গেই তিনি সমান ব্যবহার করিতেন। কোন পদস্থ ব্যক্তি তাঁহার কাছে গেলে যে প্রকার আদর-যত্ন পাইত, একজন গরীব লোক গেলেও তাহাকে ঠিক তেমনই ব্যবহার করিতেন। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী কিংবা অন্য কোন জাতীয় লোক,—সকলের সঙ্গেই তিনি উদারভাবে মিশিতেন ও আলাপ করিতেন। তাঁহার উচ্চ অন্তঃকরণের জন্য সকলেই তাঁহাকে শতমুখে সর্ব্বদা 'ধন্য ধন্য' করিত। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীতে কোন প্রভেদ ভাব রাখিতেন না। এখানকার হিন্দুস্থানীরা যেমন বাঙ্গালীকে কেমন একটু যেন বিদ্বেষের ভাবে দেখে আর বাঙ্গালীরাও যেমন তাহাদের অবজ্ঞা প্রকাশ করে—তাঁহার সে ভাব মোটেই ছিল না। তাঁহার চোখে সবাই সমান ছিল। এমন লোক কি আর হয়!"

"সত্য কথা। এমন সাম্য ভাব, এমন খোলা প্রাণের আপনা-ভোলা, উদার ব্যবহার,—বাস্তবিকই এ সংসারে বড়-একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

যাহাহৌক্, ক্রমে বদ্‌লী হওয়ার সময় আসিল। তাঁহার গুণমুগ্ধ গয়াবাসী বাঙ্গালী ও বিহারীরা এই সময়ে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে এক বিরাট্ বিদায়-'পার্টি' দেন। আসন্ন বিয়োগ-দুঃখে তৎকালে সকলেই তাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। নন্দবাবু জানাইয়াছেন,—

"এই পার্টিতে অমায়িক দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই নানা গীত গাহিয়া সবাইকে মোহিত করেন। নিজের পার্টিতে নিজেই গাহিতেছেন,—এ বড় আশ্চর্য্যরকম দেখিতে হইয়াছিল। তাঁহার উদার স্বভাবের এমনই সব অসংখ্য গুণে এখনও গয়ার লোকেরা তাঁহার কথা বলিতে অজ্ঞান!"

গয়াবাসী, শিক্ষিত সজ্জনেরা সেখানে তাঁহার পুণ্য স্মৃতির

উদ্দেশে, 'দ্বিজেন্দ্রলাল লাইব্রেরী' নামে একটি পাঠাগার বা পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই সময়ে সরকার-বাহাদুর দ্বিজেন্দ্রলালের বহুদিনের মনস্কামনা পূর্ণ করেন। অর্থাৎ—গয়া হইতে দীর্ঘ দেড় বৎসরের 'ফার্লো' (অনুগ্রহ বিদায়) পাইয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল এতদিন পরে আবার কলিকাতায় ফিরিয়া, বিয়োগ-বিধুর বন্ধুবর্গের হৃদয়রাজ্যে—তাঁহারই সেই পরিত্যক্ত, শূন্য আসনে আসিয়া, অমিত প্রভাবে পুনরায় অধিষ্ঠিত হইলেন।

৩

রবীন্দ্রনাথের সহিত মতান্তর ; আধুনিক কাব্যের অস্পষ্টতা ও সাহিত্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'সংগ্রাম'।

৺গয়ায় থাকিতেই দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্ব-প্রথম প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের কোন-কোন রচনা ও লিখন-পদ্ধতির বিরুদ্ধে লেখনী-চালনা করিতে আরম্ভ করেন। জীবনের মধ্যযুগে রবিবাবুর সহিত তাঁহার যে অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠতা ছিল, বঙ্গ-জননীর এই-দুই ক্ষণজন্মা সুসন্তান উভয়ে পরস্পরের গুণে যেরূপ বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়া-পড়িয়াছিলেন ; দুর্লভ ও অপার্থিব প্রতিভার অধিকারী হইয়া, একে অন্যকে একান্ত আত্মীয়বোধে, যেভাবে বন্ধু বলিয়া বরণ করিয়া-লইয়াছিলেন--তাহাতে সকলে ভাবিয়াছিল যে, তাঁহাদের এ বন্ধন সর্ব্বথা স্থায়ী ও অকাট্যরূপে সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের মতি-গতির যতই পরিবর্ত্তন হইতে-লাগিল, স্বাভাবিক মনোবৃত্তির নিয়মানুসারে, অল্পে-অল্পে ততই তাঁহার চিত্ত হইতে রবি-মোহ অপসারিত হইয়া-গেল ; এবং ধীরে ধীরে তাঁহার স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিভার অম্লানোজ্জ্বল বিকাশে তদীয় অপূর্ব্ব জীবনখানি দীপ্ত ও উদ্‌ভাসিত হইয়া-উঠিল।

রবিবাবুর সঙ্গে মত-ভেদ।

সত্যানুগত্য ও স্পষ্টবাদিতাই যে দ্বিজেন্দ্র-জীবনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, বলা বাহুল্য—ইতিপূর্ব্বে তাহা আমরা বহু ব্যাপারে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। আপন যশঃ প্রতিষ্ঠা, লোক-মত বা চক্ষুলজ্জার দিকে তিলার্দ্ধও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, এই তেজস্বী পুরুষ-সিংহ

মানব-সমাজের পক্ষে যাহা অন্যায়, অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়া বুঝিতেন, অকুতোভয়ে তাহার বিপক্ষে দ্বিধাহীন, দুর্ব্বার বিক্রমে চিরদিন বাক্য ও লেখনী ব্যবহার করিতে স্বভাবতঃ ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। এজন্য, কত রকমে, কত শতবার, কতই-না তাঁহাকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে; এজন্য সমাজে ও সাহিত্যে কতবারই না তাঁহাকে নিন্দিত, বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে! কিন্তু, তবু আপন বিচার-বিবেচনা বা অকপট বিশ্বাসমত, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে প্রাণপণে স্বীয় সাধ্যের সীমান্ত চেষ্টায় সংগ্রাম করিতে একটিবারের তরেও তাঁহাকে কেহ শ্রান্ত বা পরাঙ্মুখ দেখে নাই।

আমরণ দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রকৃত গুণ-সম্পৎ বা দুর্লভ ঐশ্বর্য্যরাশির পরম পক্ষপাতী ও প্রকৃত গুণগ্রাহী ছিলেন; এবং ঐ 'নোবেল'-পুরস্কার ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তুচ্ছ 'সাহিত্যাচার্য্য' উপাধি-প্রাপ্তির বহু পূর্ব্ব হইতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বর্ত্তমানে—শুধু এই ভারতের বলিয়া নহে,—সমগ্র ভূমণ্ডলেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকগণের অন্যতমরূপে গণ্য করিতেন। বরিশালে সমাহূত, প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে রবিবাবুকে সভাপতি-নির্ব্বাচন করায় তৎকালে যে মত-বিরোধ ও গোলযোগের সূত্রপাত হয় তখনও রবিবাবুর সাহিত্যিক যোগ্যতাদি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে যে অভিমতটুকু জানাইয়াছিলেন, পাঠক এখন সে কথাগুলি একবার স্মরণ করুন।* রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে, মূলে দ্বিজেন্দ্রলালের বিচার-নির্দ্দিষ্ট, নিরপেক্ষ ধারণা কি ছিল তাহা যাঁহারা মোটে জানেন না, এবং তাঁহার সেই বিবেক-প্রবুদ্ধ মনে সত্য-প্রচার ও স্পষ্টবাদিতার প্রতি যে কতদূর একটা অদম্য, স্বাভাবিক প্রবণতা বা 'ঝোঁক' ছিল তাহারও যাঁহারা কোন সন্ধান রাখেন না, সেই-সব দায়িত্বহীন, অদূরদর্শী লেখকগণ দ্বিজেন্দ্রলালের উক্তবিধ বিরূপ সমালোচনার

* এই গ্রন্থের ৩৭৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।—গ্রন্থকার।

যথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া, অযথা তাঁহার প্রতি যেরূপ যুক্তি-বোধহীন ঔদ্ধত্যের সহিত অকথ্য ভাষায় গালি ও বিদ্রূপ-বর্ষণ করিয়াছিলেন, আজ আমরা অপক্ষপাত ধৈর্য্য সহকারে বিচার করিয়া-দেখিলে, তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত অশোভন ও বিরক্তিকর বলিতে বাধ্য হই।

প্রকাশ্য প্রতিবাদের সূচনা।

প্রকাশ্যতঃ বাহ্যিক যে কারণে প্রথম দ্বিজেন্দ্রলালের মন রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপ ও উত্যক্ত হইয়া-ওঠে ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহা অবগত হইয়াছি। কিন্তু, কারণ যাহাই হৌক্, প্রকাশ্যে তখনও দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে কোনরূপ প্রতিকূল মন্তব্যাদি প্রচারিত করেন নাই। ইহার একটা হেতু এরূপ হওয়া সম্ভব যে 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যে আত্ম-জীবনীটি প্রকাশিত করেন তদ্‌বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁহার গোপনেই পত্রালাপ ও বাদানুবাদ চলিয়াছিল; সে ব্যক্তিগত ব্যাপারটা গোপনীয় বলিয়াই, তাহা লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল আর সাহিত্য-সমাজে কোনরূপ 'উচ্চ-বাচ্য' করেন নাই। কিন্তু, সে ঘটনার প্রায় পূর্ণ তিনটি বছর পরে, তিনি যখন গয়ায় বাস করিতেন সেই সময়ে, একটা বিশেষ কারণ বশতঃ, তিনি (ঘটনাচক্রে কতকটা-যেন বাধ্য হইয়াই) প্রকাশ্যতঃ বঙ্গসাহিত্যের কোন-কোন ভাবের রচনা ও রচনা-রীতির প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে, সর্ব্বপ্রথম রবিবাবুর এক শ্রেণীর কবিতার বিপক্ষে তাঁহার স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করেন। যে ব্যাপার উপলক্ষ্যে তিনি এই অপ্রিয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, পাঠকের তাহা জানা দরকার বলিয়া, সংক্ষেপে তাহা আমি এস্থলে জ্ঞাপন করিতেছি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, গয়ায় থাকিতে দ্বিজেন্দ্রলালের নিত্য-সঙ্গী ও প্রধান সহচর ছিলেন— সাহিত্যামোদী লোকেন্দ্র পালিত মহাশয়। লোকেন্দ্রনাথ রবিবাবুর একজন অকৃত্রিম বন্ধু ও বিমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যায়

পালিত ও দ্বিজেন্দ্রলাল, এই-দুই বন্ধু মিলিত হইয়া যেভাবে সাহিত্যালোচনায় সময়ক্ষেপ করিতেন, পাঠকের সে বিবরণও অবিদিত নাই। একদিন কথায়-কথায়, এইরূপে, রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া ইহাঁদের মধ্যে তুমুল তর্ক-সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। রবিবাবুর অস্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন রীতির কবিতা-রচনার উপরে দ্বিজেন্দ্রলাল মনে-মনে বিরাগ পোষণ করিতেন; কিন্তু, পালিত সাহেব সেই-সব কবিতাকেই আবার বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। দুই বন্ধুর মধ্যে একদিন এই লইয়া ঘোর তর্ক-যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া-গেল, এবং এই তর্ক দু'চার ঘণ্টা বা একদিনে শেষ না হইয়া, ক্রমান্বয়ে উপর্য্যুপরি তিন দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল। রবিবাবুর যে সকল কবিতা বা অন্যবিধ রচনা দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্র-সাহিত্যের 'গলদ্' বা আবর্জ্জনা বলিয়া গণ্য করিতেন, ৺লোকেন্দ্রনাথের মত একজন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ও মনস্বী ব্যক্তিও যখন তন্মধ্যে অনেকগুলিকে নির্দ্দোষ ও মূল্যবান্ সম্পৎ বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না; অধিকন্তু, ক্রমান্বয়ে দিবসত্রয়ব্যাপী ঘোরতর বাপ্‌বিতণ্ডা করিয়াও দ্বিজেন্দ্রলাল যখন তাঁহাকে স্বমতে দীক্ষিত করিতে অক্ষম হইলেন, প্রধানতঃ তখনই তিনি 'কাব্যে অভিব্যক্তি' প্রবন্ধটি লিপি-বদ্ধ করিয়া, প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের ঐ অস্পষ্ট রচনা-রীতির দোষ-প্রদর্শনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তৎকালে এ বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং আমাকে কি লিখিতেছেন, দেখুন,—

"এত দিন চুপ করেই ছিলাম, স্পষ্টতঃ হাতে-কলমে রবিবাবুর বিপক্ষে কোন কথা বলিনি। কিন্তু, ক্রমে যেরূপ দেখা যাচ্ছে, রবিবাবুর এই-সব অন্ধ স্তাবক ও অনুকারকদের মধ্যে তাঁর দোষগুলির বড়ই বেশী প্রতিপত্তি বেড়ে চল্‌ল। এবং রবিবাবুর প্রতিভার যেরকম দুর্দ্দম্য প্রতাপ তাতে নিশ্চয়ই পরিণামে এসব দোষ আমাদের সাহিত্যে অধিকাংশ নবীন লেখকদের মধ্যেই অল্পাধিক সংক্রামিত হ'য়ে পড়্‌বে। রবিবাবুকে এককালে বন্ধু বলে মনে কর্ত্তাম

এবং এখনও আমি আগের মতই তাঁর অসাধারণ শক্তির যথার্থই আন্তরিক অনুরাগী। এই দুই কারণে অতি কষ্টে এতকাল নিজেকে সাম্‌লে রেখেছিলাম; আশা ছিল—আর কেউ যদি সাহস করে' এ কর্ত্তব্যটুকু পালন করে ত আমি অন্ততঃ এই একটা অপ্রিয় কাজের দায় থেকে এ জীবনে উদ্ধার পেতে পারি। কিন্তু, কৈ তা তো হ'ল না! আজ তিন দিন ধরে' পালিতের সঙ্গে ক্রমাগত তর্ক কর্লাম; তা' রবিবাবুর Personality (ব্যক্তিত্ব) এম্‌নি Dangerously strong (সাংঘাতিক রকম প্রবল) যে, তিনি আমার যুক্তি-খণ্ডন কর্ত্তে অক্ষম হোয়েও আমার Points সব avoid করে' ('বক্তব্য সব এড়িয়ে বা পাশ কাটিয়ে') কেবল সেই-সব অস্পষ্ট, দুর্নীতিপূর্ণ লেখার Art আর গুণই দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। এখন স্বয়ং পালিতের মত বিজ্ঞ ও বিদ্বান্ লোকেরই যখন এই দশা তখন আর অন্যের কথা কি? * * নব্য সাহিত্যিক ও কবির দল রবিবাবুর গুণের তো আর নাগাল পাবেন না, কেবল এই সব নিকৃষ্ট Style (রচনা-পদ্ধতি) ও Ideaরই (ভাবেরই) অনুকরণ করে' ক্রমে আমাদের আরাধ্যা মাতৃভাষার Temple'এ (মন্দিরে) আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা জমিয়ে তুল্‌বেন। পালিত শেষে আর কিছুতে না পেরে বল্‌লেন—"তুমি তা হলে তোমার বক্তব্যগুলো লিখেই না হয় কোন কাগজে ছাপাও না? নিশ্চয়ই তা হলে তোমার এ ভুল কেউ দূর করে' দেবেন,—চাইকি, আমিও তোমাকে তখন লিখে বুঝিয়ে দিতে পারি।" পালিতের এ পরামর্শ একটু Risky (বিপজ্জনক) হ'লেও Fair ('শোভন বা ন্যায্য') যে, তার আর কোন সন্দেহ নাই। বেশ, তবে তাই হোক্। আমি তা হলে লিখেই প্রতিবাদ কর্‌ব। যা থাকে অদৃষ্টে,—দুর্গা বলে' ঝুলে পড়া যাক! Honest Controversy'কে আমি বাঞ্ছনীয়ই মনে করি; কিন্তু, কেউ যদি আমাকে এজন্য বিদ্বিষ্ট ভাবে,—সে কিন্তু বড়ই অন্যায় ও আক্ষেপের কথা হবে। কিন্তু, Greatest good to the greatest number * হিসাবে আমার এ কাজটা কি মূলে অন্যায়? আমার ত তা' একটুও মনে হচ্ছে না। 'মনের অগোচরে পাপ নেই' আর তা যখন এক্ষেত্রে একটুও নেই। তখন লোক-মতকে আমি অতি থোড়াই Care (গ্রাহ্য) করি। জীবনে

* অর্থাৎ—সর্ব্বাপেক্ষা বেশি লোকের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকার, অথবা প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন। (রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' ১২ পৃষ্ঠা)—প্রঃ।

এই বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত যা কথনো কর্লাম না, আজ কিনা আমি সেই লোকের নিন্দার ভয়ে 'হক্' কথা বল্‌তে পিছু হটব ? তেমন কাপুরুষ শর্ম্মা নন ?—হুঁঃ ! ভারি তো আমার ভয়—ফুঃ !"

কাব্যে অস্পষ্টতার বিপক্ষে প্রতিবাদ ও 'কাব্যে অভিব্যক্তি' প্রবন্ধ-প্রকাশ।

অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে 'কাব্যের অভিব্যক্তি' নামে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া সেটি 'প্রবাসী'-পত্রে (১৩১২ শালের কার্ত্তিক মাসে) প্রচারিত করেন। প্রবন্ধটা তত দীর্ঘ নহে; কিন্তু, তবু, লিখিতে-লিখিতে এ বইটা যে-রকম বাড়িয়া-যাইতেছে, এখানে আর তাহা পুনর্ম্মুদ্রিত করা উচিত নহে। প্রবন্ধটির মর্ম্ম গ্রহণার্থ উহা হইতে প্রধান-প্রধান বক্তব্যগুলি শুধু এস্থলে একটু উদ্ধৃত করিয়া-দিলাম।—

"গত শ্রাবণের 'বঙ্গদর্শনে' 'কাব্যের প্রকাশ' নামক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। তাহা অস্পষ্ট কাব্যের সমর্থন। শুদ্ধ তাহা নহে, যাহারা স্পষ্ট কবি, লেখক তাহাদিগকে একটু ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। যদি এটি রবীন্দ্র বাবুর মতের প্রতিধ্বনি মাত্র না হইত তাহা হইলে আমি ইহার প্রতিবাদও করিতাম না।

"লেখকের মতে এই অস্পষ্ট কবিদিগের মধ্যে একটি বৃহৎ 'আইডিয়া' আছে। সে আইডিয়াটি দু'এক কথায় বুঝা যাইবার নহে। তাহা অনেকাংশে কবির নিকটেই অস্পষ্ট।

"কাব্যের জড়তা সাধারণতঃ আইডিয়ার জড়তা হইতে প্রসূত হয়। যেখানে আইডিয়া স্পষ্ট সেখানে ভাষা প্রাঞ্জল। যেখানে আইডিয়া অনেকাংশে কবির নিজের নিকটে প্রচ্ছন্ন সেখানে ভাষাকে অবশ্যই অস্পষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু সেটা 'বৃহৎ আইডিয়া'র ফল নহে, অস্পষ্ট আইডিয়ারই ফল। * *"

এ পর্য্যন্ত এক রকম চলিতেছিল বেশ। কিন্তু, ইহার পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল যাহা বলিলেন তাহাতে 'মধুচক্রে' সহসা সজোরে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইল।—

"একটা উদাহরণ লইতে হয়। আমাদের দেশে এই অস্পষ্ট কবিদের অগ্রণী

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অতএব তাঁহার কাব্য হইতেই উদাহরণ লইতে হয়।

"রবিবাবুর ভক্তগণ রবিবাবুর 'সোনার তরী'কে তাঁহার সকল কবিতার প্রায় শীর্ষে স্থান দেন। সভায় সভায় ইহার আবৃত্তি হইয়াছে। একজন সমালোচক এইটি পড়িয়া লিখিয়াছেন যে, 'তাঁহার সোনার লেখনী অক্ষয় হউক।' দেখা যাক্ ইহার সৌন্দর্য্য কোথায় ও এ কাব্য হইতে কি ভাব সংগ্রহ করিতে পারি। বলা বাহুল্য—কবিতাটি যারপরনাই অস্পষ্ট।

"পরের ভাষায় পরের দেশের প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ কবির প্রায় সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বোধ্য কবিতা (যথা, Wordsworth'এর 'Ode on the immortality of the soul') বুঝিতে পারি; কিন্তু আমার মাতৃভাষায় আমার বাঙ্গালী ভ্রাতার কবিতা বুঝিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হয়। এই যদি ইহাঁদের বৃহৎ ভাবের ফল হয় ত বলিতে হইবে যে, সে ভাব বড়ই বৃহৎ !! কারণ এ কবিতাটি দুর্ব্বোধ্য নয়, অবোধ্যও নয়,—একেবারে অর্থশূন্য, স্ব-বিরোধী।

বিশদরূপে 'সোনার তরী'র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা উহার অর্থ বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াও অসমর্থ হইয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল এ প্রবন্ধে রবিবাবু সম্বন্ধে মাত্র ঐটুকু মন্তব্য ব্যক্ত করেন; এবং পরিশেষে এই বলিয়া সে প্রবন্ধটি শেষ করেন যে,—

"যদি স্পষ্ট করিয়া না লিখিতে পারেন সে আপনার অক্ষমতা, তাহাতে গর্ব্ব করিবার কিছু নাই। অস্পষ্ট হইলেই গভীর হয় না; কারণ ডোবার পঙ্কিল জলও অস্পষ্ট। স্বচ্ছ হইলেও Shallow বা অগভীর হয় না; কারণ সমুদ্রের জলও স্বচ্ছ। অস্পষ্টতা লইয়া বাহাদুরী করিয়া বা 'Miraculous' দাবী করিয়া স্পষ্ট কবিদের ব্যঙ্গ করিবার কারণ নাই। অস্পষ্টতা একটা দোষ, গুণ নহে।"

প্রবন্ধটা প্রচারিত হইলে কিছুদিন যাইতে-না-যাইতে ইহা লইয়া বঙ্গসাহিত্যে খুব একটা 'তোলপাড়' কাণ্ড সুরু হইয়া গেল। অস্পষ্ট কবিতার পক্ষপাতী ও রবিবাবুর অন্ধ অনুকারকের দল দ্বিজেন্দ্রলালের ঐ প্রতিপাদ্য বিষয়টা যে সম্পূর্ণ অসার তাহা প্রতিপন্ন করার জন্য প্রাণপণে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এবং

চারিদিক্ হইতে নানা জনে 'সোনার তরী' কবিতাটির নানারূপ কল্পিত ও অসঙ্গত অর্থ ভাবিয়া-চিন্তিয়া আবিষ্কার করিয়া, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা-রসগ্রাহিতার যে কতখানি অভাব তাহাই প্রমাণ করিতে তৎপর হইলেন। ব্যাপারটা ক্রমে এত অধিক দূরে গড়াইয়া-পড়িল যে, একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কাব্য-সমালোচনার 'অছিলায়' 'সোনার-তরী'র শেষে একটা অদ্ভুত, আধ্যাত্মিক অর্থ 'খাড়া' করিয়া, দ্বিজেন্দ্রলালকে 'চাষা' পর্য্যন্ত বলিয়া গালি দিতে সঙ্কুচিত হইলেন না! এই-সব অসংযত লেখকগণের নগণ্য প্রতিবাদ-সমূহের কোন জবাব না দিয়া, অবিচলিত চিত্তে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাহিত্য'-পত্রে কেবলমাত্র ইহাঁদের প্রতি একটা অব্যর্থ ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেন। সে ব্যঙ্গের আবরণে ইহাই দ্বিজেন্দ্রলাল জানাইতে চাহিয়াছিলেন যে, এজগতে এমন অর্থহীন ও নগণ্য রচনা খুব-অল্পই আছে, যাহা হইতে, প্রাণপণে চেষ্টা করিলে, যথেচ্ছভাবে কোন-না-কোন একটা মনোমত, কল্পিত, 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' 'টানিয়া-বুনিয়া' বাহির করা যায় না। মোটামুটি ব্যঙ্গটা এইরূপ,—

একটি পুরাতন মাঝির গান।

(আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)

(১)

"ঘাটে ডিঙ্গা লাগায়ে বন্ধু পান খায়ে যাও!
পান খায়ে যাও বন্ধু, পান খায়ে যাও!

(২)

"কোন গেরামের লাও তোমার, কোন গেরামের লাও?
এক্‌টা কথা কও বা না কও, পান খায়ে যাও।

(৩)

"আমার গাছের পান স্থপারী, তোমায় দিমু ভাও।
কড়ির কথা শ্যাষে হবে পান খাইয়া যাও!

ব্যাখ্যা

(১)

"ঘাটে = সংসারে ; ডিঙ্গা = করুণা-(তরী) ; লাগায়ে = দান করিয়া ; বন্ধু = হরি ; পান খায়ে = দেখা দিয়ে ; যাও = যাও। অর্থাৎ—হে হরি ! আমাকে করুণা করিয়া দর্শন দিয়া যাও।

"[এখানে 'ডিঙ্গা'র অর্থ ছোট নৌকা নহে। কারণ, যিনি ভব-সংসারের কাণ্ডারী তাঁহার নৌকা যে কেন ছোট হইবে, বোঝা যায় না। এখানে ডিঙ্গের অর্থ দেশী তরী। ইহা যাপানী যুদ্ধ-জাহাজ নহে ; গোয়ালন্দ ঘাটের ষ্টীমারও নহে ; ইহা একান্ত দেশী নৌকা। অতএব, অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ভক্ত কোনও বিজাতীয় ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন না, আমাদের হরিকেই ডাকিতেছেন। আর কবি 'পান খায়ে যাও' কেন বলিলেন ? অর্থাৎ, পুত্র যেমন পিতাকে ডাকে, ছাত্র যেরূপ গুরুমহাশয়কে ডাকে, ভক্ত সেরূপ ডাকিতেছেন না ; প্রেমিকা যেরূপ প্রেমিককে ডাকে, ভক্ত হরিকে সেইরূপ ডাকিতেছেন। 'বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে।'—জয়দেব। * * * ইত্যাদি।"

বাহুল্য অনাবশ্যক। এইভাবে,তিনি উল্লিখিত মাঝির গানটার এমন-একটা হাস্যকর ব্যাখ্যা করিয়া-দিলেন যে, অতঃপর আর-কেহ রবীন্দ্রনাথের 'অর্থশূন্য' ঐসব কবিতাদির আধ্যাত্মিক অর্থ জাহির করিতে সাহসী হন নাই।

'কাব্যে অভিব্যক্তি' প্রবন্ধটা প্রকাশিত করায়, রবিবাবুর পক্ষীয় বহু অজাত-গুম্ফ সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালকে 'রবীন্দ্র-বিদ্বেষী' বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, আমরা জানি—দ্বিজেন্দ্রলালের মনে তখন ঐরূপ হীন ভাব একবিন্দুও ছিল না। তিনি রবিবাবুর উৎকৃষ্ট রচনার অতি-উচ্চ কণ্ঠে খ্যাতিবাদ করিতেন ; তবে, যে-সব লেখা কোনক্রমে রবিবাবুর যোগ্য নহে, বরং তাঁহার প্রতিভার কলঙ্ক বলিয়াই তিনি অকপটে বিশ্বাস করিতেন সে-সব রচনার প্রতি তদীয় মনোগত বিরাগ তিনি কোনমতেও যে চাপিয়া-রাখিতে পারেন নাই, এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য বটে। যাহাহৌক্, ঐ ভাবে কেহ-কেহ যখন

তাঁহার দুর্নাম রাষ্ট্র করিতে ব্যস্ত হইলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তখন সত্যের অনুরোধে, সে অপবাদের প্রতিবাদ করার ছলে, (পর বৎসর মাঘ-সংখ্যক) 'বঙ্গদর্শনে' 'কাব্যের উপভোগ' নাম দিয়া আর-একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেটির সারাংশ প্রধানতঃ এই,—

"কবি স্বয়ং যে সব কবিতার ভাব গ্রহণ কর্ত্তে অসমর্থ সে সব কবিতা দেখ্‌লাম, যে কবির চেলাগণ বেশ বোঝেন। আমি এই চেলাদিগকে এইখানে বলে' রাখি যে, রবীন্দ্রবাবুর কাব্য আমি যেরূপ উপভোগ করি, সেই চেলাগণ তাহার দশমাংশও করেন কিনা সন্দেহ। তবে রবিবাবু যা'ই লেখেন তাতেই—'তাধিন-তাকি ধিন-তাকি ম্যাও-এঁও-এঁও'—বলে' কোরাস্ দিতে পারি না,—রবীন্দ্রবাবুর বন্ধুত্বের খাতিরেও নয়।

"রবীন্দ্রবাবু তাঁর আত্ম-জীবনীতে Inspiration দাবী ক'রে যখন নিজের কবিতাবলী সমালোচনা কর্ত্তে বসেছিলেন তখন তাঁর দম্ভ ও অহমিকায় আমি স্তম্ভিত হয়েছিলাম। তাঁরই উক্তি বঙ্গদর্শনে প্রায় তাঁরই ভাষায় পুনরুক্ত দেখে বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গল হিসাবে তার প্রতিবাদ কর্ত্তে বসেছিলাম; এবং উদাহরণ স্বরূপ জনকতক নগণ্য চেলা তাঁহার উত্তমগুলি অনুকরণে অসমর্থ হয়ে তাঁর অর্থহীন কবিতাগুলির অন্ধ অনুকরণে শুধু ভাবহীন ঝঙ্কার করেন, তাই আমার উক্ত প্রবন্ধটি লেখার প্রয়োজন হয়েছিল। আমি দেখে সুখী হলাম, যে সে বিষয়ে সকলেই আমার সঙ্গে একমত। কাব্য যে স্পষ্ট ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট হওয়া উচিত সে বিষয়ে ত তাঁরা আমার সঙ্গে একমতই; আর আমার উল্লিখিত কবিতাটিরও যে কোন অর্থ হয় না, সে বিষয়েও তাঁরা আমার সঙ্গে একমত। কারণ, যখন পাঁচজন শিক্ষিত ব্যক্তি সেই নগণ্য কবিতার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বাহির করে' নিজেদের মধ্যে বিবাদ কর্চ্ছেন তখন এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয় যে, কবিতাটির সত্যই কোন অর্থ নাই। তবে তাঁরা পণ্ডিত লোক, নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করেছেন। * *

"আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, প্রবুদ্ধ উপভোগ থেকে সমালোচনার সৃষ্টি। আমাদের দেশে সমালোচনা জিনিষটা বড় একটা নাই। তাই আমার বোধ হয় আমাদের দেশে কাব্যের প্রবুদ্ধ উপভোগও বড় বেশি নাই। শিক্ষিত

সমাজে শতাংশের একাংশও কবিতা পড়েন কিনা সন্দেহ। আবার সেই ভগ্নাংশের একাংশ ব্যক্তি কবিতা বুঝে পড়েন কিনা সন্দেহ।"

এই পর্য্যন্ত মুখবন্ধ স্বরূপ বলিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল এ প্রবন্ধে উৎকৃষ্ট কবিতার নমুনা স্বরূপ রবিবাবুর 'যেতে নাহি দিব' কবিতাটির এক দীর্ঘ সমালোচনায় তৎসম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত আবেগে অত্যন্ত প্রশংসা কীর্ত্তন করেন। নিষ্প্রয়োজন বোধে সে অংশটা আর এখানে পুনর্ম্মুদ্রিত হইল না।

স্বয়ং রবিবাবুর বক্তব্য।

'বঙ্গদর্শনে'র তৎকালীন সম্পাদক, অকৃত্রিম সাহিত্যসেবক ৺শৈলেশ মজুমদার মহাশয় রবিবাবুর অনুগত বেতনভুক্ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের এই প্রবন্ধটি ছাপিবার পূর্ব্বে রবিবাবুর কাছে পাঠাইয়া-দিয়া, তদ্বিষয়ে রবিবাবুর বক্তব্য ও মন্তব্য সবিনয়ে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শৈলেশবাবুর এই ইচ্ছানুসারে রবীন্দ্রনাথ ইহার উপরে যে মন্তব্যটি লিপিবদ্ধ করিয়া-দেন তাহারও প্রধান বক্তব্য পাঠকবর্গকে সংক্ষেপে জানাইতেছি।—

"আমার আত্ম-জীবনী প্রবন্ধে আমি অলৌকিক শক্তির প্রেরণা দাবী করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিয়াছি, দ্বিজেন্দ্রবাবুর এইরূপ ধারণা হইয়াছে। আমি জানি অহঙ্কার প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। * * কিন্তু অহঙ্কার করিব বলিয়া কোমর বাঁধিয়া বসি নাই—তবু অহঙ্কার আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। * * আমার সেইরূপ বিকৃতি যদি লক্ষিত হইয়া থাকে তবে দ্বিজেন্দ্রবাবু তাহার শাস্তি দিতে কিছুমাত্র আলস্য বোধ করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। তিনি প্রবন্ধে ও গানে, সভাস্থলে ও মাসিকপত্রে এবং যে ব্যঙ্গ কদাচ ব্যক্তিবিশেষের মর্ম্ম ভেদ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয় নাই সেই ব্যঙ্গ ও ভৎর্সনায় অশ্রান্তভাবে আমার লাঞ্ছনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।"

এই অবধি বলিয়া, রবিবাবু ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিকটে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কিরূপ ঋণী তাহার উল্লেখ করিয়া, স্বীয় স্বভাব-সুলভ

দক্ষতার সহিত নিজের প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন।—

"* * আমি মাসিক পত্রে দ্বিজেন্দ্রবাবুর অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছি। তাঁহার লেখার সেই সকল 'অপ্রবুদ্ধ উপভোগে'র বিবরণ পড়িয়া অনেক বিচারক আমাকে দ্বিজেন্দ্রবাবুর অযথা স্তাবক বলিয়া অপবাদ দিয়াছেন। আমি তাহাতে কান দিই নাই।"

অতঃপর মন্তব্যটির শেষাংশে লিখিতেছেন,—

"দ্বিজেন্দ্রবাবু কেন অযথা কল্পনা করিতেছেন যে, আমি এক দল চেলা আমার চারিপাশে তৈরী করিয়া তুলিয়াছি। যদিচ তাঁহার অনুরক্ত বন্ধুবর্গের অভাব নাই তথাপি আমি রাগ করিয়াও এরূপ অপবাদ তাঁহাকে পাল্টা ফিরাইয়া দিতে পারি না! আমার যে কবিতা দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনমতেও ভাল লাগে নাই তাহা যে আর কাহারো ভাল লাগিতে পারে আমার এ অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রবিবাবুর এই ব্যক্তিগত 'বক্তব্যে'র আর-কোন উত্তর দেওয়া উচিত ভাবেন নাই। 'সভাস্থলে' ইতিপূর্ব্বে যে তিনি কবে রবিবাবুকে অপদস্থ করিয়াছেন, আমরা সে সংবাদ কোনদিনই শুনি নাই। তবে, 'প্রবন্ধে' রবিবাবুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু, তাহাও সাহিত্যের দিক্ দিয়া,—'ব্যক্তিগত' ভাবে নহে। রবিবাবু লিখিয়াছেন,—'যে ব্যঙ্গ ইতিপূর্ব্বে কদাচ কোন ব্যক্তিবিশেষের মর্ম্মভেদ করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয় নাই, দ্বিজেন্দ্রলাল 'অশ্রান্তভাবে' তদ্রূপ 'ব্যঙ্গ ও ভর্ৎসনায়' রবিবাবুকে 'লাঞ্ছনা' দিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এ সম্বন্ধীয় লেখাগুলি এখনও বিলুপ্ত বা দর্শন-দুর্লভ হইয়া-ওঠে নাই; সে-সব একটু পড়িয়া-দেখিলে রবিবাবুর এ অভিযোগ যে কতদূর কল্পিত ও ভ্রমাত্মক তাহা অতি-সহজেই আমরা বুঝিয়া-লইতে পারিব। আসলকথা,—উভয়ের সেই বহুদিন-সঞ্চিত মনোমালিন্যের উপরে, ইহাঁদের অনুগ্রহার্থী ও

পার্শ্বচর এই-সব 'চেলা-চামুণ্ডা' বা 'অনুরক্ত বন্ধুবর্গ' এই সময়ে সুযোগ পাইয়া, একজনের কাছে অন্যের সম্বন্ধে যত-রাজ্যের অমূলক ও মিথ্যা অপবাদ ও নিন্দা ক্রমাগত পুঞ্জীভূত করিয়া-তুলিয়া, তাঁহাদের চিত্তকে অত্যধিক উত্তেজিত ও ভারাক্রান্ত করিয়া-ফেলিতে এবং এই বিচ্ছেদকে স্থায়ী ও অলঙ্ঘ্য করিয়া-রাখিতে স্বতঃপরতঃ নানাপ্রকারেই বিবিধ জঘন্য চক্রান্ত চালাইতেছিলেন। রবিবাবু উক্ত 'বক্তব্যে' যে 'গানে'র কথার উল্লেখ করিয়াছেন সেটা অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিগত সন্দেহ নাই; কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলাল এদেশের আরও ঐরকম অনেক বড়-বড় 'নাম-জাদা' ব্যক্তির সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে যে-সব রাশীকৃত বিদ্রূপাত্মক গান লিখিয়াছিলেন,—এবং যে-সব গানের সমাদর এককালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি,—সে সকল 'হাসির গান' ইহার চেয়ে যে কোন অংশেও কম ব্যক্তিগত বা 'মর্ম্মভেদী' তাহা তো আমাদের মোটেই মনে হয় না। উদাহরণতঃ, তল্লিখিত 'নন্দলাল', 'বদ্‌লে গেল মতটা,' 'গীতার আবিষ্কার,' 'চণ্ডীচরণ,' এমন কি 'আমরা বিলেতফের্ত্তা ক'ভাই' প্রভৃতি আরও 'বহু' গানের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। যাঁহাদের সম্পর্কে ঐসব গান রচিত হয়, এখনও তো তাঁহারা দিব্য সশরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন; কিন্তু, কৈ—তাঁহারা তো এজন্য আদৌ নিজেদিগকে একটুও উপেক্ষিত, ক্ষতিগ্রস্ত বা অপদস্থ বোধ করিতেছেন না? এই-সব দেখিয়া-শুনিয়া ও ভাবিয়া, তাই, আমাদের মনে হয়—বাজে লোকের দশরকম জঘন্য মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত কথায় রবিবাবুর মনটা তৎকালে বড়-বেশি বিষাক্ত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহা না হইলে, তাঁহার মত একজন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমান্, বিশ্ব-মান্য ব্যক্তি যে এ বয়সে অমন অসহিষ্ণু হইয়া, ঐ রকম-একটা ব্যক্তিগত 'বক্তব্যে' আপনাকে ধরা দিতে অকারণ কখনই এহেন দৌর্ব্বল্যের আশ্রয় নিতেন,—শত হইলেও, আমরা কিছুতে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।

অনেকে বলেন যে, 'অস্পষ্ট কবিতার উপরে দ্বিজেন্দ্রবাবুর যদি এতই বিরাগ, এতদিন কেন তবে সে বিষয়ে তিনি কোন কথা বলেন নাই ?' কেন যে বলেন নাই,—আজ দ্বিজেন্দ্রলাল নাই ; কাজেই —তাহা ঠিক করিয়া বলা একটু শক্ত। তবে, এটা অবশ্য আমরা সকলেই জানি যে, এ সময়ের পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলাল পৃথক্‌রূপে আর কখনও বড়-একটা গদ্য প্রবন্ধই লেখেন নাই ; এবং তাই, এ সম্পর্কীয় মতামতও হয়ত এতকাল প্রকাশ্যে জানাইবার তাঁহার কোন সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু, স্বতন্ত্র প্রবন্ধে এ মত তিনি ব্যক্ত করুন আর না-ই করুন, অস্পষ্ট কবিতার প্রতি তাঁহার যে চিরকালই একটা বিতৃষ্ণা ছিল তাহা তদীয় বাল্য-বন্ধু বা সহচরদের মধ্যে আজও যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারা অনেকে বার-বার আমাকে বিশেষভাবেই জ্ঞাত করিয়াছেন ; তা' ছাড়া, এ সময়ের বহুদিন পূর্ব্বে, তিনি 'মন্দ্র' নামক যে কাব্যখানি লেখেন তাহাতেও 'সুখ-মৃত্যু' নামক কবিতায়, মৃত্যু-কালে তাঁহার কাম্য বিষয়ের একটা যে কৌতুককর ফর্দ্দ দাখিল করিয়াছিলেন তাহার একস্থলে দেখিতেছি—তিনি ব্যঙ্গচ্ছলে বলিতেছেন যে, তখন যেন—

*　　*　　*

'রূপসী-শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো
যার শীঘ্র অর্থ হয় বোধ।'

রবিবাবুর এক শ্রেণীর কবিতাকে দ্বিজেন্দ্রলাল এইরূপে আক্রমণ করিলেন,—রবিবাবুও তদ্বিষয়ে তাঁহার ঐ বক্তব্য বিবৃত করিলেন। সুতরাং, তৎপূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলালকে যতই-কেন আক্রান্ত ও নিন্দিত হইতে হোক্ না, আমরা ভাবিলাম,—রবিবাবু যখন নিজে তাঁহার বক্তব্য কহিয়া-'চুকিয়াছেন,' আর, দ্বিজেন্দ্রলালও যে কারণেই হোক্, তাহার যখন কোন জবাব দেন নাই তখন অতঃপর এ ব্যাপারের এখানে একটা পূর্ণচ্ছেদ বা সমাপ্তি ঘটিয়া-গেল।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় তৎকালে আমাদেরও মনে হইয়াছিল,— 'রাজায় রাজায় যখন এ যুদ্ধ চলিয়াছে, বন্য শৃগালের অশোভন আস্ফালন' তখন আর এক্ষেত্রে আমাদের সহিতে হইবে না। কিন্তু, মন্দ-মতি মূষিকের না হিংস্র-স্বভাব মশকের মজ্জাগত চাপল্য অথবা নিঃসার শফরীর অশ্রান্ত 'ফর্‌ফরি' অত সহজে সংযত হইবার নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল দেশের অবস্থা দেখিয়া, যদিচ তখন মনে-মনে সংকল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ধারণানুরূপ দেশের হিতার্থ সত্যের খাতিরেও, তিনি আর এসব বিষয়ে কোনরূপ 'উচ্চবাচ্য' করিয়া অযথা সময়ের অপব্যয় করিবেন না;—কিন্তু, তিনি নিরস্ত হইতে ইচ্ছুক হইলেই বা কি হইবে?—'দশ চক্রে' তবু তাঁহাকে স্থির ও নিশ্চিত থাকিতে দিল না। নব-জাত সাহিত্যিকবর্গ শালীনতা ও সংযমের সীমা পদাঘাতে বিচূর্ণ করিয়া, চারিদিক্ হইতে নিতান্ত অশ্রাব্য ও অকথ্য ভাষায় তখনও তাঁহাকে 'দুশ্চরিত্র,' 'হিংসুক,' 'মাতাল' প্রভৃতি যা'-নয়-তাই বলিয়া, ক্রমাগত কেবল জঘন্য গালি দিয়া, নিজেদের গাত্রদাহ ও কর-কণ্ডূতির পরিচয় দিতে লাগিলেন। আপন বিবেকবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, বঙ্গ-সাহিত্যের শুভোদ্দেশ্যে, শুধু একটা স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করার ফলে, তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলালকে এই-সব উদ্ধত সাহিত্যিকের দ্বারা যেরূপ অযথা নিন্দিত, অপদস্থ ও নির্য্যাতিত হইতে-হইয়াছিল,—আজ পর্য্যন্ত একটা মত-প্রচারের জন্য, কোথায়ও, কোনদিন, কোন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ, প্রবীণ সাহিত্যসেবীকে এমন ভীষণভাবে আক্রান্ত ও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে বলিয়া আমরা দেখি তো নাই-ই,—এরূপ ঘটনা আর তৎপূর্ব্বে কখনও শুনিও নাই কিংবা কল্পনাও করিতে পারি না।

প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে—সাপ্তাহিক, মাসিক বা বেনামী পত্রে,—নানারূপে ও নানাভাবে আঘাতের পর আঘাত অবিরাম, অশ্রান্তবেগে পতিত হইতে লাগিল। পূর্ণ বর্ষত্রয়ের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল সুস্থ মনে,

সহজ স্বস্তির সঙ্গে একটি দিনও যেন নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পান নাই। উপর্য্যুপরি এতদিন ধরিয়া, এরূপ অকথ্য অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াও, প্রায় দুটি বৎসর সম্পূর্ণ নীরবই ছিলেন। কিন্তু, শেষে তিনিও আর এ যাতনা সহিতে না পারিয়া, (১৩১৬ শালের জ্যৈষ্ঠসংখ্যক 'সাহিত্য'-পত্রে) 'কাব্যে নীতি' নামক পুনরায় একটা জ্বালাময়, তীব্র প্রবন্ধ লেখেন; এবং তাহাতে রবীন্দ্রনাথের শিল্প-সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব আধার 'চিত্রাঙ্গদা' নামক কাব্যখানির বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে, কবি-গুরুর এই সব 'অপকৃষ্ট, অক্ষম' অনুকারকগণ যেভাবে তাঁহারই নজীরের দোহাই দিয়া, ক্রমশঃ দুর্নীতিপূর্ণ, অজস্র কবিতার আম্‌দানী করিয়া, এক্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যকে অসার আবর্জ্জনাস্তূপে সমাচ্ছন্ন করিয়া-ফেলিতেছেন,—তদ্বিপক্ষে অতি-প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেন। প্রবন্ধটির বক্তব্য দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষাতে যথোচিত সংক্ষেপে নিম্নোক্ত হইল।—

সাহিত্যে দুর্নীতির বিপক্ষে সংগ্রাম-ঘোষণা ও 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধ-প্রকাশ।

"দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতির দিকে তাঁহারা আমার সহায় হউন। * *

"কবিতা লিখিতে বসিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। নভেল-নাটকেও প্রায় তাই। যেন, পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই,—সব নায়ক আর নায়িকা। * * * তাও যদি কবিরা দাম্পত্য প্রেম লইয়া কাব্য লেখেন, তাহাও সহ্য হয়। ইহাঁদের চাই—হয় বিলাতি কোর্টসিপ, নয়ত টপ্পার প্রেম। নহিলে প্রেম হয় না। অবিবাহিত পুরুষ ও নারী চাই-ই। * * ফল দাঁড়ায় এই যে, এইরূপ প্রেম হয় ইংরাজী, (অতএব আমাদের দেশে অস্বাভাবিক,) না হয় দুর্নীতিমূলক। সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে উভয়েরই উচ্ছেদ আবশ্যক।

"উদাহরণ দিতে হইবে? রবীন্দ্রবাবুর প্রেমের গানগুলি নিন। 'সে আসে ধীরে,' 'সে কেন চুরি করে' চায়', 'দুজনে দেখা হ'লে পথেরি মাঝে' ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গান সবই ইংরাজী কোর্টসিপের গান, তাঁহার 'তুমি যেও না

এখনই,' 'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না' ইত্যাদি গান লম্পট বা অভিসারিকার গান।

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এরূপ গানে মৌলিকতাও নাই। শয্যা-রচনা করা, মালা-গাঁথা, দীপ-জ্বালা—এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ। * * রবিবাবুর খণ্ড কবিতাতেও ঐ একইরূপ পদ্ধতি দেখিতে পাই। নায়িকা ছাড়া রমণীজাতির অন্যরূপ কল্পনা তিনি করেন নাই বলিলেই হয়। * * এ সম্বন্ধে একটি বড় উদাহরণ না দিলে চলে না। রবীন্দ্রবাবুর 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যটি লউন। * * * রবীন্দ্রবাবু কোর্টসিপের অবতারণা করিলেন। 'কোর্টসিপ' নহিলে প্রেম হয়? এ কোর্টসিপে একজন সামান্যা ইংরাজ-নারী সম্মত হইত না; কিন্তু একজন হিন্দু রাজ-কন্যা তাহা যাচিয়া লইলেন। রবীন্দ্রবাবু অর্জ্জুনকে জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। * * * রবীন্দ্রবাবুর গ্রহ-উপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন। অশ্লীলতা ঘৃণার্হ বটে; কিন্তু, অধর্ম্ম ভয়ানক। ঘরে ঘরে বিদ্যা হইলে সংসার 'আঁস্তাকুড়' হয়, কিন্তু ঘরে ঘরে এ চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তেমন বঙ্গদেশে কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেজন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।

"আমি 'চিত্রাঙ্গদার' সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমা-ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পরে এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।

"কেহ কেহ আমায় মনে মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আমি রবীন্দ্রবাবুকেই এত আক্রমণ করি কেন? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি—তাহা না করিয়া কি হরিঘোষকে আক্রমণ করিব? তাহার দোষ কি? সে বেচারী অন্ধ অনুকারক মাত্র। * * রবিবাবুর কবিতার প্রাণহীন অনুকরণের জ্বালায় মাসিক পত্রের সম্পাদক ও পাঠক উভয়েই জ্বালাতন। * * রবিবাবুর গুণগুলি আয়ত্ত করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত, কিন্তু দোষগুলি হুবহু নকল করিতেছেন।"—ইত্যাদি।

প্রবন্ধটির কোন-কোন স্থান অনেকের পক্ষে দুঃসহ তিক্তকর হইলেও, ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য সম্বন্ধে কেহই কোনরূপ বাদানুবাদ বা প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হইলেন না। তবে, 'চিত্রাঙ্গদা'র ব্যাখ্যা লইয়া, রবীন্দ্র-বন্ধু, পরম পণ্ডিত ৺প্রিয়নাথ সেন মহাশয় (উক্ত প্রবন্ধটি প্রচারিত হওয়ার প্রায় পাঁচ মাস পরে,) 'সাহিত্যে'ই একটি প্রতিবাদ-প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন ; এবং তাহাতে সাধ্যমত তিনি তদীয় অনুরক্ত ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ্বরের রচনাকে 'দুর্নীতি'র কলঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া-দিতে যথেষ্ট সচেষ্ট হন। মোটের উপরে, দ্বিজেন্দ্রলালের উক্ত ধারণার 'গোড়ায় গলদ্' প্রমাণ করার জন্য, প্রধানতঃ প্রিয়বাবু এক প্রবন্ধে এই কথাটাই বিশেষ করিয়া বলেন যে, অর্জ্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার প্রথম মিলনের পূর্ব্বে—'কাব্য পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় এবং বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল।' প্রিয়বাবুর মত একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত লোকের এ রকম একটা কথার 'চট্' করিয়া কোন প্রতিবাদ করা ধৃষ্টতা মনে ভাবিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল পুনরপি 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যটি তাঁহার জন দুই প্রতিষ্ঠাবান্, 'সমজ্দার' বন্ধুকে লইয়া খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করেন ; কিন্তু, সেবারেও প্রিয়বাবুর কথিত ঐ 'স্পষ্ট বুঝা যায় এবং বুঝিতে হইবে' বাক্যের তাঁহারা কেহই কোন কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না। যাহাহৌক্, অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলাল আর এসব বিষয়ে মোটে লেখনী-ধারণ করেন নাই। কিন্তু, নিজে নীরব থাকিলেও, প্রিয়বাবুর প্রতিবাদ-প্রবন্ধের এক অতীব তীব্র ও দীর্ঘ, প্রতিকূল সমালোচনা কোন-একজন সর্ব্বজন-পরিচিত, প্রবীণ কবি ও ঐতিহাসিক * (নিজ নাম গোপন করিয়া) 'হিতবাদী'-পত্রে মুদ্রিত করেন ; এবং স্বয়ং প্রিয়বাবু সে সমালোচনাটি পাঠ করিয়া,

* ইনি এখনও জীবিত। সুতরাং, যদিও আমি ইহাঁকে বিশেষভাবে জানি ও চিনি তবু, ইহাঁর সম্মতি না পাইলে, নামটা প্রকাশিত করা অনুচিত বলিয়াই লেখকে বিরত রহিলাম।—গ্রন্থকার।

যে কারণেই হৌক্, তাহার আর-কোন উত্তর দেওয়া উচিত বোধ করেন নাই।

'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধটা উপলক্ষ্য করিয়া এ সময়ে সাহিত্য-সমাজে একটা ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল ; তৎকালে উহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কত রকমের কতই যে প্রবন্ধ, কবিতা, ছড়া প্রভৃতি নানাভাবে গজাইয়া-উঠিয়াছিল, আজ তাহার ইয়ত্তা করাও অসম্ভব।

সাহিত্যিক মত-মন্থনে গরলের উদ্ভব।

সাহিত্য-সাগরে এই বাদানুবাদের অশ্রান্ত ও প্রচণ্ড মন্থনে ঘনীভূত নির্য্যাসসম যে বিষম মর্ম্মদাহী হলাহল উৎপন্ন হইল, একাকী অসহায় দ্বিজেন্দ্রলালই তাহা আকণ্ঠ পূরিয়া পান করিলেন। কতিপয় নবোদ্‌গত সাহিত্যিক এই সুযোগে রবীন্দ্রনাথের কৃপা-দৃষ্টি ও অনুগ্রহ-আকর্ষণের দুরাশায়, আর-কিছু করিতে পারুন আর না পারুন, দ্বিজেন্দ্রলালের মুখে অবিরাম যে হৃৎকার-জনক, অত্যুগ্র বিষ-ধারা বর্ষণ করিতে-লাগিলেন তাহার ফলে তাঁহার দেহ-মন সত্য-সত্যই যেন জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। সেই-সব বিদ্বেষ-বিষাক্ত, ক্রোধোদ্ধত লেখা নিশ্চয়ই যে-কোন সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রের সম্পাদক প্রাপ্তিমাত্র ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেন ; কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ, তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে তৎকালে একটা মাসিকপত্র চালিত হওয়ায় ইহাঁরা বর্দ্ধিতোৎসাহে তাহাতে সেই-সব অমিশ্র কটূক্তি,—পূর্ণ একটা বৎসর ধরিয়া,—মাসে-মাসে, সংখ্যার পর সংখ্যায়,—উদ্ধত অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে থাকিলেন ; আর. দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাতে বাহ্যিক কোনরূপ চাঞ্চল্য বা বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া, নীরব ঔদাস্যের সহিত, সাধ্যমত সে অপমান হাসিয়া উড়াইয়া-দিতে প্রাণপণ যত্ন পাইলেন। এই ব্যাপার উপলক্ষ্যে সে সময়ে তিনি একপত্রে লিখিতেছেন,—

"ব্যাপারটা যে শেষে এতখানি গড়াবে তা আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি।

অশ্রান্ত বেগে, মাসের পর মাস নানারকমে এই যে অকথ্য গালি চলিয়াছে, তাতে কৈ আমার তো একটুও কিছু এল গেল না! তবে, একটা কারণে আমার কিন্তু সত্যি সত্যি আজ খুব অহঙ্কার বোধ হচ্ছে। সেটা এই যে, শুদ্ধ আমাকে গালাগাল দিয়েও বেশ একটা মাসিক কাগজ বাঙ্গালা সাহিত্যে অনায়াসে চালানো যেতে পারে। এটা দেখেও যদি আমার গর্ব্ব না হবে ত কিসে হবে বল! উঃ! কি কাণ্ডটাই না চল্‌ছে! এরা শেষকালে কি বাস্তবিক পাগলই হয়ে গেল নাকি?"

মুখে এইভাবে এসব ঘটনাকে উপেক্ষা দেখাইতে চাহিলেন বটে; কিন্তু,—দ্বিজেন্দ্রলাল, শত হইলেও, মানুষ বৈ ত আর কিছু নহেন? —এ ব্যাপারে ভিতরে-ভিতরে তিনি যে মর্ম্মান্তিক আহত ও বিচলিত হন নাই, নানা কারণে এমন অসম্ভব কথা আমরা কিছুতেই ভাবিতে পারি না।

মানসিক দৌর্ব্বল্য ও অবনতি।

আমরা পূর্ব্বে জানিয়া-আসিয়াছি, প্রথম যখন তিনি রবিবাবুর প্রতিবাদ করিতে লেখনী-চালনা করেন তখন বাস্তবিক তাঁহার মনে কোন গ্লানি বা 'গলদ্' ছিল না। কিন্তু, আপন বিশ্বাসানুসারে, (বঙ্গসাহিত্যের মঙ্গলার্থ,) একটা স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করিতে-গিয়া এমনভাবে যে অযথা তিনি স্বতঃপরতঃ আক্রান্ত হইবেন, একটিবারের জন্যও তাহা তিনি কল্পনা করেন নাই। নিজেও যেমন সরল বিশ্বাসে একটা মত-প্রচার করিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন—প্রতিপক্ষও তেমনই সোজাসুজি এ সম্বন্ধে শুধু ঐ মতটা লইয়াই তাঁহার সঙ্গে যথোচিত বাদ-প্রতিবাদ বা তর্ক-বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু, ঐ মূল মতামতের কথা, তর্কিত আসল বিষয়টি যে কোথায় গেল তাহার ঠিক নাই;—হঠাৎ দলবদ্ধ হইয়া, তাণ্ডব বিক্রমে, যখন একটা উদ্দাম ঔদ্ধত্য অকস্মাৎ আসিয়া, (তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে, স্বভাব-চরিত্রাদি পর্য্যন্ত লইয়া,) অজস্র বিদ্রূপ ও 'অতি-কুৎসিত গালাগালি দিতে

বদ্ধপরিকর হইল তখন,—প্রকাশ্যে কোন কিছু বলুন আর নাই বলুন, মনে-মনে তিনি যে যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতিত, ব্যথিত ও উত্যক্ত হইয়া-উঠিলেন, তদ্বিষয়ে বস্তুতঃ সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। বলা বাহুল্য—দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষেও ইহার পরিণাম অবশেষে একান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে যাহা একটা নিরপেক্ষ সাহিত্যিক অভিমত মাত্র ছিল, এক্ষণে তাহা অন্ধ 'জেদে' প্রবর্ত্তিত হইল; এবং প্রথমে যাহা শুদ্ধমাত্র সাহিত্যের শুভার্থই উদ্দিষ্ট ছিল, এক্ষণে তাহা (দ্বিজেন্দ্রলালের অনিচ্ছা ও সমূহ সতর্কতা সত্ত্বেও,) রবীন্দ্র-বিদ্বেষে অর্থাৎ,—ব্যক্তিগত আক্রোশে পরিণত হইল! দ্বিজেন্দ্রলালের অমন যে উদার ও নির্ব্বিকার মন—যাহা আজীবন অতি-বড় শত্রুরও কখনও অকল্যাণ কামনা করিতে জানিত না,—আজ হায়, তাহা এমনই করিয়া, এই-সব দায়িত্ববোধহীন, চপল লোকের অক্লান্ত চেষ্টায়, শেষে কিনা এহেন দুর্ব্বল ও অনুপায়-ভাবে অবনত ও লাঞ্ছিত হইল!

আপন অজ্ঞাতসারে, দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরের নিভৃত কোন্ এক কোণে এই-যে ভীষণ কীট আসিয়া কখন্ লুকাইল,—তিনি তাহা স্পষ্টতঃ জানিতে বা দেখিতেও পাইলেন না বটে; কিন্তু, মধ্যে-মধ্যে তাহার সেই বিষ-দন্তের জ্বালাময় দংশনে যখন তিনি চকিত ও চঞ্চল হইয়া-উঠিতেন তখনও যে ইহার অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁহার মনে একটু সংশয়েরও উদয় হইত না,—কি করিয়া এমন কথা বিশ্বাস করা যায়! যখন দেখি যে, পাছে তাঁহাকে বস্তুতঃ রবি-বিদ্বেষী বলিয়া ভবিষ্যতে নিশ্চিতরূপে কাহারও কোন ধারণা জন্মে, এই আশঙ্কায়,—আজন্মের একাগ্র সাধনা ও ঐকান্তিক অসীম অনুরাগ, এবং অতখানি শক্তি ও অতটা প্রতিষ্ঠা-প্রখ্যাতি সত্ত্বেও,—তিনি বিশেষ কষ্টের সহিত চেষ্টা করিয়া ক্রমে কবিতা-রচনাই একরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পন্থায় সাহিত্যসেবা করিতে প্রবৃত্ত

হইলেন, তখন বলা বাহুল্য—আমার এ সন্দেহ অনেকাংশে ধারণায় রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। ভগবান্ করুন—আমার এ দ্বিধাস্পষ্ট ধারণা কালের নির্ভুল বিচারে সর্ব্বথা যেন অমূলক বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়; কিন্তু, পরম প্রিয় পাত্র অপেক্ষাও সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখাই যে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক ও একান্ত কর্ত্তব্য তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনব্যাপী আচরণ ও বক্ষ্যমাণ এই ব্যাপারটি হইতেও আমি বিশেষ-ভাবে শিক্ষা লাভ করিয়াছি; সুতরাং, তাঁহার খাতিরেও, এক্ষেত্রে আমি তদীয় আদর্শের অপলাপ করিতে অক্ষম হইলাম।

সত্যনিষ্ঠা। সত্য-প্রচারের অদম্য প্রবৃত্তি ও অপরিহার্য্য প্রকৃতি।

সত্যই—সে জীবনের চরম আদর্শ ও মুখ্য লক্ষ্য ছিল। আদ্যন্ত তজ্জীবনীর পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই—তুচ্ছ লাভালাভ, নিন্দা-খ্যাতি বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থের হিসাব করিয়া, কোনদিনই দ্বিজেন্দ্রলাল কোন কাজ করিতে জানিতেন না। এবিষয়ে তাঁহার 'সাংসারিক বুদ্ধি' এত কম ছিল যে, সময়ে-সময়ে, অবস্থাবিশেষে তাঁহাকে 'নিরেট' নির্ব্বোধ বলিয়া অনেকে অনায়াসে ভাবিতে পারিত। অযাচিত ভাবে, অকারণ, বহু নিষেধ করা সত্ত্বেও, স্বীয় জীবনের এমন অনেক কথা তিনি অনায়াসে আমাকে বলিয়া-গিয়াছেন যাহা কোন মানুষ মানুষকে অমন করিয়া কস্মিন্‌কালেও বলিতে পারে না। এমনই, সকল সময়ে, সর্ব্ব ব্যাপারে, সমস্ত কাজে তাঁহার সম্পূর্ণ খোলাখুলি, শাদাসিধা ব্যবহার ছিল; মনে-মুখে দু'রকম তো ছিলই না,—কার্য্য ও চিন্তায়ও অপূর্ব্ব ঐক্য বা সামঞ্জস্য দেখিয়া অনেক সময়ে আমরা অবাক্ হইয়া যাইতাম। এতটুকু 'কচি' ও 'হাবা' ছেলের মত, স্থান-অস্থান বিচার না করিয়া, যাহা মনে উঠিত,—সোজাসুজি ঠিক তাহাই ব্যক্ত করায়, কতবার যে তাঁহাকে 'অপ্রস্তুত,' ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হইতে-হইয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। হয়ত একজনের সঙ্গে তেমন-কোন ঘনিষ্ঠতা কি 'জানা-শোনা'

নাই,—অথচ ঠিক তাহার মুখের উপর, তাহারই বিশেষ-একটা দোষ বা অন্যায় (এক-ঘর লোকের সমক্ষে) এমন নির্লজ্জ অসঙ্কোচে বলিয়া-বসিলেন যে, সে ব্যক্তি তাঁহার তদ্রূপ বে-আদপী দেখিয়া চিরদিনের মত তাঁহার প্রতি জাতক্রোধ তো হইলই,—ঘর-ভরা যত লোক তাহারাও তাঁহাকে নিতান্ত অভদ্র ও অহঙ্কারী বলিয়া ধারণা করিয়া-লইল। এমন ঘটনা কেবল যে একবার বা একদিন তাহা নহে,—'হামেষা' প্রায়ই ঘটিতে দেখিতাম। বিশদভাবে দু'একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা আরও স্পষ্ট হইবে।—

দ্বিজেন্দ্রলাল চিরটাকাল গভর্ণমেণ্টের উপাধির উপরে 'হাড়ে চটা' ছিলেন। একদিন একজন 'আন্‌কোরা' খেতাবী ডেপুটী তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে-আসিয়া স্ফূর্ত্তির আতিশয্যে খুব খানিকটা আত্মীয়তা দেখাইয়া, তাঁহাকে বলিলেন,—

"বলি, Mr. দ্বিজু, তুমি কেমনধারা লোক হে? আমি 'টাইটেল' পাওয়ায় বিশ্বশুদ্ধ সবাই আমায় আজ congratulate কর্‌ছে, আর তুমি কিনা আপনার লোক হয়ে' আমার একটা খোঁজও নিলে না?"

শুনিয়াছি দ্বিজেন্দ্রলাল তদুত্তরে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখের উপরে বলিলেন,—

"হা আমার কপাল! বলি, তোমায় যে সরকার বাহাদুর আসলে ঠাট্টা করেছেন, তা'ও বুঝি বুঝ্‌লে না? তা' নইলে তোমার মত অশিক্ষিত লোকেরও খেতাব মেলে!"

অবশ্য, বলা বাহুল্য—কথাগুলি দ্বিজেন্দ্রলাল হাসিতে-হাসিতে বলিয়াছিলেন; কিন্তু, এরূপ অপ্রিয় বাক্য সে ভদ্রলোকের কর্ণ-পটহে যে সুধা সেচন করে নাই তাহা সহজেই অনুমেয়। ফলে, উক্ত ডেপুটিবাবুও এ অপমানটা যে বিশেষ সরল বা ভালো ভাবে গ্রহণ করিলেন তাহা নহে। শুনা যায়—প্রতিশোধ লওয়ার জন্য, অতঃপর গুপ্ত-পুলিশের খাতায় ইনি নাকি দ্বিজেন্দ্রলালের নামে কয়েকটা

অতি-সাংঘাতিক, মিথ্যা অভিযোগ ভরিয়া-দিয়া তবে নিশ্চিন্ত ও ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

আর-এক দিনের এমনই-একটা বিরক্তিকর ব্যবহারের কথা আমার বেশ মনে পড়িতেছে। জনৈক নবোদ্গত নাট্যকার একখানি নাটক লিখিয়া-আনিয়া, দেখিবার জন্য তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে রাখিয়া যান। দিন দুই পরে ঐ ভদ্রলোক পুনরায় তাঁহার কাছে আসিয়া, বহুক্ষণ যাবৎ নানারকম নির্লজ্জ স্তুতিবাক্যে অকারণ তাঁহার তোষামোদ করিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তির ধারণা ছিল,—দ্বিজেন্দ্রলাল ইহাতে বুঝিবা খুব খুসী হইবেন; এবং তদ্দ্বারা তাঁহার মনোগত আসল মৎলবটিও সুসিদ্ধ হইতে (অর্থাৎ—নাটকখানি রঙ্গালয়ে অভিনীত হইতে) বিলম্ব ঘটিবে না। কিন্তু, খানিকক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন—তাঁহার অতখানি শ্রম ও সাধনার ফল একেবারে বিপরীত দাঁড়াইল।

"আপনি তো এ দেশের একজন আদর্শ মহাপুরুষ। সত্য বলিতে কি,—বাস্তবিক এই আপনাকে আমি যত ভক্তি করি, এ জগতে তেমন আর আমি কাহাকেও করি না। চরিত্রের কথা না হয় না-ই তুলিলাম। কিন্তু, আপনার মত নাট্যকার, আপনার মত এত-বড় কবি, (অবশ্য এক ঐ Shakespeare ছাড়া) আর কয়জন জন্মিয়াছে?"—

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, ভদ্রলোক খুব উৎসাহের সঙ্গে আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া, সম্মতি লাভের আশায় বলিলেন—'কি বলেন মহাশয়? এমনটি আর,—হুঁঃ!'—মুখের কথা মুখেই রহিয়া-গেল! দাঁড়াইয়া-উঠিয়া, উদ্দীপ্ত মন্যু (Indignation) প্রভাবে, দৃপ্ত-উত্তেজিত কণ্ঠে দ্বিজেন্দ্রলাল কহিলেন,—

"ওঃ! আপনি এতদূর নির্লজ্জ, এমন অপদার্থ তা' আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি। নিজে যতটা অধঃপাতে গেছেন তা'ই ঢের; আর ও ভদ্রলোককে আপনার দলে টানবেন না,—দোহাই আপনার! আমার চেয়ে আপনি আর জগতে আদর্শ পুরুষ খুঁজে পাননি—না? (উচ্চ হাস্য) বটে!! আমাকে

আপনি যত ভক্তি করেন এমন আর কাউকে করেন না,—কেমন? উঃ! এ কি ভীষণ, জঘন্য খোসামোদ! আপনার পিতা জীবিত—মা-ও বোধ হয় আছেন; আপনি অম্লান মুখে এই কথা ভদ্রসন্তান হ'য়ে বল্‌তে পার্‌লেন? একটু বাধ্‌লও না? মহাশয়, কি আর বল্‌ব?—ধন্য, ধন্য আপনি!!"

এই-না বলিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল সেই কক্ষের 'মেঝে'র উপরে একেবারে 'সটাং' শুইয়া-পড়িয়া, সে ব্যক্তিকে সত্য-সত্যই এক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন, এবং দাঁড়াইয়া-উঠিয়া আর-একবার করযোড়ে তাঁহাকে নমস্কার করিতে-করিতে বলিলেন—'আবার বলি ধন্য, আপনিই ধন্য!' আমরা তো অবাক্! সে ভদ্রলোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া যথার্থ তখন কি যে দুঃখ হইল তাহা আর কি বলিব। আহা! ভদ্রলোক তখন 'কাঁদ-কাঁদ'মুখে, 'যা-মুখে-আসিল-তাই'—অসংলগ্ন ভাবে কি-যে সব বলিলেন, আমার তা' ছাই এখন মনেও পড়িতেছে না। কিন্তু, কোনমতে তখন যে তিনি দু'চার কথা বলিয়া উঠিয়া-পালাইবার পথ খুঁজিতেছিলেন তা' তাঁহার ভাব-গতিক দেখিয়াই বেশ বুঝা গেল। ব্যাপারটাকে উপস্থিত মত চাপা দিবার জন্য আমি তখন তাড়াতাড়ি দ্বিজেন্দ্রলালকে কহিলাম—"উনি বোধ হয়, সেই নাটকের খাতাখানা নিয়ে যেতে এসেছেন। সেটা আপনার পড়া হয়েছে তো?" ভদ্রলোকটি আমার দিকে কৃতজ্ঞ-করুণ দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সেই জন্যই—।" "এই নিন্ মহাশয়, আপনার সেই খাতা,—আমি রক্ষা পাই!" এই বলিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল উঠিয়া-আসিয়া সে ব্যক্তিকে খাতাখানি দিলেন; এবং তিনি গমনোদ্যত হইয়া 'কেমন লাগ্‌ল?' জিজ্ঞাসা করায় দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন,—

"কথা দিয়েছিলাম; তাই, বাধ্য হ'য়ে শেষ পর্য্যন্তই পড়ে' দেখেছি, মহাশয়। কিন্তু আপনার কথামত সংশোধনাদি কর্‌তে পারিনি,—মাপ কর্‌বেন। সত্যি বল্‌তে কি—এ বই'টার ত্রুটী সংশোধন করার চেয়ে, নতুন একখানা বই

বরং আপনাকে লিখে দেওয়া ঢের বেশী সহজ। নাটক হিসাবে বইটা কিছু হয় নি। তবে আপনি অন্যরকম প্রবন্ধাদি লিখ্‌তে চেষ্টা কর্লে খুব সম্ভব সফল হবেন। আপনার ভাষায় খাসা দখল।"

বলিতে কি—ভদ্রলোকটি সেখানে আর তিলার্দ্ধ দেরি না করিয়া, ক্ষিপ্রগতি সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

কথায়-কথায় আমরা বোধহয়—একটু বেশি-দূর চলিয়া আসিয়াছি। কিন্তু, এসব কথা বলার আমার উদ্দেশ্য এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল আসলে যে কি ধাতের মানুষ, তা' এতদ্দ্বারা সকলে হয়ত কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারিবেন। এমনই খাঁটি সত্যনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন তিনি;—কল্পনা, কথা ও কার্য্যে তাঁহার এতটুকুও বৈষম্য ঘটিবার উপায় ছিল না,—তাঁহার সদর বৈঠকখানায় বসিয়াই অন্দরের সমস্ত খবর আপনা হইতে জানিতে পারা যাইত। সরলতা, সহৃদয়তা, স্পষ্ট-বাদিতা বা তেজস্বিতা,—যতই-যাহা বলুন না,—মূলে, একমাত্র ঐ সত্যনিষ্ঠা হইতেই তৎসমূহ সে জীবনে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। বাস্তবিক, সত্যের খাতিরে তাঁহার অসাধ্য যে দুনিয়ায় কিছু ছিল, এমনটা ভ্রমেও মনে করিতে পারা যায় না। ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, ইহাঁদের তো কথাই নাই।—তাঁহার অতি-বড় শত্রুও কোনদিন এমন অপবাদ বোধ হয়, তাঁহার বিপক্ষে আভাসেও উত্থাপন করিতে সাহস পান নাই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল কথায় বা কার্য্যে কখনও কাপট্য বা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই কাপট্য ও মিথ্যাচারের যুগে যে-লোকটা জীবনে কখন একটা মিথ্যা কথা পর্য্যন্ত বলেন নাই, তাঁহার দিব্য জীবন যে কি অমূল্য উপাদানে গঠিত, তাহা বুঝি—আমাদের মত হীনমতি ব্যক্তির কল্পনা করাও অসম্ভব। যৌবনারম্ভে এই সত্যনিষ্ঠার ফলে, নামমাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তিনি সমাজে উঠিলেন না,—সেই বয়সে আত্মীয়-বান্ধব-বিচ্ছেদের দুঃসহ-দারুণ

দুঃখকেও তিনি গণনার মধ্যে আনিলেন না, এবং সামাজিক শতবিধ উৎপীড়ন ও উপেক্ষাকেও তিনি তিলার্দ্ধ অনিষ্টকর বলিয়া অণুমাত্রও বিচলিত বা উদ্বিগ্ন হইলেন না। এজন্য, তিনি কখনও কোথায় যেন একটা কবিতা পড়িয়া-আসিয়া, অধীর আনন্দে, একদিন সেই দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে হাঁটিয়া-গিয়া, কবি করুণানিধানকে প্রেমভরে বুকে জড়াইয়া ধরিতেছেন; কখনও গভর্ণমেণ্টের পদস্থ কর্ম্মচারী হইয়াও, 'স্বদেশী'র পূরা 'মরশুমে'র মুখে, প্রকাশ্য পথে ও সভাস্থলে গিয়া স্বয়ং গান গাহিয়া বেড়াইতেছেন; কখনও খোদ ছোট লাটের সঙ্গে অসঙ্কোচে বচসা বাধাইয়া, আপন পার্থিব পদোন্নতির পথ চিরতরে বিঘ্নসঙ্কুল করিতেছেন; কখনও সমাজের ভিতরে থাকিয়াও তাহারই সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সকল রকম ভণ্ডামী, 'নষ্টামী' ও অন্যায়ের উপরে দুর্দ্দম বিক্রমে নির্ব্বিচারেই ভীষণ কশাঘাত চালাইতেছেন; এবং কখন নির্লজ্জ স্পষ্টবাদিতায় পরমাত্মীয় ও গুণগ্রাহীদের বিরাগ জন্মাইয়া, (হয়ত তাঁহাদিগকে পর বানাইয়া,) পরক্ষণে আবার তাঁহাদেরই বিয়োগ-ব্যথায় কাঁদিতে বসিতেছেন! দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনব্যাপী এই-সব আচার-ব্যবহারের বিষয় যখন একটু 'থিতাইয়া,' তলাইয়া, ভাবিয়া-দেখি, যখন এ-সব বিষয় একটু শ্রদ্ধা ও সহমর্ম্মিতার সহিত বিবেচনা পূর্ব্বক বিচার করি, বাস্তবিক তখন পাঁচকড়ি বাবুর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া, এ কথা অকপটেই স্বীকার করিতে হয় যে, মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল সত্যসত্যই যেন সত্য ও 'সারল্যের অবতার' ছিলেন। প্রত্যুতঃ, তাঁহার স্বাভাবিক ধাত্‌ই এমন-এক আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত ধরণের ছিল যে, কোন-রকমে কোথাও কোনরূপ অন্যায় বা অসত্য দেখিবামাত্র, (ব্যক্তিগতভাবে তাহাতে তাঁহার নিজের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি থাক্ আর না-ই থাক্,) তাহা প্রাণান্তেও তিনি একেবারে 'বরদাস্ত্' করিতে পারিতেন না। এই হেতু, বলিতে

কি—তাঁহার সেই স্বভাব-কোমল, মধুময় প্রকৃতি সময়ে-সময়ে এত উগ্রভাব ধারণ করিত যে, তৎকালে তাঁহাকে দেখিলে সত্যই সহজে বিশ্বাস হইত না যে, এই ব্যক্তিই আমাদের সেই সদানন্দ দ্বিজেন্দ্রলাল!

এই-সব কারণে, তাই, আমাদের অকপট বিশ্বাস—মূলে, বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণ-কল্পেই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমতঃ ঐ কাব্যের 'অস্পষ্টতা' ও 'দুর্নীতির' বিপক্ষে একক ও সহায়হীন হইয়াও, ঐ ভাবে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে উদাহরণতঃ, রবিবাবুর রচনাকে প্রসঙ্গক্রমে অতটা বিশ্লেষণ-বিচার করিয়া তিনি যদি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ (যাহা তাঁহার স্ব-ধর্ম্ম) না করিতেন ত' নিশ্চয় তাঁহাকে কোনরূপ নিন্দিত বা নির্য্যাতিতও হইতে হইত না। কিন্তু, আপন ধারণা বা বিশ্বাসমত, প্রকৃত সত্য-প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হওয়া, এক হিসাবে যেমন তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক ও অসাধ্য ছিল, অন্য দিকে আবার অমন একজন মহাশক্তিমান্‌কে প্রতিপক্ষ না পাইলে, আসলে তাঁহার এ কার্য্যের কোনরূপ আবশ্যকতা বা সার্থকতাও লোকে স্বীকার করিত না; এবং ফলে, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইত বলিয়া মনে হয় না। দ্বিজেন্দ্রলাল একবার আমাকে তাঁহার এইরূপ অযাচিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অপ্রীতিকর প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা লিখিয়াছিলেন, এখানে তাহার একাংশ হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া-দিলে মন্দ হইবে না। উক্ত পত্রের * এক স্থলে তিনি বলিতেছেন,—

"আমি বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে বা এদেশে আর কিছু না করে থাকি,—চিরকাল অন্যায়, অসত্য ও Hypocrisy ('ভণ্ডামি বা কপটতা') Expose ('উদ্ঘাটন') করে' এসেছি। দৌর্ব্বল্যকে যদি কখনও আক্রমণ করে থাকি—একশবার ক্ষমা প্রার্থনা কর্ব্ব। কিন্তু অন্যায়, ন্যাকামী ও Hypocrisy ('ভণ্ডামি') দেখ্‌লেই

* গয়া।—১২।৭।'০৩।

আমার মেজাজ ঝাঁ করে' উষ্ণ হ'য়ে উঠে। কি কর্ব্ব বল! সে আমার স্বভাবগত ধর্ম্ম,—কিছুতে পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি না।"

সুতরাং, এ অবস্থায়, যতদূর জানা যায়—সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই-যে দুইটি বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রতিকূলতায় প্রবৃত্ত হইলেন, এ জন্যই তাঁহাকে আমরা অযথা দোষী সাব্যস্ত করিলে বাস্তবিক অত্যন্ত অন্যায় হইবে।

বক্ষ্যমাণ ব্যাপারের দোষ-গুণ বিচার।

সুহৃত্তমের সঙ্গে আমার যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে, নিজের অজ্ঞাতেও, হয়ত এ ব্যাপারে আমি তাঁহার পক্ষপাত করিতেছি,—এরূপ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। পাঠকগণের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য নিঃসম্পর্ক, কয়েকজন সুশিক্ষিত, বিবেচক ব্যক্তির মন্তব্য আমি এ ক্ষেত্রে মুদ্রিত করিয়া দিলাম। পাঠক দেখুন তাঁহারা কি বলিতেছেন।

(ক) 'চট্টল-চন্দ্র' কবি শশাঙ্কমোহন সেন বি-এল মহাশয় তদীয় 'বঙ্গবাণী'-গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে একত্র লিখিতেছেন—

"* * বঙ্গসাহিত্যে এমন শক্তিধর এবং সৌভাগ্যজন্মা পুরুষ কে আছেন যিনি এই বিপত্তি হইতে সমুচিত দৃষ্টান্তে বঙ্গসাহিত্যকে রক্ষা করিতে পারেন? এই ভণ্ডতা এবং ভাবোন্মত্ততা,(?) এই Prettiness বা 'মেয়ে-মুখো' এবং 'মুখচোরা' ভাবই যে সাহিত্যে শালীনতা বা ভব্যতার একান্ত লক্ষণ নহে, উহা কথায়—কার্য্যে প্রমাণিত করিতে পারেন? * * দ্বিজেন্দ্রলাল কথায়, কার্য্যে এ বিদ্রোহের সূচনা করিয়াছিলেন। * * ঋজুতা ও বস্তুভিত্তি এবং ভাবসংযম, এ ক্লাসিক আদর্শের কাব্য-শিল্পের প্রধান শক্তি; দ্বিজেন্দ্রলাল এই ক্লাসিক আদর্শে পরিচালিত হইয়াই, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের অত্যন্ত প্রবল অস্পষ্টতা-আদর্শের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন; উচিত, উপযুক্ত সময়েই করিয়াছিলেন। * * কিন্তু একেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল অসহায়*। তবে এ বিদ্রোহ-ঘোষণার ফল উত্তরোত্তর শুভদায়ী হইতেছে। আমরা জানি দ্বিজেন্দ্রলালের এই কার্য্যকে নানা জনে নানাভাবে গ্রহণ করিয়াছে। * * কিন্তু আমরা দেখিতেছি

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বকীয় শিল্প-আদর্শের হিসাবে উক্তরূপ প্রতিষেধ উচ্চারণ না করাটাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। * * উহা হইতে বঙ্গসাহিত্যের লাভই দাঁড়াইয়াছে।**বঙ্গসাহিত্যে দুইটি ঘটনা লিপি-বদ্ধ থাকিবে, যদ্দ্বারা সাহিত্যের জীবন বিশেষভাবে অগ্রসর হইয়াছে। প্রথম হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দ্বারা হৃদয় খুলিয়া মধুসূদনের সমর্থন; দ্বিতীয় দ্বিজেন্দ্রলাল কর্তৃক হৃদয় খুলিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রণালী বিশেষের প্রতিষেধ। ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, এইরূপ কার্য্যের দ্বারা আসন্ন পক্ষগণের কিছুমাত্র লাভ নাই; বরং ব্যক্তিগত প্রীতি-সম্পর্কের হিসাবে সবিশেষ ক্ষতি। * * কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের পাঠসংঘ, বিশেষতঃ এই সাহিত্যের সেবকবৃন্দ উক্ত কার্য্য হইতে যথেষ্টমতে লাভবান্ হইয়াছে। এই লাভের সুস্পষ্ট উপলব্ধি ঘটিতে এখনও বিলম্ব আছে। * * *" ইত্যাদি।

(খ) দ্বিজেন্দ্রলালের দক্ষ ও নিরপেক্ষ চরিত-লেখক, সুখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ বি-এ, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"এই বাদানুবাদের কথা স্মরণ করিলে মনে হয়, দ্বিজেন্দ্র যে দুর্নীতির প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন তাহার জন্য তিনি বাণীভক্ত মাত্রেরই আন্তরিক ধন্যবাদার্হ। * * দ্বিজেন্দ্রলাল এ বিবাদ ব্যক্তিগতভাবে দেখেন নাই। * * *

"* * তিনি যে সমালোচকের উচ্চ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়াই এই সাহিত্য-সমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছায় বা অপর কোনরূপ স্বার্থ-চিন্তায় প্রণোদিত হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, ইহা আমাদের ধ্রুব ধারণা।"

আমরাও বলি—সাধু! সাধু! নবকৃষ্ণবাবু দূর হইতে, নিরপেক্ষ বিচারে এই-যে প্রকৃত তথ্যটি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন; দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত না মিশিয়া, তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি ও সহৃদয়তা লাভে তৎপ্রতি আকৃষ্ট বা অনুরক্ত না হইয়াও যে এমন 'নিছক' সার সত্যটি বুঝিয়া-লইতে সমর্থ হইয়াছেন, এজন্য প্রকৃতই তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

(গ) রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও গুণ-মুগ্ধ ভক্ত, মনস্বী ৺লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় আমার প্রশ্নোত্তরে, এ সম্পর্কে তাঁহার অতি-সংক্ষিপ্ত যে বক্তব্যটুকু জানাইয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ উভয় দলভুক্ত ব্যক্তিগণের কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক হইবে। 'দুই কূল বজায় রাখিয়া' বন্ধুবর বলিতেছেন,—

" 'সোনার তরী' নিয়ে দ্বিজুর সঙ্গে আমারই প্রথম ঘোর Discussion ('বাদানুবাদ বা আলোচনা') হয়। আপনিও জানেন—তারি ফলে তিনি ঐ প্রবন্ধটা লিখেছিলেন। কিন্তু কি কুক্ষণেই তিনি এটা লিখ্লেন!—তাঁর উদ্দেশ্য না বুঝে, কয়েকজন Irresponsi'le ('দায়িত্বহীন') লোক তাঁকে এর জন্য নাস্তানাবুদ কর্ত্তে লাগ্লেন। দ্বিজু রবিবাবুর Real admirer, ('প্রকৃত ভক্ত বা গুণগ্রাহী') ছিলেন;—তাঁকে রবি-বিদ্বেষী বলা খুব ভারী বে-আদপী ও অন্যায়। 'কাব্যে নীতি' প্রবন্ধটা সম্বন্ধেও The same blunders repeated over again. ('সেই একই প্রমাদের পুনরভিনয় হ'ল'।) He never actully meant anything bad when he wrote it. ('ওটা যখন লেখেন তখন বাস্তবিক তাঁর কোন বদ্ মতলব ছিল না'।) তবে অত Strongly ('কঠোর ভাবে') চিত্রাঙ্গদা ও রবিবাবুর কথা না বলাই উচিত ছিল,—ঐখানেই তাঁর দোষ হয়েছে। কিন্তু দ্বিজু যখন যা'ই ধর্তেন, Half-heartedly ('দু'নো-মনা' ভাবে বা আধা-আধি রকমে') কর্ত্তে পার্ত্তেন না। তাঁর nature'ই (প্রকৃতিই) সে বিষয়ে বাধা ছিল। ব্যাপারটা যে শেষে এমন শোচনীয় দাঁড়াবে, তখন জান্লে, I would never have allowed him to rush into print at all. (কখনও অমন 'সাত তাড়াতাড়ি, তাঁকে ও-সব মোটে ছাপ্তেই দিতুম না।')

(ঘ) তারপর, আদর্শ গৃহাশ্রমী, দেশ-পূজ্য ব্রাহ্মণ, সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়—যাঁহাকে একদিন স্বয়ং আমাদের রবীন্দ্রনাথই 'সমাজপতি' পদে বরণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছিলেন,* —এ সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, উপসংহারের হিসাবে,

* স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথের লিখিত 'স্বদেশী-সমাজ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—গ্রন্থকার।

এখানে তাহা চরম সিদ্ধান্তরূপে বিবৃত করিয়া আমি এখন বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে ইচ্ছা করি। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে দর্শন করিতে-গিয়া, এই জীবনী সম্বন্ধে কথা উঠিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে,—

"আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্নীতিকে যেভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আপনার কি মনে হয়?"

পূজ্যপাদ গুরুদাস বাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, দুলিতে-দুলিতে কহিলেন,—

"তিনি ঠিক উপযুক্ত সময়েই, মাতৃভাষার মঙ্গলের জন্য সাহিত্যসেবীদিগকে সতর্ক করিয়া গিয়াছেন।"

আমি বলিলাম—

"এজন্য কিন্তু তাঁহাকে অনেক নির্য্যাতন ভুগিতে হইয়াছিল। সে সময়ে নানাজনে তাঁকে এজন্য, এমন কি—গালাগালি পর্য্যন্ত দিয়েছেন।

শুদ্ধ-সত্ত্ব সার্ গুরুদাস একটু হাসিয়া-বলিলেন,—

"সেই তো তাঁর আরও বিশেষত্ব। তিনি যে এই Consequence (পরিণাম) জানিয়া-শুনিয়াও এতটা সাহস করিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতেও কি তাঁহার সৎসাহস ও মনোবলেরই পরিচয় পাওয়া যায় না? মা'কে তিনি যথার্থ ভালবাসেন, ভক্তি করেন, মা বলিয়া ভাবিতে জানেন, তিনি কি নিজের একটু নিন্দার ভয়ে মাতৃমন্দিরকে কলুষিত হ'তে দিতে পারেন? এই মহান্ আদর্শ, দিব্য চেতনা দেশবাসীর অন্তরে জাগাইয়া-দেওয়ায় তিনি নিশ্চয়ই সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। * *"

এস্থলে অবশ্য একটা কথা স্পষ্ট করিয়া জানান আবশ্যক যে, এই অজাত-শত্রু মহাজন ঐ-যে মন্তব্যগুলি ব্যক্ত করেন তন্মধ্যে তিনি একটিবারও রবিবাবুর কোন প্রসঙ্গ—এমন কি, নামটি পর্য্যন্তও উল্লেখ করেন নাই। গুরুদাস বাবু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সাধারণভাবে, শুধু দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই আপন অভিমত আমার কাছে উক্তরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

যাহাহৌক্, প্রথম-প্রথম আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের মনে রবীন্দ্রবিদ্বেষ বা হিংসার কোন লক্ষণ বা আভাস দেখিতে পাই নাই। কিন্তু, ইহার পরে, অশ্রান্ত বেগে তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ এমন অন্যায় আক্রমণ করায়, তিনিও মনে-মনে রবিবাবুর উপরে বিরক্ত, বিদ্বিষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। আমি জানি—তাঁহার তখন মনে এ ধারণাও জন্মিয়াছিল যে, এই-সব আক্রমণকারীদিগকে 'লাই' দিয়া রবিবাবুই তাঁহার বিরুদ্ধে অমন করিয়া ক্রমাগত লেখাইতেছেন। কি দুর্দ্দৈব!

পরিণাম।

যাহাহৌক্, ফলে সেই-যা' বলিয়াছি তাহাই দাঁড়াইল। আমাদের কাছেও কিছু না বলিয়া,—আভাসেও আমাকে কোন-কিছু জানিতে না দিয়া,—গোপনে এই সময়ে তিনি রবিবাবুর প্রতি প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণের জন্য যোগাড়-যন্ত্র আরম্ভ করিয়া-দিলেন। মনের এই শোচনীয় দুর্দ্দশা ও অস্বাস্থ্যের অবস্থায়, অন্যের অগোচরে, তিনি রবিবাবুকে ভীষণভাবে ও অতি অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়া 'আনন্দ-বিদায়' প্রহসনখানা সম্পূর্ণ করেন; এবং বিন্দু-মাত্র কাল-বিলম্ব না করিয়া, যথাসম্ভব শীঘ্র সেখানা একেবারে প্রকাশ্য 'ষ্টার'-রঙ্গালয়ে অভিনয়ও করান হয়।

আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না। যেদিন অভিনয় হইবে,—সব ঠিক হইয়া-গিয়াছে, সেইদিন কি-একটা বিশেষ আবশ্যকে বহুকাল পরে কলিকাতায় আসিয়া, হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বন্ধুর কাছে সমস্ত ব্যাপার শুনিলাম। তদ্দণ্ডেই আমি বন্ধুবরের কাছে গিয়া এ ব্যাপার হইতে নিরস্ত হওয়ার জন্য তাঁহাকে বারংবার অনুরোধ করি ও পুস্তকখানা অভিনয়ের পূর্ব্বে একবার দেখিতে চাই। বইটা তখনও প্রেস হইতে ছাপিয়া আসে নাই; কাজেই, দেখিতে পাইলাম না। হাসিতে-হাসিতে দ্বিজেন্দ্রলাল

'আনন্দ-বিদায়ের' প্রচার, রঙ্গালয়ে অভিনয় ও দ্বিজেন্দ্রলালের অনুতাপ।

বলিলেন,—"ওহে, আগে অভিনয়টা দেখ, তারপরই না হয় অত গালাগাল দিও। এখনই অত চট্‌ছ কেন?" অভিনয় দেখিতে গেলাম। বলা বাহুল্য—অভিনয় দেখিতে-দেখিতে আমার এত দুঃখ ও বিরক্তি বোধ হইতে-লাগিল যে, আমি তখনও বিশেষ করিয়া বারংবার অভিনয়টা বন্ধ করাইয়া-দিবার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালকে বলিয়াছিলাম; কিন্তু, তখন আর সে উপায় ছিল না। যাক্, অভিনয় তো শেষ হইল। কিন্তু, যতক্ষণ অভিনয় চলিয়াছিল, এবং যখন সব শেষ হইয়া-গেল তখনও, দ্বিজেন্দ্রলালের মুখের দিকে আমি যতবারই চাহিলাম, দেখিলাম—উহা অস্বাভাবিক বিকৃত ও বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; বোধ হইল—যেন তৎকালে তাঁহার অন্তরে দারুণ অনুশোচনার উদয় হইতেছে। বাড়ি ফিরিবার সময়ে, গাড়ির ভিতরে একবার দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন,—"কিরকম বুঝ্‌ছ?" আমি বলিলাম—"এতদিন পরে, এই-আজ আপনি আত্ম-হত্যা করিলেন!" ইহার পর, আমার সঙ্গে তিনি আর কোন কথা বলিলেন না; মনে হইল—যেন ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু, বন্ধুবরের জন্য তখন আমার মনে এই যাতনা হইতেছিল, এবং বাস্তবিক এই অভাবিত ব্যাপারে আমি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, প্রাণপ্রিয় বন্ধুর অমন বিকৃত মুখ দেখিয়াও, আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য একটী কথাও বলিতে পারিলাম না। পরদিন সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার কাছে গেলাম। দেখি—তখন তিনি শুষ্ক মুখে বসিয়া আছেন। সমবেত বন্ধুরা নানাজনে নানারকম হাসি-তামাসা করিতেছেন; কিন্তু, তিনি নীরব, বিমর্ষ চিন্তান্বিত। আমি যাইবামাত্র মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল গৃহের বহির্দ্বার পর্য্যন্ত উঠিয়া-আসিয়া সহসা আমাকে সবেগে বক্ষে চাপিয়া-ধরিলেন; এবং আমার হাত ধরিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী নিভৃত বারেন্দায় আসিয়া গাঢ় স্বরে বলিলেন—"দেখ, তোমার কথাই ঠিক। সত্যই এটা আমার অত্যন্ত ভুল হ'য়ে গেছে। আমি

আর এমন কাজ করব না। তুমি ভাই, কিছু মনে কো'রো না যেন!" আমার প্রাণটা যেন কেমন করিয়া-উঠিল। বলিলাম—"এতক্ষণে তা' হ'লে বুঝেছেন তো কি অন্যায় হ'য়ে গেল?" একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, (শব্দটা আজও যেন আমার কানে লাগিয়া-আছে!) সত্যনিষ্ঠ বন্ধু-আমার বলিলেন—"সেই থেকে, বলব কি তোমায়,—আমার ভিতরটা যেন জ্বল্‌ছে। অন্যায়ই যদি না করে' থাকি ত' এত কষ্ট হচ্ছে কেন? তর্ক করে' আমি হয়ত এখনও এটা প্রমাণ করতে পারি যে, কাজটা কিছু দোষের হয়নি। কিন্তু, (বুকে হাত রাখিয়া) এইখানেই যে সব তর্কের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত! এর চেয়ে আর প্রমাণ কি আছে?" সমবেদনায়, গর্ব্বে ও আনন্দে—একটা মিশ্রিত ভাবের তাড়নায়—আমার চোখে জল আসিল। মানুষ এত সরল, এমন মহৎ,—এতদূর সত্যবাদী হইতে পারে? এত-বড় পদস্থ লোক এমন করিয়াও আত্মদোষ স্বীকার করিতে পারেন?—অবাক্ হইয়া গেলাম! বন্ধুর অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিয়া, নিজেকে সত্যই আজ ধন্য মনে করিলাম যে, এমন লোকেরও স্নেহ লাভ করিতে পারিয়াছি। যাহাহৌক্, অতঃপর আর সে স্থানে এ ভাবে বিলম্ব করা উচিত নহে ভাবিয়া বলিলাম—"আর এখানে এমন 'ফুস্-ফুস্' করা ভাল নয়; এখন ঘরে চলুন। বইটাকে কিন্তু তা' হ'লে Out of Print করে' দিন।—আর যেন এর থিয়েটারেও অভিনয় হয় না।" বলা বাহুল্য—রঙ্গালয়ের অভিনয় অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলালেরই কথামত বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু, আবার কোন-কোন 'বন্ধু'র পারমর্শে, পরে কি ভাবিয়া জানি না, তিনি বইটার বিক্রয় বন্ধ হইতে দিলেন না।

এ ক্ষেত্রে আসল কথা যা' আমি জানিতাম, অকপটে তাহা বলিয়া দিলাম। অসহায় দ্বিজেন্দ্রলাল সাময়িকভাবে অবশ্য এ ব্যাপারে অপরাধী হইলেন; কিন্তু, যে-সব অপরিহার্য্য কারণে সাময়িক

উত্তেজনার বশে তাঁহার এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল, একটু ভাবিয়া দেখিলে, তজ্জন্য তাঁহাকে একেবারেই অমার্জ্জনীয় গণ্য করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল 'শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ,' স্বর্গ-চ্যুত অবতার ছিলেন না। অকারণ, 'যেন তেন উপায়েন,' সত্য চাপা দিয়া, তাঁহাকে একেবারে আদর্শ পুণ্যাত্মারূপে প্রতিপন্ন করিতে-যাওয়া, শুধু যে লজ্জাকর, জঘন্য স্তাবকতা তাহা নহে; তাহাতে বরং আমাদের দেব-তুল্য দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতেও অসহায়রূপে বঞ্চিত করিয়া, পরিণামে দেশের কাছে উপহাসাস্পদই করিয়া-তোলা হইবে। মূলে, কেবল মাত্র মাতৃভাষার মঙ্গল-উদ্দেশ্যে তিনি পরিণাম-চিন্তা বিস্মৃত হইয়া, এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু শেষে, অবিরাম অকথ্য উৎপীড়ন ও অত্যাচারের ফলে,—মানুষ তিনি,—যদি একবার আত্ম-বিস্মৃত ও বিপথগামী হইয়াই-থাকেন, তাহাতে এমনই বা কি 'মহাভারত অশুদ্ধ' হইয়া গেল? সাময়িকভাবে একটিবার মাত্র যেমন তিনি এই বিষম ভুল করিলেন;—অনুতপ্ত তিনি, তেমনই আবার পরক্ষণেই কি তজ্জন্য সাধ্যমত প্রতিকার-প্রয়াসী হন নাই?

কোনদিনও রবীন্দ্রনাথের গুণের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল বিমুখ বা অন্ধ ছিলেন না। 'সাহিত্য-সম্মিলনের' সূচনায় রবিবাবু সম্বন্ধে তাঁহার মনোগত ধারণার কথা আমরা তাঁহার নিজের কথায় জ্ঞাত হইয়া আসিয়াছি। (উভয়ের মনোমালিন্য কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই 'সুরু' হইয়া গিয়াছিল;) তাহার পর, একদিকে যেমন তিনি 'কাব্যে অভিব্যক্তি' প্রবন্ধে তদীয় স্বাভাবিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিযোগে রবিবাবুর প্রতিকূল সমালোচনা করিলেন, অন্য দিকে 'কাব্যে উপভোগ' প্রবন্ধে তিনিই আবার রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' প্রভৃতি কবিতার অকপটে অজস্র খ্যাতি-কীর্ত্তন করিলেন। অতঃপর, 'কাব্যনীতি' প্রবন্ধেও রবিবাবুর 'অশুভ' দৃষ্টান্তের অন্ধ অনুকারীদের তিনি যেরূপ সাবধান করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, 'বাণী'-পত্রিকায় তদ্রূপ

তৎপরেও ঐ রবিবাবুরই 'গোরা' উপন্যাসের তিনি যতদূর অসঙ্কোচ ও অত্যুচ্চ স্তুতি-গান করিয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তেমন নিপুণ ও যোগ্য ভাবে আর-কেহ রবীন্দ্রনাথের গুণ-ব্যাখ্যা করিতে-পারিয়াছেন কিনা, আমি জানি না। এই-সব দেখিয়া ও বিবেচনা করিয়া, 'দশ চক্রে'র নিষ্পেষণ ও আলোড়নে, সাময়িকভাবে আমরা তাঁহার যে মনোবিকার ও চিত্ত-চাঞ্চল্যের পরিচয় পাই তজ্জন্য তাঁহাকে স্বভাবতঃই মার্জ্জনা করিতে বাধ্য হই। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, 'ভারতবর্ষ' পত্রের 'সূচনা'-প্রসঙ্গে যে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের মহীয়সী প্রতিভার যোগ্য সমাদর না করার জন্য 'গভর্ণমেন্ট'কে অনুযোগ দিয়া লিখিয়াছিলেন যে, 'আমাদের শাসনকর্ত্তারা যদি বঙ্গ-সাহিত্যের আদর জানিতেন তাহা হইলে * * রবীন্দ্রনাথ আজ Knight (নাইট) উপাধিতে ভূষিত হইতেন',—তাঁহার উদার ও নির্ম্মল মানসাকাশে ঐ ক্ষণস্থায়ী, ভাসমান মেঘখানি যে বহুপূর্ব্বেই অনুতাপে কাঁদিয়া, গলিয়া, মিলাইয়া-গিয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ করার অণুমাত্রও অবসর নাই। হায়, এ 'সূচনা' লেখার পরে, আর যদি তিনি তিনটি মাসও জীবিত রহিতেন তবে তাঁহার এ আক্ষেপ সত্যসত্যই দূর হইয়া-যাইত; এবং তিনি সগর্ব্বে দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহার সার্থক লেখনী ধন্য হইয়াছে!—আমাদের 'আঁধার ঘরের উজ্জ্বল মানিক' কবিবর রবীন্দ্রনাথের অকপট জয়-ঘোষণায় ততদিনে ঐ দশদিকে সমগ্র বিশ্ব-লোক মুখরিত হইয়া-উঠিয়াছে!

দ্বিজেন্দ্রলাল স্বীয় শেষ কবিতাগ্রন্থ 'ত্রিবেণী'তে সম্ভবতঃ স্বীয় কৃত কর্ম্মের এই-সব কথা স্মরণ করিয়া যাহা লিখিয়া-গিয়াছেন, আমরাও এ প্রসঙ্গে তাহাই এক্ষণে উদ্ধৃত করিয়া, এ বিষয়ের উপসংহার করি।—

"করেছি কর্ত্তব্য যাহা, সেইটুকুই আমার যাহা জমা,
করেছি অন্যায় যাহা, সেইটুকুই খরচ,—দিও বাদ;
তোমাদিগে' যেটুকু দিয়াছি দুঃখ, ক'রো ভাই ক্ষমা।

তোমাদিগে' যেটুকু দিয়াছি সুখ, ক'রো আশীর্ব্বাদ !
তোমাদিগের মধ্যে আমি আসিনিক কর্ত্তে বিসম্বাদ,
কেড়ে' নিতে কারো অংশ, দিতে কারো মনে দুঃখ, ভাই ;
দুঃখ যদি দিয়ে থাকি ভ্রান্তিবশে, ক্ষম অপরাধ ;
বিনিময়ে দুঃখ যদি পেয়ে থাকি, কোন দুঃখ নাই ।
জমার চেয়ে খরচ বেশী হ'য়ে থাকে, তোমরা দোষী নহ ;
জমাই যদি বেশি থাকে, তোমাদিগের সেটা অনুগ্রহ !"

———

৪

কলিকাতায় প্রত্যাগমন ;

নব-নির্ম্মিত 'সুর-ধাম' গৃহ-প্রবেশ ; কতিপয় স্বভাব-সুলভ গুণ-বর্ণন ও চরিত্র-বিশ্লেষণ ; 'পূর্ণিমা-মিলনে'র পুনরাবির্ভাব ; নাট্যাচার্য্য ৺গিরিশচন্দ্রের সহিত আলাপ ; 'ইভ্‌নীং-ক্লাব' ও 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রের জন্মেতিহাস ; তনয়ের উপনয়ন,—ইত্যাদি।

৺গয়া হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল একক্রমে পোনেরো মাসের—'ফার্লো' ('অনুগ্রহ-বিদায়') লইয়া, (১৩১৫ শালের মাঘ মাসে,) কলিকাতায় আসিয়া তদীয় বন্ধুবর্গের হৃদয়-রাজ্যে পুনর্ব্বার অধিষ্ঠিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় তাঁহার একখানি সুদৃশ্য বাস-ভবন নির্ম্মিত হইতেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় ফিরিয়া, প্রথমতঃ 'দাদামহাশয়' প্রসাদদাস বাবুর বাসায় কয়েক মাস থাকেন ; পরে, 'সুর-ধামে'র নির্ম্মাণ-কর্ম্ম সম্যক্ শেষ হইলে, ১৩১৬ সালের ১'লা বৈশাখ, 'নিছক' হিন্দু-পদ্ধতি মতে নূতন গৃহে প্রবেশ করেন। এখন হইতে জীবনের অবশিষ্ট কালের অধিকাংশ তিনি এই 'সুর-ধামে'ই যাপন করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও নূতন গৃহ-প্রবেশ।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাড়িখানার নাম রাখেন—'সুর-ধাম'। কবিভবনের এই নাম-করণ আমার তাদৃশ শ্রুতি-সুখকর না হওয়ায়, একদিন কথাপ্রসঙ্গে কৌতুকচ্ছলে বলিলাম—"রস-বোধের অভাব যে আপনার কতখানি তা' এই বাড়িটার

'সুর-ধাম'।

নাম শুন্‌লেই সকলে বেশ বুঝ্‌তে পারে।" এতক্ষণ বন্ধু-আমার বেশ প্রফুল্ল ছিলেন; কথাটা শুনিবামাত্র মুখখানা বিবর্ণ হইয়া-গেল। একটু থামিয়া, 'ঢোক' গিলিয়া, ধীরে-ধীরে বলিলেন,—"এ যে তাঁরই যত্ন-সঞ্চিত অর্থের পুণ্য মন্দির! এখানে আমি তাঁ'র দিব্য স্মৃতির আশ্রয়-ছায়ায় এ শূন্য জীবনটা কাটিয়ে দেব। এমন বেশী দিন তো হয়নি,—এরই মধ্যে নামটাও ভুলে' গেলে?" লজ্জায় ও দুঃখে অধোবদন হইলাম। জানি না কেন—তখন আমার মনে পত্নী-হারা রামচন্দ্রের সেই অশ্ব-মেধ যজ্ঞের কথা জাগিয়া-উঠিল!

সাহিত্য সেবা।

গয়ায় থাকিতে তিনি 'মেবার পতন' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমরা জানি। কলিকাতায় আসার অল্পকাল পরে তিনি ইহা মুদ্রিত করেন, এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গে 'সাজাহান' প্রণয়নে মনোযোগী হন। 'মেবার পতন' সম্পূর্ণ করার সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল 'দাদামহাশয়' প্রসাদদাস বাবুর অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। নাটক রচনায় তিনি কিরূপ তন্ময় হইয়া-যাইতেন তাহা প্রসাদবাবু ও আমার প্রদত্ত বহু বিবরণ হইতে আশাকরি, গ্রন্থান্তরে পাঠক যথাকালে * সে সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। কলিকাতায় আসার পরে, ক্রমান্বয়ে 'সীতা,' 'মেবার পতন,' 'সাজাহান,' 'সোরাব-রুস্তম,' 'চন্দ্রগুপ্ত,' 'পুনর্জ্জন্ম,' 'ত্রিবেণী' ও 'পরপারে'—মোট এই আটখানা পুস্তক দ্বিজেন্দ্রলাল অল্লাধিক বর্ষচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রকাশিত করেন। তন্মধ্যে 'সীতা' বহুপূর্ব্বে সম্পূর্ণ লেখা ছিল, এবং 'মেবার পতনে'রও খানিকটা গয়ায় থাকিতে লিখিত হয়। তা'ছাড়া, বাকী—ঐ ছয়খানা বই

---

* সে অনেক কথা। এ খণ্ডে আর সে-সব জানানো সম্ভব হইল না। বিধাতার ইচ্ছা হইলে, যথাকালে, অতঃপর এ পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের যখন পরিচয়াদি প্রদত্ত হইবে, পাঠক হয়ত তখন সেই-সব মনোহর ও কৌতূহলোদ্দীপক, নানাবিধ বিচিত্র সংবাদ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।—গ্রন্থকার।

আদ্যন্ত, এবং বহু প্রবন্ধ, গান, অপ্রকাশিত ও অসম্পূর্ণ দু'খানি নাটক * ও একখানা প্রহসন এই সময়ের মধ্যেই মহাকবি অসামান্য নৈপুণ্যের সহিত লিখিয়া-রাখিয়া গিয়াছেন। সুবিধামত, যদি পারি, সময়ান্তরে এ সকলের সাধ্যমত আলোচনা করা যাইবে ; এ স্থলে কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে এখন একবার তাঁহার সেই অবিনশ্বর কীর্ত্তি-কথা একটু স্মরণ করা গেল মাত্র।

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন যাহা লিখিতেন,—ছোট-বড় তা' যাহাই হৌক্ না কেন,—বন্ধুদের না দেখাইয়া, কখনও তিনি তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। অবশ্য রবিবাবুর 'বৈকুণ্ঠের' মত এজন্য তাঁহাকে কখনও অন্যের বিরক্তির উদ্রেক করিতে হয় নাই ; বরং শ্রোতার প্রবৃত্তি, আগ্রহ ও সুবিধার প্রতি তাঁহার সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি থাকিত। রচনাদি সম্বন্ধে বন্ধুরা অকপটে যে সব পরামর্শ ও মন্তব্য জানাইতেন, অসাধারণ ও আশ্চর্য্য নিরপেক্ষতার সহিত তিনি তাহা তন্ন-তন্ন করিয়া বিচার ও বিবেচনা পূর্ব্বক, প্রয়োজন ও উচিতমত তাহা সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিতেন। এ সম্পর্কে তাঁহার অপূর্ব্ব উদারতা ও অপক্ষপাত বিচার-বুদ্ধি চিরদিন আমাদিগকে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করিয়াছে। খ্যাতনামা সমজ্‌দার সাহিত্যিকের বক্তব্য তিনি যে ভাবে গ্রহণ করিতেন, নিতান্ত নগণ্য, তুচ্ছ, স্বল্পশিক্ষিত যে-কোন লোকের, (এমন কি, তাঁহার দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্রের) কথাও তেমনই আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করিতে চাহিতেন। জ্ঞানার্জ্জন সম্বন্ধে তাঁহার পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না ;—শিক্ষা লাভের জন্য তাঁহার স্বাভাবিক এই ঐকান্তিক উৎকণ্ঠা, আন্তরিক আগ্রহ ও অসীম ঔৎসুক্য জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সমভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। যে অনাবিল ও অচপল সত্যনিষ্ঠা তদীয় জীবনের মূল মন্ত্র বা মুখ্য লক্ষ্য,—সর্ব্বত্র, সকল অবস্থায়, সর্ব্ব সময়ে সকলেরই কাছে

* এই নাটকদ্বয় 'সিংহল বিজয়' ও 'বঙ্গনারী' নামে প্রকাশিত হইয়াছে।—গ্রন্থকার।

তিনি তজ্জন্য ভিক্ষার ঝুলি বহিয়া-বেড়াইতে প্রস্তুত ছিলেন। বস্তুতঃ, এ সম্পর্কে তাঁহার ছাত্রবৎ নিরভিমান ব্যগ্রতা, অসীম ঔৎসুক্য বা ব্যাকুলতা এবং বিনয়াবনত ব্যবহার দেখিলে অতি-বড় নিন্দকের মনেও সম্ভ্রম ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইত।

১৩১৬ শালের ১'লা বৈশাখ, নব-নির্ম্মিত 'সুর-ধামে' 'গৃহপ্রবেশ' করার কিছুকাল পরে, দ্বিজেন্দ্রলাল তদীয় একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ দিলীপকুমারের শুভ উপনয়ন-সংস্কার সম্পূর্ণ হিন্দু-পদ্ধতিমত সুসম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে, হিন্দু-সমাজভুক্ত, তাঁহার যাবতীয় আত্মীয়-বন্ধু-স্বজনেরা যথারীতি নিমন্ত্রিত হইয়া, অবাধে এই উৎসবে আসিয়া সবান্ধবে যোগ দিয়াছিলেন; অধিকন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা সাধারণতঃ সামাজিক কোন ব্যাপারে তাঁহার সহিত প্রকাশ্য সংশ্রব রাখিতে সাহসী হন নাই তাঁহারাও এ সময়ে তাঁহার আহ্বান আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না,—একে-একে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনস্বী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ প্রসঙ্গে যাহা জানাইয়াছেন তাহা এখানে একটু না বলিয়া পারি না। তিনি লিখিয়াছেন,—

তনয়ের উপনয়ন-সংস্কার।

"মনে পড়ে—তাঁহার তনয়ের উপনয়নের পূর্ব্বে তাঁহার একটা কথায় আমি বড় রাগ করিয়াছিলাম, একটু ব্যথাও বোধ করিয়াছিলাম। পুত্র 'মণ্টু'র উপনয়ন; কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করা যায়, তাহার ফর্দ্দ হইতেছে। এমন কালে আমি সেখানে উপস্থিত। গোঁড়া হিন্দুরা তাঁহার নিমন্ত্রণ রাখেন কি না, ইহা লইয়া একটা প্রশ্ন উঠিল। আমি বলিয়া ফেলিলাম—আর কেউ আসুক আর না আসুক, আমি আমার পুত্রদের সঙ্গে লইয়া আসিবই আসিব। দ্বিজু এ কথাটা শুনিয়া একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—"তোমার কৃপা! তোমরা গোঁড়া সমাজভুক্ত যাঁহারা, আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলে আমি তোমাদের Condescension'এর ('অনুগ্রহ প্রদর্শনার্থ অবনতি স্বীকারে'র)

পরিচয় পাই।" কথাটা শুনিয়া আমার মুখটা লাল হইয়া-উঠিল। উত্তরে কহিলাম—"দেখ দ্বিজু, এই জন্যই আমরা বলিয়া থাকি, বিলাতে গেলে আমাদের জাতি যায়। জাতি কেবল খেয়ালের ঝোঁকে বা সঙ্গদোষে একবার-আধ্‌বার গরু-শুয়ার খাইলেও যায় না, সখের খাতিরে হ্যাট্‌কোট্‌ পরিলেও যায় না অথবা সাহেব-মেমের সঙ্গে দু'একবার নাচিলে-গাহিলেও যায় না। জাত যায় তখন—যখন এই হিন্দুর বিশিষ্টতার পরিচায়ক হৃদয়টি বিকৃত হয়, শুষ্ক হয়, নষ্ট হইয়া যায়। তুমি একে বারেন্দ্র বামুন, তায় বিলেত-ফের্ত্তা, তায় আবার 'ঘটিরাম' ডিপুটি,—ত্রিদোষ তোমাতে স্পর্শিয়াছে। তুমি হিন্দুর সখ্যের, বন্ধুত্বের, প্রেমের মহিমা কেমন করিয়া বুঝিবে বল!" দ্বিজু অপ্রস্তুত হইল; বলিল—"রাগ করিলে?" পীঠটা আমার দিকে ফিরাইয়া বলিল, "এই নাও—এক ঘা জুতা মার, অন্যায় করিয়াছি, 'ঘাট' হইয়াছে। আমি ভাই, অন্য মাপ-কাটিতে তোমায় মাপিয়াছিলাম। তুমি তো জান—আমি বিলাত হইতে ফিরিয়া-আসিয়া, আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহারে কত ব্যথা পাইয়াছি! কিছু মনে করিও না, দাদা!" এই কথায় আমাদের দু'জনেরই চোখে জল আসিল। দ্বিজুর মাতৃহীনা কন্যাকে কোলে করিয়া সে চোখের জল সাম্‌লাইলাম। দ্বিজু কিন্তু সাম্‌লাইতে পারিল না,—অন্য কক্ষে উঠিয়া গেল। সে দিন স্ত্রী-বিয়োগ-জনিত শোকটা কেন যেন সহসা উথলিয়া উঠিয়াছিল।"

মণ্টুর (শ্রীমান্ দিলীপের) এই যজ্ঞোপবীতের সময়ে আমি কলিকাতায় ছিলাম না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'তার' পাইয়া কলিকাতায় আসিলাম। 'সুর-ধামে' গিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমার উদ্বিগ্ন মনের সমস্ত আশঙ্কা নিমেষেই 'সাফ' হইয়া-গেল। দেখিলাম —'সুর-ধাম' লোকে লোকারণ্য। হিন্দু-সমাজের অনেক জানা-শোনা, নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সভাস্থলে সমবেত হইয়াছেন; শুভ-কর্ম্মে শাস্ত্রানুরূপ বিধি-ব্যবস্থার কোনরূপ অপলাপ বা ব্যত্যয় ঘটে নাই; আহার ব্যবহারেরও কোন ত্রুটি বা অপচয় হইতেছে না। কল্যাণীয় দিলীপ তখন দ্বিজত্ব লাভ করিয়া, ব্রহ্মচারী বেশে একটি কক্ষে বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছেন।

নূতন যতি-কুমারকে যথারীতি ভিক্ষা দান করিয়া আমি চলিয়া-আসিতেছি, দেখি—এক-মুখ হাসি লইয়া, পথ-রোধ পূর্ব্বক এক কোণে দ্বিজেন্দ্রলাল দুইটি বাহু বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন! আমি অগ্রসর হইবামাত্র বন্ধু-আমার 'এসেছ! তুমি এসেছ?'—বলিয়া, আমাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর আনন্দের আবেগে আপনা হইতে বলিলেন—

"সব বেশ সুসম্পন্ন হচ্ছে। ভেবেছিলাম—এজীবনে বুঝি কেবল ঐ 'এক-ঘরে'ই হ'য়ে কাটাতে হ'বে। কিন্তু আজ ভাই, আমি যেন একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব কচ্ছি; * * মণ্টুকে কেমন দেখ্‌লে? বেশ দেখাচ্ছে, না—?"

আমি অন্যান্য কাজকর্ম্মের কতদূর কি হইতেছে, জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলে, সে কথা যেন তাঁহার কানেও গেল না। বালকের মত বলিতে লাগিলেন—

"যখন বৈদিক-ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছিল, আমার মনে এম্‌নই একটা অস্থিরতা ও অনুতাপ এল যে, তা' আর কি বল্‌ব! এসব অনুষ্ঠানের আচার ও মন্ত্রাদিতে কি যে একটা বৈদ্যুতিক পবিত্র প্রভাব আছে, তা' এর আগে আমি কখনও কল্পনাও কর্ত্তে পারিনি। কি চমৎকার উপদেশ! কি অপূর্ব্ব, সব সুন্দর ব্যবস্থা! আমরা কি ছিলাম, আর আজ এ কি হ'য়েই যাচ্ছি,—কেবল যেন এই চিন্তাটা আজ আমাকে কশাঘাত করে, ভিতরে-ভিতরে কাঁদিয়ে তুলেছে। আচ্ছা, আবার কি আমরা তেমন হ'ব না?"

কথাগুলি এমন ব্যাকুল আগ্রহে, তীব্র হতাশার সঙ্গে তিনি উচ্চারণ করিলেন আমি চেষ্টা করিয়াও তখন আর একটা কথাও কহিতে পারিলাম না;—শুধু অবাক্ হইয়া, তাঁহার সেই সারল্যমাখা, পবিত্র মুখখানির পানে একদৃষ্টে চাহিয়া-রহিলাম। বন্ধু আমাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া একটু স্বর চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বল?" আমি বলিলাম, "হাওয়া ফির্‌ছে।" দ্বিজেন্দ্রলাল কহিলেন,—"আহা, তা'ই হোক্, তা'ই হোক্! তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক!" 'এই

বলিয়া গুণ-গুণ করিয়া 'কিসের শোক করিস্ ভাই, আবার তোরা মানুষ হ'!'—এই গানটা গাইতে-গাইতে, আমার হাত ধরিয়া অভ্যাগতদের কাছে নামিয়া আসিলেন। দেখিলাম—সেখানেও সকলের সঙ্গে উপস্থিতমত নানারূপ আলাপাদি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু, কেমন একটু যেন উদাস, আন্‌মনা, চিন্তান্বিত!

মত-পরিবর্ত্তন।

শেষ বয়সে দ্বিজেন্দ্রলাল শেষে কতটা হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া-উঠিয়াছিলেন তাহা মাননীয় 'অধরদা'র, কথিত নিম্নোক্ত সংবাদ হইতেও পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত অধর মজুমদার মহাশয় বলিতেছেন,—

"নূতন বাড়ি 'সুর-ধাম' তৈয়ারী হওয়ার পরে, বাড়ির পূর্ব্ব সীমানায় যে নারিকেল গাছটা আছে তাহা একদিন একটা ঝড়ে হেলিয়া-গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ির একটি 'কার্নিশ' ভাঙ্গিয়া ফেলে। বাড়ির যিনি মালিক, একদিন তিনি এই উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালকে আসিয়া বলিলেন যে, "মহাশয়, আপনি ঐ গাছটা কাটিয়া দিন, তা নইলে দেখ্‌ছেন তো—আমাদের বড় ক্ষতি হচ্ছে।" ইহার উত্তরে দ্বিজ্‌দা ধীরে-ধীরে বলিলেন—"দেখুন মহাশয়, আমি শত হ'লেও বামুনের ছেলে, ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। কি করে' ঐ নারকেল গাছটা অমন করে' কাটি বলুন তো?" তারপরে দু'টি হাত জুড়িয়া কহিলেন— "তা' আপনার যদি বিন্দুমাত্রও ক্ষতি হচ্ছে মনে করেন ত আপনি নিজেই না হয় ওটা কাটিয়ে ফেলুন। আমার তাতে এতটুকুও আপত্তি নাই।" ভদ্রলোকটি এ কথা শুনিয়া মনে-মনে বোধ হয় খুসিই হইলেন। বলিলেন,—"তা—তা, আমিই বা কেমন করে ওটাকে কাটি! সে কি করে'ই বা সম্ভব হবে?"— এইরূপ 'আম্‌তা'-'আম্‌তা' করিয়া, স্বীয় অক্ষমতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তখন তাঁহার রকম দেখিয়া, হাসিতে-হাসিতে বলিলেন—"আপনার ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও যখন আপনি এতে রাজী হচ্ছেন না তখন আমাকেই বা কেমন করে' আপনি এজন্য অনুরোধ করেন মহাশয়?" ভদ্রলোকটি আর বেশি কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, প্রসন্ন মনে নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন।"

শেষ জীবনে এইরূপে হিন্দু-আচার ও সংস্কারের প্রতি

দ্বিজেন্দ্রলাল যে যথার্থই শ্রদ্ধাবান্ ও অনুরাগী হইয়াছিলেন, আরও এমন বহু ব্যাপারে তাহা আমরা বিশেষভাবে জানিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। কিছু পরে পাঠক এ সম্বন্ধে আরও-কিছু খবর অবগত হইতে পারিবেন।

ক্রমান্বয়ে প্রায় চার বৎসর কাল এই-যে দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় রহিলেন, সে সময়ে সচরাচর তাঁহার যে-সব গুণ আমাদের চোখে পড়িয়াছে, এস্থলে মোটামুটি তাহার একটু-একটু, সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলে, বোধহয়—মন্দ হইবে না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবু লিখিয়াছেন,—

কএকটি স্বাভাবিক গুণ।

"দ্বিজেন্দ্রের চরিত্রে দুইটি প্রধান গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি সারল্যের অবতার ছিলেন। * * এই সরলতা ছিল বলিয়া প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারিতেন, আবার মন খুলিয়া নিন্দা-তিরস্কারও করিতে পারিতেন। দ্বিতীয় গুণ ঔদার্য্য। তিনি মিত্র-স্বজনের নিকট যেন উলঙ্গ হইয়া থাকিতেন। * * যাহারা তাঁহাকে চিনিত না, ভাবিত, লোকটা অহঙ্কারী; কিন্তু, দু'চারদিন মেলামেশা করিলেই বুঝিত, দ্বিজেন্দ্রলালের লেশমাত্রও অহঙ্কার নাই। তিনি অসাধারণ বন্ধুবৎসল ছিলেন। মিত্র-স্বজনের মান অভিমান রক্ষা করিতে, তাঁহাদিগকে বেমালুম অর্থ-সাহায্য করিতে তিনি যেমনটি জানিতেন, তেমন বুঝি আর কেহ জানিবে না।"

বন্ধু-বাৎসল্য।

বন্ধুদের রঙ্গ-রহস্য, আমোদ-প্রমোদ, অত্যাচার-উৎপীড়ন, এমন কি—অবারিত যথেচ্ছাচার পর্য্যন্ত তিনি যেরূপ অটল ধৈর্য্যের সঙ্গে, প্রসন্ন-প্রশান্ত মনে সর্ব্বদা সহিতে জানিতেন তেমন দৃষ্টান্ত এ সংসারে খুব বিরল। স্বচ্ছন্দ চিত্তে, সম্যক্ স্বাধীনভাবে তাঁহার সুহৃদ্‌বর্গ তাঁহার সহিত যেরূপ 'ঘরোয়া' ব্যবহার করিতেন, তিনিও আবার ঠিক-তেমনই ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে, এতটুকু ছোট বালকের ন্যায় 'হুড়া-হুড়ি', ছুটা-ছুটি, মারামারি করিতে ভালবাসিতেন,—যখন যেমন

খুসি, তেমনই অসঙ্কোচ আচরণ করিতেন। এই অবারিত উৎপাত-উপদ্রব তাঁহার পক্ষে এত অভ্যস্ত হইয়া-গিয়াছিল যে, দৈবাৎ কোন-দিন যদি তাঁহার কাছে গিয়াও, কেহ ভালমানুষটির মত শান্ত-ধীর-ভাবে, চুপ করিয়া বসিয়া-থাকিতেন, দ্বিজেন্দ্রলাল অমনই তাঁহার অশুভ শঙ্কা করিয়া, অত্যন্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্নভাবে বারংবার তজ্জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করিতেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল পর-দুঃখে অত্যন্ত কাতর হইতেন। আবশ্যকমত কেবল যে তিনি স্বজন-সুহৃদ্‌কেই সাহায্য করিতেন এমন নহে। নিঃসম্পর্ক কোন লোকও যদি বিপদে পড়িয়া তাঁহার কাছে আসিত ত' তিনি তাহার দুরবস্থার প্রকৃত পরিচয় পাইবামাত্র, সাধ্যশক্তি ও প্রবৃত্তি অনুসারে, তাহাকে কিছু-না কিছু সাহায্য করিতেনই। তিনি পারতপক্ষে কোনদিন কাহাকেও জানাইয়া বা দেখাইয়া অথবা আমাদের মত ঢাক-ঢোল বাজাইয়া, এক কপর্দ্দকও কোন লোককে কখনও দিয়াছেন বলিয়া, আমি তো অন্ততঃ জানি না। সাহায্যদানের সময়ে গোপনে, অপরের অলক্ষিতে,—যেন কি-একটা গর্হিত কাজ করিতেছেন এই ভাবে,—নীরবে, তিনি প্রার্থীর হাতের মধ্যে যা'-হয় কিছু গুঁজিয়া দিয়া-আসিতেন, স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে আমি দিবসের প্রায় অধিকাংশ সময় তাঁহার কাছে কাটাইয়াছি; এবং সেই সময়েই আমি প্রথম তাঁহাকে দান করিতে দেখি। দেখিতাম—যখনই কাহাকেও কিছু দিতে হইত,—ঘর ছড়িয়া, উঠিয়া-গিয়া, অন্যের অসাক্ষাতে,—ঠিক যেন ঘুষ দেওয়ার মত দান করিয়া আসিতেন। এই উপলক্ষে একদিন আমি বন্ধুকে বলিলাম—"আপনি অমন কাউকে কিছু দিতে হ'লেই উঠে' পালান কেন?" উত্তরে তিনি নবোঢ়ার মত লজ্জা-নম্র মুখে, অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—"That's my weakness. ('ওটা আমার দুর্ব্বলতা')। আমার কেমন-যেন বড্ড

দয়া-দাক্ষিণ্য।

লজ্জা করে। আর, কিই বা দি!—তা' কি আবার মানুষের সাম্‌নে দেওয়া যায়?" ক্রূর মতি আমার; তখন ভাবিতাম—সরকারী কাজ করেন কিনা? তাই এসব দান অমন গোপন করিতেছেন! কিন্তু, তারপর যখন কন্যা-দায়, পিতৃদায়,—সবরকম দায়েই দানের ঐ এক রীতি বা 'ধারা' দেখিলাম তখন আমার এ ভ্রম তিরোহিত হইল; বুঝিলাম—না, দান গোপন করাটাই তাঁর স্বভাব।

কিন্তু, দান সম্বন্ধে তাঁহার মত যে ঠিক হিন্দু-আদর্শের অনুরূপ ছিল তা' বলা যায় না। এ বিষয়েও অনেকটা তিনি পাশ্চাত্য মতের অনুগামী ছিলেন। নির্ব্বিচার দান বা প্রার্থীমাত্রেরই প্রীতিবিধান তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না; বরং, অযোগ্য জনকে পোষণ করিলে সমাজের সমূহ ক্ষতি হয় বলিয়া, তিনি তৎপক্ষে সাধ্যমত সতর্ক হইতেন।

কলিকাতায় থাকিতে * প্রতি রবিবার প্রাহ্নে, তিনি একরাশ পয়সা নিয়া বসিতেন; এবং সেদিন বেলা ১০'টা কি ১১'টা পর্য্যন্ত যত ভিক্ষুক আসিত তাহাদের প্রত্যেককে তিনি স্বহস্তে দু'পয়সা করিয়া দিতেন,—এটা আমি নিয়মিত লক্ষ্য করিয়াছি।

পাঁচকড়িবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের ঔদার্য্যের কথাটা উল্লেখ করিয়াছেন বটে; তাহার কোন দৃষ্টান্ত দেন নাই। এখানে আমি সেই সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিবরণ দিতে চাই। বলা বাহুল্য—এ সম্পর্কে যে ক'একটা উদাহরণ আমি দিব, তদ্রূপ বহু ঘটনা আমি নিজেই প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। 'সুর-ধামে' আসার বছর দেড়েক পরে, একদিন প্রাতে আমি তাঁহার কাছে বসিয়া-আছি,—প্রায় বেলা ৯॥ কি ১০'টার সময়ে একজন পলিতকেশ, মলিন-বেশ বৃদ্ধ সেখানে আসিয়া, 'বাড়ির কর্ত্তা'র সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় জানাইল। 'বাড়ির কর্ত্তা' তখন

উদারতা ও সহৃদয়তা।

* বিদেশে কি করিতেন জানি না।—গ্রন্থকার।

খালি-গায়ে ও শুধু পায়ে একটা চেয়ারের উপরে চড়িয়া, দেওয়ালে-টাঙ্গানো একটা ঘড়িতে চাবি দিতেছিলেন। লোকটি ঐ ভাবে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া, হাঁফাইতে-হাঁফাইতে, স্বয়ং কর্ত্তারই কাছে গিয়া বলিল,—"মহাশয়, বাড়ির বাবুর সঙ্গে কি একবার—এই, একটু দেখা কর্‌তে পারি?" দ্বিজেন্দ্রলাল লোকটির সেই শ্রান্ত স্বর ও ঘর্ম্মাক্ত রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দরকার, আমাকেই বল্‌তে পার!" লোকটি তখন সন্দিগ্ধ, বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছে দেখিয়া, আমি তাহাকে বলিলাম—"উনিই বাড়ির মালিক। যা' হয় ওকেই বল্‌তে পার।" 'থতমত' খাইয়া, লোকটি তখন তাড়াতাড়ি, দ্বিজেন্দ্রলালকে একবার নমস্কার করিয়া কহিল,—"তা এই আমি,—বড় 'তেষ্টা' পেয়েছে মশায়, একটু জল যদি"। দ্বিজেন্দ্রলাল তৎক্ষণাৎ 'বয়'কে † ডাকিয়া এক গেলাস জল আনিতে বলিলেন; এবং সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"তোমার নাম?" বৃদ্ধ অযথা আবার-একটা প্রণাম করিয়া অতি নম্র ও মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল,—'শ্রী * * দাস-কুণ্ড।' ভৃত্য ইত্যবসরে জল লইয়া-আসিলে, দ্বিজেন্দ্রলাল উক্ত ব্যক্তিকে তাহারই পার্শ্ব-স্থিত একটা 'ঈজি' চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন,—"ঐটিতে আগে বসে' নাও। একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে, বেশ জিরিয়ে, তারপর জলটা খেয়ো। হঠাৎ অত ঘামের উপর ঠাণ্ডা জল খেলে, কে জানে, শর্দ্দী-গর্ম্মি হ'তে পারে।" বৃদ্ধ একথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। চেয়ারটা'র দিকে চাহিতে-চাহিতে দু' একপা সেদিকে অগ্রসর হইয়া, কি-যেন ভাবিয়া, শেষে ঘরের মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িল। দ্বিজেন্দ্রলাল জিজ্ঞাসিলেন—

---

† চিরকাল এই একটা বিষয়ে তাঁহার সাহেবী ছিল। তাঁর নিজের যে চাকর থাকিত তাহাকে তিনি চিরদিন 'বয়' (Boy) বলিয়া ডাকিতেন। এ হিসাবে তাঁহার কাছে পঞ্চাশ বছর বয়সেরও 'বয়' দেখিয়াছি।—গ্রন্থকার।

"হুঁ! তারপর, কি কথা বল্‌বে বলছিলে?" বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি দু'একবার 'ঢোঁক' গিলিয়া, বলিতে লাগিল,—

"আজ্ঞে, এই আজ দুটো দিন, কোনরকম একটা চাকরি-'বাকরি'র চেষ্টায়, দেশ থেকে এখানে এয়েছি হুজুর। এর মধ্যে আমার (পেটে হাত দিয়া) কিছু জুটল না। সঙ্গে ২৲ টাকা * * ছিল। তা এম্‌নি বরাত,—পরশু সন্ধ্যে নাগাৎ এখানে পৌছে, একটা বাড়ির 'রকে' শুয়ে ঘুমিয়ে-পড়েছিলুম, মশায়;— সকাল বেলায় উঠে দেখি, কে যেন সে সম্বলটুকুও 'চুরি করে' নে গেছে! কাল সেই থেকে এই অবধি এতক্ষণ কত বাড়ি-বাড়ি ঘুরলুম বাবা,—এক মুটো ভাতের জন্যে; তা' কাল তবু বিকেলে এক রাজাবাবু চারটে পয়সা দিইছিলেন, তাই দিয়ে মুড়িটুড়ি কিনে জল খেয়েছিলাম; আজ আর কিছুই পাইনি বাবা!"

শেষ কথাকয়টা বলার সময়ে লোকটার কণ্ঠ-রোধ হইয়া-আসিল; সে আর কিছু না বলিয়া, ধীরে-ধীরে গেলাসটা 'আল্‌গোছে' মুখের উপর তুলিয়া-ধরিয়া, সমস্তটা জল একনিঃশ্বাসে নিমেষেই গিলিয়া ফেলিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাকে বসিতে বলিয়া, সহসা ভিতরে চলিয়া-গেলেন; এবং স্নানান্তে, একটু কাল পরে ফিরিয়া-আসিয়া বলিলেন, —"এদিকে এস আমার সঙ্গে"। লোকটি উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও ভিতরে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি—দু'খানি 'ঠাঁই' পড়িয়াছে; এবং খোদ কর্ত্তার জন্য যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহার অন্ততঃ চতুর্গুণ সেই অতিথির পাতে স্তূপীকৃত হইয়াছে। আয়োজন ও যত্ন দেখিয়া বৃদ্ধ সত্য-সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। পরে আনন্দে সে যে কি করিবে 'ঠাহর' না পাইয়া, বার-দুই দ্বিজেন্দ্রলালকে 'ঢীপ্‌-ঢীপ্‌' করিয়া প্রণাম করিয়া, আসনটা 'ভাঁজ' করিয়া একদিকে সরাইয়া-রাখিয়া, অনেকটা দূরে— সেই ঘরের এক কোণে গিয়া আহারে বসিল। দ্বিজেন্দ্রলালের সেই 'নাম-মাত্র' আহার শেষ হইতে অবশ্য পাঁচটি মিনিটও লাগিল না; কিন্তু, যতক্ষণ ঐ ক্ষুধার্ত্ত অভাগার সম্পূর্ণ ভোজন সমাপ্ত না হইল,

দ্বিজেন্দ্রলাল ততক্ষণ সেইখানেই বসিয়া-রহিলেন, এবং তাঁহাকে 'এটা খাও, ওটা খাও' বলিয়া, চির-পরিচিত পরমাত্মীয়ের ন্যায় অপূর্ব্ব স্নেহে ও যত্নে খাওয়াইতে-লাগিলেন। বৃদ্ধ এত আদর বোধ হয়—তা'র জীবনেও আর কখনও পায় নাই ; অসীম তৃপ্তির সহিত আহার করিতে-করিতে, তাই, সে তাহার দুঃখময় দীর্ঘ-জীবনের কতই-না বিচিত্র ইতিহাস অনর্গল বলিয়া-গেল ; দ্বিজেন্দ্রলাল কিছুমাত্র ব্যস্ত না হইয়া, সে সমস্ত আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সঙ্গে শুনিয়া-যাইতে লাগিলেন। অতঃপর, আহারান্তে কিছু বিশ্রাম করিয়া, লোকটি যখন বিদায় চাহিল, বন্ধুবর অযাচিতভাবে তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া, গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ করি—তোমার ভাল হোক্।" এতদূর অভাবিত সদয় ব্যবহারে একেবারে ব্যাকুল ও বিহ্বল হইয়া, বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রলালের পায়ের উপরে বার-বার মাথা ঠুকিতে লাগিল ; এবং অবিরল ধারে 'ঝর্-ঝর্' করিয়া চোখের জল ফেলিতে-ফেলিতে, সে আপন মনে কি-যেন বলিতে-বলিতে বাহির হইয়া গেল।

খ্যাতনামা 'এস্ ফ্রেণ্ডস্' কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, বন্ধু-বৎসল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিয়াছেন,—

"একদিনের একটি ঘটনা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অম্লশূল রোগে একবার যখন চির-রুগ্ন দেবকুমার বাবু দুঃসহ যাতনায় শয্যাশায়ী ছিলেন সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাকে দেখিতে আসেন। দেবকুমার বাবু যন্ত্রণায় 'ছট্‌ফট্' করিতেছেন দেখিয়া, দ্বিজেন্দ্রবাবু এমন উদ্বিগ্ন, ব্যাকুল ও অধীর হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার সেরূপ অস্থিরতা লক্ষ্য করিয়া আমরা উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত হইলাম। নিঃসম্পর্ক বন্ধুর জন্য তিনি সেদিন যেরূপ উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিতেছিলেন, আজকালকার দিনে অতি নিকট আত্মীয়ের প্রতিও তদ্রূপ সহানুভূতি কেহ দেখাইতে পারে না।"

কবি ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর বন্ধু-বিয়োগে শোকার্ত্ত হইয়া আমাকে যে সুদীর্ঘ পত্র লেখেন তাহা হইতে নির্লজ্জের মত নিম্নোক্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সহৃদয়, বোদ্ধা পাঠকবর্গ এজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন, ভরসা করি।

"আর আমাদের বসিবার, দাঁড়াইবার, অসঙ্কোচে মিলিবার মিশিবার এবং জুড়াইবার ঠাঁইটুকুও রহিল না। চুম্বকের মত যে প্রেমময় প্রাণের প্রবলতম আকর্ষণে আমাদের মত কঠিন লৌহগুলি 'সুর-ধামে' গিয়া স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইত, হায়! সে আকর্ষণ আর আমাদিগকে একতাবদ্ধ করিবে না। তাঁহার মহত্ত্ব ও উদারতা কি গভীর ও অসীম ছিল! তাহা অকথ্য—বলিয়া বুঝাইবার নহে, শুধু একান্ত মনে অনুভব করিবার! * * দু'একটি কথা, এখন যা মনে উঠিতেছে,—বলিয়া অদ্যকার মত বিদায় হই। যদি দরকার হয়, পরে আরও ২।১টি দৃষ্টান্ত দিব। 'আলেখ্য' নামক অপূর্ব্ব কাব্যখানি বাহির হইয়াছে। দ্বিজেনবাবু আমাকে তাঁহার একে একে সকলগুলির সম্বন্ধে মতামত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর আমিও যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যেকটি কবিতার দোষগুণ বলিয়া যাইতেছি। ক্রমে 'নর্ত্তকী' নাম্নী কবিতার কথা উঠিলে আমি তাহার ভাবের সুখ্যাতি করিলাম; কিন্তু, ছন্দের দোষে পড়া দুষ্কর, বলিলাম। যতদূর মনে হয়, তখন সেখানে সুরেশ, পাঁচকড়িবাবু, বিজয়চন্দ্র ও দাদামহাশয় প্রসাদ বাবু ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রবাবু আমার মন্তব্য শুনিয়া 'হো-হো' করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম—একি! এত হাসেন কেন? একটু যেন অপ্রস্তুত হইলাম। শেষে দ্বিজেন্দ্রবাবু বলিলেন,—"ওহে! ওটার যদি ছন্দই মন্দ হয়ে থাকে তবে ওটার কোনই মূল্য নেই। ওটার ভাব বেমালুম আর একজনের কাছ থেকে ধার করা।" সুরেশ বলিলেন "সে কি মশায়? আপনিও শেষকালে ভাবের ঘরে চুরি করতে সুরু করলেন? রসুন 'সাহিত্যে' মজা দেখাচ্ছি! * * অমুকের মত এ গুণও যে আপনার আছে তা জানা ছিল না।" এ কথার উত্তরে দ্বিজেনবাবু আবার তেমনই হাসিতে-হাসিতে বলিলেন "ওহে, না হে, না। এ সিঁদ্ কেটে চুরি নয়। আপন জনকে ব'লে ক'য়ে ধার

করা।" দাদামহাশয় বলিলেন—"ওঃ! তবেই বোঝা গেছে। এটা চুরি নয়, চুরি নয়,—ডাকাতি। সোজা কথায় যাকে ডাকাতি—বলে, এ তাই! বলি কার মাথায় এমন হাত-বুলুলে বাপু?" দ্বিজেন্দ্রলাল তখন বলিলেন, "* * লেখা 'কলঙ্কিনী' বলে' একটা চমৎকার কবিতা 'প্রবাসী'তে পড়ে' আমার তা এত ভালো লেগেছিল যে, সেই ভাবটা নিয়ে একটা কবিতা লিখ্‌তে সাধ হ'ল। তারপর এই ব্যর্থ চেষ্টা! ওটার ছন্দেই যদি দোষ হয়ে থাকে ত ওটা কিচ্ছুই হয়নি। আচ্ছা, তবে আর একটা চোরাই মাল কেমন বেমালুম আত্মসাৎ করেছি, শোন!"—এই বলিয়া তিনি Organ বাজাইয়া 'কেন এত সুন্দর শশধর? ও সে তারি মুখ অনুকারি' গানটি গাহিলেন। পরে * * যে কবিতা হইতে উহার ভাব সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাও তখনই আনিয়া পড়িয়া শুনাইলেন। গান ও সে কবিতা উভয়ই সুন্দর বটে। কিন্তু এবার বোধহয় তাঁহারই জিৎ হইল। দেখুন, কি আশ্চর্য্য সরলতা, উদারতা ও মহত্ব! অত বড় লেখক হইয়া, এভাবে সকলের সমক্ষে নিজের চুরি আর কেহ ধরাইয়া দিতে পারিয়াছে? বড় বড় অনেকেরই এ বিদ্যা আছে; কিন্তু সে 'বড়'র কারণ 'যদি না পড়ে ধরা'! আর এ বিদ্যা অন্যবিধ,—ঠিক তার বিপরীত, এবং সেই জন্যই তিনি অত 'বড়'—মনুষ্যত্ব ও মহত্বের হিসাবে! তাঁহার 'নাগাল' পাওয়াও সে দিক্ দিয়া আমাদের মত লেখকের পক্ষে অসম্ভব। আর কত বলিব? ধন্য তিনি! তাঁর কথা ভাবিলেও পুণ্য হয়।"

প্রীতিভাজন, দ্বিজেন্দ্র-ভক্ত শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মিত্র জানাইতেছেন—

"ছয়-সাত বছর পূর্ব্বে বাদুড়বাগানে ভূতনাথ মিত্র নামে আমার এক বন্ধু ছিলেন। 'ন্যাস্‌নাল ইন্‌সিওরেন্স' অফিসে তিনি ১০০০৲ টাকার একটি জীবন-বীমা করিয়া, অল্পকাল পরেই প্লেগ-রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তখন ভূতনাথের বিধবা স্ত্রী স্বামীর ঐ হাজার টাকা কি করিয়া আদায় করিবে তজ্জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে; কারণ এরূপ স্থলে কোন-একজন ডিপুটি বা অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে সহি করিয়া আবেদন-পত্র না পাঠাইলে কোম্পানীর আইন অনুসারে টাকা দেওয়া হয় না। বিধবাটি অত্যন্ত দরিদ্রা; বিশেষ, ঐ

রকম কোন হাকিমের সাহায্য-লাভ করা তাহার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। কাজেই তাহার অভিভাবকেরা আমাকে এজন্য ধরিয়া পড়ে; আর, আমিও তখন আমার পরিচিত ২।৩ জন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই উপলক্ষে অনুরোধ করি। কিন্তু, আমার কথা তাঁহাদের কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। গত্যন্তর না দেখিয়া, অবশেষে আমি তখন দ্বিজেন্দ্রলালের শরণাপন্ন হই; এবং ঘটনাটি শুনিবামাত্র সেই মহাত্মা আমাকে তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"এই ব্যাপার! তা বেশ তো, আমি এখনই সেখানে যাইতে প্রস্তুত আছি।" তাঁহার জন্য তৎপর গাড়ি আনিতে অগ্রসর হইলে তিনি তাহাতেও বাধা দিলেন। অবিলম্বে আমরা দু'জনে সেই বিধবাটির বাটি হাঁটিয়া গেলাম, এবং ৫।৭ মিনিটের মধ্যে তিনি সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া পুনরায় পদব্রজে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। এই ঘটনার পরদিন দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন,—"ওহে দেখ, আমার দ্বারা উহাঁর (বিধবাটির) যদি আর কোন উপকার হয় ত আমায় অবশ্যই জানিও।" আমি তদুত্তরে তাঁহাকে কহিলাম—"আজ্ঞে, আর আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না। আপনি যা' করেছেন তাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে।"

ঔদার্য্য সম্পর্কে আরও দু'একটা উদাহরণ দিলেই বোধ করি—যথেষ্ট হইবে। এ সংবাদটি দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তরঙ্গ আত্মীয় অধরবাবু আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।—

"একবার কোন পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রেসের স্বত্বাধিকারীদের কাছে তাঁহার প্রচুর অর্থ বাকি পড়ে। সে সব টাকা আদায়ের জন্য আমি মাঝে মাঝে (আপনা হইতে) অল্প-বিস্তর তাগাদা প্রভৃতি দিতাম। কিন্তু, বহু দিনের চেষ্টাতেও কোনরূপ ফল না হওয়ায় একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন,—"দেখ্‌ছেন ত অধরদা, কেহ কোন টাকা দেওয়ার নামও করে না।" আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলাম,—"আচ্ছা এখনই আমাকে আপনি ইহাদের একটি হিসাব লিখিয়া দিন। আমি দেখি একবার কেমন কে টাকা না দিয়া পারে।" আমার সেই কথা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের ভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি ব্যস্ত ও দুঃখিত হইলেন। বলিলেন,—"ছিঃ! অধরদা, সাবধান কিন্তু,—এমন কাজও কর্‌বেন

না। কখনই না—বুঝ্‌লেন? বেশ বুঝ্‌লেন তো? সাবধান কিন্তু!" আমি বিরক্তির সহিত বলিলাম—"না, আমি কিছু বুঝি-ও নি, আর বুঝ্‌তে চাই-ও না। আমি এ সব টাকা আদায় কর্‌বই।" আমার রকম দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল হাসিয়া ফেলিলেন; তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন,—"হুঁ, তা আপনি তো বুঝ্‌বেনই না; কেমন করে বুঝ্‌বেন বলুন? ওরা তো আর আপনার মত নয়? ওরা সকলেই যে ভদ্রসন্তান! বেচারীরা নিশ্চয়ই গরীব কিম্বা অভাবগ্রস্ত। তা নইলে ইচ্ছা করে' কি আর ভদ্রলোক কখনও ঋণ না শুধে' থাক্‌তে পারে? যখন তারা পার্‌বে, নিশ্চয় নিজেরাই এসে শোধ দিয়ে যাবে। ভদ্রলোকদের কি কখনও টাকার জন্য ওরকম বিরক্ত করতে আছে?—ছিঃ!" আমি তাঁহার এ কথায় যথার্থই অবাক্ হইয়া গেলাম। বাস্তবিক ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, এই সব পাওনাদারদের মধ্যে কোন কোন প্রেসওয়ালাকে তিনি হাজার টাকা পর্য্যন্ত ধার দিয়া রাখিয়াছেন। উদারমতি দ্বিজেন্দ্রলাল এইভাবে কড়া তাগাদা দিয়া তৎকালে টাকাগুলি আদায় করিলেন না বটে; কিন্তু, বলিতে ঘৃণা বোধ হয়—আজ পর্য্যন্তও এইসব 'ভদ্রলোকে'রা তাঁহার প্রাপ্য অর্থের এক কপর্দ্দকও পরিশোধ করা আবশ্যক বা উচিত বিবেচনা করে নাই।"

আলিপুর 'ট্রেযারী'তে পূর্ব্বাপর নিয়ম আছে যে, অবসর-প্রাপ্ত, উচ্চ-পদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীদিগকে মাসের প্রথম দিন 'পেন্সন' দেওয়া-হইলে, তা'র পরের দিন, অর্থাৎ—২'রা, অল্প-বেতনভুক্ কেরাণী প্রভৃতিকে 'পেন্সন' দেওয়া হইয়া থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল যেসময়ে সেখানকার 'ট্রেযারী-অফিসার' তৎকালে একবার, ১'লা ছুটি থাকায়, ২'রা তারিখে উক্ত উভয়বিধ কর্ম্মচারীরা 'পেন্সন'-প্রাপ্তির আশায় তাঁহার অফিসে আসিয়া উপস্থিত হন। এতগুলি লোককে একই দিনে 'পেন্সন' দিতে হইলে বহুৎ বিলম্ব হইবে,—হয়ত সন্ধ্যার পরেও এজন্য অনেকক্ষণ 'ট্রেযারী' খোলা রাখিতে-হইবে,—এই-সব ভাবিয়া, অফিসের কর্ম্মচারীরা সাধারণ পেন্সন-ভুক্ যত লোক তাঁহাদিগকে পরের দিন আসিয়া পেন্সন লইয়া-যাইতে হুকুম করেন। কিন্তু, সেই-সব, দরিদ্র বৃদ্ধেরা তখন নিতান্ত নিরাশ ও বিষণ্ণ হইয়া নানারূপ

মিনতি ও আপত্তি জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল অফিস-ঘরে কাজ করিতেছিলেন, এ ব্যাপারের কিছুই জানিতেন না। হঠাৎ গোলযোগ শুনিয়া প্রকৃত ঘটনাটা অবগত হইলেন; এবং নিজের ক্লেশ ও অসুবিধার প্রতি অণুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সন্ধ্যার পরও ২।৩ ঘণ্টাকাল অতিরিক্ত থাকিয়া, নির্ব্বিচারে একে-একে ইহাঁদের প্রত্যেকেরই প্রাপ্য সম্যক্ শোধ করিয়া দিলেন। এই ভাবে, সহৃদয় দ্বিজেন্দ্রলাল সেই-সব কৃতজ্ঞ বৃদ্ধদের উচ্ছ্বসিত অন্তরের অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদের মধ্যে সেদিনকার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া, রাত্রি প্রায় ১০টার সময়ে গৃহে ফিরিয়া আসেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের অনুগত ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রমথ ভট্টাচার্য্য জানাইয়াছেন,—

"সঙ্গীত-সমাজের সহিত একযোগে আমরা ইভ্নীং ক্লাবের সভ্যেরা একবার কবিবরের সীতা হইতে কয়েকটি বাছা বাছা দৃশ্যের অভিনয় করি। আমাদের একান্ত অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি দৃশ্যাভিনয়ে বাল্মীকির অংশ (part) গ্রহণ করেন। তাঁহার চমৎকার অভিনয় দেখিয়া সকলে যখন একবাক্যে 'ধন্য ধন্য' করিতে লাগিলেন তখন মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বসমক্ষে মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন,— "আমি কি ছাই অভিনয় করিতে জানি? আমাকে হরিদাস আর প্রমথ যেমন দেখাইয়া দিয়াছে, আমিও ঠিক তেমনই করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে যদি প্রশংসার কিছু থাকে ত উহাঁদের।" আরও কয়েকবার তাঁহার এই অনুপম সারল্য ও উদারতার জন্য আমি বড় কুণ্ঠিত হইয়াছিলাম।"

নিরভিমান ও অমায়িকতার প্রসঙ্গে অনেক কথা মনে পড়িতেছে। স্থানাভাব বশতঃ এস্থলে দু'একটা কথা মাত্র বলিব।

অমায়িকতা।

নিয়ম আছে যে, যখন যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি ধনাগারের ('ট্রেযারী'র) ভার ন্যস্ত হয় তখন এক তিনি ব্যতীত আর-কেহ ('ট্রেযারী'র) চাবী রাখিতে বা ব্যবহার করিতে পারেন না। এই কারণে 'ট্রেযারী' হইতে যখন কোন টাকা

বাহির করার দরকার হইত, স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালকেই তখন অফিস হইতে উঠিয়া-গিয়া, নিজ হাতে ধনাগারের দ্বার খুলিয়া-দিতে হইত। সকলে জানেন—কাছারীর সময়ে 'কালেক্টারী'তে সচরাচর কিরূপ জনতা হইয়া-থাকে। পাছে এই বিপুল জনতা ভেদ করিয়া-যাইতে কোনরূপ ক্লেশ হয়, তাই 'ট্রেযারী'র 'গার্ড' (রক্ষক) ও চাপ্‌রাশীরা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর ('ট্রেযারী-অফিসারে'র) 'চলাচলে'র জন্য লোক সরাইয়া, পূর্ব্ব-হইতেই পথ 'খোলসা' করিয়া রাখিত। বলা বাহুল্য —ইহাতে উক্ত 'অফিসারে'র একটু সুবিধা হইত বটে; কিন্তু, এজন্য চাপ্‌রাশীদের হাতে সমবেত জনসাধারণের নানারূপ অপমান ও নির্য্যাতনের একশেষ হইত। দ্বিজেন্দ্রলালের চক্ষে নিজের এই স্বাতন্ত্র্য বা প্রাধান্য বড়-বেশী বিসদৃশ ও অন্যায় বলিয়া বোধ হইল। তিনি অনতিবিলম্বে ভৃত্যগণকে এ ব্যাপার হইতে বিরত করিলেন; এবং নিতান্ত সামান্য ও নগণ্য লোকের ন্যায়, অতঃপর, সেই অসংখ্য জনতার ভিতর দিয়া 'ভীড়' ঠেলিয়া, আপনার যাতায়াতের পথ করিয়া লইতেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল আলিপুরে জয়েন্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট্ ভাবে কিছুকাল কাজ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার আদালতের একজন নিম্ন-শ্রেণীর কর্ম্মচারীর সহিত একবার আমার দেখা হইলে, কৌতূহলবশতঃ, তাঁহাকে আমি দ্বিজেন্দ্রলালের সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করি। লোকটি আমাকে চিনিতেন না, এবং আমার সহিত দ্বিজেন্দ্রলালের যে পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহাও তাঁহার জানিবার কোনরূপ কারণ ছিল না। কথায়-কথায় উক্ত ভদ্রলোক আমাকে বলিলেন,—

"মহাশয়, এমনধারা মানুষ যে আজকালকার কালে জন্মায় তা সত্যি সত্যি আমাদের বিশ্বাস ছিল না। এই এতকাল তো রায়-সাহেবের কাছে কাজ কর্‌ছি, একদিনের জন্যেও কি কেউ ভুলেও ভাব্‌তে পেরেছি যে, তিনি মনিব আর আমরা তাঁর অধীনস্থ চাকর? তাঁর কাছে সেই সেরেস্তাদারও যা', আর

আমি বা ঐ আর্‌দালীটাও তাই ;—সকলের সঙ্গে সমান ব্যবহার! ভুল-চুক, দোষ-ত্রুটি কার না হয়, বলুন? কিন্তু শত দোষ কর্‌লেও, একদিনের জন্য কেউ তাঁর গালাগাল বা ধম্‌কানি শোনেনি। অথচ, পাছে তিনি কোনরকম অসন্তুষ্ট কি দুঃখিত হন, এই ভয়েই অফিসের 'টিকটিকি'টি পর্য্যন্ত, ঘড়ির কাঁটার মত, সমস্ত কাজ যেন ঠিক নিক্তির ওজোনে করে' যাচ্ছে। আজ অফিসে লাটসাহেবই আসুন আর বোর্ডের বড় সাহেবই আসুন—কারুর আর বল্‌বার জোটি নেই যে, এ কাজটিতে কোন 'কশুর' হয়েছে বা অমুক কাজটা 'মুল্‌তুবি' পড়ে' আছে। রায়-সাহেবের কথা আর কি বল্‌ব? রাম-রাজত্বে আছি মশায়,—রাম-রাজত্বে!"

বার্দ্ধক্য মর্য্যাদা ও শিশুপ্রীতি।

বৃদ্ধ ও শিশুদের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলাল অত্যন্ত মর্য্যাদা ও আদর দেখাইতেন। এ বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ বিচার বা পক্ষপাত ছিল না। সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রবংশীয় বৃদ্ধদের সম্বন্ধে তো কথাই নাই,—নিতান্ত তুচ্ছ ও নগণ্য 'নিম্নজাতীয়', কোন বর্ষীয়ান্ ব্যক্তিকে দেখিলেও তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার প্রতি আদর, সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা না দেখাইয়া পারিতেন না। তিনি বলিতেন—

"বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিমাত্রেই আমাদের প্রত্যেকের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। কেন না, জ্ঞাতসারে হৌক্ আর অজ্ঞাতসারে হৌক্, তাঁহাদের সকলেই নিজেদের সুদীর্ঘ জীবনের প্রত্যেক বিন্দু শোণিত পাত করিয়া যে অমূল্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহারই সার্থক পরিণামে এই সমগ্র মানব-সমাজ সর্ব্বপ্রকার বিপৎ, অনর্থ ও ধ্বংসের কবল হইতে আপনাকে সতত শতমতে রক্ষা করিয়া-রাখিতে সমর্থ হইতেছে। বাস্তবিক ইঁহারাই ইহলোকের জ্ঞাননেত্র এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয়,—মস্তিষ্কস্বরূপ।"

এই তো গেল বৃদ্ধদের প্রতি তাঁহার মনোভাব। তারপর, শিশু ও কিশোর-বয়স্ক বালক-বালিকাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও আদরের অন্ত ছিল না। এ সম্পর্কে, অধিক নহে—একটিমাত্র কথা বলিলেই প্রচুর হইবে। পাঠক জানেন—দ্বিজেন্দ্রলাল

তাঁহার আজীবনার্জ্জিত অর্থের প্রায় অধিকাংশ ব্যয় করিয়া, কলিকাতায় স্বীয় পত্নীর নামে 'সুর-ধাম' নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কলিকাতার সর্ব্বত্র ভূমি যে কিরূপ অগ্নিমূল্য তাহাও বোধ করি—কাহারও অজ্ঞাত নাই। এই 'সুর-ধাম' সর্ব্বশুদ্ধ কিছু-বেশি-কম আঠারো কাঠা, অর্থাৎ—প্রায় বিঘাখানেক জমির উপরে অবস্থিত। দ্বিজেন্দ্রলাল এই বৃহৎ (কলিকাতার অনুপাতে) ভূমিখণ্ডের মাত্র অর্দ্ধেক স্থানের উপরে গৃহ-নির্ম্মাণ করাইয়া, অবশিষ্ট স্থানটি অযথা পতিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলেন। পাঠক, এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ কি কিছু অনুমান করিতে পারেন? কারণ এই যে, ঐ উন্মুক্ত, শ্যাম-তৃণাচ্ছন্ন মাঠটির উপরে পাড়ার যত ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে—তাহারা আসিয়া খেলা করে, ছুটাছুটি করে, মনের আনন্দে হাসিয়া, মাতিয়া, নাচিয়া-বেড়ায়;—সে দৃশ্য সুন্দর, স্বর্গীয়, বড় মধুর! —শিশু-স্বভাব দ্বিজেন্দ্রলাল তা'ই দেখিতে বড় ভালবাসেন! প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী, দ্বিজেন্দ্রলালের সহপাঠী ও গুণ-মুগ্ধ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর মহাশয়ও ঠিক এই কথাটি মহাকবির অমর আত্মার উদ্দেশে বলিতেছেন,—

"তুমি ত বালক-বালিকামাত্রকেই বড় ভালবাসিতে এবং শিশুর হাসিতে স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতে! একদিন তোমার কলিকাতার বাড়িতে বসিয়া কহিয়াছিলে—বাড়ির জন্য যে জমি কিনিয়াছিলাম, তার মোটে অর্দ্ধেকটায় বাড়ি করিয়াছি, দেখিতেছ? বাকি অর্দ্ধেকখানি পড়িয়া আছে। জমির দর যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহাতে ঐ অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিলেই আজ পূরা জমির দামটা পাওয়া যায়। গ্রাহকও অনেক, অনুরোধও বিস্তর হইতেছে। কিন্তু ভাই! জমিটা ছাড়ি নাই। ঐ জমিতে প্রত্যহ বিকাল বেলা পাড়ার ছেলেমেয়েগুলি আসিয়া খেলা করে, ছুটাছুটি করে। আলিপুরের অফিস হইতে আসিয়া তাহাদের দেখিয়া দিনের সকল অবসাদ ভুলিয়া যাই। বালক-বালিকাদের মুখ দেখিলে আমি যে বড় আনন্দ পাই।"

এ 'আনন্দ' তিনি যদি না পাইবেন ত' আর কে পাইবে?—নিজেও যে তিনি মনে-প্রাণে ঐ শিশুদেরই একজন ছিলেন! এমন শিশু-প্রীতি, এ হেন তন্ময় সহমর্ম্মিতা—এ স্বার্থপর সংসারে কি নিতান্ত দুর্লভ নহে? দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝিয়াছিলেন যে, এ পাষাণ-সম বিশুষ্ক পৃথিবীর বুকে এই শিশুরাই কোমল-কম, সুরভি কুসুম; ইহারাই সর্ব্বশোক ও সন্তাপহর, অপার্থিব অমৃতের অফুরন্ত উৎসধারা; ইহারাই অমর-লোকের জ্যোতির্ম্ময়, মৃত-সঞ্জীবন আনন্দ-কণা!

সন্তান-বাৎসল্য।

শিশুমাত্রেরই প্রতি যাঁহার প্রাণের এতদূর ঐকান্তিক অনুরাগ, তিনি যে সেই মাতৃহারা, আপন অপোগণ্ড পুত্র-কন্যার প্রতি কতখানি অনুরক্ত ও স্নেহ-মুগ্ধ ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। সাধ্বী পত্নীর আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে যখন তাঁহার শিরে অশনি-সম্পাত হইল তখন অসহায় দ্বিজেন্দ্রলাল এই অজ্ঞান শিশু দু'টিকে অনন্য অবলম্বন বোধে সেই-যে বাহুবেষ্টনে, অসীম আগ্রহে আপন বক্ষতলে আঁকড়িয়া-ধরিলেন, —জীবনের অন্তিম মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহারাই এ সংসারে তাঁহার একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা ও আশ্রয় হইয়া রহিল। নাসিকার নিশ্বাস-প্রবাহ দু'টি যেরূপ জীবের জীবনোপায়, দ্বিজেন্দ্রলালও ঠিক তেমনই-ভাবে এই যুগ্ম জীবন-ধারার সাহায্যে তজ্জীবন যাপন করিয়াছেন। প্রিয়তমা পত্নীর গচ্ছিত সম্পত্তির ন্যায়, এই-দু'টি মাতৃহারা পুত্র-কন্যাকে তিনি যক্ষ-ধনের মত, আমরণ অশেষ যত্নে ও সন্ত্রস্ত সতর্কতার সহিত স্বীয় বক্ষপুটে আগুলিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। একাধারে পিতা ও মাতা হইয়া,—কি ভাবে যে তিনি ইহাদের মানুষ করিয়া-তুলিতেছিলেন তাহা বস্তুতঃ বড়ই বিস্ময়কর। 'আলেখ্য'-কাব্যে এই মাতৃহারা অসহায়দের কথা স্মরণ করিয়া, কত রকমে কতবারই যে তিনি হাহাকার করিয়া

কাঁদিয়াছেন, 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রভৃতি নাটকের পত্রে-পত্রে ও ছত্রে-ছত্রে হৃদয়ের শোণিত-বিন্দু দিয়া তিনি বাৎসল্য-স্নেহের যে সকল মর্ম্মভেদী, করুণ দৃশ্য অঙ্কিত করিয়া-রাখিয়াছেন তাহা দেখিলে, অদম্য অশ্রু-বেগ সংবরণ করা দুষ্কর হইয়া ওঠে। ঐসব রচনা, ঐসব চিত্র, বাৎসল্য-প্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের উচ্ছ্বসিত পিতৃহৃদয়ের সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অবিকৃত অভিব্যক্তি মাত্র;—উহাতে চেষ্টা বা কষ্ট-কল্পনার তিলার্দ্ধ সংশ্রব নাই।

এক পাশে পুত্র ও এক পাশে কন্যা,—দু'হাতে দু'জনকে জড়াইয়া-ধরিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল বাৎসল্যে বিগলিত হইয়া বলিতেন,—"এই দেখ, আমার 'যথা,' আর এই আমার 'সর্ব্বস্ব'!" অনেক সময়ে শয্যাতলে শুইয়া, তিনি মণ্টু-মায়ার মাথা দু'টি নিজের বুকের উপরে তুলিয়া-লইয়া, এমন তীব্র অথচ স্নেহময়, অনিমেষ দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া-থাকিতেন যে, মনে হইত—বুঝিবা তাঁহার সারাটা অস্তিত্ব ও চেতনা একমাত্র সেই দৃষ্টিতেই আসিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়াছে; আরও খানিকক্ষণ অমন করিয়া চাহিয়া-থাকিলে, যেন তাঁহার চোখ-দু'টো উহাদের মুখের উপরেই ঠিক্‌রাইয়া পড়িবে! 'আলেখ্য'-কাব্যে 'হতভাগ্য' কবিতার একস্থানে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন,—

"ছেলেটিকে কোলে নিত মেয়েটিকে কোলে নিত,
ধর্‌ত বুকে বাহু দিয়ে ঘিরে;—
অমনি তাহার চোখের সাম্‌নে মুছে যেত বিশ্ব-জগৎ,
চক্ষু দু'টি মুদে' আস্‌ত ধীরে।"

এই তন্ময় বিহ্বলতা,—বাৎসল্যে এই অপূর্ব্ব আত্মবিলোপ, আমরা এক তাঁহারই শেষ জীবনে নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

তেজস্বিতা ও অকপট স্পষ্টবাদিতার (এবং দ্বিজেন্দ্রলালের নিজ ভাষায়—'কারো-তোয়াক্কা-রাখি-না-বাবা-তা'র) ফলে, সচরাচর

তাঁহার স্বভাবে ও ব্যবহারে আমরা বিনয়ের বিশেষ-কোন লক্ষণ দেখিতে পাইতাম না ;—বরং, অনেক সময়ে তাঁহাকে যেন একটু উদ্ধত ও অহঙ্কারী বলিয়াও মনে হইত,—তথাপি যে-সব অবস্থা ও ঘটনায় মানুষকে তাহার প্রকৃত স্বরূপে চেনা যায় তদ্রূপ বহু ব্যাপারে তাঁহাকে আবার এতই নম্র ও নিরভিমান দেখিতাম যে, তখন বস্তুতঃ তাঁহাকে অসামান্য বিনয়ী বলিয়া বোধ হইত। এই দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবের একমাত্র মীমাংসা এই যে, ব্যবহারিক জীবনে সাধারণতঃ বাহ্যিক বিনয়-প্রদর্শনে মানুষকে যেটুকু শোভন কৃত্রিমতার আশ্রয় লইতে হয়, 'সারল্যের অবতার' দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে তাহা কোনদিন সম্ভব না হইলেও, 'আসলে' কিন্তু স্বভাবতঃই তিনি যথেষ্ট অমায়িক, বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। বিনয় বলিতে যাঁহারা প্রকাশ্য ও মৌখিক আনুগত্য, নম্রতা অথবা 'লোক-দেখানো' শিষ্টাচার ভিন্ন আর-কিছু বুঝেন না কি মানেন না, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। অন্যথা, নিরভিমান, সরল গুণগ্রাহিতা, সত্যোপেত স্বাভাবিক শ্রদ্ধা,—এসব যদি বিনয়ের কোন লক্ষণ হয় ত' সে ধরণের বিনয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মন সততই ভূষিত ছিল। সত্য বটে—স্বভাব-শিশু দ্বিজেন্দ্রলাল প্রতিষ্ঠা বা যশের খাতিরে সুলভ সামাজিক শিষ্টাচার কিংবা 'মন ভুলানো' লৌকিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই, (অধিকন্তু, তাঁহার নাটকীয় কোন-কোন চরিত্রের ভাবে ও কবিতার দু'এক স্থানে বোধ হয় যেন—তিনি এবংবিধ 'বিনয়ের অন্য নাম শুভ্র মিথ্যা কথা' বলিয়া বরং একটু ঠাট্টাই করিয়া-গিয়াছেন ;) কিন্তু, অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে তিনি এভাবে যাহাই বলুন না, ভিতরে-ভিতরে তিনি নিজে যে কতদূর অমায়িক ও বিনীত ছিলেন তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ স্বজন-বন্ধুরা বিশেষভাবে অবগত আছেন।

চরিত্র-বিশ্লেষণ।

এই বিনয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায়, একটা কথা মনে

জাগিতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র ঠিকমত বুঝিতে-হইলে কেবলমাত্র প্রাচ্যভাব আমাদের মনে রাখিলে চলিবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই উভয় ভাবই তাঁহার জীবনে অতি বিচিত্ররূপে মিলিয়া গিয়াছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু শ্রেষ্ঠ গুণনিচয় তজ্জীবনে যেরূপ নির্ব্বিরোধ সখ্যে, অতি-অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল, অনেকের মতে—তাহা বর্ত্তমান সময়ে একটা মহনীয় আদর্শরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

বিনয় সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই আমার মনে হয়। হিন্দু ও মুসলমান সমাজে যে-ধরণের শিষ্টাচারকে আমরা বিনয় নামে অভিহিত করি, বাস্তবিক ভাবিয়া-দেখিলে—তদ্রূপ বিনয়ের বিশেষ-কোন চিহ্ন তাঁহার চরিত্রে বিকাশ লাভ করে নাই। কিন্তু, পাশ্চাত্য দিক্ দিয়া বিচার করিয়া-বুঝিলে, যে-ভাবের সামাজিকতা বা লৌকিকতা ঠিক ঐরকম গুণ বলিয়া গ্রাহ্য, তাহা তাঁহার স্বভাবে ও আচরণে অজস্র পরিমাণে পরিলক্ষিত হইত।

সহজাত সত্যনিষ্ঠা ও উদার সহৃদয়তার দরুণ কোন বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের মনে এতটুকুও পক্ষপাত, একদর্শিতা বা গোঁড়ামি'র লেশ অবকাশ ঘটে নাই, দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিচারে তিনি সকল বিষয়েই দোষ-গুণ আশ্চর্য্য নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিচার ও বিবেচনা করিয়া, সাবধানে দোষটুকুকে বাছিয়া-ফেলিয়া, গুণের অংশটুকু সাদরে ও সযত্নে, যথাসম্ভব স্বীয় জীবনে আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইতেন; এবং প্রধানতঃ এই কারণে, যদিচ তিনি সকল সমাজ ও সম্প্রদায়ের দোষ-নির্দ্দেশে নিঃশঙ্ক ও দ্বিধাহীন ছিলেন তবু, সকল দলের সমস্ত লোকেই তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ ও শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া পারেন নাই।

একদিকে যেমন তিনি আত্ম-মর্য্যাদাশীল, তেজস্বী, নিরপেক্ষ, স্পষ্টবাদী, সত্যনিষ্ঠ, যুক্তি-প্রিয় ও দুর্দ্দম ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই

আবার নিরভিমান, অমায়িক, সুপ্রসন্ন বা সদানন্দ, ক্ষমাশীল, উদার, মানদ, প্রেমময় ও ভাব-প্রবণ ছিলেন। অনেকে ভাবেন—মানুষ সরল হইলে বুঝি তা'র বুদ্ধির কিছু অভাব ঘটে ; যুক্তিপ্রিয় হইলে সরসতা থাকে না; তেজস্বী কি স্পষ্টবাদী হইলে দয়া, অমায়িকতা ও শিষ্টাচার লোপ পায় ; সুরসিক ও সদানন্দ হইলে শান্ত-স্বভাব ও গম্ভীর হয় না, এবং আত্ম-মর্য্যাদান্বিত হইলে অহঙ্কারী বা অভিমানী না হইয়া পারে না। কিন্তু, এসব ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত ও অমূলক তাহা স্বীয় জীবনের অসংখ্য আচরণের দ্বারা দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদিগকে সতত, পদে-পদে, 'চোকে আঙ্গুল দিয়া' দেখাইয়া গিয়াছেন।

এতগুলি পরস্পর-বিরোধী বিচিত্র গুণের শোভন সন্নিবেশ বশতঃ সে জীবনখানি পরিচিত জনের মধ্যে স্বতঃই অসামান্য প্রতিষ্ঠা ও দুর্লভ বৈশিষ্ট্য অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিল। স্বজন-বন্ধুর কথা না-হয় ছাড়িয়াই দেওয়া-গেল ;—নিতান্ত শ্রদ্ধাহীন ও নিঃসম্পর্ক, নিন্দুক লোকেও যদি কোনকারণে, ঘটনাচক্রে একটু বেশীক্ষণ বসিয়া তাঁহাকে তেমন-একটু লক্ষ্য করার সুযোগ পাইত, সাময়িকভাবেও তাহার মনে অন্ততঃ কিছু-না-কিছু সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার ভাব আপনা হইতে জাগিয়া উঠিত। এরূপ দু'একটা ঘটনা আমি জানি বলিয়াই বলিলাম। অতি-বড় অসার ও পাষাণ প্রাণও তাঁহার সংসর্গে আসিয়া সদ্‌ভাবে ও সাধু সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হইয়া-উঠিয়াছে, এমন ঘটনা আমি স্বয়ং কয়েকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

তিনি যে কেমন মিশুক ও 'ভোলানাথ' প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে একবার তাহা বলিয়াছি। কিন্তু, একটা কথা তখন বলা হয় নাই,—এখানে সেইটুকু বলিতে চাই। হাইকোর্টের 'বেঞ্চ ক্লার্ক' শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলিতেছেন,—

"দ্বিজদা আমাদের মধ্যে যেন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। * * তাঁহাকে পাইলে আমরাও তেমনি রাখাল বালকের মত হইয়া যাইতাম। মহৎ চরিত্রে চিরকাল

বাল্যভাব থাকে। * * * ইহা তাঁহার চপলতা বা ছেলেমানুষী নহে। জ্ঞানে বৃদ্ধ, কিন্তু বালকের মত কোমলহৃদয়, নির্ম্মল ও সরল ছিলেন।"

—অতি-সত্য কথা ; এবং এই কারণে অনায়াসে ও সহজে তিনি নিঃসম্পর্ক পরকেও আপনার করিয়া লইতেন। এ সংসারে এক-একজন এমন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁহারা (সম্ভবতঃ পূর্ব্বজন্মের কোন সুকৃতিবলে) জন্মাবধি এমন কোন-একটি বিশেষ শক্তির অধিকারী হন যাহার ফলে স্বভাবতঃ তাঁহাদের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। ইহা যে কেবল তাঁহাদের গুণের জন্যই হয় তাহাও ঠিক নহে ;—উহার আরও কোন অজ্ঞাত ও নিগূঢ় কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। এই ধরণের লোকসংগ্রহের ক্ষমতা,—একটা স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি দ্বিজেন্দ্রলালের ছিল।

তারপর, একরকম রসিক ধাতের লোক আছেন যাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র আপনা-আপনি হাসি আসে। (যেমন, এই ধরুন,—রসরাজ অমৃতলাল, পাঁচকড়ি বাবু প্রভৃতি!) কিন্তু, আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল সেরূপ ধরণের মানুষ ছিলেন না। তিনি হাসাইলে লোকে হাসিত বটে ; কিন্তু, তাঁহাকে দেখিলে কাহারও হাসি আসিত না। বরং খুব হাসি-তামাসার স্থলেও হঠাৎ যদি কখন তিনি আসিয়া-পড়িতেন, সকলে অমনই চুপ করিয়া-যাইত,—সহসা কেমন-একটা সম্ভ্রমের ভাব সকলের মনে সঞ্চারিত হইত। এই-সব প্রকৃতির মানুষকেই সচরাচর চলিত কথায় আমরা 'রাসভারি' লোক বলিয়া থাকি। ইচ্ছামত যখন-তখন তিনি যেমন লোককে হাসাইতেও পারিতেন তেমনই আবার যখন খুসি কাঁদাইতেও জানিতেন, এবং সময়ে-সময়ে মাতাইয়াও তুলিতেন।

এ-হেন ক্ষণজন্মা পুরুষ যে সহৃদয়, গুণগ্রাহী ব্যক্তিমাত্রেরই মনোহরণ করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় ফিরিলেন। বহু দিন পরে আবার

সেই 'চাঁদের হাট' মিলিল,—'সুর-ধাম' সতত রসিক-সজ্জনের সঙ্গত-সমাগমে 'গুল্‌জার' হইয়া উঠিল।

'পূর্ণিমা-মিলনের' পুনরাবির্ভাব।

জীবনের অপরাহ্নে, যে কয় বৎসর দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় ছিলেন এই সময় মধ্যে, বহুদিন পরে আবার তাঁহার উৎসাহে, বারত্রয় তদীয় 'সুর-ধামে' 'পূর্ণিমা-মিলনে'র অধিবেশন হয়। 'পূর্ণিমা-মিলন' পূর্ব্বে আরও অনেকবার কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে বটে; কিন্তু, এমন আন্তরিকতা, ও উৎসাহের মিলন আগে আর কখনও কোথাও হইয়াছে কিনা, বিশেষ সন্দেহ। আকাশের চাঁদ এতকাল সুদূর আকাশে বিরাজ করিতেন বলিয়া, মর্ত্ত্যের এ 'পূর্ণিমা-মিলন' স্বভাবতঃই মালিন্য ও অন্ধকারে বিলুপ্ত হইয়া-যাইতেছিল; কিন্তু, আজ স্বয়ং দ্বিজরাজ নামিয়া-আসিয়া মহোল্লাসে যখন এ মিলনে মিলিলেন, পূর্ণিমার শ্যাম-স্নিগ্ধ, সেই সম্মোহন জ্যোতিঃপুঞ্জ যথার্থই যেন 'জমাট্' বাঁধিয়া শতগুণে আরও বর্দ্ধিত হইল।

নাট্যাচার্য্য গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

তারিখটা ঠিক স্মরণ নাই,—এমনই এক 'পূর্ণিমা-মিলনে',—নাট্যাচার্য্য ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একবার দ্বিজেন্দ্রলালের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে 'সুর-ধামে' আসেন। গিরিশবাবু কাহারও গৃহে বড়-একটা যাইতেন না। কিন্তু, সাহিত্য-সেবিগণের সঙ্গ সাধারণতঃ সতীর্থ-সাহিত্যিকের কাছে এতদূর অপার্থিব প্রীতিকর যে, তাঁহার মত একজন বিখ্যাত 'কুণো' ও 'অমিশুক' ব্যক্তিও বহুবার এই মিলনের আকর্ষণ উপেক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে সেদিন এই প্রবীণ সাহিত্যরথীর যে-সব কথোপকথন হয়, সংক্ষেপে এখানে তাহার একটু সারাংশ আমি বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি।

সভাস্থলে গিরিশবাবু আসিয়া উপবিষ্ট হইলে, সসম্ভ্রমে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন,—

"আপনি যে এত কষ্ট করিয়া আসিলেন, এ আমার সৌভাগ্য। আমি আজ বড় আপ্যায়িত হইয়াছি।"

একটু হাসিয়া, বিনীতভাবে গিরিশবাবু বলিলেন,—

"না, না,—এ কি কথা? আমার তো আপনার কাছে আসাই কর্ত্তব্য। তবে কথা কি জানেন? বড় বৃদ্ধ হইয়াছি, শরীরও আর তেমন সবল নহে; তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও, সকল সময়ে কর্ত্তব্য করিয়া উঠিতে পারি না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া, তিনি একটুকাল নীরবে কি-যেন ভাবিয়া আবার বলিলেন—

"কিন্তু, আজ কেবল যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছি তা ঠিক নহে। বিশেষ একটা কথাও আছে। বসুন,—বলিতেছি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল আরও-একটু কাছে সরিয়া-আসিয়া, বসিয়া পড়িলেন।

গি।—"দেখুন, আমাদের দু'জনের মধ্যে যাতে একটা স্থায়ী মনান্তর কি বিচ্ছেদ ঘটে তজ্জন্য বহুদিন যাবৎ আমি দেখিতেছি—নানা জনে নানা রকম 'চেষ্টা-চরিত্র', 'ফিকির-ফন্দী' চালাইতেছে। এসব লোক কতকগুলো মন-ভাঙ্গানো মিথ্যা কথা আমাদের দু'জনার কাণে ইতিমধ্যেই তুলিয়াছে। কিন্তু, আমি বেশ জানি—আপনার সম্বন্ধে আমার কাছে যেসব কথা বলিতেছে তার মূলে কোন সত্য নাই; আর, আমি বিশ্বাস করি—আমার বিরুদ্ধেও আপনি যা' যা' শোনেন তা'ও আপনি 'নিছক' মিথ্যা বলিয়া, হাসিয়া উড়াইয়া-দেন। * * To be candid—('সরলভাবে বলিতে হইলে')—অবশ্য এটা ঠিক যে, আমি এযাবৎ রাশি রাশি বই লিখিয়াছি। তাহার সকলগুলি যে Readable or Successful ('পাঠ্য বা সার্থক') তাহা নিতান্ত পাগল না হইলে কেহ বলিবে না। কিন্তু দু'চারখানি যে মন্দও হয় নাই, একথা কি আপনি অস্বীকার করেন? ভাল-মন্দ—"

বাধা দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন—

"আহা, এসব কি কথা! এরকম কথা কি আপনার মুখে সাজে,—বিশেষ এই আমার কাছে? আপনি তো এ বিষয়ে আমাদের গুরু! বাস্তবিক আপনাকে অনুসরণ করিয়াই তো আমরা তবু এই-যা দু'একখানা নাটক লিখিতে শিখিয়াছি। আপনার মুখে এমন কথা শুনিলে,—কি আর বলিব বলুন।"—

যেন কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের দিকে সেই বড় বড় চোক দুটি মেলিয়া চাহিয়া-থাকিয়া, একটু জোরের সঙ্গে গিরিশবাবু কহিলেন,—

"কি বলেন আপনি! আপনার উপরে আমার কত শ্রদ্ধা তা আমি জানি। সত্য বলিতে কি,—As a dramatist, আপনার উপর আমার অগাধ আশা। ভবিষ্যতে আপনিই যে এদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার,—আমাদের একমাত্র ভবিষ্যৎ-ভরসা, এ বিষয়ে কি আর কোন রকম সন্দেহ আছে? এই অল্প কয়টি বছরের ভিতরে আপনি যা দেখাইলেন, আমাদের সারাটা জীবনের সাধনায়ও ঠিক তেমনটি হইল না। রাণা প্রতাপের তিন অঙ্ক লিখিয়া বইটা কবে ফেলিয়া রাখিয়াছি; এ নাটক তো সেইখানেই শেষ হইয়া গেল। আপনি যে সেই 'রাণা প্রতাপে'র তিন অঙ্কের পরও আরও দু'টো অঙ্ক বাড়াইয়া-দিয়াছেন তাহাতেই আপনার শক্তির প্রথম পরিচয় পাই। আমাদের তো দিন ফুরাইয়া আসিল ভায়া,—এখন আপনার উপরেই সব ভার।"

দ্বিজেন্দ্রলাল কথাটার গতি ফিরাইয়া-দিয়া কহিলেন,—

"আমি আপনার বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করিব, এ কি সম্ভব? যে সব লোক ঐ রকম 'কাণ-কথা' বলিতে-আসে তাদের অসৎ উদ্দেশ্য কি আর আমি বুঝি না? ততটুকু বুদ্ধি আমার বেশ আছে। তবে, একটা কথা আমার কি মনে হয়, জানেন?—আপনি আমাকে নিজগুণে যে-রকম উৎসাহ দিলেন তাহাতে ভবিষ্যতে আমি যদি আপনার Direction ('নির্দ্দেশ বা উপদেশ') অনুসারে চলিতে পারি, উভয়ে যদি একযোগে কাজ করিতে পারি, ত' আমার Future'এ (ভবিষ্যতে) অনেক উন্নতি হইবে এবং সম্ভবতঃ Stage'এরও (রঙ্গালয়েরও) বহুৎ উপকার করা যাইতে পারিবে।

একথায় গিরিশবাবু উল্লসিত হইয়া বলিলেন,—

বাঃ! এই তো চাই! দেখুন, আমরা দু'জনে কেহ কাহাকেও Ignore (তুচ্ছ) করিতে পারি না। আমাদের মধ্যে এই সদ্‌ভাবটুকু যেন সর্ব্বদা অটুট থাকে। লোকে যা'র যা খুসি, বলুক গিয়ে;—আমাদের তাতে কি আসে যায়?

ইহার পর, আরও খানিকক্ষণ অন্যান্য বিষয়ে আলাপ হইলে, অবশেষে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিলেন,—

"অবশ্য বলিতে সাহস হয় না;—কারণ, শুনিয়াছি, আপনি নাকি নিজের বই ছাড়া আধুনিক আর-কোন লেখকের বই 'রিহার্সাল' দেন না।—তবু মানুষের মন তো?—কত রকম আশা করে। এই যে আমার 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটা Play (অভিনীত) হইবে, আপনি কি এটাতে কোন Part (ভূমিকা) রিহার্সাল দিতে স্বীকার করিবেন?"

উত্তরে গিরিশবাবু বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে কহিলেন,—

"অবশ্য। সে কি?—আপনার বই 'রিহার্সাল' দেওয়া, এ তো আমার পক্ষে সুখের বিষয়! 'রিহার্সাল' দিব কি না, কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? অবশ্যই দিব;—এ তো আহ্লাদের কথা,—গৌরবের বিষয়!"

অতঃপর তখন উভয়েরই ইচ্ছাক্রমে স্থির হইল—'চন্দ্রগুপ্তে' নট-গুরু গিরিশচন্দ্র সেকেন্দার সাহা কিংবা য়্যালেক্‌জেণ্ডারের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশতঃ, যথাকালে গিরিশবাবুর 'হাঁপানি' হঠাৎ বাড়িয়া-পড়ায়, এ সঙ্কল্প তিনি আর কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই।

৺গিরিশ ঘোষ মহাশয় শুধু যে দ্বিজেন্দ্রলালের সাক্ষাতেই তাঁহাকে এরূপ মর্য্যাদা ও সমাদর দেখাইয়াছিলেন তাহা নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি বাস্তবিকই তাঁহার প্রগাঢ়, আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, আমার এ উক্তির সমর্থন হিসাবে, প্রসঙ্গতঃ এখানে দ্বিজেন্দ্রলালের স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন মিত্রের কথিত একটা বিবরণ প্রদত্ত হইল। কিশোরীবাবু লিখিয়াছেন,—

"ইং ১৯১০ সনের শেষে বড়-দিনের ছুটি উপলক্ষে, * * আমি একবার ৺কাশীধামে তীর্থ-দর্শনার্থ গমন করি। ২।৩ দিন পরে হঠাৎ একদিন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য আমার মনে প্রবল বাসনা হইল। * * * তিনি আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সময় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। * * পরদিন যথাসময়ে তাঁহার কাছে গেলাম এবং যথারীতি পরিচয়াদির পর নানাবিধ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলাম। কথায় কথায়, নাট্যালোচনা প্রসঙ্গে মহাকবি দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভার কথা উত্থাপিত হইল। এ সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' মহানাটক 'মিনার্ভা রঙ্গালয়ে' মহাসমারোহে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অভিনীত হইতেছিল এবং তখন কলিকাতার সর্ব্বত্র দ্বিজেন্দ্রলালের যশোগানে প্রমত্ত ও মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কথা-প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র বলিলেন,—'বাপুহে! দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার কথা আর বেশিকি বলিব?—এই সবেমাত্র সাতটি বছরে তিনি যেরূপ সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠা ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, আজ পর্য্যন্ত তাহা এদেশে আর কোন নাট্যকারের ভাগ্যে ঘটে নাই। ছোক্‌রা এই 'সাজাহানেই' তাহার নাট্য-প্রতিভার চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছে। আমি আশা করি এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, আমার অবর্ত্তমানে এ দেশের 'থিয়েটার'গুলিতে অভিনয়ের জন্য আর ভাল ভাল নাটকের মোটেই অভাব হইবে না। দ্বিজেন রায় বাঁচিয়া থাকিলে এ দেশকে সে অনেক নূতন নূতন অপূর্ব্ব জিনিষ দেখাইতে পারিবে।" এই সঙ্গে অন্য একজন খ্যাতনামা জীবিত নাট্যকারের কথা উঠিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন—"উহার নাটক থিয়েটারে চলিবে ও আদর পাইবে, যখন আমি ইহজগৎ হইতে চলিয়া যাইব, আর দ্বিজু রায় পক্ষাঘাতে অথর্ব্ব হইয়া শয্যাশায়ী হইবে। দ্বিজেনের সঙ্গে তার কথা? আগুন কখনও ছাই-চাপা থাকে না হে!"

'ইভ্‌নীং-ক্লাব'।

সম্ভ্রান্ত, ভদ্র-বংশজাত কতিপয় যুবক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইভ্‌নীং-ক্লাবে'র প্রতি এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সস্নেহ সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়। শিশু-স্বভাব দ্বিজেন্দ্রলাল অতি অল্পকাল মধ্যে এই সকল যুবকগণের সঙ্গে এমনই সহজে

মিলিয়া-মিশিয়া এক হইয়া-গেলেন যে, তাঁহার সেই অকৃত্রিম সারল্য ও সহৃদয়তাগুণে, কালক্রমে উক্ত ক্লাবের পরিচালকবর্গ তাঁহাকেই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ও নেতৃরূপে বরণ করিয়া লইলেন; এবং তিনিও তাঁহাদের সাগ্রহ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, অচিরে উহার President (সভাপতি) হইয়া বসিলেন। 'ইভ্‌নীং-ক্লাব' কেবল যে তাঁহার হৃদয়-মনের উপরে এতটা আধিপত্য বিস্তার করিল তাহা নহে;—কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, উহা অবশেষে তাঁহার বাস-গৃহ 'সুর-ধামে'রও পূরাপূরি অর্দ্ধেকটা দখল করিয়া নিয়াছে! এই উপলক্ষে, এমনই করিয়া 'ইভ্‌নীং-ক্লাবে'র নানা রকম মঙ্গল সাধিত হইল সত্য; কিন্তু, এজন্য আবার দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মীয়-বন্ধুর মধ্যে অনেকে মনে-মনে বড়-বেশি বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হইলেন। এতকাল যে-দ্বিজেন্দ্রলালকে ইহাঁরা একান্ত আপন জন ও সর্ব্বথা নিজস্ব সম্পত্তি বোধে, অক্ষুণ্ণ প্রতাপে তৎপ্রতি একাধিপত্য রক্ষা করিয়া-আসিয়াছেন, কোথা হইতে সেই অবাধ অধিকারের উপর সহসা আজ এই-সব অজাতগুম্ফ, একরাশ যুবককে এভাবে 'উড়িয়া-আসিয়া জুড়িয়া-বসিতে' দেখিয়া ইহাঁরা স্বভাবতঃ অত্যন্ত অধীর ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এই শ্রেণীর দু'একটি স্বার্থপর বন্ধু উপায়ান্তর না দেখিয়া, এ সময়ে একবার 'ইভ্‌নীং-ক্লাবে'র প্রধান-প্রধান কয়েকজন পাণ্ডার বিরুদ্ধে কয়েকটা অমূলক ও অতিরঞ্জিত অভিযোগ উত্থাপন করিয়া, তাঁহাদের বড়-সোহাগের দ্বিজেন্দ্রলালকে এই 'ক্লাবের' কবল হইতে উদ্ধার করিতে যথেষ্টই চেষ্টা করিলেন; কিন্তু, নিষ্কাম প্রেমের পরশমণি যাঁহার অনাবিল অন্তস্তলকে বারেক স্পর্শ করিয়াছে, অসীমচারী তাঁহার সেই সুবর্ণময় প্রাণ-বিহঙ্গ কোনদিনও কি আর সঙ্কীর্ণ পিঞ্জর-সীমায়,—সামান্য গণ্ডীর মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ বা বন্দী করিয়া রাখিতে পারে? সব ক্ষুধার নিবৃত্তি আছে, সকল পিপাসার পরিতৃপ্তি আছে; কিন্তু এ যে প্রেম!

এ যে অনির্ব্বাণ অমৃত-তৃষা,—এ যে সেই অসীম শিব-সুন্দরের আকুল আবাহনেরই আর্ত্ত প্রতিধ্বনি! দ্বিজেন্দ্রলাল পারিলেন না। যুবক-বর্গের সরল সোহাগ-শ্রদ্ধার অকৃত্রিম আকর্ষণে আপনাকে একান্তে তাঁহাদের কাছে 'বিনামূল্যে' বিকাইয়া দিলেন। 'ইভ্‌নীং-ক্লাব' অনায়াসে আসিয়া, 'সুর-ধামে'র নিম্ন-তল দখল করিয়া লইল।

এখন এই 'ইভ্‌নীং-ক্লাবে'র একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইংরাজী ১৯০০ সনে, মেট্রোপলিটান্ কলেজের কতকগুলি ছাত্র কলিকাতার সুকীয়া ষ্ট্রীটে 'ফ্রেণ্ডস্-ড্রামাটিক্-ক্লাব্' নামে একটি ক্লাব্ ('মিলনী') স্থাপিত করেন। বিখ্যাত পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এই অনুষ্ঠানটির প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন! কালক্রমে 'ড্রামাটিক্-ক্লাবে'র সভ্যদের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হওয়ায়, হরিদাস ও প্রমথনাথ উহার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া, স্বতন্ত্রভাবে 'কলিকাতা-ইভ্‌নীং-ক্লাব' নামে নূতন-একটি 'ক্লাবে'র প্রতিষ্ঠা করেন; এবং ইহাঁদের অক্লান্ত উদ্যোগে ও যত্নে বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের ভদ্র-সন্তান ইহাতে আসিয়া ক্রমশঃ যোগ দিতে থাকেন। 'ইভ্‌নীং-ক্লাবে'র উক্ত উৎসাহী পরিচালকদ্বয় ও আরও কোন-কোন সভ্যের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্ব হইতে পরিচয় ছিল;—ইহাঁরা সকলেই তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশ হইতে ফিরিয়া, যখন কিছু কালের মত এ সময়ে স্থায়ীভাবে কলিকাতায় অবস্থান করিতে-লাগিলেন তখন এই-সকল যুবকেরা তাঁহাকে আসিয়া উক্ত 'মিলনী'র সভাপতি হওয়ার জন্য বিশেষভাবে ধরিয়া-পড়ায়, তিনি ইহাঁদের আগ্রহ দেখিয়া সে প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর, বলা বাহুল্য—তাঁহার সভাপতিত্বে 'ইভ্‌নীং-ক্লাব'ও উত্তরোত্তর অতি-দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইল, এবং কলিকাতার সর্ব্বত্র তৎকালে ইহা প্রচুর প্রসিদ্ধি ও প্রসারতা লাভ করিয়াছিল।

নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি মহাশয়ের সযত্ন শিক্ষা ও নির্দ্দেশমত, ক্লাবের উৎসাহী সভ্যগণ পরে-পরে, খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের 'নন্দকুমার', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও সভাপতির 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকগুলি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত করিয়া, কলিকাতার রস-গ্রাহী শিক্ষিত-সমাজে যথেষ্ট যশস্বী হইয়া ওঠেন। ক্রমশঃ, আরও একবার তাঁহারা 'কলিকাতা-সঙ্গীত সমাজের' 'সারস্বত-সম্মিলন' উপলক্ষে তথায় 'কমলাকান্তের জবানবন্দী' ও দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নামক নাট্যকাব্যের কিয়দংশ বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করেন ; এবং 'সীতা'র অভিনয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে মহর্ষি বাল্মীকির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া, সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়া তোলেন।

কিন্তু, 'ইভ্‌নীং-ক্লাব' শুধু যে নিয়ত নাট্যাভিনয় নিয়াই ব্যাপৃত ছিলেন, একথা ভাবিলে ভুল হইবে। প্রতি-সন্ধ্যায় সভ্যগণ 'ক্লাবে' মিলিত হইয়া নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক করিতেন, এবং বিচার-আলোচনার সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়েও যত্নবান্ হইতেন। এই উভয় উপায়ে, অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে, নির্দ্দোষ সন্তোষ লাভের সঙ্গে-সঙ্গে ইহাঁরা নিজেদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও উৎকর্ষ সাধন করিতেছিলেন।

এতকাল 'ইভ্‌নীং-ক্লাব' কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ছিল ; কিন্তু, অনুগ্রহ-বিদায়ের 'ম্যাদ' ফুরাইয়া-আসিলে, দ্বিজেন্দ্রলালকে এ সময়ে বাঁকুড়া-জেলায় বদ্‌লী করায়, তাঁহারই সম্মতিক্রমে 'ক্লাব'টাকে তখন তাঁহার বাস-গৃহের নিম্নতলে তুলিয়া-আনা হয়। তৎকালে সকলে ভাবিয়াছিলেন—দ্বিজেন্দ্রলালকে অন্ততঃ বাঁকুড়ায় যথারীতি বর্ষত্রয় অবস্থান করিতে হইবে। কিন্তু, বাঁকুড়ায় গিয়া তিনি অতি অল্প দিন থাকিতে-না-থাকিতে সহসা তাঁহাকে মুঙ্গেরে বদ্‌লী করা হইল ; এবং এই সময়ে তিনি সেই যে একবার '২।৪ দিনের জন্য কলিকাতায়

বেড়াইয়া-যাইতে' আসিলেন, আর তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইল না।--কাল-ব্যাধির আকস্মিক আক্রমণে এইবারেই তাঁহাকে অকর্ম্মণ্যরূপে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হয়।

'ইভ্‌নীং-ক্লাব' 'সুর-ধামে' স্থাপিত হওয়ার অতি অল্প দিন পরে, অভাবিতভাবে তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে হইল বটে ; তথাপি, নিজের নানা অসুবিধা ও কোন-কোন বন্ধুর প্রকাশ্য বিরক্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও, তিনি এই শরণাগত 'ক্লাব'কে কোনমতেও অন্যত্র অন্তরিত করিতে রাজী হইলেন না। শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবু জানাইতেছেন,—

"বাঁকুড়াতে তাঁহার রোগের সূত্রপাত হওয়ার অল্প দিন পরেই তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে হয়। ক্লাব তখন পূর্ব্ব বাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে ; তিনি আসিতেছেন, অতএব, এ বাড়িও ছাড়িতে হয়। কিন্তু, হঠাৎ ক্লাবের যোগ্য বাড়ি পাওয়া যে কত শক্ত তাহা হয়ত অনেকেরই ধারণা নাই। আমরা অকূল পাথারে পড়িলাম। কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় আসিয়া আমাদের দুরবস্থা অনুমান করিয়া একদিন প্রফুল্ল মুখে বলিলেন—"তোমরা এত চিন্তিত হ'চ্ছ কেন? তোমাদের প্রেসিডেন্ট (সভাপতি) যদি তোমাদের ক্লাবে এসে বাস করে তা'তে কি তোমাদের আপত্তি হওয়া উচিত?" তাঁহার এ কথায় আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। কিন্তু তবু একটু শঙ্কিত থাকিতে হইল যে, ক্লাবে কত রকম স্বভাবের লোক আছে, পাছে দিনরাত এতটা একত্র থাকিতে গিয়া কেহ কোনরূপ অভদ্রতা বা অসম্মানসূচক আচরণ করিয়া ফেলে। কিন্তু, তাঁহার সুমধুর উদার চরিত্রে অসম্ভবও ক্রমে সম্ভব হইল। * * ক্লাবে আমাদের নিজেদের মধ্যে কত ঝগ্‌ড়া, মতান্তর, মনান্তর প্রভৃতি সর্ব্বদাই হইত—কখনও তজ্জন্য তাঁহাকে একটুও রাগিতে বা বিরক্ত হইতে দেখি নাই। ক্লাবের সঙ্গে কি ভাবে তিনি তাঁহার সত্তা মিলাইয়া দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার শেষ পুস্তক 'বঙ্গনারী'তে তিনি সদানন্দের মুখে বলিয়া গিয়াছেন।—'শুন্‌ছ, আমি একটা যাত্রার দল কর্চ্ছি?'—ইত্যাদি। আবার এই ক্লাবে তাঁহাকে গৃহিণীপনাও করিতে হইয়াছে। বেশ মনে পড়ে, একদিন ক্লাবের

দু'জন বিশিষ্ট সভ্য ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর মধ্যে 'বিলিয়ার্ড' খেলায় প্রথমে খেলার অধিকার লইয়া বাদানুবাদ, পরে বচসা, পরে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ হয়, এবং রাগের মাথায় 'আর কখনও বিলিয়ার্ড খেলিব না' এ প্রতিজ্ঞাও হইয়া যায়। দ্বিজুবাবু বাহিরে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন; তিনি সেখান হইতে সবই জানিতে পারেন। খানিক পরে 'বিলিয়ার্ড রুমে' আসিয়া অতি গম্ভীর স্বরে উহাদের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া তাঁহার সঙ্গে 'বিলিয়ার্ড' খেলিতে অনুজ্ঞা করিলেন। তৎকালে তাঁহার সেই গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া কিছুমাত্র আপত্তি করিতে সাহস হইল না;—সভ্যটি খেলিতে বাধ্য হইলেন। খেলা শেষ হইলে দ্বিজুবাবু স্বভাব-সুলভ মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন—"ওহে! আজকের ঝগড়ায় তোমারই দোষ; সেইজন্য তোমার প্রতিজ্ঞাটাই আগে ভেঙ্গে দিলাম।" অতঃপর অপর ব্যক্তিকেও ডাকিয়া, তাহাদের দু'জনাকে হাসিমুখে খেলিতে হুকুম করিয়া, গান গাহিতে গাহিতে উপরে উঠিয়া গেলেন।

"তাঁহার 'চন্দ্রগুপ্ত' হইতে 'বঙ্গনারী'—পর্য্যন্ত সকল নাটকই ক্লাবে বসিয়া রচিত। প্রতিদিন যাহা লিখিতেন, আমাদের কাছে পড়িয়া শুনাইতেন এবং আমাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। বিরুদ্ধমত প্রকাশে কখনও বিরক্ত হইতেন না; বরং, আমাদের বক্তব্য তাঁহার মনে লাগিলে, লেখা অকুণ্ঠিত চিত্তে বদ্‌লাইয়া ফেলিতেন। তাঁহার কোন নাটক প্রকাশের পূর্ব্বে, ঐ নাটকের জন্য রচিত গীত সকল ক্লাবের গীতজ্ঞ সভ্যদের শিক্ষা দিতেন এবং উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের সকলকে তাহা আদর করিয়া শুনাইতেন। * *

"লোকান্তর-গমনের পর তাঁহার উইলের * Executor (তত্ত্বাবধায়ক) তাঁহার সমস্ত বাড়িটা অন্য লোককে ভাড়া দেওয়ায় ক্লাব স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু 'শিবহীন যজ্ঞের' ন্যায় তাঁহার অবর্ত্তমানে সভ্যগণের মনে আর উৎসাহ না থাকায় এবং সুবিধামত বাড়ি না পাওয়ায় ক্লাবের পরিচালকগণ অগত্যা তাঁহার এই বড় সাধের 'ইভ্‌নীং-ক্লাব'টি অকালে উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন।"

অসুস্থ হইয়া যখন দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় চিকিৎসাধীন ছিলেন,

* দ্বিজেন্দ্রলাল Will (চরম পত্র) সম্পাদন করিবার অবসর পান নাই। তবে, তাঁহার তাবৎ বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য তদীয় মধ্যম শ্যালক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মজুমদার ব্যারিষ্টার মহাশয় তাঁহার একমাত্র পুত্রের 'তরফে' অভিভাবক নিযুক্ত হন বটে।—গ্রন্থকার।

'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রের সূচনা ও প্রচার।

একদিন সেই সময়ে তদীয় অন্তরঙ্গ আত্মীয় অধরচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত 'সুর-ধামে' বসিয়া-আছেন, হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"অধরদা, আপনি চাক্‌রী ছাড়িয়া দিন!" কোথাও কিছু নাই—সহসা এই অদ্ভুত অনুরোধ শুনিয়া অধরদা * তো অবাক্! তিনি কোন-কিছু 'ঠাহর' করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কি? চাক্‌রী ছাড়িয়া শুধু-শুধু অম্‌নি চুপ করিয়া বসিয়া-থাকিব? একটা কিছু করা তো চাই।" দ্বিজেন্দ্রলাল একটু অন্য মনে খানিকটা ভাবিয়া বলিলেন,—

"হুঁ! সেটা একটা কথা বটে! তা দেখুন, আমিও ভাব্‌ছি, এই চাক্‌রীটার ২৫ বছর পূর্ণ হ'লে,—আর তা' হ'তেও বড় বাকি নাই,—এ কাজ থেকে পেন্সন নেব। তখন, বেশ ধীরে-সুস্থে, মনের মতন করে', বেশ একটা নূতন ধরণের Ideal ('আদর্শ') মাসিক কাগজ বা'র করা যাবে। লেখকের তো আর অভাব নাই? এই ধরুন না—রাঙ্গাদা, সেজদা, † অক্ষয় মৈত্রেয়, পাঁচকড়ি, সুরেশ, দেবকুমার, বিজয়, সুরেন মজুমদার, অক্ষয় বড়াল, আপনি, দাদামশায়,‡ আমি তো আছিই—তা ভিন্ন, আরও-সব কতইতো জানাশোনা নামজাদা লেখক সব রয়েছেন। সকলে মিলে' যদি কোমর বেঁধে', তেমন ভাবে লিখ্‌তে সুরু করি ত' আর ভাবনা কি? এ ছাড়া, আমি আবার অনেক নতুন-নতুন লেখকও তৈরী করে' নেব। কেমন করে' যে তা' করে, তা' আমি বেশ জানি। দেখ্‌বেন অধরদা, এমন কাগজই বা'র কর্ব্ব যে, দেশশুদ্ধ লোকের একেবারেই 'তাক্' লেগে যাবে! আপনিও তখন আমার মত এই কাজ নিয়েই ব্যাপৃত থাক্‌তে পার্‌বেন; আর, অমন গোলামি করার দরকার হবে না।"

কি করিয়া এই খেয়ালটা দ্বিজেন্দ্রলালকে 'পাইয়া'-বসে তাহার

* 'দাদামহাশয়' প্রসাদদাস বাবুর মত ইনিও আমাদের সরকারী 'অধরদা'। এ ঘটনাটি তাঁহারই কথিত।—গ্রন্থকার।

† রাঙ্গাদা=শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় মহাশয়। † সেজদা=জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় মহাশয়।

‡ দাদামহাশয়=শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয়।—গ্রন্থকার।

কিঞ্চিৎ ইতিহাস আছে। 'ইভ্‌নীং-ক্লাবের' সম্পাদক প্রমথ বাবুর বহু দিন হইতে একটি Club-magazine প্রচার করার কল্পনা ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালকে তিনি সে ইচ্ছা জানাইলে, তিনিও তাহাতে উৎসাহ দেন। পুস্তক-প্রকাশক হরিদাস বাবু ক্লাবের একজন প্রধান সভ্য ও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ঐরূপ একখানা কাগজ বাহির করিতে কিরকম খরচ আবশ্যক, তদ্বিষয়ে একটী Estimate ('আনুমানিক হিসাব') করার ভার হরিদাস বাবুর উপরে অর্পিত হয়। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন—এ কল্পনা বৃথা; কেননা, অর্থাভাবে এরূপ কাগজ কিছুতেই চলিতে পারে না। তিনি প্রমথ বাবু ও দ্বিজেন্দ্রলালকে বুঝাইলেন যে,—

"ক্লাবে'র আর্থিক অবস্থা এমন-কিছু নহে যে, তাহা হইতে পত্রিকার কোন সাহায্য সম্ভব; তার উপরে, এরূপ একটা ক্লাবের কাগজ বাহিরের দশজনে যে লইবে, সে আশাও দুরাশা। কাজেই, এ ভাবে এ কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা কোনক্রমেই উচিত বা সুপরামর্শ নহে।"

হরিদাস বাবুর মন্তব্যে প্রস্তাবকারীরা মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তখন হরিদাস বাবু তাঁহাদের অত আগ্রহ দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলালকে কহিলেন,—

"আপনার এ ইচ্ছা পূর্ণ না হইলেও, আমি কিন্তু আর-একটি প্রস্তাব করিতে পারি।—আপনি যদি স্বয়ং সম্পাদক হ'তে স্বীকার করেন ত' আমি নিজ ব্যয়ে, বাঙ্গলা দেশে প্রকাশিত আর-সমস্ত মাসিক পত্রের চেয়ে বড় ও আপনারই নামের যোগ্য, একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক-পত্র বাহির করার ভার-গ্রহণে সম্পূর্ণ রাজী আছি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল হরিদাস বাবুর এ কথায় অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন; এবং অকপট উৎসাহে এ সম্পর্কে তাঁহার সাগ্রহ সম্মতি জানাইয়া বলিলেন—"বেশ, তা' হ'লে এ কাগজ এখনই বাহির হউক্। আমিও খুব শীঘ্র পেন্সন লইয়া নিজেকে ইহার সম্পাদক-পদে নিযুক্ত করিয়া-দিব।"

যাহাহৌক্, প্রস্তাবটি স্থিরীকৃত হইলে, নূতন মাসিকের নামকরণ লইয়া উদ্‌যোগিগণের মধ্যে প্রথমটা খুব বাগ্‌বিতণ্ডা চলে। শেষে, স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রস্তাবমত 'ভারতবর্ষ' নামটাই নির্দ্দিষ্ট হইল; এবং গোপনে ইহার অভীপ্সিত সার্থকতা সম্পাদনের জন্য বিবিধ আয়োজন আরম্ভ হইয়া গেল। দ্বিজেন্দ্রলাল অবিলম্বে ইহার 'সূচনা,' দুইটি অনুপম সঙ্গীত, 'ছত্র-মহিমা' ও 'হরিনাথের ধ্রুপদ-শিক্ষা' প্রভৃতি রচনা করিলেন; এবং বঙ্গের সর্ব্বত্র হইতে যাবতীয় শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখকগণের লেখা বহু ব্যয়ে ও সযত্নে সমাহৃত হইতে লাগিল।

বৈশাখ হইতে 'ভারতবর্ষে'র বর্ষারম্ভ হইবে, স্থির ছিল; কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের 'পেন্সনের আবেদন মঞ্জুর হইতে অযথা বিলম্ব ঘটায়, অগত্যা, শেষে উহা আষাঢ় মাসেই জন্ম-গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। যেই এই অভিনব সঙ্কল্পের সংবাদ রাষ্ট্র হইল অমনই এ দেশের সর্ব্বত্র ইহা লইয়া একটা প্রবল আন্দোলন ব্যাপ্তিলাভ করিল। দ্বিজেন্দ্রলালের শরীর পূর্ব্ব হইতেই অতিশয় রুগ্ন ও অপটু হইয়া পড়িয়াছিল। পাছে এই নূতন কার্য্যের দায়িত্বে ও উত্তেজনায় তিনি আরও পীড়িত হইয়া-পড়েন—এই আশঙ্কায়, তদীয় হিতার্থী আত্মীয়-বন্ধুরা দলে-দলে আসিয়া, তাঁহাকে এ শ্রম-সাধ্য ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে স্বতঃ-পরতঃ নানাপ্রকারেই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন; কিন্তু, তাহাতে কোন ফল হইল না। তিনি স্বীয় সঙ্কল্পে অচল-অটল রহিলেন।

বঙ্গসাহিত্যে কোনরূপ গ্লানি-মালিন্য, কুনীতি ও কুরুচি প্রশ্রয় না পায়, তৎপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল যে কত সতর্ক ও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি ছিলেন তাহা আমরা জ্ঞাত আছি। 'ভারতবর্ষ'-প্রচারের সময়েও সে বিষয়ে তাঁহার সতর্কতার অবধি ছিল না। অনেক চেষ্টা-তদ্বিরের পর, নবাবিষ্কৃত একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী গল্প-লেখক 'ভারতবর্ষে'র

জন্য একটি মনস্তত্ত্বমূলক ও 'শিল্প-কলাসম্পন্ন,' চমৎকার গল্প প্রেরণ করেন। কিন্তু, সুনীতির হিসাবে ইহার কেন্দ্র-চরিত্রটি সমর্থনযোগ্য মনে না হওয়ায়, অনায়াসে দ্বিজেন্দ্রলাল সেটিকেও নামঞ্জুর (Reject) করিয়া দেন। ইহা ব্যতীত আরও দু'একটা ব্যাপারে তাঁহার এই অবিচলিত নীতি-নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া-গিয়াছিল। একজন সুখ্যাত চিত্রকর 'ভারতবর্ষে'র জন্য একটি সুন্দর ছবি আঁকিয়া, দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে লইয়া আসেন। ছবিটি দেখিয়া সকলেরই অত্যন্ত 'পসন্দ' হইল ; কিন্তু, সম্পাদক মহাশয় উহার সম্পর্কে একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—"কালের গতি অনুসারে এখন এ চিত্র 'ভারতবর্ষে' অপ্রকাশ্য !" মন্তব্য শুনিয়া সকলে তো অবাক্। ছবিটার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' ; অর্থাৎ—সূর্য্যদেবের আবির্ভাবে কুন্তী দেবী আলুলায়িত কেশে, ভূ-লুণ্ঠিতা হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। যাঁহারা প্রথম হইতে এ চিত্রের প্রশংসা করিতেছিলেন তাঁহাদের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের তখনই ঘোর তর্ক আরম্ভ হইল ; কিন্তু, শেষে এ যুদ্ধেও দ্বিজেন্দ্রলাল জয়ী হইলেন। চিত্রটি প্রকাশ-যোগ্য বিবেচিত হইল না।

কিন্তু, নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধি কে কবে অতিক্রম করিতে পারিয়াছে ? এত যে সাধের 'ভারতবর্ষ,' হায়,—তাহাও প্রচারিত হওয়ার অল্প পূর্ব্বে, দ্বিজেন্দ্রলাল অকস্মাৎ অনন্তপথের যাত্রী হইলেন ! আর, অসহায় আমরা এই দূরে পড়িয়া-রহিয়া, কেবল হাহাকার করিতে লাগিলাম ! আজ, যদিও সেই 'ভারতবর্ষ' দ্বিজেন্দ্রলালের আশীর্ব্বাদে ও পুণ্য নামের মহিমায় এখন পর্য্যন্ত বেশ সুচালিতই হইতেছে, তবু, তিনি থাকিলে ইহার আরও যে কত বৈচিত্র্য ও উন্নতি হইতে-পারিত তাহা মনে হইলেও প্রাণটা যেন কেমন করিয়া ওঠে ! বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের কি দারুণ দুর্ভাগ্য !

———

সামাজিক ও ধর্ম্ম-মত।

'সুর-ধামে' দ্বিজেন্দ্রলাল যে তদীয় পুত্রের উপনয়ন-সংস্কার করাইলেন, পাঠককে তাহা জানান গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে, এখন একবার তাঁহার সামাজিক অন্যান্য মতের আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

দ্বিজেন্দ্রলাল জাতি-ভেদ বা বর্ণ-ভেদ প্রথার পক্ষপাতী ছিলেন। বর্ণ-মিশ্রণের, অর্থাৎ—সমাজে অসবর্ণ বিবাহ-প্রচলনের তিনি সর্ব্বথা বিরোধী মত পোষণ করিতেন। আমার বিশ্বাস—অন্যান্য বহু বিষয়ের ন্যায়, এ ব্যাপারেও কতকটা তিনি পাশ্চাত্য 'ঋষি', মহামনস্বী ৺হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের মতানুগামী ছিলেন। য়ুরোপবাসীদের সঙ্গে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত করার জন্য জাপানীরা যখন একবার দার্শনিক-চূড়ামণি হার্ব্বার্ট-স্পেন্সারের মত-প্রার্থী হইয়াছিল তৎকালে স্পেন্সার উক্ত বিষয়ে যে-সব প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করেন, দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক সময়ে, এ প্রসঙ্গে সেই কথার উল্লেখ করিয়া, বর্ণ-মিশ্রণের অনিবার্য্য অপকারিতা নানা যুক্তি-সাহায্যে প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন। বর্ণাশ্রম-'ধর্ম্মে'র বিলোপ-সাধন এদেশের পক্ষে যে কোনক্রমে আবশ্যক বা শুভকর নহে তাহা তিনি চিরকালই মুক্তকণ্ঠে বলিতেন; এবং শেষ বয়সে তিনি 'সাহিত্য'-পত্রে এ সম্পর্কে যে চিন্তা-গর্ভ ও সারবান্ প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন তাহাতেও নানাপ্রকার অকাট্য ও সূক্ষ্ম তর্ক-জাল বিস্তার পূর্ব্বক অতি স্পষ্টরূপে প্রমাণ করেন যে, 'সংসারের সমূহ অনর্থের হেতুভূত, ঐ জঘন্য, অর্থ-জাত জাতি-বিচার (যাহা বিলাতে ও পাশ্চাত্য অন্যান্য দেশসমূহে বহুল

বর্ণাশ্রম-'ধর্ম্ম', জাতি-ভেদ বা 'শ্রেণী-বিন্যাস।'

পরিমাণে প্রচলিত আছে তাহা) অপেক্ষা সামাজিক শান্তি, স্থিতি ও শৃঙ্খলা-বিধায়ক আমাদের হিন্দু-সমাজের এই গুণ ও কর্ম্মমূলক, বংশগত জাতি-বিচার বস্তুতঃপক্ষে যথেষ্ট শোভন ও যুক্তিযুক্ত। এই অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির সর্ব্বত্র কোন-না-কোন প্রকার পার্থক্য, বৈষম্য বা জাতি-ভেদ যখন এই প্রকৃতিরই অনিবার্য্য স্বভাব বা অভিব্যক্তি তখন মানুষ ইচ্ছা করিবামাত্রই যে এই বিশ্বব্যাপী বিভিন্নতার স্থলে ঐক্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, এরূপ মনে করাও আমাদের ভ্রম। প্রকৃতিগত জাতিভেদ এ দেশে যেভাবে প্রচলিত হইয়াছে তাহা গুণ-কর্ম্মগত; অতএব, সর্ব্বাংশেই ইহা যুক্তি ও স্বভাবের অনুকূল। কিন্তু, ইহার পরিবর্ত্তে যদি আর্থিক অবস্থাগত জাতিভেদ এ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে তবে এ দেশের যে অতি-দারুণ দুর্গতি ও ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হইবে তৎপক্ষে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।' কল্যাণীয় দিলীপকুমারের যজ্ঞোপবীত দেওয়ার কিছুকাল পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন,—

"* * নিছক অপকার ছাড়া এই বর্ণাশ্রম-সংহাররূপ সর্ব্বনেশে একাকারের আমি কোনদিন কোন উপকারিতা বা আবশ্যকতা বুঝ্‌তে পার্লাম না। বর্ত্তমানে গুণগত জাতি-বিচার না থাকে,—বিলাতী মোহে হিতাহিত না ভুলে',—সেই ভাবেই না হয় এ সমাজকে আবার সংস্কৃত করে তোলো না! কিন্তু, সমস্ত মিশিয়েগুষিয়ে পিণ্ডাকারে তাল পাকিয়ে তুলে কি যে ইষ্ট হ'বে তা এঁরাই জানেন। * * যে শান্তি, স্থিতি ও শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে সমাজে এই আদর্শে জাতি-ভেদ স্থাপিত হ'য়েছিল তার পরিবর্ত্তে যদি বিলাতের সেই * * * প্রভৃতি ব্যাপার আমাদের এখানেও আরম্ভ হয় ত তখন একটা ভয়ঙ্কর যথেচ্ছাচার গণ্ডগোল ও অশান্তি দেশময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়্‌বে। * * 'জাতি-ভেদ' কথাটাতেই যদি এত গোল বেধে থাকে, এস,—নাহয় সবাই মিলে' এখন থেকে এটাকে শ্রেণীভেদ বলে' নাম-করণ করি। * * "

বর্ণাশ্রমের বিলোপ-সাধন তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না সত্য; কিন্তু

স্পর্শ-দোষ ও সামাজিক অন্যান্য 'খুঁটিনাটি'।

তা' বলিয়া তিনি স্পর্শ-দোষ কিংবা 'টিকির মাহাত্ম্য' কোনদিনও বুঝিতে বা মানিতে পারেন নাই। যে সমস্ত বিধি-নিয়ম প্রত্যক্ষ বিবেচনা বা যুক্তি-তর্কে স্পষ্ট বোধ-গম্য হয় না,—এককথায় বলিতে গেলে,—তাহাকেই দ্বিজেন্দ্রলালের বিচার-প্রবণ মন অযথা কুসংস্কার বলিয়া সর্ব্বথা বর্জ্জন করিতে উদ্যত হইত। এই হিসাবে বিচার করিয়া-দেখিলে, মোটামুটি তাঁহার অন্যান্য মতামতগুলিও যথাযথ বুঝিয়া-লইতে আমাদের বিশেষ বিলম্ব হয় না।

আহার সম্পর্কে জাতি-বিচার কিংবা স্পর্শ-দোষ স্বীকার করা তিনি শুধু যে অনাবশ্যক তাহা নহে,—সমাজের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর বলিয়া, অবশ্য-পরিত্যাজ্য গণ্য করিতেন।

এই সঙ্গে ইহাও অবশ্য ধরিয়া-লইতে হইবে যে, তিনি 'হাঁচি টিক্‌টিকির বাধা' প্রভৃতি ছোটখাটো দেশাচারগুলির অত্যন্ত বিরুদ্ধাচারী ছিলেন ; এমন কি,—তিথি-নক্ষত্র দেখিয়া দিন-ক্ষণ-গণনা ও আহার-ব্যবহারের 'বাছ-বিচার' তিনি যে বড়-একটা করিতেন, আমার তা' মনে হয় না।

বাল্য-বিবাহ।

বাল্য বিবাহের তিনি ঘোরতর বিপক্ষ ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি যে কত গভীরভাবে দেশের দুর্গতির কথা অনুভব করিয়াছেন তাহা তদ্রচিত সর্ব্বশেষ নাটক 'বঙ্গনারী' পাঠ করিলে সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি বলিতেছেন,—

"নিজের উপায় কর্ত্তে না পার, ছেলেপেলেদের উপায় ত কর্ত্তে পার ? অল্প বয়সেই তাদের বিবাহ দিও না। তারা সবল ও সমর্থ হবার পূর্ব্বে তাদের ঘাড়ে সংসারের ভার চাপিও না। এই বাল্যবিবাহে জাতটাকে যেমন বিব্রত অথর্ব্ব করে রেখেছে, আর কিছুতে তেমন কর্ত্তে পারেনি।"—ইত্যাদি।

শুধু যে তিনি মুখে এই মত প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে,—অপরাপর বিষয়ের ন্যায় এ ব্যাপারেও যা' মুখে বলিয়াছেন,

কার্য্যতঃ নিজেও ঠিক তদ্রূপই আচরণ করিয়াছেন। তাঁহার রূপে-গুণে নিরুপমা কন্যা, কল্যাণী শ্রীমতী মায়া (প্রচলিত প্রথানুসারে বিবাহ-যোগ্য বয়স্থা হইলেও,) বহু বাঞ্ছনীয় স্থানের অযাচিত অনুরোধ সত্ত্বেও, তাহাকে তিনি পরিণীতা করিতে সম্মত হন নাই।

কিন্তু বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধ ছিলেন বলিয়া সমাজে তিনি বিলাতী আদর্শের 'কোর্টসিপ' বা যৌন-নির্ব্বাচন চালাইতে চাহেন নাই। বয়ঃস্থ শিক্ষিত যুবক তদীয় জনক-জননীর সম্মতি বা নির্দেশমত, পাত্রীকে সাধারণ ভাবে 'বড়-জোর' দেখিয়া-শুনিয়া বিবাহ করুক—এতটা পর্য্যন্ত তাঁহার অনভিপ্রেত ছিল না বটে ; কিন্তু, দস্তুর মত 'কোর্টসিপ'-প্রচলনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেই তিনি তীব্র মন্তব্য প্রচার করিয়াছেন। একবার তিনি প্রসঙ্গচ্ছলে আমাকে লিখিয়াছিলেন,—

"প্রাপ্ত-যৌবন পুত্র-কন্যা বয়সের দোষে এ ব্যাপারে নিজেদের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। এ সম্বন্ধেও পিতা-মাতার ন্যায় তাহাদের যথার্থ হিতার্থী এ সংসারে আর কেহই নহেন, তাহারা নিজেরাও নহে।"

বিবাহে পণ-গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহার মত একটু অদ্ভুত ধরণের ছিল। পণগ্রাহী, লোভ-পরায়ণ পিতামাতা বা আত্মীয়-অভিভাবকদের প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি বলিতেন,—

পণ-গ্রহণ।

"পণ-গ্রহণ আমি মোটের উপরে অন্যায় মনে করি না। কন্যাকে জন্মের শোধ একপ্রকার ফাঁকি দিয়ে পুত্রের জন্য সর্ব্বস্ব রক্ষা করা, আমি গর্হিত ও অন্যায় মনে করি। পিতামাতার পক্ষে, কন্যাই বা কি আর পুত্রই বা কি—কেহই কম আদরণীয় নহে। কন্যাটির একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর হ'তে যাবজ্জীবন ভরণ-পোষণের ভার যে নিবে, সে যে কেন ন্যায়তঃ পণ-গ্রহণ কর্‌বে না,—বুঝে'-ওঠা দুষ্কর। এ দেশে এ প্রথা আজ কিছু নূতন নহে ; এবং বিলাতে, স্বেচ্ছাধীন-বিবাহ চলিত থাকা সত্ত্বেও, সেখানেও যে প্রকারান্তরে পণগ্রহণ চলে না, এমন কথা কেহই বল্‌বেন না। Dower ও Dowry System এক হিসাবে পণ-প্রথা নয়ত কি ?"

বয়ঃস্থা কুমারী বেশিদিন অবিবাহিত অবস্থায় ঘরে রাখিলে সমাজে নিন্দা সহিতে হয়, এ কথা শুনিবামাত্র তিনি উত্তেজিত হইয়া চটিয়া উঠিতেন। বলিতেন,—

"এতে আবার লোক-নিন্দা কি? যে-দেশে বাল-বিধবা ব্রহ্মচারিণী দেবীর অভাব নাই সে-দেশে যোগ্য পণ-দানে অক্ষম, দরিদ্র পিতার কুমারী কন্যা কেন যে দু' চার বছর ব্রহ্মচর্য্য পালন করে' পিতৃগৃহে বাস কর্‌তে পার্‌বে না, এ তো বুঝা যায় না। লোক-নিন্দা! লোক-নিন্দার কথা কেন বল? আগে সমাজের সবাই শিক্ষিত হোক্, ভাব্‌তে শিখুক; তারপর, তাদের কথায় না-হয় কর্ণপাত করা যাবে।"

আমি অতি অল্পের মধ্যে এ ব্যাপারে তাঁহার মোটামুটি কথাটুকই মাত্র উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু, নিপুণতার্কিক দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে এবিষয়ে আমাদের যত তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে তাহার সারাংশ তিনি তাঁহার সর্ব্বশেষ সামাজিক নাটক 'বঙ্গনারী'তে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। *

উক্ত বিষয়ের তর্ক-বিবৃতির একত্র তিনি ('বঙ্গনারী'তে) বলিতেছেন—"* * যদি কুমারীরা ব্রহ্মচর্য্য কর্‌তে পারে না, এই

তোমার মত হয় ত বাল-বিধবারাও পারে না।

বিধবা-বিবাহ। তবে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত কর!"

সমাজের দিক্ দিয়া বিচার পূর্ব্বক, তর্কের খাতিরে, তিনি এই-ভাবে বাল-বিধবার পুনর্ব্বিবাহ-প্রচলনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন মাত্র; কিন্তু, আমরা জানি—প্রকৃত পক্ষে বিধবার বিবাহ দেওয়া যে সর্ব্বাংশে উচিত তাহা তিনি কখনও মনে করিতেন না। অবশ্য সমাজের বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় হয়ত বিধবা-বিবাহ প্রয়োজন ও নিরাপদ্, একথা তিনি বলিয়াছেন; কিন্তু, কি বিধবা কি বিপত্নীক,—উভয়ের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য-পালনই যে সম্পূর্ণ সঙ্গত ও

* কৌতূহলী পাঠক এ সম্পর্কে 'বঙ্গনারী' পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।—গ্রন্থকার।

বিহিত কর্ত্তব্য, তিনি তাহা বহুপ্রকারে, বারংবার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। যে-সকল বিপত্নীক বা বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করা দুরূহ বা অসাধ্য তাহাদের পক্ষে, গুপ্ত ব্যভিচার বা জঘন্য পাপে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা, বিধিমতে বিবাহিত হইয়া সমাজ-ধর্ম্ম রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়,—এই তাঁহার মত ছিল। তা' ছাড়া সকল বিপত্নীক বা বিধবাকেই যে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি বা অন্য-কোন কারণে বিবাহ দিতেই হইবে,—এমন ধারণা কোনকালেও তিনি আপন মনে স্থান দেন নাই।

হিন্দু-সমাজে চিন্তাশীল শিক্ষিতগণের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা পুরুষের পক্ষে পুনর্ব্বিবাহ বৈধ বলিয়া মানিলেও, নারীর পক্ষে—সে বালিকা হৌক্ আর বয়ঃস্থাই হৌক্,—তাহা সকল অবস্থাতেই অতীব গর্হিত ও গুরুতর অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করেন। ইহাঁদের মতে—পুরুষ মানুষ স্ত্রী-বিয়োগের পর বিবাহ করিলে এমনকি বহু-বিবাহ করিলেও, তাহাতে সমাজের তেমন-কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই; কিন্তু, রমণীর পক্ষে, যে-কোন অবস্থায় হৌক্ না, 'দ্বিচারিণী' হওয়া অতি অমার্জ্জনীয়, সাংঘাতিক অপরাধ, এবং পরিণামে তাহা সমাজের পক্ষেও সমূহ সর্ব্বনাশের নিদান! এবংবিধ মতের মধ্যে সারবান্ কোন যুক্তি কিংবা শুভোদ্দেশ্য যদিবা কিছু থাকে, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা 'গোঁড়ামি' ও সঙ্কীর্ণতা জ্ঞানে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। তিনি স্ত্রী-পুরুষের এইরূপ স্বাতন্ত্র্য বা প্রভেদ আদৌ স্বীকার করিতেন না।

সামাজিক প্রধান-প্রধান, তর্কিত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে এই তো হইল তাঁহার মতামত। এতদ্ব্যতীত, আর-আর বিষয়ের মধ্যে এখন কেবল অবরোধ-প্রথার কথাটা বলিলেই, মোটামুটি এ প্রস্তাবের প্রায় সকল কথাই আমার জানানো হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের

ভাব কত গাঢ় ও গভীররূপে বদ্ধমূল ছিল। মাতৃজাতির প্রতি কোনমতে আমাদের কৃতজ্ঞ কর্ত্তব্যের যাহাতে কণামাত্রও ত্রুটি ও অবহেলা না ঘটে; পুরুষ পরিচালিত সমাজ জননী-জাতির উপরে যাহাতে কোনরূপ অশ্রদ্ধা, অনাদর বা উপেক্ষা না করে,—তাঁহাদের সুখ-স্বস্তি প্রভাব-প্রতিপত্তি যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস না পায়, সেদিকে তাঁহার উদ্বিগ্ন, সতর্ক ও প্রখর দৃষ্টি সর্ব্বদাই নির্নিমেষ রহিত। শেষ বয়সে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি যদিও তিনি বহুল পরিমাণে অনুরাগী ও শ্রদ্ধাবান্ হইতেছিলেন তবু, একটা বিষয়ে কিন্তু এ সমাজের বিরুদ্ধে তাঁহার মনে অত্যন্ত হীন ধারণা চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি ভাবিতেন ও বিশ্বাস করিতেন যে, 'আবহমান কাল হিন্দু-সমাজ নারীজাতিকে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও হতাদর করিয়া আসিতেছে। আজ যে আমরা এসম্বন্ধে একটু মর্য্যাদাশীল হইয়াছি, সে শুধু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম মাত্র; নতুবা, হিন্দু-সভ্যতার চরমোন্নতির সময়েও আমরা ইহাঁদিগকে গৃহস্থ তৈজস-পত্রাদির ন্যায় নগণ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছি।' তিনি বলিতেন,—

অবরোধ-প্রথা ও স্ত্রী-জাতির অধিকার।

"কোন একটা অলঙ্কার বা তৈজস-পত্রের মত আমরা স্ত্রীলোকের উপরে যথেচ্ছ আচরণ করিতে কোনদিনও দ্বিধান্বিত হই নাই। হাজার রকমে অধঃপাতে গিয়াও, আজ আমাদের মধ্যে নিম্নতম স্তরের লোকেরাও যে সব কাজ করিতে লজ্জা পায়,—সভ্যতার চরমোচ্চশৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ও পরম পূজ্য-রূপে স্বীকৃত হইয়াও, স্বয়ং রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত তাহা অসঙ্কোচে করিয়া গিয়াছেন। সীতার বনবাস ও অগ্নি-পরীক্ষা এবং অক্ষ-ক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে 'বাজী' রাখা প্রভৃতি ব্যাপার একটু বিবেচনা করিয়া-দেখিলেই, আমরা মাথা হেঁট করিয়া মানিতে বাধ্য হই যে, স্ত্রীকে আমরা পার্থিব সম্পত্তির তুল্য-মূল্য ভাবে গণ্য করিতাম।"

এইসব যুক্তিসাহায্যে উত্তেজিতভাবে তিনি যখন মাতৃজাতির

দুঃখ-দুর্দ্দশার বর্ণন করিতেন তখন আন্তরিক আক্ষেপে, লজ্জায় ও বেদনায় কথা কহিতে-কহিতে বারংবার তাঁহার কণ্ঠ-রোধ হইয়া যাইত। উদ্ধৃত উক্তির একাংশ তদীয় 'সীতা' নামক নাট্য-কাব্যে তিনি যেভাবে বিবৃত করিয়াছেন, শুধু সেইটুকু পড়িলেও আমরা এ বিষয়ে তাঁহার আন্তরিকতা উপলব্ধি করিতে পারি।

সমাজের আর-আর সমস্ত ভুল-চুক্ কি ত্রুটি-অপরাধ দ্বিজেন্দ্রলালের চক্ষে তবু যা'হৌক্, ক্ষমার্হ ছিল; কিন্তু, নারীদের এই অপমান ও হতাদর তিনি প্রাণান্তেও 'বরদাস্ত' করিতে পারিতেন না। তিনি কহিতেন,—

"সব দোষের ক্ষালন আছে, সব অপরাধের মার্জ্জনা আছে, সমস্ত পাপেরই হয়ত প্রায়শ্চিত্ত আছে; কিন্তু, সমাজের সর্ব্ববিধ শান্তি, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যের আধার বা মুখ্য-কেন্দ্রের প্রতি এই-যে আমাদের অবিচারিত অত্যাচার ও আঘাত,—জননীদের প্রতি এই-যে আমাদের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা,—এ ভয়ঙ্কর মহাপাতক হইতে আমাদের কিছুতেই একেবারে পরিত্রাণ নাই। যাহাহৌক্, যদিও আজ ইংরাজদের শিক্ষা ও আদর্শের কল্যাণে সমাজে একটু চেতনার সঞ্চার হইয়াছে তবু, মত-প্রচারে—মুখে আমরা যতখানি উদার, কার্য্যতঃ—আসল কর্ত্তব্যপালনের সময়ে আমাদের এখনও তাদৃশ মনোযোগ বা আগ্রহ দৃষ্ট হয় না।"*

স্বতঃপরতঃ, দ্বিজেন্দ্রলাল বাক্যে, কর্ম্মে, চিন্তায় বা রচনায়—যখনই একটু অবকাশ পাইয়াছেন,—নমস্যা নারীজাতির প্রতি সর্ব্বতোভাবে সম্মানপর ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ হওয়ার জন্য দেশবাসীকে সর্ব্বদা উদ্বোধিত করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু, কেবল গৃহস্থ 'কুলুঙ্গী' বা অন্তঃপুরের নিভৃত 'তাকে' তুলিয়া-রাখিয়া, শুধু যে তিনি তাঁহাদের পূজার্চ্চনা করিবারই পরামর্শ দিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহাদের হৃদয়-মনের সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা ও বিকাশ-সাধনের জন্য মূলে তিনি

* অবিকল এই ভাষাতেই যে তিনি এসব কথা বলিয়াছিলেন তাহা নহে। তবে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম বা ভাব ঠিক এইরূপই বটে।—গ্রন্থকার।

ঐ অবরোধ-প্রথারও যথোচিত বর্জ্জন, অর্থাৎ—প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন, সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সংযতভাবে ও যথোচিত সম্ভ্রমের সহিত আমাদের শিক্ষিত-সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মেলা-মেশা প্রচলিত হইলে,-তাহাতে মোটের উপরে যে দেশের উপকার বৈ অপকারের আশঙ্কা নাই, একথা তিনি প্রাচীন ইতিহাসের 'নজীর' দিয়া আমাদিগকে অনেক সময়ে বুঝাইতে চাহিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহারাষ্ট্র-দেশে যে-ভাবে ও যতটা 'স্ত্রী-স্বাধীনতা'র (?) বিস্তার ঘটিয়াছে, তিনি এদেশের পক্ষেও তাহা অনুসরণীয় বলিতেন; কিন্তু, বিলাতে ও পাশ্চাত্য দেশসমূহে এ ব্যাপারের যতটা বাহুল্য বা আতিশয্য দেখা যায় ততটা 'বাড়াবাড়ি'ও আবার এদেশের পক্ষে সম্ভব বা উচিত বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিত্যক্ত, অসমাপ্ত রচনাবলীর মধ্যে দেখিলাম,—বহুকাল পূর্ব্বে এ বিষয়ে তিনি একটা প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু, তাহা এত অসম্পূর্ণ ও অল্প যে, তাহা পাঠে তৃপ্ত হইতে পারা যায় না! প্রবন্ধটার যেটুকু * পাওয়া-গেল তাহা এই,—

'অবরোধ প্রথা'

"হিন্দু-স্ত্রী বিবাহিত হইলে অবরুদ্ধা। ইংরাজ-স্ত্রী বিবাহের পরেই যাহা কিছু স্বাধীনতা পাইয়া থাকেন। হিন্দু বালিকা ৯।১০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত খেলা করিয়া বেড়ায়; বসনের একান্ত বিশৃঙ্খলতা, স্বরের অবারিত উচ্চতা, ও সর্বাঙ্গের অনিয়ত পরিচালনে তাহার স্বাধীন প্রবৃত্তি সমুদায়ের দুর্দ্দম বিকাশ আরম্ভ হয়। সে তখন একটি উচ্চ-চারী স্বাধীন-কণ্ঠ পাপিয়ার ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল; সুখে ঈশ্বরের রাজত্বে বেড়াইয়া বেড়ায়।—

"কিন্তু যেই সে বিবাহিত হইল, সেই তাহার স্বাধীন বৃত্তির গতিরোধ হইল, তাহার প্রমত্ত বাল্যসুখ-স্বপ্ন মিলাইয়া গেল; সে দীর্ঘাবগুণ্ঠনা, আবদ্ধ-কুন্তলা,

* অসম্পূর্ণ হইলেও, শুধু তাঁহার অপ্রকাশিত লেখা বলিয়াই, এটুকু পাঠককে উপহার দিতে সাহসী হইলাম।—গ্রন্থকার।

নম্র-নেত্রা, গম্ভীরা বঙ্গবধূ হইয়া শাশুড়ী, ননদী, ইত্যাদির প্রিয়ভাষে গৃহ-কর্ম্ম শিখিতে আরম্ভ করিল।

"ইংরাজ-স্ত্রী প্রায় তাহার বিপরীত। অবশ্য ৯।১০ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত সে শিশু, হিন্দু-বালিকার ন্যায়ই খেলিয়া বেড়ায়। কিন্তু ১৫ বয়ঃক্রম হইতেই সে তাহার মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বা অন্য Chaperone'এর শাসনে থাকে; তাহার স্বাধীনগতি রোধ হয়। পরে যেই তাহার বিবাহ হয়, সেই সে প্রায় পূর্ব্ববৎই স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হয়,—কেবল তাহার মাত্রার তফাৎ মাত্র। সে অন্য পুরুষের সহিত অবারিতভাবে মেশে, একাকিনী পথে বাহির হয়, এমন কি স্বামীর বা নিজের একজন অতিবিশ্বস্ত পুরাতন বন্ধুর সহিত অরক্ষিতভাবেও বায়ুসেবনে বহির্গত হওয়াতে স্বামীর আপত্তিও গ্রাহ্য হয় না।

"হিন্দু অবরোধপ্রথায় স্ত্রী বিগ্‌ড়াইবার যেরূপ সম্ভাবনা, ইংরাজী প্রথায় অবশ্য তাহার অপেক্ষা বিগ্‌ড়াইবার সম্ভাবনা অনেক অধিক। জলে না নামিলে, সাঁতার না জানিলেও ডুবিবার সম্ভাবনা নিতান্ত কম; ঘোড়ায় না চড়িলে তাহা হইতে পড়িতেও হয় না। এটি এতই স্বতঃসিদ্ধ যে তাহাতে আপত্তি করা মূঢ়তা।

"কিন্তু ইংরাজজাতি অন্তরে যে হিন্দু অপেক্ষা অধিক লম্পট বা ভ্রষ্টাচারী তাহা শুধু এইজন্যই বিশ্বাস করিবার কারণ দেখি না। তাহাহইলে স্ত্রী যে বাহিরে যাইলেই ভ্রষ্টা হইবার সম্ভাবনা, (তাঁহাদের অবরোধ-প্রথা যাহা সপ্রমাণ করিতেছে) হিন্দুজাতির এই বিশ্বাসও কি হিন্দু রমণীর লঘুতা ও হিন্দু যুবকের স্বভাব-লাম্পট্য প্রমাণ করিতেছে না? আমরা দেখিতেছি যে যাঁহারা বিলাত যান নাই, ইংরাজ-সমাজে মিশেন নাই, এবং এ্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজের বাহির হইতে বিচার করেন তাঁহারা ইংরাজ রমণীরা যে কেহ ভ্রষ্টা না হইয়া থাকিতে পারে, তাহার ধারণাও করিতে পারেন না। ইহা হইতে তাঁহারা আপনাদের ও স্ত্রীদিগের চরিত্রের স্বাভাবিক কলুষপ্রবণতার আর কি বেশি জাজ্বল্যমান প্রমাণ দিতে পারেন? অনভ্যাস বশতঃ যাহা অসম্ভব ও অসম্ভাব্য বোধ হয় তাহা অভ্যাসে সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। Bloudin ৫০০ হস্ত উর্দ্ধ-স্থিত দড়ির উপর চলিতে, নাচিতে, রাঁধিতে, শুইতে, কামান আওয়াজ করিতে অক্লেশে পারিতেন। আমরা তাহা পারি না, ও কেহ যে পারে একথা সহজে

বিশ্বাসও করিতে চাই না। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকে শুদ্ধ একগাছি ছড়ির সাহায্যে বশ ও বাধ্য করা Circus দেখিবার পূর্ব্বে আশ্চর্য্য বোধ হইত। জল জমিয়া বরফ হইতে পারে তাহা সায়ামের রাজার হাস্যকররূপে অসম্ভব বোধ হইয়াছিল। সেজন্য যে দেশে ৫০০ শত বর্ষ হইতে অবরোধ-প্রথা, সে দেশে অবরোধ-প্রথা ব্যতিরেকেও যে সতীত্ব থাকিতে পারে তাহা অসম্ভব যে বোধ হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

"অবরোধপ্রথার পক্ষে এই বলা যাইতে পারে, যে তাহাতে স্বামীর মনের কতকটা শান্তি থাকে, যে স্ত্রী এক দুর্গদ্বারা রক্ষিত আছে, এবং স্ত্রীও এই প্রথাকে অবশ্যম্ভাবী ও অনুল্লঙ্ঘ্য জানিয়া ক্রমে আপনার ভাগ্যসহিত মনোবৃত্তিকে নিয়মিত করে। এমন Evil প্রায়ই নাই যাহাতে মনুষ্য ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া যাইতে না পারে।

"ছেলেবেলায় বোধ হয় Goldsmithএ……পড়া গিয়াছিল, যে চাইনার রাজার সিংহাসনারোহণোপলক্ষে যখন অনেক কয়েদীকে কারামুক্ত করা হয়, তখন এক বৃদ্ধ কয়েদী ক্রন্দন করিয়া নরপতিকে কহে, যে সে স্বাধীনতা চাহে না, তাহাকে সেই কারাগারে পুনর্ব্বার নিক্ষিপ্ত করা হউক্। যখন দাস-ব্যবসা ইংরাজরা উঠাইয়া দেন তখন দাস-ব্যবসায়ীগণ এই উত্তর করেন, যে দাসগণ তাহাদিগের ভাগ্যে ত অসন্তুষ্ট নহে, তোমরা মস্তক স্বেদাক্ত কর কেন ? ইংরাজ-রমণী যে অবরোধ-প্রথাকে তিনদিনমাত্রের জন্যও অসহ্য বিবেচনা করিবেন, হিন্দু-রমণী সহিষ্ণু, এমন কি সন্তুষ্টভাবে তাহাকে আমরণ দুর্ব্বহ বিবেচনা করেন না। গরমজল প্রথমে গায়ে 'ছেঁক' করিয়া ওঠে, কিন্তু ক্ষণেক পরে তাহাও আর গরম বোধ হয় না।"

অতঃপর, দ্বিজেন্দ্রলাল, কি ভাবে আমরা স্ত্রীদের দেখি তাহার ক'একটা পৌরাণিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, এই 'কুপ্রথা'টা যে প্রথম কি কারণে ও কিভাবে আমাদের সমাজে সম্ভব হইল অস্পষ্টভাবে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেন। অনন্তর মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পুনরায় বলিতেছেন,—

"তবে ইংরাজ-জাতির মধ্যে যে রূপ-লালসা নাই তাহা নয়। বরং

বোধহয় বাঙ্গালী অপেক্ষা সে বিষয়ে তাদের অধিক দৃষ্টি। ইংরাজ জাতি পরিচারিকা রাখিতেও তাহার ফটো চাহিয়া পাঠায়, ঘোড়া কিনিতে হইলে রং বাছে, একটা বাড়ি করিতে হইলে তাহার চারিদিকে বাগান করে। কিন্তু সৌন্দর্য্য প্রথম Condition হইলেও ইংরাজের কাছে স্ত্রীর মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা একটা আদরের ও গৌরবের জিনিষ; ও যে স্ত্রী লিখিতে পড়িতে পারে না, প্রায় তাহার রূপ সত্বেও বিবাহ হয় না। তাই ইংলণ্ডে স্ত্রী-শিক্ষার এত আদর—"* (অসম্পূর্ণ)

* * *

উপরে, অল্পের মধ্যে, দ্বিজেন্দ্রলালের ক'একটা সামাজিক মতামত উদ্ধৃত হইল। এখন, আমি যতদূর জানি ও বুঝিয়াছি—তাঁহার ধর্ম্ম-মত বা বিশ্বাস সম্বন্ধে যৎসামান্য একটু উল্লেখ করিলেই, মতের দিক্ দিয়া মোটামুটি তাঁহার একটা পরিচয় প্রদান করা হয়।

ধর্ম্ম-মত ও ঈশ্বরে বিশ্বাস।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—তাঁহার যুক্তিপ্রবণ চিত্ত নির্ব্বিচারে কখনও কোনবিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত বা আস্থাবান্ হইতে জানিত না। এইজন্য, মানব-বুদ্ধির অতীত, যে-সকল অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে সহজাত সংস্কার ও পরিবেশ-প্রভাবে সচরাচর হিন্দু-সন্তানের মনে একটা বিশ্বাস ও ধারণা বিদ্যমান দেখা-যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তৎসমূহে তিলমাত্রও আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেন না। জন্মান্তর, পরলোক, দেব-দানব, ভূত-প্রেত প্রভৃতির অস্তিত্ব সাধারণতঃ হিন্দুর পক্ষে যেরূপ নিঃসংশয় সত্যরূপে স্বীকৃত হইয়া-থাকে, দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে তাহা অবাস্তব প্রহেলিকা কিংবা কবি-কল্পনা ব্যতীত আর বড়-বিশেষ কিছু বলিয়া গণ্য হইত না। যুক্তি-তর্ক ও প্রমাণের প্রত্যক্ষ ও বোধগম্য

* ইহার পরেও 'ছাড়া-ছাড়াভাবে' এইরূপ মাঝে-মাঝে দু'দশ 'লাইন' লেখা আছে। কিন্তু, তাহা শুধু Point এ'র মত; তদ্দ্বারা কেহ কিছু বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া, এস্থলে সেগুলি উদ্ধৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম।— গ্রন্থকার।

মান-দণ্ডে যে-সব ব্যাপারের পরিণাম জানা-যায় না, বিচার-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাহার যাথার্থ্য বা স্বরূপ নির্ণীত হয় না, সমাজে তাহা সর্ব্বজন-মান্য হইলেও, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহার কোনরূপ মর্য্যাদাদানে বা মূল্য-নির্দ্ধারণে সম্মত ছিলেন না। পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের অত্যধিক অনুশীলনের ফলেই যে তাঁহার আভ্যন্তরীণ, অর্থাৎ— মানসিক অবস্থার এইরূপ পরিণাম দাঁড়াইয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু, ইহার মধ্যেও যে তাঁহার সেই স্বাভাবিক সারল্য ও সত্যানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় আছে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে ? অবশ্য তাঁহার এই অবিশ্বাস ও সত্য-কাম সন্দেহ-বাদ ভাল না মন্দ, দোষ কি গুণ তাহা 'সুধীভির্ভাব্যম্,'—আমার বিচার্য্য নহে। আমি এখানে শুধু তাঁহার প্রকৃত স্বরূপটিই সাধ্যমত পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করিতে যত্নবান্ হইয়াছি।

পুরাণে ও শাস্ত্রাদিতে বর্ণিত, ঠিক সাধারণের ধারণানুরূপ, 'পরকাল' ও 'জন্মান্তর' তিনি মানিতেন না বটে ; কিন্তু, অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে, সমগ্র মানবজাতির ক্রমোন্নতি এবং তাহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার একটা চরম পরিণতির সম্ভাবনা তিনি যেন মনে-মনে স্বীকার করিতেন বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে তাঁহার 'আলেখ্য'-কাব্যের "পরকাল" ও অন্যান্য কোন-কোন রচনার স্থান-বিশেষ আমার এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

অতীন্দ্রিয় অন্যান্য ব্যাপারের মত ঈশ্বরের অস্তিত্বও বিচারসহ নহে বলিয়া, তিনি প্রকাশ্যে তাহাও স্বীকার করিতেন না। যদিচ তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান্ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে ভিতরে-ভিতরে একেবারে নাস্তিক হওয়া আমরা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই বিশ্বাস করিতাম ; কিন্তু, তিনি নিজে 'সোজাসুজি', স্পষ্টভাবে 'ধরাছোঁয়া' না পাওয়া পর্য্যন্ত, স্বয়ং ঈশ্বরকেও,—লোকের কথায় বা চক্ষু-লজ্জায়,— স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে মানিয়া-লইতে কোনদিন রাজী হন নাই, আমার

সঙ্গে আলাপ বা ঘনিষ্ঠতার পূর্ব্বে তাঁহার মনে কি ভাব ছিল তাহা আমি জানিও না, বলিতেও পারি না; তবে, আমার অভিজ্ঞতা যতদিনের তাহাতে আমি দেখিয়াছি—প্রথম-প্রথম, বহু বৎসর যাবৎ তিনি যথেষ্ট সন্দিগ্ধ ভাবেই এ সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি বাক্‌বিতণ্ডা করিতেন; এবং তর্ক-স্থলে যাঁহারা যুক্তিসাহায্যে সপ্রমাণ করিতে পারিতেন না, অথচ স্বাভাবিকভাবে ভগবানের অস্তিত্বে আস্থাবান্ ছিলেন তাঁহাদিগকে তিনি অশোভন ও নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ ও ব্যঙ্গ পর্য্যন্ত করিতে ছাড়িতেন না। যদি কখনও তাঁহার এই তর্ক-স্পৃহা ও নির্ম্মম আক্রমণ দেখিয়া ক্ষুণ্নমনে জিজ্ঞাসা করিতাম যে,—'এ কি শুধু এই তর্কের খাতিরেই তর্ক করিতেছেন? না, মনে-মনে মানেনও?' —তাহা হইলে, তিনি হাসিতে-হাসিতে উত্তর দিতেন,—"না, হে, না। না দেখিলে বা না বুঝিলে, কেমন করিয়া একটা স্থির বিশ্বাস করি বল তো?" কথাটা এইভাবে তিনি তখনও উড়াইয়া-দিতে, চাপা দিতে চাহিতেন সত্য; কিন্তু, তবু যেন আমার মনে হয়—বহুবার সেইসব উত্তরের মধ্যেই আমি তাঁহার একটা আন্তরিক আকুলতা, সন্দিগ্ধ অস্থিরতা ও জিজ্ঞাসু আর্ত্তনাদ অনুভব করিয়াছি।

স্ত্রী-বিয়োগের পর কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার এই সন্দেহ ভীষণভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কোনরকম একটু অবসর পাইবা-মাত্র, তৎকালে তিনি অত্যধিক উদ্ধত বিক্রমে ও উত্তেজিতভাবে এই-সব বিষয়ে প্রচণ্ড তর্ক-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যাইতেন। তখন তাঁহার ভাব দেখিলে বোধ হইত—যেন অবিশ্বাসের অসহ প্রদাহে তাঁহার অন্তঃস্থলটা নিরন্তর 'হু-হু' করিয়া দগ্ধ, ভস্মীভূত হইতেছে। কিন্তু, তখনও, সেই দুরন্ত দুর্গতির মধ্যেও, বেশ দেখিতাম—তিনি যেন কোন-মতে একটা-কিছু নির্ভরযোগ্য আশ্রয় বা অবলম্বন-লাভের আশায়, ঐভাবে, সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে, মর্ম্মান্তিক আগ্রহে কেবল কি-যেন অনুসন্ধান করিয়া, 'হাত্‌ড়াইয়া' বেড়াইতেছেন।

আমার এ ধারণা যে অমূলক নহে তাহার একটি প্রমাণ দেখুন। —তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগের কয়েক মাস পরে 'প্রভাতী' নামে আমার একখানা গীতিকাব্য প্রকাশিত হয়। উহার মধ্যে একটা কবিতায় আছে,—

* * *

"অবিশ্বাস সন্দেহের গর্ব্বিত সঞ্চয়
তিলে তিলে ছাইয়াছে এ ক্ষুদ্র হৃদয়।
আমি আজ তবু মিছে দৃপ্ত দম্ভভরে
মুঠি-মুঠি ধূলি ফেলি লোক-চক্ষু 'পরে।"
—ইত্যাদি।

পুস্তকখানি পড়িয়া, তৎসম্বন্ধে আমাকে যে মন্তব্য পাঠান তাহাতে অন্যান্য কথার পর এই স্থানটার উল্লেখ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন,—

"তারপর এই 'অনুতাপ' কবিতা। এটি Untrue, (অপ্রকৃত,) অস্বাভাবিক। Honest doubts ('সরল সন্দেহ') কি 'আত্ম-প্রতারণা' বা 'অবিশ্বাস, সন্দেহের গর্ব্বিত সঞ্চয়'? অথবা এটা কি 'দৃপ্ত দম্ভ'? Tennyson মনে আছে তো? তিনি কি বলেন? 'There is more faith in honest doubt, Believe me, then in half the creeds.'* বুদ্ধ এই 'অবিশ্বাস' জড়িত হইয়াই কি বুদ্ধ হন নাই? সন্দেহ is mere nagation, a lull, a period of darkness.† এ অবস্থা অতি দীন, অস্থির, ক্ষোভপূর্ণ, অন্ধকারময়। তাকে যিনি 'দৃপ্ত' বলেন, তিনি মনুষ্য-হৃদয় 'পড়িতে' পারেন নাই; তিনি এক অন্ধ খৃষ্টীয়ানের মত Heathenকে ('পৌত্তলিক'কে) Eternal hell'এ ('অনন্ত নরকে') নিক্ষেপ করেন। তর্ক—'অহঙ্কার' নয়। তর্ক—বুঝিতে চেষ্টা, অন্বেষণ, এবং মিথ্যা যুক্তির খণ্ডন।"

* প্রচলিত বিশ্বাস বা পুঁথিগত ধর্ম্মমতের সমষ্টিভূত অর্দ্ধাংশেও যেটুকু বিশ্বাস না আছে, স্থির জানিও—সরল সন্দেহবাদে তদপেক্ষা ঢের বেশি বিশ্বাস নিহিত রহিয়াছে।

† এ শুধু একটা শূন্যতার, অভাবের, ঘুমন্ত নিশ্চেষ্টতার ও অজ্ঞান বা অন্ধকারের অবস্থা। —গ্রন্থকার।

পাঠক দেখিবেন—আমার উক্ত ধারণা প্রকৃত কিনা। টীকা অনাবশ্যক।

*　　　*　　　*

যাহাহৌক্, এসময়ের বহু দিন পরে, গয়া হইতে যখন তিনি কলিকাতায় আসিয়া 'সুরধামে' বাস করিতে-লাগিলেন তখন, তাঁহার বেশ একটা পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে সুযোগ পাইলেই যে দ্বিজেন্দ্রলাল ঈশ্বর সম্পর্কে নানা তর্কে মাতিতেন, এখন দেখিলাম—তিনিই আবার, এ সব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেও আদৌ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহেন না; বরং, জিজ্ঞাসিত হইলেও, পারতপক্ষে সে বিষয়ে কোন উত্তর না দিয়া, (যেন শুনিয়াও শোনেন নাই—এইভাবে) অন্য কথা কহিয়া বা গান গাহিয়া, এসব প্রসঙ্গ প্রায়শঃ চাপা দিতে চেষ্টা পাইতেন।

সত্য-নিষ্ঠ, বিবেকী মানুষের পক্ষে এটুকু পরিবর্ত্তন একান্ত অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক। যুক্তি-তর্কের 'চুল-চেরা' বিচারে চিত্ত-বৃত্তি বা মনোবুদ্ধি আপাততঃ কিছু তুষ্ট হইতে পারে বটে; কিন্তু, এই হৃদয়ের, অন্তরের অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাহাতে চরিতার্থ হয় না। সংসার-চক্রের এই কর্ম্মপাকে আবদ্ধ ও বিভ্রান্ত, বিষয়-মোহে বিমুগ্ধ ও উন্মত্ত, এই অসহায় জীবের বিরহ-ব্যথাতুর হৃদয়-কন্দরে সেই 'অজ্ঞাত' বা বিস্মৃত চির-বাঞ্ছিতের উদ্দেশে অবিরাম যে অদম্য ও আকুল ক্রন্দন-ধ্বনি হাহাকারে গুমরিয়া-মরে,—এ নশ্বর সংসারে এমন কি আছে যে, তাহাকে শান্তি বা সান্ত্বনা দিবে? দ্বিজেন্দ্রলালের বহির্ম্মুখ মন যতদিন এই বিবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়-ব্যাপারে আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও কৌতূহল অনুভব করিতেছিল ততদিন সে পার্থিব উত্তেজনা ও কোলাহলে তিনি মর্ম্ম-গুহার এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, নিম্ন-গভীর আর্ত্তনাদ তেমনভাবে একবারও শুনিতে পান নাই; কিন্তু, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে, এ সব অনিত্য সৌন্দর্য্য ও

বৈচিত্র্যরাশি যতই তাঁহার চক্ষে তাৎপর্য্যহীন নিঃসাররূপে প্রতিপন্ন হইতে-লাগিল, এবং দৈবানুগ্রহে পত্নী-বিরহিত হইয়া যখন তিনি একান্ত একক ও অসহায় হইয়া-পড়িলেন তখন, ধীরে-ধীরে ও অল্পে-অল্পে, তদীয় অন্তরের ঐ অনিবার্য্য অভাব-জনিত আকুলতা তিনি স্বভাবতঃই মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সময়ে কখনও তিনি বৈষ্ণব পদাবলী বা ভক্ত-কবি রামপ্রসাদের সেই সাধন-সিদ্ধ সঙ্গীতগুলি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেন, কখন রবিবাবু ও 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা'র ব্রহ্ম-সঙ্গীত শুনিতে-শুনিতে বা গাইতে-গাইতে তাঁহার চক্ষু দু'টি মুদিয়া-আসিত, কখনও বা কীর্ত্তন ও পদাবলী-গান শুনিয়া তাঁহার লোচন-পল্লব জল-ভারে অবনত হইয়া পড়িত। একদিন আমার বেশ মনে পড়ে—'পরপারে' নামক নাটকের জন্য সদ্যোরচিত তাঁহার একটি গান ('আর কেন মা, ডাক্‌ছ আমায়—এই যে এইছি তোমার কাছে,' ইত্যাদি) আমাকে শুনাইতে-গিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল ভগ্ন-জড়িত স্বরে কয়েক 'কলি' গাইতে-না-গাইতে, স্বর 'চড়ানো'র সঙ্গে-সঙ্গে বাস্তবিক একেবারে কাঁদিয়াই ফেলিলেন; এবং হার্ম্মনিয়াম ছাড়িয়া, চোখ মুছিতে-মুছিতে আমার কাছে উঠিয়া-আসিয়া, একটা চেয়ারে অঙ্গ এলাইয়া বসিলেন! আমি তাঁহার এতখানি পরিবর্ত্তন দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না; কিছুক্ষণ তাই, আমারও তখন বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। শেষে, দ্বিজেন্দ্রলাল নিজে আমার সেই স্তম্ভিত ভাব লক্ষ্য করিয়া, বাদ্‌লা দিনের মেঘ-ভাঙ্গা আলোর মত সজল চক্ষে অকস্মাৎ হাসিয়া-ফেলিলেন; (তখনও তাঁহার নেত্র শুষ্ক হয় নাই!) এবং কহিলেন,—"কি? এমন করে' 'একদৃষ্টে' তাকিয়ে রইলে যে?" আমি কাছেই বসিয়াছিলাম; তাঁহার একখানি হাত আমার মুঠোর মধ্যে চাপিয়া-ধরিয়া বলিলাম,—'তবে নাকি মানেন না?' দ্বিজেন্দ্রলাল হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন, এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—

"দেখ, তোমাদের ঈশ্বরকে আমি না দেখে ঠিক যে মানি, তা বল্‌তে পারি না। তবে, এই কীর্ত্তন শুন্‌লে বা তেমন-কোন ভাবাত্মক গান শুন্‌লে আমার যে কান্না আসে বা প্রাণটা হঠাৎ কেমন 'হু-হু' করে'-ওঠে—সেটা কি-জানি আমার কেমন-যেন একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা! বুঝি তো যে, আমার এ ব্যাকুলতা কি উচ্ছ্বাসটা কিছুই না,—কেবল একটা অকারণ পাগ্‌লামি মাত্র; কিন্তু তবু কেন যে এমন হয়, তা' আমি কেমন করে' বল্‌ব? এর একটা কারণ বোধ হয় এই (ঠিক জানি না অবশ্য) যে, আমার মা অদ্বৈতপ্রভুর বংশের মেয়ে ছিলেন। কে জানে, হয়ত তাঁরই সেই রক্তের ছিটে-ফোঁটা এই আমাতেও এতদূরে এসে পৌঁছেছে।'

কথায়-কথায় সেদিনও ক্রমে কিছু তর্ক জমিয়া-উঠিল; কিন্তু, আশ্চর্য্য এই—আগে যেমন তিনি সেই হার্ব্বার্ট-স্পেন্সারের Eternal energy ছাড়া ভগবানের আর-কোন সত্তার অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ অস্বীকারই করিতেন, সেদিন আর ততদূর গেলেন না। বরং মুখে বার-বার 'মানি না', 'জানি না',—এই রকম নানা কথা বলিলেও, শেষে যেই আমি কোন-কোন মহাপুরুষ বা মহাত্মার উক্তি তাঁহার সমক্ষে উত্থাপিত করিলাম অমনই তিনি আর কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া, সহসা ঘুরিয়া-বসিয়া ও চক্ষু বুজিয়া চিরঞ্জীব শর্ম্মার সেই—

'আমি চিনিনা, জানিনা, বুঝিনা তাঁহারে তথাপি তাঁহারে চাই,
আমি সজ্ঞানে, অজ্ঞানে, পরাণেরি টানে তাঁর পানে ছুটে যাই'—

—এই মর্ম্মস্পর্শী মধুময় গানটি তারস্বরে গাইতে 'সুরু' করিয়া দিলেন। প্রসঙ্গক্রমে সেদিন এ সব বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁহার অনেক কথা হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, কীর্ত্তন শুন্‌লে আপনার কিরকম হয়?" উত্তরে বলিলেন,—

—"তা' কি আর ঠিক করে' বলা চলে? তবে, ঐ সুরটা শুন্‌বা-মাত্র আমার কেন-যেন এই প্রাণটা কেঁদে-কেঁদে' ওঠে—কি যেন একরকম 'মন কেমন' করে;—যেন, তখন লজ্জা-সঙ্কোচ সমস্ত ভুলে গিয়ে লাফিয়ে-উঠে

নাচ্‌তে সাধ যায়। বাস্তবিক আমার ভিতরটা তখন এম্‌নি করে যে, ডাক ছেড়ে কাঁদতে পার্‌লে আমি রক্ষা পাই।"

আমাকে তো এই বলিলেন। কিন্তু, কেবল আমাকেই যে এ ধরণের কথা বলিয়াছেন তাহা নহে। মনস্বী, সাহিত্যজীবী পাঁচকড়িবাবুও আমাকে জানাইতেছেন,—

"দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত যখন শাস্ত্র ও ধর্ম্মমত লইয়া কোন তর্ক উঠিত, সে এক বেজায় হাঙ্গামা বাধিয়া যাইত। অমন নিপুণ তার্কিক আমি আর দেখি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু, এই তর্কের মুখে এক এক সময়ে সে বলিয়া ফেলিত যে, 'দেখ, পাঁচকড়ি, আমার মাতামহকুল শ্রীমদদ্বৈতের বংশ, মা আমার বৈষ্ণব ঘরের মেয়ে। আমি আকারে-প্রকারে অনেকটা মা'র মত দেখিতে। আমার মনে হয়, আমি যদি কখনও ধার্ম্মিক হই তাহা হইলে আমি বৈষ্ণব হইব। কারণ, কে জানে কেন, কীর্ত্তন শুনিলে আমার প্রাণের ভিতর একটা উদাস বিরহের ভাব জাগিয়া ওঠে; যেন মনে হয়, কাহাকে হারাইয়াছি খুঁজিয়া পাইতেছি না। দেখ ভাই, এ জীবনটা তো এমনই বহিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া * যা হয় একটা কিছু করা যাইবে।"

কিন্তু, ভিতরে-ভিতরে তাঁহার যতই কেন পরিবর্ত্তন হইয়া-থাক না, মুখে তিনি—ঈশ্বরে যে বিশ্বাস করেন, এমন কথা স্পষ্টতঃ কখনও 'কবুল' করেন নাই। যুক্তি-তর্কে মেলে না, মাঝে-মাঝে মন সংশয়াচ্ছন্ন হয়—এইজন্যই হৌক্‌, অথবা ব্যঙ্গ-প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে কে কি ভাবিবে—এই আশঙ্কাতেই হৌক্‌, বাস্তবিক তিনি প্রকাশ্যে ও বিষয়ে 'খোলাখুলি' ভাবে কিছু না বলিলেও, আসলে যে তিনি বিশেষভাবে বদলাইয়া-গিয়াছিলেন তাহাতে আর এতটুকুও সন্দেহ নাই। অনেক সময়ে এমনও ঘটিত যে, তিনি নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় হয়ত কিছু ভাবিতেছেন বা চুপ করিয়া বসিয়া-আছেন, হঠাৎ—'জগদীশ্বর, ও জগদীশ্বর, জগদীশ্বর!' বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন। যদি

* 'ফিরিয়া আসিয়া' শব্দটি যদি বাস্তবিক তিনি বলিয়া-থাকেন,—পাঁচকড়ি বাবুর একটু ভ্রম না হয়, তবে মনে হয়—শেষকালে তিনি জন্মান্তরেও সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান্‌ হইয়াছিলেন।—গ্রন্থকার।

বলিতাম—"ও আবার কি?" দ্বিজেন্দ্রলাল ম্লান ও গম্ভীর মুখে, মাথা নাড়িয়া বলিতেন,—"উহুঃ! কোন উত্তর নেই!" এ তাঁহার শেষ বয়সের অবস্থা! তখন এইরূপে, তাঁহার অনেক কথা-বার্ত্তায়, ভাব-ভঙ্গীতে, লেখায় ও আলাপে—এটুকু অন্ততঃ আমাদের খুবই বোধ হইত যে, অল্পে-অল্পে তাঁহার অন্তরে আস্তিকতার অঙ্কুর তরুরূপে পরিণত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে, বোধ করি—তখনও সে বৃক্ষ তেমন বড় হয় নাই,—তাহা ফল-পুষ্প-পল্লবে তাদৃশ সার্থক হয় নাই,—অস্পষ্ট সংস্কার জ্বলন্ত ও প্রত্যক্ষ বিশ্বাসে পরিণত হয় নাই বলিয়া, তখনও সত্যনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলালের অতৃপ্ত মন আপনাকে কোনমতেও লোকের কাছে 'বিশ্বাসী' বলিয়া অসঙ্কোচে প্রচার করিতে প্রস্তুত হয় নাই। কারণ, তিনি তো আর আমাদের মত ছিলেন না!

বিশ্বাসের পথে তিনি যে কতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহার বিশ্বাস্য প্রমাণস্বরূপ, এখানে তাঁহার জন-দুই অন্তরঙ্গের উক্তি এক্ষণে একটু উদ্ধৃত করা আবশ্যক। 'দাদামহাশয়' প্রসাদদাসবাবু বলিতেছেন,—

"মত-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহার সঙ্গে হয়। দ্বিজু প্রথমে ঘোর নাস্তিকের মত ছিল। কিন্তু, ইদানীং, শুধু আস্তিক নয়—হিন্দুর দেব-দেবীকে পর্য্যন্ত রীতিমতই প্রণাম কর্‌ত। একবার কালীঘাটের কালী-মন্দিরে গিয়ে মা-কালীকে প্রণাম করে, আসে। * * মাঝে কিছুদিন সে রোজ সকালে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেত। একদিন 'ঠন্‌ঠনে' শীতলা-মন্দিরের কাছে একটু পিছিয়ে পড়ে' শীতলা প্রণাম কচ্ছে দেখে' জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"এ কি হে? তুমি যে বড় শীতলাকে পর্য্যন্ত প্রণাম কর্‌লে?" দ্বিজু জবাব দিল—"দেখুন দাদামহাশয়, মণ্টু-মায়ার জন্যে আমার বড় weakness ('দুর্ব্বলতা') এসেছে।" * * আর একদিন আমায় দ্বিজু বল্‌লে যে, "এক জ্যোতিষী গুণে' বলেছে, আমি নাকি কালে ঘোর শাক্ত হ'ব। কিন্তু, আমি তো দেখ্‌ছি, আমার বৈষ্ণব হওয়ার দিকেই tendency ('ঝোঁক') বেশি।"

দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার 'বৈষ্ণব হওয়ার দিকে ঝোঁক বেশী' ; কিন্তু, আমি জানি, শুধু ঝোঁক নহে, বাস্তবিক তিনি মনে-প্রাণে বৈষ্ণব ভাবাপন্নই ছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের পর যখন তিনি অতিমাত্র সন্দিগ্ধ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কপ্রিয় হইয়া-ওঠেন তখনও দেখিয়াছি, তিনি সাধারণভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে উদ্ধত ও উত্তেজিতভাবে নানাপ্রকার বাদানুবাদ করিতেন বটে ; কিন্তু, ভ্রমক্রমেও কখনও শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্যকে তদ্রূপ অযথালোচনার বিষয়ীভূত হইতে দেন নাই। মনে পড়ে,—একদিন ঐরূপ তর্কস্থলে তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষ যুক্তির হিসাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত লোকও যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমে বিহ্বল, আত্মহারা ও তন্ময় হইয়া-গিয়াছিলেন,—এই কথা বলায়, দ্বিজেন্দ্রলাল এমনই অত্যন্ত 'অপ্রস্তুত' হইয়া-গিয়া, 'থতমত খাইয়া,' সে প্রসঙ্গটা তৎক্ষণাৎ চাপা দিয়া বলিলেন,—'এইবার আমার হার স্বীকার কর্‌ছি।—ওকথা তুল্‌লে আমি বেচারী 'নাচার'! যাক্, আসুন তবে এখন একটা কীর্ত্তনই গাওয়া যাক্।' এই বলিয়া তিনি হার্ম্মনিয়মের কাছে গিয়া বসিলেন, এবং তাহা বাজাইয়া তারস্বরে গান ধরিলেন,—

"(ও কে) গান গেয়ে গেয়ে চ'লে যায়
পথে পথে ঐ নদীয়ায়।
(ও কে) নেচে' নেচে' চলে, মুখে হরি বলে,
ঢলে' ঢলে' পাগলেরই প্রায়!"—ইত্যাদি।

* * *

এ বিষয়েও বহুসময়ে আমার সঙ্গে তাঁর অনেক কথা হইয়াছে ; কিন্তু, বারংবার সকল বিষয়েরই প্রমাণভার আপন স্কন্ধে গ্রহণ করা অশোভন বিবেচনায়, এ ব্যাপারে তাঁহারই স্ব-লিখিত একটি অকাট্য প্রমাণ আমি সংক্ষেপে এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিব। আশা করি—এতদ্দ্বারা পাঠক তাঁহার বৈষ্ণব প্রকৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত

হইবেন। দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাঙ্গাদাদা,' প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি-এল মহাশয়ের অধুনালুপ্ত 'নবপ্রভা' নাম্নী মাসিক পত্রিকায় স্বামী উত্তমানন্দ নামক জনৈক ভদ্রলোক বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' আলোচনা প্রসঙ্গে একটি সন্দর্ভ প্রকাশিত করেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও লীলা সম্পর্কে নানাপ্রকার বিরূপ মন্তব্যাদি ব্যক্ত হওয়ায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহা পড়িয়া অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হন ; এবং উক্ত পত্রিকাতে উহার যে প্রতিবাদ প্রকাশিত করেন, এস্থলে তাহারই অংশবিশেষ আমি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিতেছেন,—

"সম্পাদক মহাশয়,

শ্রীমৎ উত্তমানন্দের দ্বিতীয় বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

* * *

"শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুর ধারণা এই যে, (১) রাসলীলা অপ্রামাণিক, অর্থাৎ Historical নহে, এবং (২) তাহা রূপক। বঙ্কিমবাবু যে প্রতিপাদ্য দুইটি প্রমাণ করিয়াছেন তাহা বলি না। মহাভারত যে historical নহে এবং পুরাণগুলি যে কাল্পনিক সেইটি তিনি ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি প্রমাণ না করেন ততক্ষণ মূল প্রশ্নের কোনরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। * * * শ্রীমৎ উত্তমানন্দও সে বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি যে রাসলীলা রূপক হইতে পারে না, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু প্রমাণ দেন নাই। তাঁহার প্রধান কথা যে, রাসলীলা অপবিত্র এবং তাহা ধর্ম্মের (যাহা পবিত্র জিনিষ তাহার) রূপক হইতে পারে না। কিন্তু রাসলীলা যে অপবিত্র প্রেমের কাহিনী তাহার প্রমাণ কি ?

এসকল বিষয়ে বিচার করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে দুইদিক্ হইতে দেখা যাইতে পারে।—যদি তিনি ঈশ্বর হন তাহা হইলে তাঁহার পাপ-পুণ্য বিচার-ক্ষমতা আমাদের নাই ; নহিলে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বর যাহা প্রতিদিন করিতেছেন তাহার ন্যায়ান্যায়, উচিতানুচিত কি কেহ বিচার করিতে প্রস্তুত ? সহস্র নিরীহ জীব অন্নাভাবে, সর্পাঘাতে, ভূমিকম্পে, জলোচ্ছ্বাসে, ঝঞ্ঝায়

প্রতিদিন যে হত্যা হইতেছে ; পিতার ব্যাধি যে নির্দ্দোষ পুত্রকে আশ্রয় করে ; বিনা দোষে প্রসূতি যে কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করে,—এবংবিধ আপাত প্রতীয়মান অত্যাচারের, অন্যায়ের, অবিচারের জন্য 'মঙ্গলময়' ঈশ্বরকে,—সেই অপ্রত্যক্ষ, অনন্ত, অজ্ঞেয় ভগবানের লীলার সম্বন্ধে, আমরা আমাদের সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধিকে কি স্পর্দ্ধায় বিচার করিতে বসিব ? যদি ঈশ্বর তাঁহার নৈতিক সহস্র হত্যার জন্য দোষী না হন তবে কৃষ্ণ (যদি তিনি স্বয়ং ঈশ্বর হন) রাসলীলার জন্য কেন ভক্তের নিকটে আসামীর ন্যায় দাঁড়াইবেন তাহা বুঝিতে পারি না।—অতএব, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, ঐতিহাসিক হোক বা রূপক হোক, উচিত কি গর্হিত তাহা ভক্তের বিচারাধীন হহে।

"আর শ্রীকৃষ্ণকে যদি মনুষ্য বিবেচনা করা যায় তাহা হইলে দশ বৎসর বয়সে তাঁহার গোপীগণের সহিত বিহার দূষ্য হইতে পারে না। * * *

"৩য় কথা। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবদিগের প্রতি উত্তমানন্দ স্বামী যে আক্রমণ করিয়াছেন তাহা একান্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গত! এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম কামের ধর্ম্ম নহে,—ইহা প্রেমের ধর্ম্ম। * * * * বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল মন্ত্র—প্রেম। তাহার পার্থিব বিকাশ শ্রীরাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলায়। রাসলীলা ঐতিহাসিক হোক্ বা রূপক হোক্, তাহার মাধুর্য্য সমানই রহিল! সে প্রেমের কীর্ত্তন শুনিয়া ভক্তের হৃদয়ে কামের উদ্রেক হয় না,—চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বর্ষিত হয়।

"বঙ্গদেশে অনেক পাপিষ্ঠ, ভণ্ড, হেয় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী আছে। সেরূপ হিসাবে অনেক হেয় খৃষ্টান আছেন, বহু ব্রাহ্মও আছেন, মুসলমানও আছেন, শাক্তও আছেন। কিন্তু, এইটি স্মরণ রাখিতে হইবে, যে স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ এই ধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন, রূপসনাতন বৈষ্ণব ছিলেন, শ্রীঅদ্বৈত বৈষ্ণব ছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুও বৈষ্ণব ছিলেন ; এবং এরূপ অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব ছিলেন, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন ; ইহা মনে রাখিতে হইবে, যে এখনও অনেক ভক্ত হরিপ্রেমে সন্ন্যাসী হইয়া আছেন ; ইহা মনে রাখিতে হইবে, যে এখনও সহস্র সহস্র পবিত্রচিত্ত বঙ্গ-কুলবধূ প্রভাতে সন্ধ্যায় বিশুদ্ধ ভক্তিভরে হরিনাম করেন ; মনে রাখিতে হইবে—যে শত রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার মধ্যেও,—দুঃখে, দৈন্যে, দুর্দ্দিনে এই তারকব্রহ্ম হরিনামই এই অধঃপতিত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে শান্তি ও সান্ত্বনার পীযূষ বর্ষণ করিতেছে!

"বঙ্কিমবাবু রাসলীলাকে বর্জ্জন করিয়াছেন, শ্রীমৎ উত্তমানন্দ স্বামী রাসলীলাকে আক্রমণ করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, রাসলীলা বাদ দিলেই শ্রীকৃষ্ণের বাকী (মহাভারতে বর্ণিত) কার্য্যগুলিই বা এমন কি দেবোচিত যে তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? * * সে হিসাবে তাঁহার চরিত্র অপেক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন অধিক দেবজ্যোতিতে উজ্জ্বল ও মধুর। উত্তমানন্দের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম জনসাধারণকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সে ধর্ম্ম স্বয়ং রামমোহন রায় প্রচার করিয়া সফলপ্রযত্ন হইতে পারেন নাই। ফলতঃ কৃষ্ণচরিত্রের এই আদিকাণ্ড,—এই সখ্য, এই প্রেম, এই বাল্যক্রীড়া, এক কথায় এই রাসলীলা বাঙ্গালীর কাছে যেরূপ মধুর বোধ হয়, মহাভারতে কৃষ্ণের দর্শনজ্ঞান, যুদ্ধবিদ্যা ও কৌশল সেরূপ মনোহর বলিয়া বোধ হয় না। তাই যশোদানন্দনের এই ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা, এই বংশীবাদন, এই বনফুলহার বঙ্গবাসীর নিকট অতি প্রিয়। পশ্চিমপ্রদেশী অধিকাংশ লোক সীতারাম বলে কেন, আর বাঙ্গালীই বা এতদিন রামায়ণ পড়িয়াও 'জয় রাধেকৃষ্ণ' বলে কেন? ইহার তথ্য কি প্রচারকগণ অনুসন্ধান করিয়াছেন? বাঙ্গালা দেশে Strawberry হয় না কেন বা ইংলণ্ডে আম্র ফল হয় না কেন? কোমলস্বভাব, ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর প্রাণে—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা (সে প্রকৃতই হৌক্, প্রক্ষিপ্তই হৌক্ বা রূপকই হৌক্,) চিরকাল আদরের জিনিষ, আরাধনার বস্তু। সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া, কখনও অন্তরের সহিত আর কাহাকেও গ্রহণ করিবে না, করিতে পারে না। আমরা মহাভারতের কৃষ্ণ বা রামায়ণের রামকে দূর হইতে প্রণাম করিতে পারি, পূজাও করিতে পারি। কিন্তু আরাধনা করিব, ধ্যান করিব, প্রেমভরে আলিঙ্গন করিব—ঐ বৃন্দাবনের চপল, ননীচোরা, ক্রীড়াপ্রিয়, বংশীধারী, প্রাণারাম, রাসবিহারী শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।"

এই তো গেল তাঁহার প্রকৃতিগত গোপন অবস্থার কথা। কিন্তু, বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া তিনি যে হিন্দুর অন্যান্য দেবদেবীর প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না তাহার প্রমাণ প্রসাদদাস বাবুর উল্লিখিত

পত্রে পাঠক জ্ঞাত হইয়াছেন। অধিকন্তু, এ বিষয়ে হাইকোর্টের 'বেঞ্চক্লার্ক' হেমবাবু আমাকে আরও জানাইতেছেন যে,—

"কালীঘাটে গিয়া দেবী-মূর্ত্তির সম্মুখে তিনি লুটিয়ে-পড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছিলেন।"

পরিবর্ত্তনের আর ইহা অপেক্ষা অধিক প্রমাণ কি হইতে পারে? শুধু কি এই পর্য্যন্ত? তাহা নহে। এইসময়ে তিনি যথার্থ ভগবদ্‌জন—সাধু-মহাত্মা ও ভক্তদের প্রতিও অসামান্য শ্রদ্ধাবান্ হইয়া পড়েন। পরমারাধ্য, ভক্ত-ভগবান্ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও সিদ্ধ-দেবতা পরমহংস-শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে তিনি এ সময়ে যে কতদূর ভক্তিমান্ হইয়াছিলেন,—আমি নিজে তাহার অনেক পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি নিভৃতে ও গোপনে,—সাধারণ বন্ধুদের অগোচরে,—উক্ত মহাপুরুষদের অমূল্য জীবনী, উপদেশ ও কথামৃত অত্যন্ত যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত বহুবার আমার নিকট হইতে চাহিয়া-লইয়া পাঠ করিয়াছেন, এবং ইহাঁদের জীবন-প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে-করিতে কখন-কখন চোখের জল পর্য্যন্ত ফেলিয়াছেন।

এ প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্ব্বে, আর-একটি কথার একটু উল্লেখ আবশ্যক বোধ করিতেছি। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবর্ত্তিত 'ভারতবর্ষে,' মল্লিখিত 'দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য' নামক একটা প্রবন্ধ পড়িয়া কেহ-কেহ আমাকে তখন অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছিলেন। প্রবন্ধটা আমার বহুবৎসর পূর্ব্বের রচনা;—তখন দ্বিজেন্দ্রলালও জীবিত। যে-সময়ের বিবরণ আমি উহাতে বলিয়াছি, বাস্তবিক তখন (রবিবাবুর ভাষায় বলিতে-গেলে বলিতে হয়)—শুধু যে 'তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন, বলিলে কম বলা হয়—তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন'। তখন পর্য্যন্ত তাঁহার মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনরূপ প্রত্যয়ের সূত্রপাত হওয়া তো দূরে থাক্, তিনি স্পষ্টতঃ সংশয়বাদী বা 'অজ্ঞেয়বাদী'

(ইংরাজীতে যাহাকে বলে Agnostic, তা'ই) ছিলেন, এবং তাঁহার বাক্য ও ব্যবহারে সর্ব্বদা তাঁহাকে আমাদের ঘোরতর (Pessimist) নৈরাশ্যবাদী বা দুঃখবাদী বলিয়া মনে হইত। স্ত্রী-বিয়োগের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে আমার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে; অসম্ভব নহে যে, পত্নী অভাবে, সহসা সে আকস্মিক আঘাতের ফলেই, তখন তদীয় অন্তরে অতটা অস্বাস্থ্য সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু, তাঁহার আজন্ম-সহচর বন্ধুদের মধ্যেও ২।৩ জনের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া আমি যাহা জানিতে-পারিয়াছি তাহাতে, দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে,—আমার উক্ত ধারণা বরং আরও দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূলই হইয়া পড়িল। তৎকালে তাঁহার আভ্যন্তরীণ অবস্থাটা যে কতদূর শোচনীয় ছিল, যদি তাহা কেহ আজ জানিতে চাহেন, তাঁহাকে আমি 'প্রতাপসিংহ' নাটকের শক্তসিংহ চরিত্রটি একবার বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিয়া, বুঝিয়া-দেখিতে অনুরোধ করি।

দ্বিজেন্দ্রলালের আবাল্য-সুহৃদ্‌গণের মধ্যে এখানে আমি সুলেখক ও কবি, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের এ সম্পর্কীয় কথ্যটি তুলিয়া দিলাম। পাঠক দেখিবেন, আমার ধারণা প্রকৃত কিনা। বিজয়বাবু লিখিতেছেন,—

"কবি দ্বিজেন্দ্রলাল যে সম্পূর্ণ Agnostic ('সন্দেহবাদী') ছিলেন, একথা সুস্পষ্টভাবে সকল বন্ধু-বান্ধবকেই বলিতেন। তাঁহার সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক তর্ক ও আলোচনাও হইয়াছে, এবং তিনি যে Herbert Spencer'এর শিষ্য ছিলেন তাহা অতি পরিষ্কার করিয়াই বলিতেন। কেহ কেহ বলেন, যে শেষকালে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেও তাঁহার মুখে Agnostic মতবাদেরই অনুকূল কথা শুনিয়াছি। * নাটকে

* তা তো বটেই,—মুখে তো তিনি ঐরূপ বলিতেনই। কিন্তু, আসলে কার্য্যতঃ, তিনি যে শেষকালে কতটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, বিদেশে থাকার দরুণ বিজয়বাবু তাহা ঠিকভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ পান নাই।—গ্রন্থকার।

ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটাইবার জন্য যাহার মুখে যে কথা শোভা পায়, লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞ কবি তাহার মুখে সেই কথাই দিয়াছেন এবং সেইজন্য কয়েকটি গান ধর্ম্ম-সঙ্গীতের মত হইয়াছে। নহিলে তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, যেভাব তাঁহার নিজস্ব নয় তাহা লইয়া তিনি ক্ষুদ্র কবিতা বা স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র গান কদাচ বৃথা কল্পনায় রচনা করেন না; আর তাই, তিনি কখনও ধর্ম্ম-সঙ্গীত রচনা করেন নাই।"

ঠিক কথা। শেষ জীবনে যদিও আমরা তাঁহার আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন অতি স্পষ্টই লক্ষ্য করিয়াছি,—তিনি নিজে কিন্তু তাহা কোনদিনও স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই। অবশ্য বিশ্বাস বলিতে যতখানি নিঃসংশয় ধ্রুব ধারণা বা প্রত্যক্ষ প্রত্যয় বুঝায়,—'নিছক্' সত্যের খাতিরে, তাঁহাকে সেভাবে বিশ্বাসী বলিতে পারা যাক্ বা না-ই যাক্, প্রকৃতপক্ষে তিনিও যে শেষ জীবনে, সমাজের অধিকাংশ লোকের ন্যায়, মোটামুটি মনে-মনে ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থাবান্ হইয়া-উঠিতেছিলেন,—তৎপক্ষে সন্দেহ করার আমি কোনই সঙ্গত কারণ দেখি না।

অবসান

৫

শেষ বিদায়-সংবৰ্দ্ধনা ; কালব্যাধি ; নিরুদ্দেশ-যাত্রা।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—পোনেরো মাসের 'ফার্লো' ('অনুগ্রহ-বিদায়') লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ৺গয়া হইতে কলিকাতায় আসেন; এবং এই সময় হইতে কিয়দূর্দ্ধ চারিবৎসর কাল * তিনি কলিকাতাতেই ছিলেন;—তন্মধ্যে তাঁহাকে আর মফঃস্বলে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় নাই। বিদায়ের নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হইলে, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহাকে ২৪ পরগণায় বদ্‌লী করিল। তিনিও পরম সুখে স্বীয় ভবন—'সুরধামে' রহিয়া, তদীয় প্রাণ-প্রিয় সুহৃদ্‌গণের প্রীতিময় সঙ্গ নিয়ত সম্ভোগ করিয়া, অক্ষুণ্ণ সন্তোষ উদ্যমের সহিত আলীপুরের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মসমূহ অতি অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এই দীর্ঘ বর্ষচতুষ্টয়, প্রধানতঃ, তিনি যেভাবে জীবন-যাপন করিয়াছেন, পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে পাঠক তাহার কথঞ্চিৎ আভাস অবগত হইয়াছেন।

কলিকাতায় অবস্থান আকস্মিক 'বদ্‌লী' ও সংবৰ্দ্ধনা।

এইরূপে কলিকাতায় থাকিয়া বেশ সুখে কাজকর্ম্ম চালাইতেছেন, সহসা এমন-একটা অভাবিত ঘটনা ঘটিল—যাহাতে বাধ্য হইয়া, অকস্মাৎ তাঁহাকে আবার স্থানান্তরে বদ্‌লী হইতে হইল। পাঠক জানেন—বঙ্গচ্ছেদের বিপক্ষে বাঙ্গালী কিরূপ ভীষণ ও তীব্রবেগে, 'একটানা' প্রতিবাদ করিতেছিল। এই প্রবল আন্দোলনের ফলে দেশময় ইংরাজ-বিদ্বেষ ও ঘোরতর অসন্তোষ তো স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল

হইলই ; তাছাড়া, কতকগুলি অপরিণামদর্শী, পথ-ভ্রান্ত যুবক নানাপ্রকার উৎপাত-উপদ্রবও আরম্ভ করিয়া দিল। দেশের যখন এই ভয়াবহ দুর্দ্দশা, তৎকালে আমাদের মহামান্য ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ মহোদয় পরিদর্শন উপলক্ষে এই ভারত-ভ্রমণে আসিলেন ; এবং শান্তি-স্থাপনের উদ্দেশে (এ দেশকে বিহার ও উড়িষ্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া-লইয়া,) বিভক্ত পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে সংযুক্ত করিয়া, বঙ্গের লোকমতকে ও বাঙ্গালীর 'জেদ্'কে সার্থক ও জয়-যুক্ত করিয়া-দিলেন। ভারত-সম্রাটের ও তৎপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিংএর এই সদয় বিধানে পুনর্যুক্ত বঙ্গ একদিকে অখণ্ড ভাবে একটি স্বতন্ত্র 'প্রেসিডেন্সী'তে (প্রদেশে ?) পরিণত ও উন্নীত হইল বটে ; কিন্তু, এই উপলক্ষে বিযুক্ত বিহার ও উড়িষ্যাকে লইয়া আর-একটা যে নূতন প্রদেশ গঠিত হইল তাহার কার্য্য-চালনার জন্য এই সময়ে অবিলম্বে বঙ্গদেশ হইতে বিস্তর রাজ-কর্ম্মচারীকে তথায় প্রেরণ করা অনিবার্য্য আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই নূতন ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তের ফলে,—দ্বিজেন্দ্রলালকেও হঠাৎ বেহার-গভর্ণমেন্টের অধীনে প্রথমে বাঁকুড়া ও পরে মুঙ্গেরে বদ্‌লী হইয়া যাইতে হয়।

সুদীর্ঘ চারি বৎসর পরে, এই ভাবে, দ্বিজেন্দ্রলাল যখন এ দেশ ছাড়িয়া-চলিলেন তৎকালে কলিকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন স্থান হইতে নানা রকমে তাঁহাকে উপর্য্যুপরি কয়েকটা বিদায়-অভিনন্দন প্রদত্ত হয়। যথাক্রমে কলিকাতার 'মিনার্ভা' ও 'ষ্টার' রঙ্গালয়, 'ইভ্‌নীং ক্লাব', রাণাঘাটে'র 'Happy-club' প্রভৃতি ও উত্তরপাড়ার শিক্ষিত ও পদস্থ জন-মণ্ডলী বিভিন্ন উপায়ে এ সময়ে তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত ও অভিনন্দিত করিয়া, তাঁহার প্রতি দেশের অকৃত্রিম ও অনাবিল শ্রদ্ধা ভক্তি ও অনুরাগের পরিচয় প্রদান করেন। এ সকল অভিনন্দনের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে আমার আর এখন সাহস হয় না ; কেননা, বইটা বড়ই দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে। অতি-

সংক্ষেপে কোথায় কি হইয়াছিল, এখন মাত্র তাহারই একটু-একটু উল্লেখ করিয়া যাইব—

(ক) দ্বিজেন্দ্রলালের অনুরক্ত বন্ধু, 'মিনার্ভা'-রঙ্গালয়ের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ৺মহেন্দ্রকুমার মিত্র (এম্-এ ; বি-এল্,) মহাশয় প্রচুর আড়ম্বর সহকারে তাঁহার সংবর্দ্ধনার জন্য উক্ত রঙ্গমঞ্চে যে উৎসবের অনুষ্ঠান করেন তাহাতে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ ব্যতীত ষোড়শোপচার ভোজ্য দ্রব্যেরও ব্যবস্থা ছিল।

(খ) 'ষ্টার'-রঙ্গালয়ে যে উৎসবের অনুষ্ঠান হয় তাহাতে অন্যান্য ব্যাপারের মধ্যে, উক্ত রঙ্গালয়ের কর্ম্মকর্ত্তা ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা ৺অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, বঙ্গীয় রঙ্গালয়সমূহের পক্ষ হইতে, দ্বিজেন্দ্রলালের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া যে দীর্ঘ অভিনন্দনটি প্রদান করেন, স্থানাভাব বশতঃ, এখানে তাহার অতি-সংক্ষিপ্ত একটু সারাংশ মাত্র * মুদ্রিত হইতেছে।

"THE STAR THEATRE — CALCUTTA

Cornwallis Street, — The 20th January, 1912.

To D. L. Roy, Esq, M.A., M.R.A.S., M.R.A.S.E.,
&c., &c., &c.

Sir,

* * * You, by sheer dint of perseverance, not only attained * * but created an immortal name for yourself as one of the best dramatists of Bengal, who imparted a moral and healthy tone to our modern dramas. Your songs, both comic and serious, are never to be forgotton by Bengal, will be preserved for ever as a cherished treasure and will be handed down to posterity as hair-looms. * *

* * * Besides Rai Dinabandhu Mitra Bahadur and Rai

* মূল অভিনন্দন পত্রটা আমার কাছে আছে। তাহা হইতে অবিকল এই সারাংশ উদ্ধৃত হইল। বলা বাহুল্য রচনার দোষ-গুণের জন্য লেখক দায়ী।—গ্রন্থকার।

Bankimchandra Chatterjea Bahadur, we do not remember of any one else but you, as a high Government Official, an ardent devotee to our literature and at the same time a true lover and regenerator of the Histrionic art. The unmistakable enthusiasm with which the vast multitude have greeted your works on every available opportunity during the past years bear sufficient testimony to my sayings.

In conclusion, we give you a hearty send-off and pray to God for a long life, health and prosperity.

I remain,

Sir,

Your most obedient servant,

Amarendranath Dutta,

Manager, The Star Theatre."

(গ) অতঃপর দ্বিজেন্দ্রলালের বড়-আদরের 'ইভ্নীং-ক্লাবে' তাঁহাকে অকৃত্রিম ভক্তি-সম্ভ্রমের সঙ্গে যথোচিত সংবৰ্দ্ধনা করেন ; নাট্য-গুরু ৺দীনবন্ধুর যোগ্য পুত্র, দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব-সখা, সুকবি রায় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর এই উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্দেশে নিম্নোক্ত কবিতাটি রচনা করেন।—

"আজি ভাই ! গৌরবের উচ্চ শিখরের 'পরে
দাঁড়ায়ে চাহিয়া দেখ নিম্নে তিলেকের তরে,—
ঐ দূর তলদেশে আনন্দ-আলোকে কিবা,
ফুটিয়া উঠেছে তব জীবন-তরুণ-দিবা ।

"সেই দীক্ষা শৈশবের ভুল নাই এ জীবনে,
কবি-দৃষ্ট কুঞ্জবনে ভ্রমিয়াছ হৃষ্ট মনে ;
আজি নানাবিধ ফুলে সাজী তব ভরিয়াছে,
পর্য্যাপ্ত প্রসূন-পথ সম্মুখে বিস্তৃত আছে ।

"শিশু মানবের পিতা নহে শুধু কাব্য-কথা ;
তোমার জীবনে তার আজ পূর্ণ-সার্থকতা।
যেই শিশু বাল-কণ্ঠে রোমাঞ্চিত হ'ত দেশ,
আজি তাহে মুখরিত পবিত্র 'আমার দেশ !'

*

* *

বাল্য-স্মৃতি-বিজড়িত এই কবিতাটি শুনিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ তিনি দশ মিনিটের মধ্যে ইহার একটি যোগ্য উত্তর রচনা করিয়া সেই সভাস্থলে পাঠ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরে বলিতেছেন,—

"প্রভাতে এ জীবনে হাসায়েছি বঙ্গভূমি,
করিয়াছি তীব্র ব্যঙ্গ বন্ধুবর জানো তুমি ;
জীবনের এই সন্ধ্যায় মিলায়ে গিয়েছে হাসি,
সব হাস্য শুয়ে আছে রোদনের পাশাপাশি !

"মানুষের সুখ-দুঃখ, মানুষের পুণ্য-পাপ,
দেবতার বর, আর পিশাচের অভিশাপ,
নাটকেরে যে আকারে রচিতেছি বন্ধু আজ,
তাহাই আমার ব্রত, তাহাই আমার কাজ।

"ঈশ্বরের কাছে আর অন্য কিছু নাহি চাই—
আমার এ খ্যাতি শুধু পুণ্যে-গড়া হোক ভাই !
তোমাদের শুভ-ইচ্ছা আমার মস্তকে 'ধরি'
যেন বন্ধু তোমাদের ভালবাসা নিয়ে মরি।"

(ঘ) রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ জমিদার পাল-চৌধুরী মহাশয়দের সাগ্রহ যত্নে কবিবরের সম্বর্দ্ধনার জন্য সেখানকার Happy club'এর সভ্যগণ তদীয় 'পাষাণী' নাট্য-কাব্যের অভিনয়াদি করিয়াছিলেন। সবান্ধবে পালচৌধুরী মহাশয়েরাও শুনিয়াছি,—এই অভিনয়ে যোগ দেন। এই উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার কতিপয় আত্মীয় ও বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া রাণাঘাটে গমন করেন।

অভিনয়ের প্রারম্ভে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া, একটি অপ্সরা নিম্ন-লিখিত গানটি গাইয়া তাঁহার কণ্ঠে মনোহর ফুল-হার পরাইয়া দেয়। গানটি এই,—

"এস, এস, এস রসরাজ!
ধন্য মানি পেয়ে তব পদ-ধূলি আজ।
তোমারি গানে জাগে পরাণে নব আশা,
লভিছে নব ভূষা তোমারি দানে ভাষা,
কি মোহ-মন্ত্রে গাইলে 'মন্দ্রে'!
স্বাগত দ্বিজেন্দ্র-কবি দ্বিজরাজ!
দেবের সৃজিত কুসুমে গাঁথি হার
দেবতা-চরণে পূজার উপচার।
দীন ভক্তের কিবা আছে আর?
নিও না অপরাধ, দিও না লাজ।"

(ঙ) নিমন্ত্রিত হইয়া, একবার দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরপাড়ায় যান; তৎকালে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে, 'উত্তরপাড়া-সম্মিলনী'র সভ্যগণ ও তথাকার 'সমবেত জনমণ্ডলী' তাঁহাকে এক অতি-দীর্ঘ অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি যে গভীর অনুরাগ ও ভক্তি প্রদর্শন করেন তাহার সম্যক্ পরিচয় এস্থলে প্রদান করা অসম্ভব। এখানে কেবল সেই সুবিস্তৃত অভিনন্দনের প্রধান-প্রধান অংশটুকু উদ্ধৃত হইতেছে।—

"বন্দে মাতরম্।"

"কবিবর শ্রীল শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়—
শ্রীকরকমলেষু।

"মানব জীবনে অনেক সৌভাগ্য না হইলে শুভ মুহূর্ত্ত সহজে আসে না। সেই শুভ মুহূর্ত্ত লাভ করিয়াও যাঁহারা অভিমানে, ভ্রান্তিতে বা আলস্যে লব্ধ শুভ-মুহূর্ত্তের সুযোগ ত্যাগ করেন তাঁহারা নিতান্ত ভাগ্যহীন। আজ আমাদের জীবনে এই শুভ মুহূর্ত্ত আপনি আসিয়া ধরা দিয়াছে এবং আমরা এ সুযোগের লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। * * যে জাতি আপনার মর্য্যাদা-গৌরব অনুভব না করে সে জাতি জগৎ হইতে লুপ্ত হইলেও ক্ষতি নাই।* আমরা আজ জাতি নির্ব্বিশেষে আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। * * তাই আজ

আমরা পূজনীয় কবি, মনীষী, সুধী, বীর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের সংবর্দ্ধনার জন্য এ স্থলে সমবেত হইয়াছি। তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া আমরা তাঁহার গৌরব-বৃদ্ধি করিবার স্পর্দ্ধা করি না। কারণ, তাঁহার গৌরবেই আমরা ও আমাদের দেশ গৌরবান্বিত।

"আমরা আপনার সম্বর্দ্ধনা করিতেছি কেন ? * * *

"আপনি কেব্‌লমাত্র গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী নহেন, কেবলমাত্র ধনী নহেন, কেবলমাত্র বিদ্বান্ নহেন, কেবলমাত্র বনিয়াদি বংশের ছেলে নহেন, আপনি কেবলমাত্র সাহিত্যিক নহেন, কবি নহেন ;—আপনি বীর! কারণ, আপনি সত্যকথা কহিতে ভীত নহেন। আপনি জাতীয় কবি, উপদেষ্টা ; আপনি আমাদের জাতির গুরুর স্থানাভিষিক্ত পথ-প্রদর্শক। হে দেশ-কবি! আপনাকে কি বলিয়া সম্বর্দ্ধিত করিব ? আমাদের সে ভাব কৈ, সে ভাষা কৈ ? হে বাণী-বরদ! আমরা আপনাকে কি দিয়া পূজা করিব ?

"আপনি আপনার অবলম্বিত বৃত্তির অনুষ্ঠানের মধ্যেও আপনার প্রকৃত কর্ত্তব্য ভুলেন নাই, এই পাশ্চাত্য কর্ম্ম-তাণ্ডবের মধ্যেও আপনার ধর্ম্ম ভুলেন নাই, আপনার দেশ ভুলেন নাই। আপনি সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও, বাদ্য-গীত অবলম্বিত আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে থাকিয়াও মাতৃভূমির পুরাতন গৌরবকে উপহাস করিতে শেখেন নাই, পৌরাণিক বার্ত্তাগুলি মিথ্যা বলিয়া মনে করেন নাই,—এই হৃত-বৈভবা ত্রিশ-কোটি অকৃতী সন্তান-পালিতা দেশ-মাতার দুঃখ-দৈন্য-লজ্জা-ক্লেশে গৌরবান্বিত বা নিরাশ হন নাই। ইহাতেই আপনি মহান্, ইহাতেই আপনি কৃতী।* * আপনি কবি। কিন্তু আপনার ন্যায় কবি আমাদের দেশে আর কৈ ? * * বুঝিবা স্বয়ং সপ্তকোটী সন্তানের দেশ-মাতা আপনার কবিত্ব ফুটাইয়াছেন।* * * দেশের প্রতি এত ভক্তি, এত ভালবাসা, এত স্নেহ, এত আত্মীয়তা আপনারই ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। * * এক নূতন চিত্র, নূতন ভাব, নূতন ভাষা, নূতন সাধনা, নূতন আশা আপনিই দেশকে দিয়াছেন। * * আজ আপনি নূতন দেবী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, আপনি নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন, নূতন সাধনার আয়োজন করিয়াছেন। হে নবমন্ত্রের মন্ত্র-দ্রষ্টা কবি! আপনাকে আমরা নমস্কার করিতেছি। * * * আপনার এই সুমধুর জলদ-গম্ভীর আশার বাণীতে জাগরিত

হইয়া আনন্দে, উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য-পথে ছুটিয়াছি। 'আমরা মানুষ; নহি তো মেষ!' হে কবি, আপনাকে আমরা নমস্কার করি। * * * আপনি প্রত্যক্ষদর্শী কবি হইয়া যাহা স্বয়ং প্রত্যক্ষ-দর্শন করেন, যাহা দেখিয়া আপনার ভাবাবেশ হয়, * যে ভাবাবেশে আপনি আত্ম-পর ভুলিয়া যান, বিশ্বকে আপনার ঘর মনে করেন, যে আবেশে আপনি দেশ-মাতার স্বরূপ দর্শন করেন তাহাতেই আমরা অনুপ্রাণিত এবং তজ্জন্যই আমরা আপনাকে নমস্কার করিতেছি।

*

* *

"আর কি বলিয়া আপনার সংবর্দ্ধনা করিব? আপনি আপনার আদর্শে আপনার সহকর্ম্মিগণকে গঠিত করুন। আপনার শুভ ইচ্ছায় ভগবানের আশীর্ব্বাদ এ জাতির মস্তকে বর্ষিত হউক। * * *

"উত্তরপাড়া সম্মিলনীর সভ্যগণ ও
উপস্থিত জন-মণ্ডলী।"

এ সময়ে আরও অনেক স্থান হইতে তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করার জন্য আয়োজন চলিতেছিল; কিন্তু, উত্তরপাড়ার এই অভিনন্দনের পর তিনি আর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। কারণ, সরকারী নিয়মে সরকারের সম্মতি ও আদেশ ব্যতীত, কোন রাজ-কর্ম্মচারী নাকি এ ভাবের অভিনন্দনাদিও গ্রহণ করিতে অধিকারী নহেন। এসব আয়োজনের কথা ঘুণাক্ষরেও কিছুমাত্র না জানিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থ উত্তরপাড়ায় গিয়া, তিনি যখন এইরূপ বিরাট্ সংবর্দ্ধনার ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন, ভদ্রতার খাতিরে ও চক্ষুলজ্জার দায়ে, তখন তিনি প্রকাশ্যে সেই সভাস্থলে এ ব্যাপারের কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না এবং বাধ্য হইয়াই অভিনন্দন-পত্রটা লইলেন বটে; কিন্তু, তৎকালে তিনি যে নিজেকে এজন্য অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও বিপন্ন বোধ করিয়াছিলেন তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। যাহাহৌক্, বিধাতার কৃপায় যদিও অতঃপর এজন্য তাঁহাকে কোনরূপ

বিপন্ন হইতে হয় নাই তবু, এই কারণবশতঃ, তিনি তদবধি স্থির করিলেন যে, আর কখনও তিনি এরূপ সংবর্দ্ধন-উৎসবাদিতে কোন-ক্রমে যোগদান করিবেন না।

১৯১২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঁকুড়ায় বদ্‌লী হইয়া যান ও সেখানে প্রায় মাস তিনেক অবস্থান করেন। এই অল্প কাল সেখানে থাকার পর, সরকার-বাহাদুর তাঁহাকে অকস্মাৎ আবার মুঙ্গেরে বদ্‌লী করিলেন। মুঙ্গেরে গিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করার পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলাল ২।৪ দিনের জন্য একবার সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসেন ; এবং সেইবারেই তাঁহার শরীরটা সহসা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে।

ইহার প্রায় বছর খানেক পূর্ব্ব হইতে তাঁহার শরীরটা ক্রমশঃ অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছিল। কলিকাতায় আসার পর

কাল-ব্যাধির আবির্ভাব।

সেই-যে অনিদ্রার উৎপাতে মধ্যে-মধ্যে তিনি কষ্ট পাইতেন, এই সময় হইতে সেটা একরূপ তাঁহার নিয়মিত—প্রাত্যহিক ব্যাধিতে পরিণত হয়, এবং প্রায়ই তিনি শিরঃপীড়া ও মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক উষ্ণতার দরুণ খুব বেশিরকম অসুখ বোধ করিতে থাকেন। মুঙ্গেরে যাওয়ার পথে, বাঁকুড়া হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া, এই-সব যন্ত্রনা ও দৈহিক অবসাদ তাঁহার এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি নিজেই স্পষ্ট ভাবে অনুভব করিলেন, যেন ভিতরে-ভিতরে তাঁহার একটা-কোন গুরুতর রোগের সূত্রপাত হইয়াছে ; এবং এই সন্দেহের ফলে, যখন তিনি ডাক্তার ডাকাইয়া পরীক্ষিত হইলেন তখনই তাঁহার সেই মারাত্মক কাল-ব্যাধি প্রত্যক্ষরূপে ধরা পড়িয়া গেল।

যে-সূত্রে ও যে-ঘটনায় তাঁহার এই রোগ ধরা পড়ে তদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র লিখিতেছেন,—

"দ্বিজদা আমাদের মধ্যে যেন শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন। রাখালবালকেরা যেমন

শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া আহার-বিহার, আমোদ-প্রমোদ করিত আমরাও তেমনই দ্বিজদাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া যাইতাম। * * সেবার এইরূপ আহারাদির পর বহুক্ষণ নানারূপ আমোদ-আহ্লাদ করা গেল। তারপর তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—"দেখ, আমার কিন্তু মুঙ্গেরে যাইতে বড় ভয় হইতেছে। মনে হয়, যেন সেখানে গেলে মারা পড়িব। আমার এই মাথাটা আজকাল বড়ই দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, একটু বেশিক্ষণ ধরিয়া কোনরূপ পরিশ্রম করিতে পারি না। আমার ভিতরে নিশ্চয়ই কি যেন একটা ভীষণ রোগ হইয়াছে। এই মাথাটায় একবার হাত দিয়া দেখ—কি রকম গরম!" আমরা কিন্তু তখনও এ কথায় তেমন উদ্বিগ্ন হইলাম না। বলিলাম—"কোন ভয় নাই। মুঙ্গের শুনিয়াছি স্বাস্থ্যকর স্থান। তবে যদি আপনার নেহাৎ সহ্য না-ই হয় পরে না হয় ছুটী লইয়া চলিয়া আসিবেন। অত চিন্তার কারণ কি?" দ্বিজদা একথা শুনিয়া, একটু মলিন হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"আর চলিয়া আসিতে হইবে না। শরীরটাতে বড় বেশি অবসাদ আসিয়াছে।" তাঁহার এ রকম ভাব দেখিয়া আমরা একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। তখন আমার ভ্রাতা মণীন্দ্র (যিনি ডাক্তার) বলিলেন,—"আচ্ছা, কাল সকালেই ডাক্তার কালর্ভাট-সাহেবকে ডাকানো যাইবে। তিনি যদি পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, আপনার কোন অসুখ নাই তবেই তো হইল?" এই কথার পর তিনি শুইয়া পড়িলেন এবং কথা কহিতে কহিতে নিদ্রিত হইলেন। রাত্রিকালে আহারাদি করিয়া প্রায়ই তিনি এভাবে আমাদের সঙ্গে ঘুমাইতেন। সুতরাং আমরা আর তাঁহাকে ব্যস্ত করিলাম না। পরদিন কালর্ভাট-সাহেবকে আনানো হইল। তিনি Blood-pressure (রক্তের গতি বা 'চাপ') পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "Pressure বড় অধিক।" মূত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল—তাহাতেও Albumen যথেষ্ট। ডাক্তার সাহেব সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া ও তাঁহার সম্যক্ পরিচয়াদি জানিয়া বলিলেন—"এখনই অবশ্য তেমন কোন ভয় নাই। কিছুদিন সমস্ত রকম কার্য্য হইতে অবসর লইয়া, অত্যন্ত অল্পাহারে, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তভাবে—শান্তিতে থাকিতে পারিলেই ক্রমে এই রোগ কমিয়া যাইবে।"

'মেডিক্যাল'-কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ কালভার্টের কথামত এখন

হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের আর কার্য্যে যোগ দেওয়া ঘটিল না। ইহার অব্যবহিত পরেই উক্ত ডাক্তার-সাহেবের 'সার্টিফিকেট্' সহ তিনি সরকার-বাহাদুরের কাছে বিদায়-প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিলেন; এবং সে বিদায় মঞ্জুর হইলে, অতঃপর তিনি আর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। কলিকাতায় থাকিয়া ক্রমান্বয়ে তিনি সেখানকার বহু বড়-বড়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা য়্যালোপ্যাথি, কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাইলেন বটে; কিন্তু কোন ঔষধেই তাঁহার আর কোন স্থায়ী উপকার হইল না। কালভার্ট-সাহেব তাঁহাকে যেভাবে থাকিতে পরামর্শ দেন, কার্য্যতঃ তদ্রূপ সতর্ক হইতে কিছুতেই তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না;—তৎপক্ষে তাঁহার শোচনীয় চক্ষুলজ্জা ও অত্যধিক সঙ্গীত ও সাহিত্যানুরাগ সদা-সর্ব্বদা নানাপ্রকারেই তাঁহাকে নিষেধ-বিধি লঙ্ঘন করিতে বাধ্য করিত। ডাক্তার কালভার্ট বলিয়াছিলেন,—

"আপনাকে এখন হইতে ঠিক হিন্দু-বিধবার মত সংযত ও প্রশান্তভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে। নিতান্ত শাদাসিধা ও মোটামুটি রকমের খাদ্য ভিন্ন আপনি আর-কিছু আহার করিতে পারিবেন না। মাংস, ডিম, ঘী বা এইরকম তেজস্কর ও উগ্র-বীর্য্য আহার কিংবা কোনপ্রকার মাদক দ্রব্য আপনার পক্ষে বিষতুল্য ও সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। বর্ত্তমান অবস্থায় আপনার দেহ যতবেশি দুর্ব্বল হইবে, রক্ত যত হ্রাস পাইবে, আপনিও ততই নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইতে পারিবেন। নিমন্ত্রণ-খাওয়া একেবারে বর্জ্জন করিবেন। কোনরূপ মস্তিষ্কের চালনা বা মানসিক উত্তেজনা না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেন। এমন কি, গান গাওয়া বা তর্ক-বিতর্ক করাও এখন আপনার এ শরীরে সইবে না।"

কালভার্ট-সাহেবের এই উপদেশমত তদবধি তিনি মদ্যপান চিরতরে ত্যাগ করিলেন, প্রথম-প্রথম আহারাদি সম্বন্ধে ঐসব ব্যবস্থাও অনেকটা পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, এই একদিকে

সাবধান হইলে কি হইবে? অন্যান্য ব্যাপারে, অর্থাৎ—সাহিত্য-সেবা, সঙ্গীত-চর্চ্চা ও বিতর্ক-বিচার হইতে কোনমতেও তিনি নিজেকে সম্যক্ বিরত রাখিতে পারেন নাই। তর্ক করিবেন না মুখে বলিয়াও, বহু সময়ে তিনি কথায়-কথায় (আপন অজ্ঞাতেও) বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরতর তর্ক-যুদ্ধে মত্ত হইতেন; গান গাহিবেন না ভাবিয়াও, তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, রীতিমতই পূর্ব্বের ন্যায় গলা ছাড়িয়া দিতেন; স্বভাবের দোষে ও ভাবের উদ্দীপনায় প্রবন্ধ, সঙ্গীত ও নাটকাদি তো লিখিতেনই; তা'ছাড়া, সর্ব্বোপরি আবার সেই সঙ্কল্পিত "ভারতবর্ষ"-প্রকাশের উৎসাহে (তজ্জন্য স্বীয় কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া,) তিনি নানাপ্রকারে দৈহিক ও মানসিক যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেন। কিন্তু, সেই ক্ষীয়মাণ, ভগ্ন ও দুর্ব্বল দেহ এতটা অনিয়ম সহিল না;—ভিতরে-ভিতরে প্রকৃতি তাহার নির্ম্মম প্রতিশোধের চরম আয়োজন করিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের আত্মার উদ্দেশে তদীয় প্রেম-মুগ্ধ বাল্য-বন্ধু, বিখ্যাত সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কর (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) মহাশয় যে মর্ম্মহারী প্রবন্ধটি লেখেন তাহার একস্থলে আছে,—

* * * "চিকিৎসক তোমাকে লঘু আহার করিতে বলিয়াছেন;—শরীর যত দুর্ব্বল হইবে তত অধিক দিন বাঁচিবে। তিনি তোমাকে নিমন্ত্রণ খাইতে, গান গাহিতে এবং মস্তিষ্ক-চালনা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। * * * তোমার 'সুরধামে' গিয়াছি। তোমার স্বাস্থ্যের কথাই অধিক হইল। বলিলে, 'ভাই, এই ছ'সাত মাস হিন্দু-বিধবার খাদ্য খাইয়াছি। কিন্তু গান গাওয়া বা লেখা একেবারে বন্ধ করিতে পারি নাই।" আমি বলিলাম, ঐ ত তোমার রোগ। সেবার সন্ধ্যার সময় একদিন তোমার বাড়িতে আসিয়া দেখিলাম, তুমি টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া গান ধরিয়াছ। বন্ধুবান্ধবকে শুনাইবার জন্য তুমি সেদিন যে ভাবে গান করিতেছিলে, বোধ হয়, কোন ব্যবসাদার গায়ক অর্থলোভেও সে ভাবে গায়িতে রাজি হয় না। * * * আমি

কৃষ্ণনগরে ফিরিলাম। সাতদিন পরে * তুমিও এখানে আসিলে। * দু'তিন জন বন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইলে, দু' একটি গানও গায়িলে। আবার তোমার মাথা ঘুরিতে লাগিল।''

বাস্তবিক প্রথমতঃ—দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ যা' বলিয়াছেন,—'ছ'সাত মাস' কাল আহার সম্বন্ধে তিনি ঐরূপ একটু বাঁধাবাঁধি নিয়মে চলিয়াছিলেন বটে; কিন্তু, য়্যালোপ্যাথি ও কবিরাজী ছাড়িয়া, ক্রমে যখন তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাধীন হইলেন, শুনিয়াছি—তখন এ দিকেও নাকি শৈথিল্য, অনিয়ম ও স্বেচ্ছাচার 'সুরু' হইয়া গেল। তেজস্কর আহার্য্য তাঁহার পক্ষে বিষবৎ পরিহার্য্য হইলেও, এই সময়ে মধ্যে-মধ্যে আবার তিনি তাঁহার সেই অতি-প্রিয় মাংসাহারও * করেন; এবং যে নিমন্ত্রণ-খাওয়া তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, 'মুখবদ্‌লানো'র হিসাবে (এবং হয়ত ঐ মাংসের লোভে!) তাহাও তিনি খাইতে আরম্ভ করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে বড়-একটা রোগ-যন্ত্রণা সহিতে হয় নাই; কাজেই, এই যে তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে এবার 'ছ'সাত মাস' রোগীর ন্যায় নিয়ম-পালন করিতে-হইল ইহাতেই তিনি বিরক্ত ও অধীর হইয়া উঠিলেন। আহার সম্পর্কে এত নিয়মে থাকিয়া, (মাংস পর্য্যন্ত না খাইয়া!) এত ঔষধাদি সেবন করিয়াও, যখন তাঁহার সেই আভ্যন্তরীণ রোগের উপশম হয় নাই বলিয়া ডাক্তার-কবিরাজেরা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন তখন তিনি

---

* মাংস তাঁহার বড়-বেশি প্রিয় খাদ্য ছিল। মাংসের তুল্য, তিনি বোধ হয়—আর কোন খাদ্যই পছন্দ করিতেন না। পূর্ব্বাপর চিরটাকাল প্রায় প্রতি রাত্রেই তিনি যেমন হোক্ একটু-আধটু মাংস খাইতেনই। প্রবল গ্রীষ্ম কালেও প্রতিদিন এইরূপ মাংস খান দেখিয়া, একবার তাঁহাকে আমি বলিলাম,—"এত গরমে কি অমন রোজ-রোজ মাংস খাওয়া ভাল?" দ্বিজেন্দ্রলাল কহিলেন,—"দেখ, —ঐ একটা জিনিষ, যার উপর আমার অত্যন্ত আসক্তি।" বলিলাম—"তা বলিয়া এত গরমেও নিত্য খাইতে অরুচি ধরে না,—এতই ভালবাসেন?" হাসিয়া-উঠিয়া উত্তর দিলেন—"উঃ, কি ভালই যে বাসি! এই মাংসটা যেদিন আমি আর খাইতে পারিব না, সেদিন জানিব, আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে!" কৌতুক করিয়া, হাসির ছলে এই-যে একটা কথা বলিয়াছিলেন, কে জানিত—বিধি-বিড়ম্বনায় ইহাও শেষে সত্যে পরিণত হইবে!—গ্রন্থকার।

ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া 'ধরা-বাঁধা' বিধি-নিষেধের প্রতি উপেক্ষা ও অবহেলা দেখাইতে লাগিলেন। একে তো আশৈশব নিজের প্রতি তাঁহার তেমন যত্ন বা আদর কোনদিনই ছিল না,—স্ত্রী-বিয়োগের পর আবার সে ঔদাস্য যে কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা তাঁহার পরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষভাবে জানেন।—এখন সেই শরীরটা যখন এমনই ভাবে অপটু হইয়া, তাঁহার কাছে যত্ন-তদ্বিরের দাবী জানাইল তখন তিনি স্বভাবতঃ তাহার উপরে নিতান্ত বিরক্ত ও রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। 'এই তো তুচ্ছ ও নশ্বর জীবন, ইহার আবার এত সুখ কেন?'—দেহ সম্বন্ধে এই ছিল তাঁহার মনের ভাব। পাঁচকড়িবাবুও আমায় ঠিক এই কথাই বলিতেছেন,—

"দ্বিজেন্দ্রলালের সন্ন্যাস রোগের সূচনা হইয়াছে, চারিদিক্ হইতে বন্ধু-বান্ধবেরা বলিতেছিল যে, 'তুমি সকাল সকাল প্রাতভ্রমণ (Morning-walk) করিতে বাহির হও,' 'অমুক অমুক জিনিষ খাইও না,' 'এটা করিওনা, ওটা করিও না,'—ইত্যাদি। বন্ধুদিগের এই উৎকণ্ঠা ও 'টান' দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন হাসিয়া আমাকে বলিল,—"দেখ পাঁচু, যেদিন মরিবার সে দিন তো মরিবই। মরিবার জন্যই আসিয়াছি; বাঁচিতে কিছু আসি নাই! আর, ছাই বাঁচিবই বা কোন্ সুখে, ভাই? তোমার না হয় একটা কর্ত্তব্য আছে,—যতদিন তোমার বাপ-মা বাঁচিয়া আছেন ততদিন তোমাকে বাঁচিবার জন্য অন্ততঃ একটু চেষ্টাও করিতে হইবে। ভাল, আমি বাঁচি কিসের জন্য? এই পোড়া জীবনের জন্য রোজ রোজ 'হেদো'র চারদিকে পাক খাইতে হইবে? গোলদিঘীতে গিয়া গোল বাড়াইতে হইবে? আর, 'গো-চারণের মাঠ'—গড়ের মাঠে যাইয়া দু'চক্র ঘুরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে ফিরিতে হইবে? এত বোকা নই যে, ছার জীবনের জন্য এমন বাঁদর সাজিব। এস, বসে' বসে' গল্প করা যাক্। বাঁচ্‌তে হয় বাঁচ্‌ব, মর্‌তে হয় মর্‌ব। এই তো জীবন,—এর জন্য আবার এত কষ্ট কেন কর্‌তে যাই?"

বাস্তবিক এইরকমই তাঁহার নিজের উপর,—আপন শরীরের উপর চিরকাল অযত্ন ও অনাদর ছিল।

কাজেই, সেই শরীর যখন সহসা ঐরূপ অসুস্থ ও অশক্ত হইল তখন, নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া, কিছু কাল অর্থাৎ—প্রথম-প্রথম ঐ 'ছ'সাত মাস' যাবৎ—একটু সাবধান হইয়া তিনি চলিলেন বটে; কিন্তু, তাহাতেও যখন কিছু হইল না তখন কেবল যে তিনি বিরক্ত ও হতাশ হইলেন তাহা নহে, সেইসঙ্গে বিধি-নিষেধও একে-একে তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন। এসম্বন্ধে তিনি সে সময়ে আমায় এক পত্রে * কি লিখিয়াছিলেন, শুনুন,—

"* * আমার শরীর কিচ্ছুই সারে নি। ডাক্তারেরা বলিয়া গেলেন যে, 'সার্ব্বে না।' যাক্! এক রকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। পূর্ব্বে এটুকু জ্ঞান না থাকার জন্য চিন্তিত ছিলাম বোধ হয়। এখন আর কোন চিন্তাই রহিল না।"

কিন্তু, এই 'কোন চিন্তাই' না থাকার ফলে, শেষে হইল এই যে, পূর্ব্বে তিনি যেটুকুও বা সতর্ক ছিলেন, এখন আর তাহাও রহিলেন না। সাহিত্য-চর্চ্চা, গান ও তর্ক করা তো কোনদিনও একেবারে বন্ধ হয় নাই, এখন আবার (এক মাদক-দ্রব্য সেবন ব্যতীত) নানা প্রকারে আহারেরও বিধি-লঙ্ঘন হইল। সুতরাং, রাজ-কার্য্য হইতে অবসর লইয়া, এতকাল ঘরে বসিয়া, বিবিধ ঔষধ-সেবনেও যে তাঁহার শরীরে কোন স্থায়ী উপকার হইল না তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি আছে? হায়—অলঙ্ঘ্য, নিষ্ঠুর নিয়তি!

ব্যাধির উপশম না হওয়ায়, দ্বিজেন্দ্রলাল চাকরী হইতে চিরদিনের মত অবসর লইলেন। কিন্তু,—'স্বভাব না যায় ম'লে'! —চেষ্টা করিয়াও তিনি কর্ম্মের বন্ধন কিছুতে কাটাইতে পারিলেন না। পূর্ব্ববৎ নাটক, সঙ্গীত ও রহস্য-কৌতুক-রচনা সমভাবে চলিল, এবং সেইসঙ্গে 'ভারতবর্ষ'কে স্বীয় আদর্শানুরূপ উৎকর্ষ দান করিতে তাঁহাকে আবার যথেষ্ট দুশ্চিন্তা ও পরিশ্রম সহিতে হইল। এইরূপে, সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও তিনি স্বীয় স্বভাবের প্রভাব অতিক্রম

* কলিকাতা,—২৫।২।১৩।

করিতে অক্ষম হইলেন; ফলে পরিণামে,—কি আর বলিব!—এমনই করিয়া, অবহেলা, অনাদর ও উপযুক্ত সেবা-যত্নের অভাবে, সেই অমূল্য জীবন অকস্মাৎ অকালে ঝরিয়া পড়িল!

*

* *

বিখ্যাত সাহিত্যিক, বন্ধুবর বিজয়চন্দ্র সেদিন (৩'রা জৈষ্ঠ, ১৩২০ শাল *) 'সুরধামে' দ্বিজেন্দ্রলালের অতিথি। তিনি বলিতেছেন,—

"সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর দ্বিজেন্দ্র একটু বিশ্রাম করিবার জন্য বিছানায় শুইলেন এবং * * আমাকেও শুইতে বলিলেন। আমি সে অনুরোধ না শুনিয়া চক্ষু দেখাইতে ডাঃ মেনার্ডের কাছে চলিয়া গেলাম। যখন ফিরিলাম তখন বেলা প্রায় দুইটা। দেখিলাম 'গুণ্ গুণ্' করিয়া * * * এই গানটি আপন মনে গাহিতেছেন। আমি কাছে গেলে, 'সিংহল-বিজয়' নাটকের শেষ অঙ্কটা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে কিছু আলোচনা করিলেন। তারপর, বেলা যখন প্রায় ৩'টা কি ৩॥'টা, তখন শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস গোস্বামী 'দাদামহাশয়' আসিয়া জুটিলেন এবং একজন চাকর আমাদের জন্য চা আনিয়া-দিয়া আমার যাত্রার জন্য গাড়ি ডাকিতে গেল।

বিজয়বাবু যাহাতে অন্ততঃ সেদিনটাও তাঁহার কাছে থাকেন তজ্জন্য তিনি বিজয়বাবুকে অনেক জেদ্ করিলেন; কিন্তু, বিজয়বাবু রাজী হইলেন না দেখিয়া, 'দাদামহাশয়'কে বলিলেন, 'আসুন তবে আজ গল্প করে'ই বিজয়কে ট্রেন্ 'মিস' করিয়ে দি।' বিদায় লওয়ার সময়ে বিজয়বাবু লিখিতেছেন,—

"শীঘ্রই আমি যাহাতে আবার কলিকাতায় আসি এবং সম্বলপুরের বাড়িতে নদীর ধারে একটা বসিবার স্থান করি তাহার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। 'ভারতবর্ষ' বাহির হইয়া গেলে একবার সম্বলপুরে যাইবেন, এমন একটা ইচ্ছাও জানাইয়াছিলেন, আমি প্রায় ৪'টার সময়ে গাড়িতে উঠিলাম, দাদামহাশয়ও তখনই বাড়ি যাইবেন বলিলেন।"

* ১৭ই মে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ

বিজয়বাবু এইভাবে বিদায় লইলে, দাদামহাশয় বাসায় যাওয়ার জন্য উঠিলেন। তখন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাকে অন্যদিনের অপেক্ষা আজ একটু 'সকাল-সকাল' নৈশ আহার সমাধা করিয়া-আসিতে বলিলেন ; কারণ, কথা ছিল—সেদিন শনিবার, তাঁহারা উভয়ে ক্ষীরোদবাবুর 'ভীষ্ম' নাটকের অভিনয় দেখিতে যাইবেন।

নিরুদ্দেশ-যাত্রা। তারপর, দ্বিজেন্দ্রলাল বাড়ির ভিতর দিকের একটা ঘরে, একাকী, 'ফরাসে'র উপরে একটা তাকিয়ায় 'ঠেস্' দিয়া, তদীয় 'সিংহল-বিজয়' নাটকের পাণ্ডুলিপি সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠিক কতক্ষণ তিনি এ কার্য্যে নিবিষ্ট ছিলেন, জানি না। হঠাৎ যেই তিনি মাথার উপর দু'দিকে দু'হাত তুলিয়া-দিয়া, তাকিয়াটার উপরে মাথা রাখিয়া, একটিবার মাত্র 'আলস্য ভাঙ্গিলেন' অমনই তাঁহার মস্তিষ্ক-দেশে কোথায়-যেন একটা শিরা ছিঁড়িয়া -গেল,—একটা চীৎকার করিয়াই তিনি অজ্ঞান হইলেন! পার্শ্বস্থ কক্ষে তখন 'ইভ্‌নীং ক্লাবে'র জন দুই যুবক 'বিলিয়ার্ড' খেলিতেছিলেন। অতর্কিতভাবে, সহসা তাঁহারা অস্বাভাবিক, জড়িত ও বিকৃত স্বরে দ্বিজেন্দ্রলালকে অমন 'বয়' বলিয়া ডাকিতে-শুনিয়া, ছুটিয়া-গিয়া সেই ঘরে ঢুকিলেন। কিন্তু, ততক্ষণে তাঁহার সংজ্ঞাহীন দেহ 'ফরাসে'র উপরে এলাইয়া পড়িয়াছে।

অবিলম্বেই ইহাঁরা ভৃত্যদের ডাকিয়া সাধ্যমত সেবায় নিযুক্ত হইলেন ; এবং কাছেই দাদামহাশয়ের বাসা, তাঁহাকে খবর দিতে লোক ছুটিল। প্রসাদদাসবাবু তাঁহার পুত্র ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন ; খবর পাইয়া, অল্প ক্ষণের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্বশুর, ডাক্তার প্রতাপবাবু ও শ্যালক জিতেনবাবুও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধীরে-ধীরে তখন মাথায় বরফ ও ঠাণ্ডা জলের 'ধারা' দেওয়া-হইল ; এবং সঙ্গে-সঙ্গে সাধ্যমত চিকিৎসাও

চলিল। সেবা-শুশ্রূষা, চিকিৎসা ও যত্নের একশেষ হইল। কিন্তু, কিছুতেই আর কিছু হইল না!

নৈশ অন্ধকার তখন দশ দিক্ ছাইয়া ফেলিতেছে।

*

* *

ক্রমে রাত্রি যখন ৯'টা, কি কারণে যেন, একবার তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন; পরক্ষণেই মহানিদ্রার আবেশে চক্ষু মুদিয়া-আসিল। এই সময়ে একবার—একটিবারমাত্র তাঁহার সেই ইহ-সর্ব্বস্ব, নয়নের মণি, অন্তিমের আশা, একমাত্র পুত্রের নাম ধরিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল অস্পষ্ট স্বরে ডাকিলেন-'মণ্টু!'

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস কে জানে কিসের সন্ধানে, ক্ষণতরে কাঁপিয়া-কাঁপিয়া, সহসা সেই কক্ষপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আর, সেই সঙ্গে আমাদের সোনার স্বপ্ন নিমেষেই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল! প্রশান্ত মহাসাগরে বুদ-বুদ-কণা মিলাইল। দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন!

শুক্লা দ্বাদশীর শশি-কলা তখন সেই অসীম আকাশ-পথে আলো দেখাইতেছে!

———

উপসংহার

১

রোগের সূচনা।

দেবী সুরবালার অভাব দ্বিজেন্দ্র-জীবনে সকল অনর্থপাতের মূল। পত্নী-বিয়োগের পর হইতে দেহের প্রতি একেবারেই তাঁহার মমতা কি লক্ষ্য রহিল না। হতাদর, অবহেলা ঔদাস্থ জীবনের সমস্ত কার্য্যে,—প্রত্যেক ব্যবহারে নিত্য-নিয়ত প্রতিভাত হইতে থাকিল। হেলায়-ফেলায়, কোনক্রমে দায়ে পড়িয়া, এ দিনগুলো যেন কাটাইয়া-দিতে পারিলেই হইল!

এইরূপে, ভিতরে-ভিতরে ঘোর অতৃপ্তি, অবসাদ ও যাতনা তিল-তিল করিয়া, দিনের পরে দিন, তাঁহাকে অল্পে-অল্পে ক্ষয় করিয়া, ধ্বংসের পথে লইয়া চলিল। মাতৃহারা, অসহায় পুত্র-কন্যার মুখ চাহিয়া, কর্ত্তব্য বোধে বাধ্য হইয়া, বাঁচিয়া-রহিলেন বটে; কিন্তু, 'সে জীবন—শুধুই জীবন-ধারণ।"

*

* *

এম্‌নই করিয়া কিছুকাল কাটিল। হঠাৎ, প্রবল বন্যা-প্রবাহের মত, উদ্দাম ঘূর্ণী ঝঞ্ঝার মত, 'ঈশানের পুঞ্জ মেঘে'র মত, 'বাধা-বন্ধহারা' হইয়া, 'অন্ধ বেগে' এ দেশে 'স্বদেশী'-আন্দোলনের অতর্কিত আবির্ভাব ঘটিল। দেশ-মাতৃকার আজন্ম উপাসক, অকৃত্রিম, তন্ময় ভক্ত, মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; চমকিয়া চাহিয়া দেখিলেন—সে স্বপ্ন সহসা প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইয়াছে! দৈবী প্রেরণায় সঞ্জীবিত হইয়া, স্বদেশ-সত্তায় ডুবিয়া-গিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল শিহরিয়া-উঠিয়া গাইলেন,—

'দেবী আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!'

প্রমত্ত আগ্রহে সমগ্র দেশ সে গানে যোগ-দান করিল। দ্বিজেন্দ্রলালের অবসাদ-নির্জ্জীব হৃদয় তখন, অসীম আত্ম-প্রসাদে ও অপূর্ব্ব আনন্দে অধীর হইয়া, অকস্মাৎ সেই তীব্র উদ্দীপনায় ক্ষিপ্তবৎ, উদ্দাম নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল।

*

*   *

কিন্তু, শরীরে এতটা সহিল না! 'আমার দেশ' গানটা গাইবার সময়ে, সচরাচর তিনি যে কি রকম উত্তেজিত হইয়া-উঠিতেন তাহা অনেকে জানেন। দাঁড়াইয়া-উঠিয়া, বীরত্ব ও আত্ম-মর্য্যাদাব্যঞ্জক অঙ্গ-ভঙ্গী করিবার কালে, উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাঁহার চোখ-মুখ একেবারে 'টক্‌টকে' লাল হইয়া উঠিত। প্রথম-প্রথম এ গানটা তখন তিনি গাইতেনও খুব;—কেহ যদি ইঙ্গিতেও গানটি একবার শুনিতে-চাহিত, অমনই তিনি লাফাইয়া-উঠিয়া গান ধরিয়া দিতেন।

কিন্তু, কালক্রমে স্বদেশী-স্রোতে যখন ভাঁটা ধরিল, বিবিধ প্রতিকূল বাধায় দেশের সঙ্কল্প ও উদ্যমের বেগ শেষে যখন মন্দীভূত হইয়া-আসিল তখন, অনুরুদ্ধ হইলেও, 'পারতপক্ষে' তিনি আর 'আমার দেশ' গাইতেন না। এই ভাবান্তর আমার সন্দিগ্ধ মনে বিরুদ্ধ ভাবের আঘাত করায়, একদিন বলিলাম—"এখন অনুরোধ করিলেও যে আপনার মুখে এ গান শোনা যায় না, ব্যাপার কি? শঙ্কা-ভীতি তা'হইলে আপনাকেও ক্রমে পাইয়া বসিয়াছে? 'সাধে কি বাবা বলি,—গুঁতোর চোটে বাবা বলায়"! কথাটা বলার সময়ে অত বুঝি নাই; কিন্তু, দেখিলাম—এ কথায় তিনি অত্যন্ত বিরক্ত, আহত ও ব্যথিত হইলেন। অভিযোগটা শুনিয়া, কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ নেত্রে চাহিয়া-রহিলেন; পরে, দাঁড়াইয়া-উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—

"বটে! আমাকে এত অধম, এত হীন ও কাপুরুষ তুমি ভাব? ভয়! কেন, কাকে—কিসের জন্য ভয় কর্‌তে যা'ব? মানুষ হ'য়ে জন্মেছি। যা' উচিত বুঝ্'ব,—ন্যায্য, সঙ্গত ও কর্ত্তব্য বলে' মনে ক'র্‌ব,—একশ'বার তা আমি প্রকাশ্যেই কর্‌তে প্রস্তুত। ** তবে, এই গানটা—এটা আর তেমন গাই না কেন, যদি জিজ্ঞাসা কর তা'র উত্তর এই যে, এ গান গাইতে গেলেই 'ঝাঁ' করে' কেন যেন আমার মাথাটা ভয়ানক গরম হ'য়ে ওঠে; বোধ হয়, যেন সমস্ত শরীরের রক্ত মাথায় গিয়ে জমেছে। ** ভয়! ওঃ!—ভারি তো আমার ভয়! অমন ভয়ের মস্তকে এই আমি পদাঘাত করি!"

এই বলিয়া, দ্বিজেন্দ্রলাল বাস্তবিকই 'মেঝে'র উপর পদাঘাত করিয়া, রাগে ও অভিমানে কেমন-একটা বিকৃত হাস্য করিয়া উঠিলেন।

*

*   *

বোধ হয়—'পূর্ণিমা-মিলন' উপলক্ষে, সেই-প্রথম, দ্বিজেন্দ্রলাল বন্ধুবর শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্রের 'দীন-ধামে' 'আমার দেশ' গাইয়া, মাথার ভিতরে কি-যেন একটা উদ্বেগ অনুভব করিতে থাকেন। উপস্থিতমত কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সে ভাবটা তিরোহিত হইলে, সেবারে মনে করা গেল—বুঝি লোকের ভিড়ের দরুণই এমনটা হইয়াছিল। সুতরাং, তখন আর এ সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ খেয়াল করিলেন না।

ইহার কিছুকাল পরে, তাঁহার নিজ বাড়িতে একদিন সকাল বেলায়, কয়েকজন অভ্যাগত বন্ধুর অনুরোধে, এ গানটা গাহিতে-গিয়া, 'চট্' করিয়া তাঁহার এমন মাথা ধরিল যে, সেবার সারাটি দিনরাত—প্রায় ২০।২২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত—তাঁহাকে তজ্জন্য বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন—সেবার গাইতে-গাইতে, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, কে যেন তাঁহার মস্তকের তালুদেশে সজোরে

একটা 'চাঁটি' (চপেটাঘাত) মারিল, এবং সেই সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত মাথাটা 'চট্' করিয়া 'ধরিয়া' উঠিল।

আর-একবার, সার্-ডাক্তার কৈলাস বসু মহাশয়ের গৃহে, বহু লোকের সমক্ষে, তিনি 'ইভ্নীং-ক্লাবে'র সভ্যদের লইয়া, এই গানটা গাইয়া শুনাইতেছিলেন। মাথায় রক্ত উঠিয়া তাঁর এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া যথারীতি আবেগভরে গাহিতেছিলেন, —অবসন্ন হইয়া হঠাৎ বসিয়া-পড়িলেন, এবং চক্ষে সব অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। 'ইভ্নীং-ক্লাবে'র প্রমথবাবু বলেন যে, মাথায় ও চোখে-মুখে গুলাব ও বরফ জল দিয়া, বহুক্ষণ বাতাস করার পর ক্রমে তিনি অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইলেন বটে; কিন্তু, প্রথমটা সকলেরই ভয় হইয়াছিল—বুঝিবা একেবারেই অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

*

* *

দেশের দুঃখ-দৈন্য, ও দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া, সৌভাগ্যক্রমে অধুনা অনেক শিক্ষিত-সজ্জন তাহার প্রতিকার-কল্পে চিন্তা ও চেষ্টা করেন, স্বীকার করি। কিন্তু, মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় স্বীয় স্বার্থ অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া, আপন উন্নতি, প্রতিষ্ঠা ও পার্থিব সম্মানের আশা তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষাভরে পদ-দলিত করিয়া, অমন দুর্দ্দম, ব্যাকুল আগ্রহে দেশ-মাতৃকার একাগ্র ধ্যানে আত্ম-হারা, তন্ময় হইয়া-যাইতে আর কয়জন পারিয়াছেন, আমি জানি না। সুবিধা ও সুযোগ বুঝিয়া, মাঝে-মাঝে, আপন প্রবৃত্তিমত, মা'র পায়ে মৌখিক ভক্তি-প্রীতির সুলভ পুষ্পাঞ্জলি দিয়াই তিনি সন্তানের সকল দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করেন নাই। পরন্তু, দেশাত্মবোধের এই মহা-পুরোহিত দেশমাতৃকার মহীয়সী-দিব্য মূর্ত্তিখানি আপন মাথায় তুলিয়া-লইয়া, তাঁহারই দিব্য বন্দন-গীতি গাইবার কালে স্বীয় প্রেমোদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত হৃদয়-রক্তে জননীর

রাতুল পদারবিন্দ ধৌত করিতে-করিতে অকস্মাৎ যেন সানন্দে আত্ম-বলি দিয়া, তাঁহারই চরণোপান্তে যথার্থই হাসিতে-হাসিতে লুটাইয়া পড়িলেন!

———

(২)

শেষ সাক্ষাৎ

শেষবার যেদিন 'সুরধামে' সুহৃত্তমকে আমি দেখি, শিহরিয়া-উঠিয়াছিলাম,—এতই তাঁহাকে বিষণ্ণ, মলিন ও শুষ্ক দেখাইতেছিল। সেই স্থলপঙ্কজতুল্য, রক্তিম-গৌর বদনে বার্দ্ধক্যের বলি-লেখা ও অবসাদ-চিহ্ন অতি-স্পষ্ট প্রকট হইয়া-উঠিয়াছে;—কে যেন সেই 'সদানন্দ,' হাস্য-সুন্দর মুখমণ্ডলে হতাশা ও বিষাদের মালিন্য-কালিমা মাখাইয়া দিয়াছে। অকস্মাৎ সেদিন এই ঘোর পরিবর্ত্তন দেখিয়া বুকের ভিতরে আঘাত লাগিল; শঙ্কাকুল চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলাম—আজকাল শরীরে কি বিশেষ-কোন অসুবিধা বোধ হচ্ছে?

দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যমনে কি-যেন ভাবিতে-ভাবিতে বলিলেন,—'হ্যাঁ, নাঃ,—তা এমন আর বেশিই বা কি?" কথাটা ধীরে-ধীরে, উদাসভাবে উচ্চারণ করিলেন; ভাল লাগিল না। একটু হাসি-মুখ দেখিবার আশায় কহিলাম,—

"একাকী বসিয়া এবে মেলিয়া নয়ন
কি ভাবিছ মনে মনে? অথবা তোমার
ভাবিবার বাস্তবিক আছে অধিকার।"

চেষ্টা করিয়া বন্ধুবর একটু হাসিতে-গেলেন, পারিলেন না। অজ্ঞাত-সারে একটা দীর্ঘ শ্বাস পড়িল। উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলাম,—বলুন না, কি হ'য়েছে?

দ্বি। "হবে আবার কি? কিছুই না।"

আমি। চলুন, গাড়ী ক'রে একটু বেড়িয়ে-আসা যাক্। যাবেন?

দ্বি। কোথায়?

আমি। এই ধরুন, গড়ের মাঠে কি Strand'এ, (গঙ্গার ধারে,) কিংবা আর-যেখানে খুসী?

ঘনীভূত ক্রন্দনের ন্যায়, একটা শুষ্ক-ম্লান হাসি হাসিয়া, গাঢ় স্বরে বলিলেন—"এক্‌লা-এক্‌লা এবার যাব বটে বেড়াতে; তবে সে একটু দূরে!"

চমকিয়া-উঠিলাম। তাঁহার একখানি হাত আমার কাঁধের উপরে ছিল; টানিয়া লইয়া, সজোরে তাহা চাপিয়া-ধরিয়া বলিলাম—এ সব কি কথা আপনার? আমি কাল বরিশালে চলে' যা'ব জানেন?

প্রেমময় বন্ধু-আমার, আমার হাতটার উপরে বার কয়েক নিজের হাতখানি অতি স্নেহে বুলাইলেন; পরে, শান্ত-স্নিগ্ধ অপলক চক্ষে আমার মুখের দিকে একটিবার চাহিয়া, (আহা! সে যে কি চাহনি তা' আমিই জানি!) গদ্‌গদ্, গাঢ় স্বরে কহিলেন—"কষ্ট হয়?"

আমি তাঁহার এমন ভাব বড়-একটা দেখি নাই। মনে-মনে বল সংগ্রহ করিয়া, 'চ্যাচাইয়া' উঠিলাম—"আমি আর কখ্‌খনো—কিছুতেই আর আপনার কাছে আস্‌ব না। কষ্ট! কষ্ট আবার কিসের? পাগলের কথায় যে কান দেয় সে-ও পাগল। ওঃ,—ভারি তো!"

বন্ধু শুনিয়াও যেন শুনিলেন না। অর্দ্ধ-স্বগত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাল, সত্যি কালই যাবে? আবার আস্‌ছ তো শিগ্‌গির?" বলিলাম—"না গিয়ে যে উপায় নেই। আবার কবে আসি,—কি ক'রে বল্‌ব?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে, আবার যেন আমাকে ক্ষেপাইবার জন্য, ছোট্ট একটি দুষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"তা যাও! কিন্তু আমাকেও বিদায় দিয়ে যে'ও। আমারও এখন সেই—"সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।" রাগ করিয়া,

তাঁহার মুঠোর ভিতর হইতে আমার হাতটা ছিনাইয়া-লইয়া, চলিয়া-যাওয়ার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল আমার জামার একটা কোণ টানিয়া-ধরিয়া, দৃঢ় আদেশের কণ্ঠে কহিলেন—"শোন! বোস আগে!—বল্‌ছি।"

বসিলাম। বন্ধু অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া, অত্যন্ত ধীর ও গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"কি কর্‌ব? উপায় নেই যে ভাই! শরীরের যে'রকম অবস্থা দাঁড়িয়েছে, বেশ এখন আমি বুঝ্‌তেই পার্‌ছি—আর বড় দেরি নেই।"

ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—অনিয়ম, অত্যাচার করে' আপনিই তো আরও এ অসুখটা বাড়িয়ে-তুল্‌ছেন। ডাক্তার-কবিরাজের কথামত সাবধান হ'য়ে না চল্‌লে এ সব রোগ সারে কখনও? Complete rest ('নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম') নেওয়ার কথা; অথচ, আপনি বই লিখ্‌ছেন, গান গাইছেন, মিটিং'এ যাচ্ছেন, থিয়েটার দেখ্‌ছেন, বই পড়্‌ছেন, তর্ক করছেন,—এখনও ঠিক সেই আগের মতই তো যা-ইচ্ছে-তাই কর্‌ছেন! অমন কর্‌লে রোগ সারে? তারপর, খাওয়া-দাওয়ার বিষয়েও নিশ্চয়ই অনিয়মের চরম হচ্ছে।

তিরস্কার শুনিয়া খানিক ক্ষণ কিছু বলিলেন না। কয়েক মিনিট চুপ করিয়া-থাকিয়া বলিলেন,—"দেখ দেবকুমার, এই পুরুষকার ছাড়া Fate (অদৃষ্ট) আমি কোনদিনও মানিনি;—তুমিও তা জান। কিন্তু, এখন যতই ক্রমে দিন ফুরিয়ে-আসছে, স্পষ্ট দেখ্‌ছি—সমস্ত ব্যাপারেরই একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও পরিণাম আছে,—প্রায়ই তা' হাজার চেষ্টা কর, কাটানো যায় না। তারপর, তোমার এই ডাক্তাররাই যখন স্পষ্ট কবুল জবাব দিয়েছেন তখন আর অত নিয়ম-'টিয়ম' রক্ষা করে'ই বা লাভ কি, বল! সাফ্‌ সেদিন জানিয়ে-গেল, যে এই রোগেই আমার শেষ,—এর হাত থেকে এবার আর আমার কোনমতেও উদ্ধার নেই।

অনেকক্ষণ এই লইয়া, তাঁহার সঙ্গে আমার বিস্তর বাদবিসম্বাদ, কথা-কাটাকাটি হইল। কিন্তু, দেখিলাম—তাঁহার মনে কি-যে একটা গাঢ় অবসাদ ও দুর্ব্বোধ্য বিষাদের ভাব আসিয়া-জমিয়াছে, —কিছুতেই তাহা মুছিবার বা ঘুচিবার নহে। নানা প্রকারে আমার সাধ্যশক্তি মত আমি তাঁহাকে তথাপি অনেক মিনতি করিয়া সতর্ক থাকিতে বলিলাম। তিনি আমার সে ব্যাকুলতা ও আগ্রহ দেখিয়া শুধু বার কয়েক হাসিলেন,--কিছু বলিলেন না।

বিদায় নিয়া যখন আসি,—গাঢ় প্রীতিভরে বন্ধু-আমার দুই হাত দিয়া আমাকে বুকে জড়াইয়া-ধরিলেন; এবং সেই ভাবে সমধিক দীর্ঘ কাল আমাকে চাপিয়া-রাখিয়া, হঠাৎ বাহুপাশ শিথিল করিয়া-দিয়া, কম্পিত, স্নেহসিক্ত কণ্ঠে কহিলেন,—

"সুখে থাক ভাই-আমার! আমি যেন তোমার সকল বালাই নিয়ে চলে' যাই!"

গলার নীচে কি-যেন একটা ঠেলিয়া-উঠিল। তাড়াতাড়ি নমস্কার করিয়া, আর তাঁহার দিকে না চাহিয়া, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা-ভার হৃদয়ে লইয়া, অতি দ্রুত আমি সেখান হইতে পলাইয়া আসিলাম। ইহজীবনে সেই আমার তাঁহার সঙ্গে শেষ দেখা!

*

* *

ইহারই দিন চৌদ্দ পরে, হঠাৎ একদিন আমার মস্তকে বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল!

———

৩

দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য

(আভাস)

বলিতে লজ্জায় শির নত হইয়া-পড়িতে চায় যে, আজও এদেশে এই-সব তথা-কথিত, শিক্ষিত-বাবুদের ভিতরে খুব-অল্প লোকই দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র রচনার সহিত পরিচিত। যাঁহারা জাতীয় সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত নহেন তাঁহাদের পক্ষে জাতীয় উন্নতি-সাধন কল্পনামাত্র। আজ আর বঙ্গভাষা 'দীনা', 'মলিনা', ভিখারিণী নহেন ; আজ তিনি হাস্যোজ্জ্বল, গীতি-মুখরা মহীয়সী সম্রাজ্ঞী ! আজ এ ভাষার সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিবার দিন আসিয়াছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়—এখনও বঙ্গীয় শিক্ষিত-ব্যক্তিগণ দেশীয় গ্রন্থকারের সহিত আশানুরূপ পরিচিত হইতে পারেন নাই। আজও অনেকে বঙ্গভাষার উত্তম পুস্তক উপেক্ষা করিয়া, বিলাতী, ঐ সব যত অসার ও কুরুচিপূর্ণ নভেলগুলিকে পর্য্যন্ত সমাদর করিয়া থাকেন !

৬ ভূমিকা।

আমাদের বিশ্বাস—দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে আরও-একটু বেশি দিনের প্রয়োজন হইবে। আজও বঙ্গদেশ তাঁহাকে যথার্থভাবে বুঝিতে পারে নাই। যে-সকল লেখক কোন-একটা নূতন রকমের (Style) ঢং বা ধরণের প্রবর্ত্তক, সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে তাঁহাদের কিছু-বেশি দিন বিলম্ব লাগে। যাঁহারা পাঠকদের রুচি অনুসারে খাদ্য যোগান অথবা কোন সাময়িক ভাবের উপর নির্ভর করিয়া লেখনী-চালনা করেন তাঁহারা অতি অল্পদিনেই প্রশংসিত ও পরিচিত হন। জগদ্বিখ্যাত কবি Shakespeare'এর অনন্যসাধারণ প্রতিভা তদ্দেশবাসিগণ কর্ত্তৃক

প্রথমতঃ সমাদৃত হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলালেরও সেই অবস্থা। আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা সম্যক্ বুঝিতে পারি, এরূপ গর্ব্ব করি না। তবে, এটুকু আত্মপ্রসাদ অবশ্য আছে যে, বুঝিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি, এবং চেষ্টা করিয়াও যাহা না বুঝি তাহা লইয়া অনর্থক বাগাড়ম্বর করি না।

দ্বিজেন্দ্রলাল এ দেশের যতগুলি উপকার করিয়াছেন তন্মধ্যে একটা এই যে, ভবিষ্যবংশধরগণ তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া এ দেশের রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতির একটি মোটামুটি চিত্র স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইবে। কেবল সন, তারিখ, এবং জন্ম-মৃত্যুর ধারাবাহিক বিশুদ্ধ তালিকাই যদি প্রকৃত ইতিহাস না হয় তাহাহইলে কবিবর বর্ত্তমান ভারতের একজন সুনিপুণ ঐতিহাসিক। এ গুণটি আমাদের আর-কোন নাট্যকারের নাই, একথা বলিলে বোধ হয়—অত্যুক্তি হইবে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল সর্ব্বসাধারণে 'হাসির কবি' বলিয়াই বেশি পরিচিত। অবশ্য একথা ঠিক যে, তিনি একমাত্র হাসির কবিতার দ্বারাই বঙ্গ-সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন; কিন্তু, হাসির কবিতা ছাড়া কি নাটকে, কি প্রহসনে, কি গানে, কি অন্যান্য কবিতায় সর্ব্বস্থলেই তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নহে; তবে, ভগবৎকৃপায় সুযোগ উপস্থিত হইলে, এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয়-প্রসঙ্গে, একদিন ইহা দেখাইবার চেষ্টা করিতে সাহসী হইব যে, দ্বিজেন্দ্রলালের তুল্য আর কোনও লেখক—হাসির গানে, নাট্য-সাহিত্যে, ব্যঙ্গ-কবিতায়, এবং জাতীয় ভাবের অনুপ্রাণনায়—অপাততঃ আর এ বঙ্গদেশে এতাদৃশ কৃতিত্বলাভে সমর্থ হন নাই এবং তিনি এমন-কিছু দান করিয়া গিয়াছেন যাহা তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহই দিতে পারেন নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা কবিত্বে কমনীয়, মৌলিকতায় মনোজ্ঞ ও উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ রুচিপরায়ণতায় স্বাস্থ্যকর, এবং সদ্ভাবে পরিপূর্ণ। দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে কবি পরিহাসরসিক, দার্শনিক, সমালোচক, প্রবন্ধ-লেখক এবং নাট্যকার।

এখন গোড়াতে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, যদি কেহ কোন প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে ভ্রম-প্রমাদশূন্য বলিয়া ভাবিয়া-থাকেন তাহা হইলে দুঃখের সহিত বলিতে-হইতেছে যে, তাঁহার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য ও সাহিত্য লিখিত হয় নাই। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে; দ্বিজেন্দ্রেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শ্রদ্ধাপূর্ণ সমালোচনার এমন সঙ্কীর্ণ নিয়ম হইতেই পারে না যে, দোষগুলিকে গুণ বলিয়া প্রচার করিতে হইবে। দোষ সম্বন্ধে নীরব থাকা শুধু যে ভক্তিমানের লক্ষণ নহে তা' নহে,—তাহা এক হিসাবে তোষামোদও বটে। শ্রদ্ধা যখন অসংযত ভাবে উচ্ছলিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যটি প্রশ্রয় দেয় তখন তাহার নাম হয়—অন্ধ ও অসার স্তাবকতা। সমালোচনায় এ ভাব-প্রবণতার স্থান নাই। সত্য কথা বলিতেই হইবে। সমালোচনার অর্থ—নিরপেক্ষ বিচার; উহা নিন্দাও নহে, প্রশংসাও নহে।

সর্ব্বাগ্রে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতার কথা বলি। কবিবরের পূর্ব্বে বিশুদ্ধ হাস্যরস বঙ্গসাহিত্যে একপ্রকার অজ্ঞাত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ও অমৃতলাল প্রভৃতি কবিগণ হাস্যরসের কবিতা রচনা করিয়াছেন সত্য; কিন্তু, তাঁহাদের রচনার বহু স্থানে 'ভাঁড়ামি' বাহুল্য বর্ণনা বা অত্যুক্তি ও অশ্লীলতার প্রচুর সমাবেশ ঘটিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতায়, প্রহসনে, গানে এবং Parody, অর্থাৎ—অনুকৃতি-কৌতুকে হাসাইয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার কুরুচি ও অশ্লীলতার লেশস্পর্শশূন্য, সেই অনায়াসোপহিত হাস্যরস কোনস্থলেই সম্পূর্ণ বিফল হয় নাই।

রসিকতা।

তাঁহার হাসির কবিতার কতকগুলি অপূর্ব্ব বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ, ইহার ভাষা ও ছন্দ।—এসব ছন্দ তাঁহার নিতান্তই নিজস্ব; এবং তাঁহার এমন একটি কবিতা বা গানও নাই যাহার ছন্দ ভাবানুগ ও সম্যক্ স্বাভাবিক নহে। বক্তব্য বুঝিয়া ছন্দোনির্ব্বাচনের শক্তি তাঁহার অসাধারণ ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার ভাষাও ভাব-প্রকাশের একান্ত উপযোগী। অনেক সময়ে ছন্দ, মিল, ও ধ্বনির বিচিত্র সমাবেশে খুব-একটা সাধারণ কথাও সরস রসিকতায় 'জমায়েৎ' হইয়া উঠিয়াছে। মিলের অনায়াস গতি ও অপূর্ব্বতা বিস্ময়কর। তাঁহার ছন্দ পূর্ব্ব-প্রচলিত ছন্দ অপেক্ষা প্রায়ই একটু নূতন ধরণের —অনেকস্থলে ইংরেজী পদ্ধতির অনুযায়ী, এবং সর্ব্বত্র নিপুণ হস্তের কারুকার্য্য-মণ্ডিত।

তাঁহার হাসির কবিতার রুচি নির্ম্মল ও সুমার্জ্জিত। কিন্তু, এই বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে যাওয়ায় কোনস্থলে 'আড়ষ্ট' ভাবের সাবধানতা লক্ষিত হয় নাই। এরূপ বোধ হয় না—যেন তিনি কোন কথা ইচ্ছা করিয়া 'বাদ-সাদ' দিয়া বা কাটিয়া-ছাঁটিয়া লইয়াছেন। বরং, দেখা যায়—তিনি এতই অনায়াসগামী যে, আর-একটু এদিক্-ওদিক্ হইলে কোন-কোন স্থলে তাঁহাকে অশ্লীলতা-পঙ্কে পড়িতে হইত; কিন্তু, অপূর্ব্ব কৌশলে সাম্‌লাইয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক কবিতাই রসিকতায় ভরপূর। আরও অনেকে হাসির কবিতা লেখেন সত্য; কিন্তু, প্রায়শঃ তাঁহাদের রচনায় সেই হাস্যরসোদ্ভাবনের ব্যর্থ প্রয়াসেই হাস্যরসের উদ্রেক করিয়া থাকে। অনেক স্থলে এই পণ্ডশ্রম বা রসিকতার ব্যায়াম দেখিয়া হাস্যের পরিবর্ত্তে করুণারও উদ্রেক হয়। এরূপ হাসাইবার চেষ্টা, 'সুড়সুড়ি' কি 'কাতুকুতু' দিয়া কিংবা 'ভ্যাঙ্‌চাইয়া' হাসাইবার মত।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র, দীনবন্ধুবাবু, অমৃতবাবু, কাব্যবিশারদ প্রভৃতি লেখকগণ রসিকতা করিয়া হাসাইয়াছেন বটে; কিন্তু, পূর্ব্বে যা'

বলিয়াছি—তাঁহাদের সে-সব ধরণ দ্বিজেন্দ্রলালের মত মোটেই নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসি অনেকস্থলে অশ্রুর রূপান্তর। তাঁহার প্রতি হাসির গান চিন্তা ও শিক্ষার প্রচুর "খোরাক" যোগাইয়া থাকে। অথচ, আশ্চর্য্য এই যে, তজ্জন্য অনাবিল, উচ্ছ্বসিত হাস্যের কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গোঁড়ামি ছিল না। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের তিনি অন্ধ পক্ষপাতী ছিলেন না। যেখানে আবর্জ্জনা, যেখানে 'গন্ধদ্' যেখানে 'ভণ্ডামি' দেখিতেন সেইখানেই তাঁহার ব্যঙ্গের কশাঘাত সমভাবে চলিত। সর্ব্বপ্রকার 'ন্যাকামি' ও 'ভণ্ডামি'র উপর তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। তাই, দেখিতে পাই—কখনো হংসপুচ্ছ-পরিহিত কাকের মত বিলাত-ফেরৎ সম্প্রদায় তাঁহার বিদ্রূপের পাত্র; কোথাও দেখি—ফোঁটা-তিলক-টিকিধারী, অসংযত ও অনাচারী বিপ্রের উপর তাঁহার আক্রমণ; কভু দেখি—ভণ্ড দেশ-হিতৈষীর 'ধাপ্পাবাজী' প্রকাশ করিয়া-দিতেছেন; কখনও দেখি—অর্ব্বাচীন সমাজ-সংস্কারক তদীয় কশাঘাতে বিপর্য্যস্ত, এবং কোথাও দেখি—উচ্ছৃঙ্খল 'বাবু'-সম্প্রদায় তাঁহার সম্মার্জ্জনী-প্রহারে সন্ত্রস্ত। অথচ, তাঁহার এই-সকল সুন্দর, সরস-কঠোর ব্যঙ্গের অভ্যন্তরে এমন-একটু স্বভাব-সরল রসিকতা আছে যে, আক্রান্ত ব্যক্তিও সাময়িকভাবে তাহা মধুরভাবেই উপভোগ করিতে বাধ্য হয়।

অবশ্য তাঁহার সকল আক্রমণ, সকল ব্যঙ্গই যে ন্যায্য এবং যুক্তি-যুক্ত তাহা বলিতে পারি না। তবে, যাহা অযৌক্তিক তাহা অপরের কাছে অযৌক্তিক হইতে পারে; কিন্তু, তিনি নিজে অযৌক্তিক ও অশোভন বুঝিয়াও, কেবল ব্যঙ্গের প্রলোভনে অথবা কোন অসাধু উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া কখনও কিছু লিখেন নাই।—নিজে যাহা ঠিক বুঝিতেন তাহাই সরলভাবে লিখিয়া-যাইতেন। ফলে, আজ দ্বিজেন্দ্রলালের ঐসব ব্যঙ্গ-কবিতার প্রভাব সমাজকে যে কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর করাইয়া

দেয় নাই, একথা বলিতে যাওয়া, বোধ হয়—খুবই অনুচিত ও অসঙ্গত হইবে। দ্বিজেন্দ্রলাল 'হাসির গান', 'আষাঢ়ে', 'কল্কী অবতার', —এই তিনখানি হাস্যরসাত্মক কবিতা-গ্রন্থ রচনা করিয়া অমর হইয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ-হিতৈষণা সম্বন্ধে আজ বঙ্গবাসীকে আর নূতন করিয়া কিছু বলিয়া-দিতে হইবে না। তাঁহার জাতীয় সঙ্গীতগুলি সাহিত্য-ভাণ্ডারের মহার্হ রত্ন। মৌলিকতার হিসাবে ও প্রকাশের ধরণে,—সরল সতেজ ও সুস্পষ্ট ভাব-বিন্যাসে—এ সকল সঙ্গীতের যে একটা নিপুণ বৈচিত্র্য আছে তাহা বস্তুতঃই অপূর্ব্ব ও অতুল।

স্বাদেকশিতা।

দ্বিজেন্দ্রলাল দেশ-হিতৈষণা সম্বন্ধে অসার ভাব-প্রবণতার বিরোধী ছিলেন। 'নেতা' কবিতাটি ইহার প্রমাণ। তিনি জানিতেন যে, জন্মভূমির জন্য কেবল অলস অশ্রুপাত করা খুব সহজ; কিন্তু, তাহার জন্য ত্যাগীর ন্যায় কার্য্য করা কঠিন।

দ্বিজেন্দ্রলালের এ স্বদেশ-ভক্তির মূল ভিত্তি গণ্ডীবদ্ধ "স্বার্থে" নহে,—পরন্তু, সার্ব্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছায়। এ দেশ-ভক্তির পরম পরিণতি দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে—সমগ্র জগতের মঙ্গলেচ্ছায়। তাঁহার দেশভক্তি কোন জাতি বা দেশের উপর বিদ্বেষ বা ঘৃণার উদ্রেক করে না। বলা বাহুল্য—এই বিশেষত্বটুকু তাঁহার এবংবিধ রচনাগুলিকে অবশ্যই অবিনশ্বর যশের অধিকারী করিয়া রাখিবে। ইহা কখনও অসংযতভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া-উঠিয়া, অতি-বৃষ্টির মত নিজের সৃষ্টিকে নিজেই পণ্ড করিয়া দেয় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল জানিতেন, ধর্ম্মোন্নতিতেই জাতীয় কল্যাণের পরিণতি। আমরা এখন সেই ধর্ম্মে 'খাটো' হইয়া পড়িয়াছি। বাহ্যিক আচারের 'উদ্দেশ্যহীন আবর্জ্জনা' বাড়িয়া-উঠিয়া, ক্রমে এখন দেবতার সিংহাসন-খানি ঢাকিয়া-ফেলিয়াছে; তাই, তিনি অনেকস্থলে আচার-গত

কুসংস্কারের উপর ভীষণ আক্রমণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন —ধর্ম্মই আমাদের চরম লক্ষ্য ; এবং সেই ধর্মেই আমাদের যথার্থ সার্থকতা !

প্রেম।

বঙ্গদেশে প্রেমের কবিতার অভাব নাই। জয়দেব, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রায় সকল কবিই প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন। বঙ্গীয় কবিদিগের একটা সাধারণ রীতি এই যে, তাহারা কবিতা লিখিতে-হইলেই প্রথমে প্রেম লইয়া বসেন। অবশ্য, আমি এ কথা বলি না যে, প্রেমের কবিতা লেখা উচিত নহে; বরং, এক হিসাবে দেখিতে গেলে— প্রেমই কবিতার প্রাণ। কিন্তু, আজকাল প্রায় সব কবিই কেমন যেন একরকম 'একঘেয়ে' জরাজীর্ণ, অবসাদ-নির্জ্জীব ও নিতান্ত প্রাণ-হীন প্রেমের কবিতা লিখিয়া, অযথা বঙ্গসাহিত্যের আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করিতেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু এ ধরণের প্রেমের কবিতা কখনও লেখেন নাই। তিনি জানিতেন যে, প্রেম ছাড়া স্নেহ, ভক্তি, কৃপা, অনুকম্পা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি কবিতা লিখিবার উপাদান আরও অনেক আছে। তাঁহার বাল্যকালে লিখিত 'আর্য্যগাথা' নামক কবিতা-গ্রন্থে যে-সকল প্রেমের কবিতা পাওয়া-যায়—যদিও তাহাতে বিশেষ-কোন মৌলিকতা নাই তথাপি—সেগুলির রুচি অতি বিশুদ্ধ ও ভাব প্রকৃতই আন্তরিকতাপূর্ণ। ইহা কবিবরের ষোড়শ কি সপ্তদশ বর্ষ বয়সে লিখিত। যে প্রতিভা একদিন সমগ্র বঙ্গদেশকে স্তম্ভিত করিবে ; কিশোর বয়সে—উন্মেষ সময়েই তাহার এই প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল 'আর্য্যগাথা', 'মন্দ্র', 'আলেখ্য' 'ত্রিবেণী', নামক চারিখানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া-গিয়াছেন। এই সকল কাব্যে তিনিও বহু প্রেমের কবিতা লিখিয়াছেন বটে ; কিন্তু, তাহা পবিত্র, স্বর্গীয়, এবং সর্ব্বত্র সুরুচিসঙ্গত। একমাত্র কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে, আধুনিক বঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেম-কবিতার তুলনা

হয় না। তিনি 'মেবার-পতন' নাটকে মানসী, কল্যাণী ও সত্যবতীতে তিন রকম প্রেমের তিনটি অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়া একত্র তাহাদের চরম পরিণতি দেখাইয়াছেন। প্রথমে পতি-প্রেমে বা দাম্পত্য-প্রেমে, সেই পতি-প্রেম পরে স্বদেশ-প্রেমে, অবশেষে এই স্বদেশ-প্রেম আবার বিশ্বপ্রেমে পরা-পরিণতি লাভ করিল। তিনি বিভিন্ন নাটকে নানা প্রকারে বিচিত্র প্রেম-চিত্র অঙ্কিত করিয়া-গিয়াছেন।

প্রেম সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা খুব Practical! তিনি স্বাভাবিক প্রেমকে 'কি-যেন-কি, রহস্যময় 'বুঝি-বুঝি না' ভাবে দেখিতেন না। প্রেমকেও তিনি যুক্তি দ্বারা বিচার করিয়া যেন 'তন্ন-তন্ন' করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন।

প্রেমের কবিতা লিখিতে-যাইয়া অনেক উচ্চস্তরের কবিরও পদস্খলন হইয়াছে; কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রত্যেক প্রেম-কবিতা সুরুচিসম্মত। তাঁহার প্রেম রূপজ নহে,—প্রায়ই গুণজ। সৌন্দর্য্য ও প্রেম সম্বন্ধে তিনি তাঁহার 'আলেখ্য' কাব্যে বলিতেছেন,—

'সৌন্দর্য্য নয় দেহের বর্ণ,
ওষ্ঠ-অক্ষির আকার ভেদ,
গ্রীবা-গণ্ডের প্রকার মাত্র!
—সে তো শুদ্ধই অস্থিমেধ!
দণ্ডমাত্র আঁখির তৃপ্তি,
—সুখে সেব্য, প্রেমের নয়;
যেথায় দীপ্ত প্রাণের দীপ্তি,
সে সৌন্দর্য্যই ধন্য হয়।'

এই মার্জিত রুচির পরিচয়ে তিনি বুঝি—বঙ্গের যাবতীয় কবিকেই পরাস্ত করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নারী-জাতিকে কেবল মধুরভাবে অথবা কামনার বস্তু বোধে দেখেন নাই;—নারী-জাতিকে দেখিয়া সাধারণতঃ তাঁহার মাতৃত্ব-স্বস্তৃত্বর কথাই স্মরণ হইত; এবং নারীর

ললিত দেহ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া, সর্ব্বাগ্রে তদন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিগুলির কথাই মনে জাগিত।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় সর্ব্বত্র পুরুষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 'মেয়েলি' ধরণটা তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল। তাই, তিনি লম্বা-লম্বা কোঁকড়ানো চুল রাখা, নাকি-সুরে কথা বলা, মন্থর-পদক্ষেপে গমন, অপাঙ্গ দৃষ্টি-নিক্ষেপ প্রভৃতির উপর চিরদিন 'হাড়ে চটা' ছিলেন। পুরুষ চেষ্টা করিয়া স্ত্রীলোকের মত হইবে, এটা তাঁহার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইত। তাঁহার 'আনন্দ-বিদায়' নামক (Parody'তে) অনুকৃতি-কৌতুকে কতকটা যেন তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া, অশোভনরূপে ও অন্যায়ভাবে, ইহার বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি নাটকেও বীর-চরিত্র অঙ্কন করিতে ভালবাসিতেন। শুধু প্রেমের ছড়াছড়ি তাঁহার নাটকে দেখিতে পাই না। এই পুরুষত্ব সম্বন্ধে তিনি অনেকাংশে পাশ্চাত্যজাতির অনুকারী। তাঁহার বীরত্ব ও যুদ্ধবর্ণনার গানগুলি বঙ্গসাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন, এবং অভাবনীয়রূপে অতুল। এস্থলে তিনি মহাকবি রবীন্দ্রনাথকেও পরাজিত করিয়াছেন।

পৌরুষ।

কিন্তু, এই পৌরুষের আধিক্যে তাঁহার অনেক কবিতা—কবিতার প্রধান লক্ষণ যে স্বাভাবিক কোমলতা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কবিতা বীররসের হইলেও তন্মধ্যে একটা স্বাভাবিক কোমলতা থাকিবে; কারণ, কোমলতাই কবিতার বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন একটু-বেশি 'মেয়েলি,' দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা তেমনই আবার একটু-বেশি পরুষ। কবিবর মধুসূদন একাধারে 'মেঘনাদবধে' গভীর নির্ঘোষে দুন্দুভি বাজাইয়াছেন, আবার 'ব্রজাঙ্গনা'-কাব্যে মধুর বংশীধ্বনিও করিয়াছেন। এই-যে একই কবির রচনায় মধুর ও কঠোর,—দুইটি বিপরীত ভাবের অপূর্ব্ব

সমাবেশ, দ্বিজেন্দ্রলালের ভিতরে তাহা তেমন নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের কোমল বা করুণ রসের ভিতরেও কিছু কিছু কাঠিন্যের বা পুরুষত্বের আভাষ পাওয়া যায়। ইহাতে অবশ্য নূতনত্ব আছে ; কিন্তু, নূতন হইলেই তাহা সমর্থন-যোগ্য নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা ওজস্বিনী ও পৌরুষপ্রকাশিনী। তাঁহার ছন্দ, শব্দ, বিষয়-নির্ব্বাচনও সর্ব্বথা পৌরুষব্যঞ্জক।

দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাবতঃ কতকটা নিরাশাবাদী, অর্থাৎ—Pessimist. দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যভাবের দার্শনিক। তিনি তার্কিক ও যুক্তিবাদী। কিন্তু, তর্কের তো কোনও মীমাংসা নাই! তিনি জগতের প্রত্যেক বিষয়ই তর্কের দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিতেন ; সুতরাং, তর্কের অন্ত না পাইয়া, স্বতঃই অনেক স্থলে সন্দেহবাদী হইয়া পড়িয়াছেন! এই জন্য, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা আধ্যাত্মিকতার দিক্ দিয়া তাঁহার কবিতার স্থান উচ্চে নহে। তাঁহার কবিতা পাঠে সন্দেহ হয়,—তিনি Personal God মানিতেন না।

নৈরাশ্যবাদ।

নানা অনিত্য ও সংকীর্ণ ব্যাপার দেখিয়া জগতের উপর যখন অশ্রদ্ধা জন্মে তখন মানুষ এই বিশ্বাতীত, অপ্রত্যক্ষ, কোনও চৈতন্যময়, সর্ব্ব-শক্তিমান্ সত্তায় বিশ্বাস করিয়া, অন্তরে সান্ত্বনা ও শান্তি পায়। এই বিশ্বাসের প্রভাবেই লোকে সংসারের এত নিরাশা, এত অপূর্ণতা ও দুঃখ-দুর্গতি সত্ত্বেও, সম্পূর্ণরূপে অবসন্ন ও Pessimist হইয়া পড়ে না। কিন্তু, যাঁহারা জগতের উপরে বিরক্ত বা বীতশ্রদ্ধ, অথচ তর্কের দ্বারা অতীন্দ্রিয় এমন-কোনও নির্দ্দিষ্ট সত্তার অনুভব করিতে পারেন না—যাহা সর্ব্বশক্তিমান্, ন্যায়পরায়ণ, শিব-সুন্দর এবং সর্ব্বভূতে দয়াবান্,—অনিবার্য্যরূপেই তখন নৈরাশ্য বা Pessimism তাঁহাদের প্রাণে আসিয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলালেরও সেই অবস্থা। তাঁহার কবিতায় দেখা যায়—তিনি স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, দেব-দেবী সম্বন্ধে বস্তুতঃ

বড়-বেশি আস্থাবান্ ছিলেন না। ভাল-মন্দ যাহা-কিছু—তিনি প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়া দেখিতেন ; এবং প্রধানতঃ তিনি পুরুষকার ও নীতি মানিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি—কি কবিতায়, কি নাটকে, কি ব্যক্তিগত জীবনে—যুক্তি-তর্কের দিকেই তাঁহার মনের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল।

তাঁহার 'পরপারে'-নাটকের সেই এক ভবানীপ্রসাদ ছাড়া আর-কোন নাটকেই তিনি ভক্তির চিত্র অঙ্কিত করিয়া যান নাই। শেষ জীবনে তাঁহার মত অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল সত্য ; কিন্তু, এই আংশিক ও অস্পষ্ট আধ্যাত্মিকতায় যে তিনি কোন যুক্তি-তর্কের দ্বারা পৌঁছিয়াছিলেন, এমনও বলা যায় না। এই হেতু, নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল সন্দেহবাদী কর্ম্মীর চিত্রই বেশি অঙ্কিত করিয়াছেন। শক্তসিংহ, দারা ও চাণক্য এ কথার দৃষ্টান্তস্থল। চাণক্যের হৃদয়হীন, ভক্তিহীন পুরুষকার অবশেষে তাঁহার নিজের আত্মার কাছে নিজেই পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু তবু, সে সময়েও তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইলেন না ; অথচ, কি-যেন একটা কোমল ও মধুময় আকর্ষণে তাঁহার জীবনের গতি সহসা ফিরিয়া গেল। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতাতেও দেখা যায়—কি-যেন একটা অপার্থিব আকর্ষণ, আকাঙ্ক্ষা ও আশা তাঁহাকে আসিয়া বারংবার আঘাত করিতেছে, এবং তাহাদের নিকটে তিনি বিনত ও আত্মহারা হইয়া লুটাইয়াও পড়িতেছেন ;—কিন্তু, তাহার মূল কারণ যে কি তাহা তিনি নিশ্চিতরূপে ধরিতে বা বুঝিতে পারিতেছেন না। ঈশ্বরের উল্লেখ তাঁহার কবিতা ও নাটকের স্থানে-স্থানে থাকিলেও, তন্মধ্যে প্রকৃত ভক্তিবাদ নাই।

আধ্যাত্মিকতার অভাব।

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ঈশ্বর যেন কতকটা অপরিচিত, অজ্ঞাত বা অস্ফূট ; এবং সে অস্পষ্ট সত্তা প্রধানতঃ বিশ্বপ্রেমেই অভিব্যক্ত। ঈশ্বরের সহিত তাঁহার এই সম্পর্ক বৈষ্ণব কবিদিগের ন্যায় কান্তভাবে

বা হাফেজের ন্যায় প্রণয়িনীভাবে নহে ;—ঈশ্বরের সহিত তাঁহার রাজা-প্রজা ও পিতা-পুত্র সম্বন্ধ।

বলা বাহুল্য—ইহাও পাশ্চাত্য ভাব। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় ধর্ম্ম ও স্বর্গ—'পরহিত-ব্রত'! মরণ তাঁহার কাছে মধুর নহে,—আবার ভীষণও নহে। মৃত্যু তাঁহার কাছে কেবল একটা নিয়ম,—একটা রহস্য মাত্র!

দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার সহিত বিশেষভাবে এই অংশেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনার পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ('humanity') বিশ্ব-প্রেম কম, দ্বিজেন্দ্রলালে তাহা প্রচুর। আবার, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কোমল ভক্তিবাদ আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় তাহা নাই। এই জন্যই, আমরা বলি যে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ভাব-সম্পদে মৌলিক, তাহাতে রবিবাবুর প্রভাব নাই। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ভাষা ও ছন্দের পার্থক্য; এস্থানে দেখিলাম, ভাবেরও অনৈক্য। অবশ্য, অনেকস্থলে এরূপ হওয়া সম্ভব যে, কোন উপমা বা অনেক কথা উভয়ের কবিতায় একই রকমে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু, কথা বা উপমা তো কাহারও একার নিজস্ব সম্পত্তি নহে। এমন প্রায়ই দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক ভিন্ন-দেশবাসী কবিও একভাবেরই কবিতা লিখিয়াছেন। তবে, একথা অবশ্য স্বীকার করিতে-হইবে যে, বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের অধিকাংশ লেখকের ন্যায় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালও—কোন-কোন বিষয়ে অল্লাধিক পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের নিকটে ঋণী। শেলীর প্রভাবও কিয়ৎপরিমাণে বায়রণের উপরে পড়িয়া তাঁহার কবিতায় নূতন শক্তি দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাবের দিক্ দিয়া বৈষ্ণব কবি ও উপনিষদের প্রভাব বেশী; আর, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বিলাতী কবিদের প্রভাব বেশী।

এস্থলে আমি রবীন্দ্রনাথের কথাও উত্থাপন করিলাম; বোধ হয়

—ইহাকে কেহ অবান্তর বলিয়া ভাবিবেন না। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল—উভয়ে সমসাময়িক কবি। একের সমালোচনা করিবার সময়ে অপরের কথার উল্লেখ করা, অনেক কারণে অনিবার্য্য-রূপে আবশ্যক হইয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলালের মৌলিকতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে-গেলেও রবীন্দ্রনাথের কথা আংশিক উত্থাপন না করিয়া উপায় নাই।

সত্যনিষ্ঠ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের আদৌ আধ্যাত্মিকতার ভাণ ছিল না। এই ভক্তির অল্পতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সরলতারই পরিচায়ক। তিনি যাহা বুঝিয়াছেন, অকপটে তাহাই মাত্র লিখিয়াছেন। এমন অনেকে আছেন যাঁহারা কেবল প্রচলিত বিশ্বাসের অনুবর্ত্তন করেন, —নিজেদের কিছুমাত্র বিচার-ক্ষমতা নাই। ইহাঁদের মধ্যে অনেকের আদৌ হয়ত ঈশ্বর-প্রেমই নাই; কিন্তু, দিব্য ঐশ-প্রেমের ভাণ করিয়া, ইহাঁরা অনায়াসে, কল্পনা-বলে কবিতা রচনা করিয়া থাকেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কথায়, কার্য্যে লেখায় বা কল্পনায় এসব ভণ্ডামির বিন্দু-লেশও ছিল না।

স্নেহ, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, অনুকম্পা, দয়া প্রভৃতিতে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়-তন্ত্রী স্বতঃই মুহুর্ম্মুহু বাজিয়া উঠিয়াছে। যেখানেই কোনও মহদ্ভাবের পরিচয় পাইয়াছেন সেখানেই তাঁহার আত্মা সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে ও আনন্দে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছেন। একটা মহোচ্চ আদর্শের অপূর্ব্ব কল্পনা ও অনুভূতি দ্বিজেন্দ্রলালের মনে নিয়ত জাগরূক ছিল, কিন্তু, সেটা যে কি তাহা তিনি কখনও ঠিক নির্দ্দিষ্টরূপে ধরিতে পারেন নাই। তাঁহার 'সত্যযুগ' কবিতাটি পড়িলে দেখা যাইবে যে, একটা মহান্ আদর্শের অস্পষ্ট আভাস তিনি মনে-মনে অনুভব করিতেন।

সত্য, শিব, সুন্দর,—সেই 'সাক্ষাৎ মন্মথমন্মথ,' প্রেমময়, প্রাণারামই সকল কবিত্বের মূলাধার। সুতরাং, ভগবৎ-কবিতাই যে

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু, ভগবৎ-কবিতা না লিখিলেই একজনকে নিম্ন-স্তরের কবি বলিতে পারি না। কারণ, কবিতার কোনও নির্দ্দিষ্ট বিষয় নাই। দেখিতে হইবে যে, কবি যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহাকে তিনি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে পারিয়াছেন কিনা। তাহা পারিলেই সে কবিতা উচ্চাঙ্গের হইল। যদি কেহ ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কবিতা ভাল করিয়া না লিখিতে পারে, অথচ অপর আর একজন যদি বৃক্ষ সম্বন্ধেও একটা সুন্দর কবিতা লেখে তাহাহইলে সেই বৃক্ষ সম্বন্ধীয় কবিতাটিই প্রশংসনীয় হইবে। অর্থাৎ,—কবিতার বিচার বিশেষত্বও কবিত্ব লইয়া,—অনুভূতি বা ভাব-সঞ্চারণে;—বিষয় লইয়া নহে। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন যে কবিতাটি লিখিয়াছেন তাহাকে সরল সহৃদয়তার সহিত খুব স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার কবিতা জটিল কিংবা দুর্ব্বোধ নহে; —একটা সহজ ও সতেজ ভাবে তাঁহার সকল রচনা অনুপ্রাণিত।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় যে-একটু অস্পষ্ট ভাব—অর্দ্ধ-ব্যক্ত, অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন ভাব আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায় তাহা কম। অবশ্য এই-সব পাশ্চাত্য ধরণের কবিতার Suggestiveness'এই (ইঙ্গিতেই) মাধুরী; কিন্তু, অনেক স্থলে এই 'কি-যেন-কি' ভাবটা আবার আধুনিক বহু কবিতায় এত বেশী বাড়িয়া-উঠিয়াছে যে, তাহাতে অর্থবোধেরও সময়ে-সময়ে বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটে। রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন, যাহা প্রকাশের ভিতরে প্রকাশের অতীত তাহাকে প্রকাশ করিতে; এইজন্য, তাঁহার কবিতাও একটু অস্পষ্ট। কারণ, সে অনুভূতিকে বাহিরে বুঝাইতে হয়—'না বুঝার মধ্যে দিয়া, তাহাকে পাইতে হয়—'না-পাওয়া'র মধ্যে দিয়া। এক 'ত্রিবেণী'র কতিপয় কবিতা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলাল সে ভাবের কবিতা বড়-একটা লেখেন নাই।

ছন্দ ও ভাষার বিশেষত্বের কথা ছাড়িয়া-দিলে, বোধ হয়—এই

ভগবদ্ভক্তির অল্পতাহেতু, জাতীয় কবিতা ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের অন্য কবিতাগুলি এদেশবাসীর হৃদয় তেমন ভাবে স্পর্শ করিতে পারে নাই! ভগবদ্ভাব ভারতবাসীর অস্থি-মজ্জাগত। খুব সাধারণ ভাবে একটা ভগবৎ-কথা লিখিলেও এদেশবাসীর হৃদয়ে তাহা বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় স্পন্দন তোলে। দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতায় যাহা দিয়াছেন তাহা এদেশবাসীর পক্ষে নূতন। কিন্তু, এ নূতনত্বে তাহারা এখনও মুগ্ধ হয় নাই; কারণ, ইহা তাহাদের অপরিচিত, এবং প্রায়শঃ চিন্তা ও ধারণার বহির্ভূত।

দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তর্জ্জগতের কবি। তিনি দার্শনিক। তিনি বহিঃপ্রকৃতি অপেক্ষা অন্তঃপ্রকৃতিতেই অধিকতর অভিনিবিষ্ট। এই জন্য, পরিশেষে তাঁহার কবিত্ব নাটকের ভিতরে পরিণতি লাভ করিল। তিনি আকাশ-বাতাস, আলো-ছায়া অপেক্ষা সুখ-দুঃখ, স্নেহ-প্রীতি, ভক্তি-অনুকম্পা লইয়াই বেশি সংখ্যক কবিতা রচনা করিয়াছেন। ফলতঃ, অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনা করিতে যতটুকু বহিঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ প্রয়োজন ততটুকুই তিনি বর্ণনা করিতেন; এবং তাঁহার রচনায় বহিঃপ্রকৃতি সাধারণতঃ অন্তঃপ্রকৃতিকে ফুটাইয়া-তুলিবার একটা উপায় মাত্র। নাটকেও তিনি এই অন্তঃপ্রকৃতির সহিত পরিপূর্ণ মাত্রায় সহানুভূতি রাখিয়া বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতির ভিতরে সেই আনন্দময়ের খেলা দেখিয়া তিনি ভক্তি-পুলকিত হন নাই বা সেই অরূপকে রূপের মাঝে স্পর্শ করিয়া সার্থক হইয়া-ওঠেন নাই।—তিনি প্রকৃতির কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা নির্ণয় করিতে না পারিয়া, শুধু একটা রহস্য-মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি প্রকৃতিকেও যুক্তি দিয়া, তর্ক দিয়া, যেন তন্ন-তন্ন করিয়া বুঝিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু, মায়াময়ী প্রকৃতিকে তো কেহ কখনও এমন প্রশ্ন করিয়া কিছু বুঝিতে পারে নাই! দ্বিজেন্দ্রলালও তা' পারেন নাই; সুতরাং, অবশেষে স্বতঃই তাঁহার

প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণ।

মনে সন্দেহবাদ আসিয়া পড়িয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা প্রায়ই যাহা প্রত্যক্ষ—তাহাকে লইয়া, তাহাকে পরিস্ফুট করিয়াই তুষ্ট বা তৃপ্ত থাকিত। অতএব, দ্বিজেন্দ্রলাল Realistic কবি।

তিনি 'পাষাণী', 'তারাবাই', 'সোরাব রুস্তাম' ও 'সীতা' এই কয়খানি নাট্য-কাব্য লিখিয়াছেন। 'সীতা' মিত্রাক্ষর ও অন্যগুলি অমিত্রাক্ষর। তাঁহার অমিত্রাক্ষরছন্দ মাইকেলের মত গম্ভীর ও সতেজ নহে কিম্বা রবীন্দ্রনাথের মত ললিত-মধুরও নহে। ফলতঃ, অমিত্রাক্ষর ছন্দের নাটকে তিনি আদৌ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবু, তাহাতেও যে ভাষা ও ছন্দের অনায়াস-গতি এবং ভাব প্রকাশের একটা সহজ স্বাভাবিকতা নাই, এমত বলা অন্যায্য হইবে।

নাট্য-কাব্য।

তিনি 'সীতা' কাব্যে পৌরাণিক রাম চরিত্র, যুক্তিতর্কের দ্বারা যেরূপ বুঝিয়াছেন সেইভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। কোনস্থলেই তিনি অন্ধভাবে শুধু প্রচলিত সংস্কার বা মতের অনুবর্ত্তন করেন নাই। তিনি কাব্যে ও জীবনে সর্ব্বথা স্বাধীনতা-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার 'পাষাণী' নাটকে দেখিতে পাই—অহল্যা-চরিত্র এই প্রচলিত মতের প্রতিকূলে চিত্রিত হইয়াছে। 'মন্দ্র' কাব্যের ভূমিকায় পাঠক তাঁহার এ সম্পর্কীয় বক্তব্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। 'সোরাব-রুস্তম' অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীর যোগ্য হয় নাই ; কিন্তু, কাব্যহিসাবে 'সীতা' নাট্যখানি বস্তুতঃই বঙ্গসাহিত্যের একখণ্ড মহার্হ রত্নস্বরূপ।

দ্বিজেন্দ্রলাল 'একঘরে', 'বিরহ', 'কল্কী অবতার', 'বহুৎ আচ্ছা', 'পুনর্জ্জন্ম' প্রভৃতি কতকগুলি প্রহসন ও লালিকা লিখিয়াছেন, ইহাতে বিবিধ প্রকার সমাজ-চিত্র ও রসিকতা আছে। স্বর্গীয় দীনবন্ধু ও রসরাজ অমৃতলালের দু' একখানি প্রহসন ভিন্ন, দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রহসন

প্রহসন।

বঙ্গ-সাহিত্যে আর কে লিখিয়াছেন, জানি না। এই সকল গ্রন্থ সম্পূর্ণ সুরুচিপূর্ণ। সাহিত্যে কোনরূপ কুরুচির প্রশ্রয় দেওয়ার উপর চিরকাল তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রত্যেক পুস্তকের ভূমিকা লিখিতেন, এবং ভূমিকায় অক্ষম ও অযোগ্য সমালোচকগণের উপর তীব্র আক্রমণ থাকিত। অনেকে মনে করেন—এই ভূমিকাগুলি একটু ঔদ্ধত্য-প্রকাশক; ('কতকাংশে তাহা সত্যও বটে) কিন্তু, তৎকালে তাঁহার পক্ষে ঔদ্ধত্য না হৌক্, অন্ততঃ একটু কঠোরতার প্রয়োজন হইয়াছিল। অনেক নগণ্য ব্যক্তি না বুঝিয়া, এমন কি—পুস্তকটিও আগাগোড়া না পড়িয়া,—সমালোচনার ছলে, আক্রোশ করিয়া বহুবার তাঁহাকে অনর্থক গালাগালি দিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সাহিত্য-ভাণ্ডারের দুর্লভ সম্পৎ। যদি কবির অক্ষয় কীর্তির তেমন-কিছু থাকে তবে তাহা এই নাটক।

নাট্য-সাহিত্য।

বঙ্গের কোন রঙ্গালয় তাঁহার এসব নাটক অভিনয় করিবার মত উপযুক্ত অবস্থায় এখনও উপনীত হয় নাই। তদীয় শিক্ষাগুণে দু'একজন মাত্র অভিনেতা অবশ্য তাঁহার নাটকের কোন্-কোন জটিল চরিত্রের অভিনয় করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন; কিন্তু, সাধারণতঃ, হাততালি পাইবার জন্য বা ব্যবসার খাতিরে, অন্যান্য অভিনেতৃগণ নাট্যরসানভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের অমার্জিত রুচি অনুযায়ী অভিনয় করিতে-গিয়া, তদীয় চরিত্র-সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য যেন কতকটা নষ্টই করিয়া ফেলিয়াছেন, মনে হয়! এই জন্য, যাঁহারা কেবল রঙ্গমঞ্চেই তাঁহার নাটকের সহিত পরিচিত তাঁহারা তাঁহার নাটকের সৌন্দর্য্য ও অপূর্ব্বত্ব লক্ষ্য করিতে পারেন না।

কোন সাময়িক ভাব-স্রোতে ভাসমান হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লেখেন নাই; অথচ, বর্ত্তমান কাল যাহা চায় তাহা তাঁহার নাটকে

আছে। কেবল সাময়িক ভাবের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গ্রন্থ-রচনা করিলে সে গ্রন্থ স্থায়ী সাহিত্যরূপে গণ্য হইতে পারে না ; কারণ, যতদিন সাময়িক ভাবের সেই প্রবাহটুকুর অস্তিত্ব থাকে, শুধু ততদিনই ঐ গ্রন্থের সমাদর হইয়া থাকে।

তিনি কোন তত্ত্বকথা প্রচারের জন্য নাটক লিখেন নাই ; অথচ, অনেক তত্ত্ব সরল ও স্বাভাবিকভাবে তাঁহার নাটকে আপনা-আপনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে নাটক, নাটকমাত্র ; তাহা সংহিতা, ইতিহাস, পুরাণ বা দর্শন-শাস্ত্র নহে। যদি শাস্ত্র, পুরাণ, দর্শন বা ইতিহাস নাটকে থাকে তাহা গৌণভাবে। নাটকের নাটকত্বই একমাত্র লক্ষ্য।

তিনি ব্যবসার খাতিরে অথবা শুধু বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের যোগ্য করিয়া অভিনয়ের জন্যই নাটক রচনা করেন নাই। ব্যবসার খাতিরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রেরই পদস্খলন ঘটিয়াছে ; এবং অধুনা এই ব্যবসার খাতিরেই কতকগুলি নিম্ন-শ্রেণীর নাট্যকার নাট্য-জগতে নিতান্ত বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতেছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ভাষার মাধুর্য্য পদ-লালিত্য, চরিত্র বিশ্লেষণের নিপুণতা, দৃশ্যসমাবেশের কৌশল, ঘটনা-পরম্পরার দ্রুততা, সরস বিবৃতি, সঙ্গীতে নূতন ধরণের রাগরাগিণীর সন্নিবেশ, ঘটনাবলীর কেন্দ্রানুবর্ত্তিতা, রুচির বিশুদ্ধতা, উপাখ্যান ভাগের মৌলিকতা প্রভৃতি বহুগুণে নাট্য-জগতে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছে। এমন কি, এইসব গুণে বোধ হয়—তাঁহার কোন-কোন নাটক সর্ব্বদেশ ও কালের স্মরণীয় ও বরণীয় গণ্য হইবার যোগ্য।

তিনি নাটকে 'স্বগত' উক্তি বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুইজন অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া অভিনয় করিতেছে। তন্মধ্যে একজন উচ্চৈঃস্বরে গোপনীয় মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে, সমস্ত শ্রোতৃবর্গ শুনিতেছেন, কেবল পার্শ্ববর্ত্তী অভিনেতাটিই তাহা

শুনিতে-পাইতেছে না,—ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং হাস্যকর। দ্বিজেন্দ্রলাল অতি-চমৎকার কৌশলে এই 'স্বগত' উক্তি বাদ দিয়া, নাট্যোল্লেখিত ব্যক্তিবৃন্দের পরস্পরের কথা ও কর্ম্মের মধ্য দিয়া, অতি-সংক্ষেপে এবং বিশেষ নিপুণতার সহিত তাহাদের মনোভাব প্রকটিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই স্বগত-উক্তি বর্জ্জন-প্রয়াস সাহিত্যে একেবারে নূতন। এতদ্ব্যতীত, তাঁহার নাটক অনেক অভিনেতাকে 'অর্থপূর্ণ দৃষ্টি' নিক্ষেপ করিতে এবং 'অর্দ্ধ-স্বগত' কথা কহিতে শিখাইয়াছে।

নাটকেও দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য—ইহাতে বর্ণনাগুলি সমধিক প্রাসঙ্গিক ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে অবস্থাবিশেষে নানাজনের চিত্তে বিভিন্ন ভাবে অনুভূত হয়, ইহাতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; এবং ফলতঃ, তদ্দারা প্রকৃতি-দর্শন-জ্ঞান জন্মে।

তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি যথেষ্ট বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত লিখিত। কোনস্থানেই তিনি ইতিহাসকে অযথা বা সর্ব্বথা অতিক্রম করিয়া যান নাই। যেখানে ইতিহাসকার নীরব, মাত্র সেইখানেই তাঁহার মোহিনী কল্পনা সুদক্ষ স্বাধীনতার সহিত বর্ণপাত করিয়াছে। নাটক ইতিহাস নহে; কিন্তু, ঐতিহাসিক নাটক যে একেবারে ইতিহাস ছাড়াও নহে,—তিনি তৎসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

তিনি মানব-চরিত্রের সকল দিক্‌, সকল বৃত্তির ক্রিয়া দেখাইতে পটু ছিলেন। কোন-কোন স্থানে খুব সাধু চরিত্রের মধ্যেও দুই-একটি দুর্ব্বলতা দেখাইয়া, এবং অসাধু চরিত্রের ভিতরেও দুই-একটি মহত্ত্বের দিক্‌ দেখাইয়া, চরিত্রগুলিকে স্বাভাবিকত্বে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অনেক গুণরাশির ভিতরে কোথায় কোন্‌ পাপটুকু

লুক্কায়িত রহিয়াছে, পরবর্ত্তী ঘটনাপরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাতে তাহাই অবশেষে কিরূপ অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিণতি লাভ করিয়া, সর্ব্ববিধ অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দেয়,—তিনি তাহা অসাধারণ বিচক্ষণতার সহিত দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার, অনেক দোষের মধ্যে কোথায় একটু মহত্ত্বের বীজ গোপনে নিহিত আছে, অনুকূল আবেষ্টনের ফলে তাহা কিরূপে বাড়িয়া-উঠিয়া, মানুষকে ক্রমে দেবত্বে লইয়া-যায় তাহাও তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। মনিব-চরিত্রের যে সমস্ত গুণ বা দোষ সহজে অন্যের চক্ষে ধরা পড়ে না, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্পষ্টরূপে দেখাইতে পারিতেন। বলা বাহুল্য—এরূপ চরিত্রাঙ্কনে সমাজেরও প্রভূত উপকার দর্শে। অনেক সময়ে মানুষ—হৃদয়ের মধ্যে কোথায় একটু পাপ আছে, প্রথমে অনবধানবশতঃ তদুচ্ছেদ-সাধনকল্পে আদৌ কোন সতর্কতা অবলম্বন করে না; কিন্তু, অবশেষে দেখিতে পাই—ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনে, সেই ক্ষুদ্র অসৎ প্রবৃত্তির বীজই কালে বিষম বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া, তাহার জটিল শাখা-পল্লবে হৃদয়-দেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এই মানুষের ভিতরেই নিয়ত যে দেবাসুরের সংগ্রাম উপস্থিত হয় তাহা তিনি উজ্জ্বলবর্ণে দেখাইয়া-দিয়াছেন; এবং আশ্চর্য্য সাফল্যের সহিত এ সম্পর্কে তিনি মহাকবি সেক্সপীয়ারের অনুসরণ করিয়াছেন। অন্তর্বিরোধের বহির্বিক্ষেপ অপেক্ষা, পুটপাক-যন্ত্রমধ্যস্থ আচ্ছাদিত প্রদাহের মত, অন্তর্নিগূঢ়, তীব্র আক্ষেপ প্রদর্শনে সমধিক কৃতিত্ব। এইজন্য, বঙ্গীয় নাট্য-জগতে 'নুরজাহান', 'চাণক্য' ও 'ঔরংজেবের' চরিত্র-সৃষ্টি অতুল! আরও অনেক চরিত্রে তাঁহার এবংবিধ অসাধারণ শক্তির পরিচয় আছে বটে; কিন্তু, 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত,' 'নুরজাহান'—এই তিনখানি নাটকেই সেরূপ চরিত্রাঙ্কন বেশি।

তিনি দু'একটি দৃশ্যে অদ্ভুত মহত্ত্বের ছবি চিত্রিত করিতেন; যথা—সেকেন্দার, শেরখাঁ, সাহাবাজ প্রভৃতির চিত্র।

নাটকের হাস্যরসোদ্ভাবনের জন্য তিনি কখনও বিদূষক-চরিত্র (যেমন সচরাচর যাত্রায় অথবা নিম্নস্তরের নাটকে দেখা যায়) অঙ্কন করেন নাই। নিত্যকার স্বাভাবিক কথা ও ঘটনাবলীর মধ্যেই তিনি হাস্যরস জমাইয়া-তুলিতে চাহিয়াছেন। যেমন, বাচাল, পৃথ্বীসিংহ প্রভৃতি। কিন্তু, একথা আমি বলিতে বাধ্য, যে এ সকল হাস্য মোটেই তেমন জমিয়া-উঠে নাই।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকসমূহ তিনভাগে বিভক্ত। সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরানিক। প্রহসনগুলিকেও তাঁহার সামাজিক নাটকের অন্তর্গত ধরিয়া লইলাম। কারণ, তিনি প্রহসন লেখার ছলে সমাজ-সংস্কার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সমাজের কোন্ কোণে কোথায় কি গলদ্ রহিয়াছে, সূক্ষ্মরূপে, তন্ন-তন্ন করিয়া তিনি তাহা দেখাইয়াছেন; এবং শুধু দেখাইয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই,—সুকৌশলে সেসকল সংশোধনেরও উপায় নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন।

কবি নীতি-শাস্ত্রের মূল সূত্রের মত সংক্ষেপে কেবল তত্ত্ব-কথার উপদেশ দান করেন নাই। বহুকালের অভিজ্ঞতায়, এই স্থূল কথাটা এখন হয়ত অনেকে বুঝিয়াছেন যে, যাঁহারা দেশোদ্ধার বা সমাজ-সংস্কারের জন্য কটীবদ্ধ হইয়া চীৎকার করেন অথবা কেবল বৈঠকখানায় তাকিয়া 'ঠেসিয়া,' আলবোলার নল মুখে দিয়া দেশের দুরবস্থার জন্য দুঃখ ও আক্ষেপ প্রকাশ করেন তাঁহাদের অপেক্ষা সমাজসংস্কার ব্যাপারে কবি বা সাহিত্যিকের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বথাই ঢের-বেশি। একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, সংহিতাকার অপেক্ষা মহাভারত ও রামায়ণ রচয়িতার দ্বারা এ জগতের কম উপকার হয় নাই। কেবল নীরস, শুষ্ক উপদেশে তেমন কাজ হয় না, 'বাল্যশিক্ষা' নামক গ্রন্থে আমরা 'চোরকে সকলে ধিক্কার দেয়,' 'মিথ্যাকথা কহিও না,' প্রভৃতি অনেক উপদেশ

পাইয়াছি। কিন্তু, উপদেশকে যে পর্য্যন্ত দৃষ্টান্তদ্বারা জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ-রূপে না দেখান যায় ততক্ষণ উহা কেবল উপদেশ মাত্রেই পর্য্যবসিত থাকে, সহজে তাহা জীবনে পরিণত করার সুবিধা হয় না।

বাস্তব জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন না হইলেও, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, কবিদিগের এক-একটি ভিন্ন-ভিন্ন জগৎ আছে। কবির কল্পনা-লোক,—অর্থাৎ সেই বিচিত্র জগৎকে বাস্তবের মত ধরিয়া-লইতে, তাহাকে হৃদয়ে সম্যক্ গ্রহণ করিতে প্রচুর ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-শক্তির প্রয়োজন। সমালোচনার সময়ে এই স্থূল অথচ অতি-আবশ্যক বিষয়টি ভুলিয়া, কোন-কোন সমালোচক দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্বন্ধে অনেক স্থলে অবিচার করিয়াছেন। যখন যে পুস্তকখানির সমালোচনা হইবে, সমালোচ্য চরিত্রগুলির বিচার সেই পুস্তকের বর্ণনীয় অবস্থা ও ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়াই করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সূর্য্যমুখী' বা সেক্সপীয়ারের 'হ্যাম্‌লেট,' 'কিংলিয়ার' প্রভৃতি চরিত্র খুবই অসাধারণ সন্দেহ নাই ;—কারণ, সেরূপ চরিত্র সচরাচর সুলভ নহে ;—কিন্তু, অসাধারণ হইলেই তাহা অস্বাভাবিক হয় না। অনেকে কোন চরিত্র একটু নূতন বা অসাধারণ হইলে তাহাকে অমনই অসঙ্গত বা 'অস্বাভাবিক' বলিয়া বসেন। ইহা তাঁহাদের অত্যন্ত ভুল। সমাজের অবস্থা পুরাকালে একরূপ ছিল, বর্ত্তমানে অন্যরূপ, এবং ভবিষ্যতে আর-একরূপ হইবে। সমাজের অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু, তা' বলিয়া, মানুষের চিরন্তন চিত্তবৃত্তি কখনও আমূল রূপান্তরিত হয় না। চিত্ত-বৃত্তির ক্রিয়া দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে প্রযুক্ত হইলে তাহার ফল কিরূপ হয়, প্রথমতঃ তাহাই শান্ত ও ধীরভাবে চিন্তনীয়। যেমন—দয়া দয়াই থাকে, রূপান্তরিত হইয়া হিংসা-বৃত্তিতে পরিণত হয় না ; কিন্তু, দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে উহার ক্রিয়া আপাততঃ হয়ত কিছু ভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে।

আবার, এই দয়া মানুষের একটি সাধারণ বৃত্তি, ইহা মানুষের চিরদিন আছে ও থাকিবে; কিন্তু দধীচি বা হরিশ্চন্দ্রের মত দাতা একালে খুঁজিলে মিলিবে না। পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের অবস্থান্তর বিপর্য্যয়ে মানুষের সংস্কার পরিবর্ত্তিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নাটক লিখিতে হইবে, এবং সমালোচকেরও বিশেষ মনোযোগ সহকারে সেটুকু বুঝিয়া লইতে হইবে।. নতুবা, আধুনিক সমাজে পুরাতন আদর্শ, এবং পুরাতন সমাজে আধুনিক আদর্শ অঙ্কন করিতে-গেলে নাটক স্বতঃই 'অস্বাভাবিক' হইয়া পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকীয় আদর্শগুলি একালের ছাঁচে গঠিত। তাই, এই সকল চরিত্র বুঝিতে হইলে, একালের মধ্য দিয়াই তাহা বিচার্য্য।

জগতে 'ইহা হইতে পারে,' আর 'উহা হইতে পারে না,'— সহসা 'চট্' করিয়া এরূপ কথা বলা যায় না; এবং কি-কি হইতে পারে ও কি-কি হইতে পারে না তাহার একটা সুদীর্ঘ তালিকা দেওয়াও সম্ভবপর নহে। দেখিতে হইবে যে, নাট্য-বর্ণিত ঘটনার সমাবেশে বর্ণিত চরিত্রকে কোন্ ভাবে পরিচালিত ও পরিণত করিয়াছে, এবং সেই পরিচালন বা পরিণতি নাট্যোল্লিখিত অবস্থানুসারে সম্যক্ স্বাভাবিক হইল কিনা। নাটকীয় চরিত্রাঙ্কনের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভাবিকতা বুঝিবার এই একমাত্র উপায়। নতুবা, কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি ও দেশ-কালের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, অন্য জাতি ও দেশ কালের পক্ষে তাহা অস্বাভাবিক বোধ হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের অনেক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু, দুঃখের বিষয়—কোন সমালোচনাই ঠিক যুক্তিযুক্ত হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল 'বিলাত ফেরত্' তিনি বঙ্গীয় সমাজের সহিত তেমন ভাবে মিশিয়াছেন কিনা, প্রধানতঃ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন কিরূপ ছিল,—এইসব নানা ভাব লইয়া সমালোচনা

করিতে-গিয়া, সমালোচকগণ ভ্রান্ত সংস্কারবশে অনেকস্থলে বৃথা বাজে তর্ক করিয়াছেন। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। প্রহসনগুলির কথা বাদ দিলে, মুদ্রিত বা প্রকাশিত নাটকাবলীর মধ্যে 'পরপারে' নাটকই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ও শেষ সামাজিক নাটক *। এই নাটকের প্রধান চরিত্র 'দাদামহাশয়ে'র চিত্র অতিশয় অসাধারণ ; কিন্তু তথাপি ইহাকে আমরা 'অস্বাভাবিক' বলিয়া মনে করি না। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্‌সপীয়ারের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই তো অসাধারণ,—'হ্বামলেট,' 'কিংলীয়ার,' 'লেডি ম্যাকবেথ' 'মীরণ্ডা' প্রভৃতি কোন চরিত্রই পথে-ঘাটে সচরাচর আমাদের চক্ষে পড়ে না ;—কিন্তু, তা' বলিয়া সেগুলিকে 'অস্বাভাবিক' আখ্যা প্রদান করা কি সঙ্গত বা যুক্তিযুক্ত ?

নিষ্ঠুর নিয়তি আর অবকাশ দিল না ; নতুবা, দ্বিজেন্দ্রলালের দুর্ল্লভ প্রতিভা কালে যে তাঁহাকে সামাজিক নাট্য-সাহিত্যেও উচ্চাসন প্রদান করিতে পারিত তাহা, অল্পাধিক ত্রুটি-প্রমাদ সত্ত্বেও, এই 'পরপারে' পাঠ করিলেও, আমরা দ্বিধাহীন নিশ্চয়তার সহিত স্বীকার করিতে বাধ্য হই।

শেষ জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল—কি সামাজিক, কি ঐতিহাসিক, কি পৌরানিক—কোন নাটকেই কেবল আদর্শ চরিত্র-সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পান নাই। আদর্শ চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে সমালোচক ও নাট্যকারদিগের নানাবিধ মত আছে এ প্রবন্ধে তাহার যথাযোগ্য আলোচনা করিবার স্থান নাই। আদর্শ-চরিত্র সৃষ্টি করা অপেক্ষাকৃত সহজ ; এইজন্য, কেহ-কেহ যে নাটকে আদর্শ-সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষিত হয় তদপেক্ষা সাধারণ

আদর্শ চরিত্রাঙ্কন।

* এ প্রবন্ধ লিখিত হওয়ার বহুদিন পরে, অর্থাৎ—সুহৃত্তম লোকান্তরিত হওয়ার পরেও প্রায় একবৎসর অতীত হইলে, উল্লিখিত আর-একটি সামাজিক নাটক কবিবরের পুত্র শ্রীমান দিলীপকে আমি প্রকাশ করার জন্য দিয়াছিলাম ; এবং উহা যথাকালে 'বঙ্গনারী' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। বলা বহুল্য—'দেখিয়া-দেওয়ার জন্য আরও কয়েকটি রচনার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল উহাও আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন ; এবং তদবধিই উহা আমারই কাছে গচ্ছিত ছিল।—গ্রন্থকার।

মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণমূলক নাটককে উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। আদর্শ অঙ্কনের পদ্ধতিও দুই প্রকার। কেহ-কেহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ সৃষ্টি করেন; কেহ বা দোষগুণসমন্বিত মনুষ্য-চরিত্রেই কোন একটি বা দুইটি মাত্র উচ্চ প্রবৃত্তি বর্ণনীয় চরিত্রে ঘাত-প্রতিঘাতসঙ্কুল জীবনের জটিল গতির মধ্য দিয়া—কিরূপ ভাবে বিকশিত হইল, কেবল তাহাই দেখাইতে চাহেন। এই বিভিন্ন চরিত্র-সৃষ্টির তারতম্য বা তুলনা করিতে পারা যায় না। ইহার প্রত্যেকটিরই এক-এক হিসাবে সার্থকতা আছে।

কিন্তু, মরণশীল এই-সব অপূর্ণ মানুষ বস্তুতঃ কখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ হইতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ একমাত্র শ্রীভগবান্! সুতরাং, সাধারণ মানুষকে 'নিখুঁৎ' সুন্দর আদর্শরূপে চিত্রিত করিতে গেলে, স্বভাবতঃই উহা অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে। সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ মনুষ্যের অস্তিত্ব বুঝিবা আমাদের এই সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ কল্পনাতেও অসম্ভব। সাধারণতঃ দোষ গুণের মিশ্রণেই মানব-চরিত্র গঠিত;—দুই-চারিটা ভুলভ্রান্তি আছে বলিয়াই মানুষ, মানুষ। তবে কি না—এক-এক ব্যক্তি অবশ্য এক-এক বিষয়ে আদর্শস্থানীয় হইতে পারেন। যিনি স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ আদর্শকে ফুটাইরা-তুলিতে পারেন তিনিই যথার্থ উচ্চস্তরের কবি। দ্বিজেন্দ্রলালের এ ক্ষমতা প্রচুর ছিল। তিনি 'মেবার-পতনে' মহাবৎ খাঁর চরিত্রে আদর্শ কর্ত্তব্য-পরায়ণতা, 'প্রতাপসিংহে' আদর্শ স্বদেশ-ভক্তির দৃঢ়তা, 'হেলেন'-চরিত্রে আদর্শ প্রেম, আত্মত্যাগ, 'চন্দ্রকেতু'তে আদর্শ বন্ধু-প্রেম, 'কাশীমে' প্রভুভক্তি প্রভৃতি নানা ভাবের মধ্য দিয়া মনুষ্য-চরিত্রের নানা প্রকার মহত্ত্বের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

একমাত্র 'দুর্গাদাসে'র চরিত্রকে তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে-যাইয়া তাহাকে একটু-যেন অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন। এই দুর্গাদাস চরিত্রের কোথাও কোন স্খলন বা ত্রুটি দেখানো হয় নাই।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা বালুবেলা-মধ্যবাহী নদী-ধারাবৎ অনায়াসগামিনী ও স্ফটিক-স্বচ্ছ। তাঁহার ভাষা আনন্দে উচ্ছ্বসিত, বেদনায় বিকম্পিত, আবেগে আন্দোলিত। একটা সতেজ, সরল ভাবের অনুপ্রাণনা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কোন-কোন স্থানে তাঁহার ভাষা শুনিতে একটু যেন ইংরাজি 'তর্জ্জমা'র মত; কিন্তু, এ অভিনব ভাষা নাট্য-সাহিত্যের পক্ষে অনেক সময়ে অত্যন্ত উপযোগী। ভাষার এই বাঁধুনির নূতনত্বে তাঁহার নাটক অভিনয়ের পক্ষেও খুব সুবিধাকর হইয়াছে। গ্রাম্যতা বা প্রাদেশিকতা বর্জ্জন পূর্ব্বক, অনেক স্থলেই তিনি প্রচলিত কথা-বার্ত্তার ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—ভাব-প্রকাশের উপযোগী যেখানে খাঁটি বাঙ্গালা পাওয়া-যায় সেখানে অকারণ দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ-প্রয়োগের আদৌ আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃ, তাঁহার ভাষা যেমন মার্জ্জিত, প্রাঞ্জল ও মধুর তেমনই সরল, শোভন ও সতেজ।

ভাষা।

কিন্তু, দ্বিজেন্দ্রলাল অজ্ঞ-বিজ্ঞ এবং স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতির মুখে ভাষার বিভিন্নতা রক্ষা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। অনেক স্থলে তিনি নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তির মুখ দিয়াও সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। নাট্য-সম্রাট্ দীনবন্ধু মিত্র ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখায় এই বিশেষত্ব আছে।

তাঁহার উপমা-প্রয়োগ বঙ্গসাহিত্যে অভিনব ও অতুল। কিন্তু, স্থানে-স্থানে অনাবশ্যক উপমাপ্রাচুর্য্যে রচনা ভারাবনত হইয়া পড়িয়াছে। অল্প কথায় রাশি-রাশি ভাব প্রকাশ করিতে দ্বিজেন্দ্রলাল অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার উপমা প্রত্যক্ষ অর্থের দ্বারা যতটা ভাব ব্যক্ত করে তদপেক্ষা অনেক বেশি ভাব কল্পনায় জাগাইয়া তোলে।

উপমা

কোনমতে, সংক্ষেপে কর্ত্তব্য পালন করিতে-গিয়া, এ প্রবন্ধে

আমাদের বহু বক্তব্যই অব্যক্ত থাকিতে লেখনী বন্ধ করিতে-হইল।

দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের ভিতরে জ্যোৎস্নার মত মৃদুল আবেশে আসেন নাই; তিনি আসিয়াছিলেন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায়,—সেই উজ্জ্বল, দীপ্ত, জ্বালাময় প্রতাপে! দ্বিজেন্দ্রলাল

উপসংহার

বসন্তের পিকের মত আবেশবশে, ললিত উচ্ছ্বাসে কুঞ্জবনে গীত গান নাই; তিনি গাহিয়াছেন পাপিয়ার মত প্রবল, গম্ভীর, উদাস স্বরে,—ঐ উন্মুক্ত, উদার নীলাকাশে! দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষা যেন বর্ষার আকাশের মত,—তাহাতে গর্জ্জন আছে, বিদ্যুৎ আছে, বর্ষণ আছে; তাঁহার ভাব-সম্ভার হিমাচলের ন্যায়,—তাহাতে গাম্ভীর্য্য আছে, সৌন্দর্য্য আছে, মহিমা আছে, বন্ধুরতাও আছে; এবং তাঁহার কবিত্ব পাথরের মত—তাহাতে তরঙ্গ আছে, আলো আছে, ছায়া আছে, এবং অসীমতায় তাহা দুলিয়া-দুলিয়া এক-একবার কাঁপিয়া ওঠে!

এতক্ষণে আমরা তাঁহার কাব্য ও নাটকের অতি-তুচ্ছ, সামান্য একটু আভাস মাত্র প্রদান করিলাম। এক-একটি কুসুম ছিঁড়িয়া যেমন উদ্যানের সৌন্দর্য্য দেখান যায় না, এক-একখানি প্রস্তর আনিয়া যেমন 'তাজে'র মহিমা প্রদর্শিত হয় না তেমনই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার যথোচিত পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। সম্যক্‌রূপে রসাস্বাদন করিতে-হইলে তাঁহার কাব্য ও নাটক একাগ্র ও নিবিষ্ট মনে পড়িতে-হইবে, এবং পড়িয়া তাহার যথাযোগ্য আলোচনা করিতে হইবে।

আজ বঙ্গসাহিত্যে দিজেন্দ্রলালের স্থান-নির্দ্দেশ করিবার সময় আসিয়াছে! সহৃদয় বিদ্বন্মণ্ডলী, আশা করি—আমাদের জাতীয় গৌরব দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে আর অকারণ নীরব রহিয়া আত্মবঞ্চিত হইবেন না।

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট

১

স্মরণ

প্রিয়তমেষু—

বন্ধু, অনেকদিন হয় তুমি আমার নিকট দ্বিজেন্দ্র-কথা জানিতে চাহিয়াছেলে, অদ্য আবার তোমার তাড়া খাইয়া, আদেশ লঙ্ঘনের আর সাহস হইল না। এতদিন পরে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রসঙ্গ তুলিয়াছ,—সে সময়ের কত ভাব, কত কথা, কত ঘটনা স্মৃতির উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তখন তাহা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করি নাই;—আজ কি তাহা আখরের নাগপাশে বাঁধিয়া আনিতে পারিব? সে সময়ে লোকটাকে নিয়া এতই মাতিয়াছিলাম যে তাঁহার অপূর্ব্ব জীবনটিকে শুধু সম্ভোগ করিয়াই তৃপ্তি মানিয়াছি, সমালোচনার অবসর পাই নাই। শুধু দ্বিজেন্দ্র-ভক্তগণের নয়, বঙ্গ-সাহিত্যের সৌভাগ্য যে, তোমার ন্যায় একজন বড় কবি ও লেখক আজ সোদরাধিক স্নেহ-যত্নে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনচরিত রচনায় অগ্রসর।

দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত তোমার প্রথম পরিচয় আমিই করাইয়া দিই। আজ সে কথা সানন্দে স্মরণ করিতেছি। মনে পড়ে কি, এক দিন তুমি, তোমার মাতুল-পুত্র বন্ধুবর ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি,—এই তিন জনে বসিয়া তোমার বাড়িতে সাহিত্যালোচনা করিতেছিলাম; তুমি রবীন্দ্র-গুণাবলীর অভিনন্দন করিতেছিলে; আমি দ্বিজেন্দ্রের কথা পড়িলাল? বলিলাম আলাপ করবে? তুমি উত্তর দিয়াছিলে—"শুনেছি তিনি নাস্তিক।" আমি বলিলাম—একবার আলাপ হইলে আর ছাড়িতে পারিবে না। তুমি পরিচয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে। মহৎসঙ্গের জন্য মহতের এমনি আগ্রহ হইয়া থাকে। কবে তোমাকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিলাম, সে দিনক্ষণ মনে নাই। কিছুদিন পরে জানিতে পারিলাম, তুমি দ্বিজেন্দ্রকে আমা অপেক্ষাও ভালবাসিয়া ফেলিয়াছ; তিনিও তোমার প্রতি বেশ অনুরক্ত—আসক্তই হইয়া পড়িয়াছেন।

আমারও কবে কি সূত্রে তাঁহার সহিত প্রথম আলাপ হয়, মনে পড়ে না। শুধু মনে আছে, অনেকদিন পর একটি আদত মানুষের দেখা পাইয়াছিলাম। একটা সজীব প্রাণ;—দেখিবা মাত্রই মজিয়াছিলাম। দ্বিজেন্দ্রের আকর্ষণী-শক্তি অসামান্য ছিল। নিজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে সংবরণ করিয়া, শিশুর ন্যায় অনাবৃত হইয়া এমন করিয়া মিশিবার শক্তি কয়জন লোকবিশ্রুত সাহিত্যিকের আছে জানি না।

দ্বিজেন্দ্রের অসাধারণত্বে অহমিকার লেশ ছিল না। ছিল—প্রেমময় ঔদার্য্যের স্নিগ্ধ ধারা। আমি তাহাতে অবগাহন করিয়া ধন্য হইয়াছি! দ্বিজেন্দ্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ সব স্মৃতিই আমার নিকট চন্দ্রিকার মত মিষ্ট। তাঁর গান মধুর, গল্প মধুর, হাস্য মধুর, রঙ্গ-ব্যাঙ্গ সবই মধুর!

তর্ক করিবার তাঁর একটী প্রবল ঝোঁক ছিল। ঝোঁক বলিলে অন্যায় হয়, উহা বহু তত্ত্ব ও তথ্যের আকর। যে দিন তাঁর ওখানে যাইতাম, কিছু না কিছু নূতন শিখিয়া আসিতাম। তিনি উপদেষ্টার আসনে বসিয়া বক্তৃতা দিতে ভালবাসিতেন না। কর্মঠের ন্যায় আত্ম-সঙ্কোচ করিয়া অন্যের নিকট এমন ছোট বনিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। দ্বিজেন্দ্রের একদিনের তর্ক আমার মনে পড়ে। তখন তিনি ঘোরতর জড়বাদী। এ বিশ্বজগৎ নৈসর্গিক সৃজন বলিয়া তর্ক ঘুড়িলেন। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত সে ঢেউ চলিল। তর্ক-যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে আক্রমণের এমন সুযোগ দিত, অতি কম লোকেই তাঁহার মত পারে, দ্বিজেন্দ্র হাসিতে হাসিতে তর্ক শেষ করিলেন, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তার আবশ্যকতা স্বীকার করিতে রাজি হইলেন না। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় তাঁর মুখে এইসব কথা শুনিয়াও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার কোন হ্রাস হইত না। এমন প্রেমময় কবি-হৃদয়, এমন বিবেক-দীপ্ত চরিত্র কয়দিন বিশ্বপতিকে ছাড়িয়া বিশ্ব দেখিতে পারে? ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয় হইতে নৈরাশ্যবাদের কুজ্ ঝটিকা অন্তর্হিত হইতেছিল; অল্পে অল্পে তিনি আস্তিক হইতেছিলেন। জীবনের সন্ধ্যায় তিনি ভক্তের পদবীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। অথচ উহা জাহির করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ ছিল না।

এইখানেই দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষত্ব। দ্বিজেন্দ্রলালের তুলনা শুধু দ্বিজেন্দ্রলাল! এই সময় আমি তাঁহার নিকট ঘন ঘন যাতায়াত করিতাম,

তিনিও প্রায়ই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। আমার পরিষ্কার মনে আছে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার এমন একটা প্রবল ঔৎসুক্য জন্মিত, যাহাকে নেশা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুধু এ নেশার অবসাদ ছিল না। তাঁহার সহিত সুদীর্ঘ মিলনেও বিরক্তি বা শ্রান্তি আসিত না, বরং ছাড়িতে ক্লেশ হইত। আজিও দ্বিজেন্দ্রের যে কয়জন বন্ধু আছেন, সকলেই অকপট ও তাঁর প্রতি সমানভাবে অনুরক্ত। এমন সৌভাগ্য কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ?

নিন্দা কাহারও মুখরোচক নয়, ইহা স্বাভাবিক। দ্বিজেন্দ্র অস্বাভাবিক ছিলেন না, কিন্তু তিনি নিন্দুককে বন্ধুবৎ কোল দিতে জানিতেন। এইজন্য উপহাস করিতে গিয়া, অনেকে দ্বিজেন্দ্রের উপাসক হইয়া ফিরিয়াছে। তাঁহার রচনাকে আক্রমণ করিলে, তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইতেন না। সসম্ভ্রমে বিরূপ সমালোচকের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। এ ক্ষেত্রে ছোট-বড়-মাঝারী ভেদ তাঁহার ছিল না। এই স্থানে সেই অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী কবি-নাট্যকারের রচনার বিশেষত্ব আমার যা চোখে পড়িয়াছে তার একটি সরল-রেখা মাত্র টানিয়াই শেষ করিব।

দ্বিজেন্দ্রের রচনা বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট। সে বলের মধ্যে পালোয়ানের প্যাঁচ-খেলা না আছে তা নয়, কিন্তু সেগুলি এতই সজীব, এতই সহজ, যে তা, পাঠকের নিকট একটি অবলীলাগতি প্রস্রবণের ন্যায়,—তেজে জল্-জল্ মাধুর্য্যে ঢল-ঢল! দ্বিজেন্দ্রের রচনাবলীতে প্রেমের উচ্ছ্বাস ও কঠোর বিবেকবাদ যেন গলাগলি ধরিয়া চলিয়াছে। তাঁহার রচনায় আর একটি প্রধান বিশেষত্ব, তিনি রিপুর উত্তেজক মিষ্ট বিষ লেখনীমুখে সঞ্চারিত করিয়া দিবার প্রলোভনে কখনও পড়েন নাই। কল্পনার এই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি লোকালয়ে গিয়া প্রকৃত জীবন-গঠনে কতটা আসক্তি ছড়াইয়া দিতে পারে তাহা তিনি জানিতেন। তাঁহার সত্যানুরাগ সাহিত্যে যুধিষ্ঠিরের মত ভাল মানুষ হইয়া পাঠককে দেখা দেয় না; মিথ্যার প্রতি বিরাগও ইন্দ্রজিতের মত লুকাইয়া বাণ মারে না। বঙ্গসাহিত্যে মহারথগণ মধ্যে তিনি যেন মধ্যম পাণ্ডব!—স্বাধীনতার গৈরিক প্রস্রবণ, সম্মুখ সংগ্রামে অদ্বিতীয়! আমার 'গান' পুস্তক যখন দ্বিজেন্দ্রলালের নামে উৎসর্গীকৃত হয়, তখন তিনি বঙ্গসাহিত্যে হাসির গানের জন্যই বিশেষ

ভাবে পরিচিত। উৎসর্গ-পত্রে আমি লিখিয়াছিলাম,—"আপনি শুধু হাসির কবি নহেন,—গভীর রচনায়ও আপনি সুদক্ষ"। দ্বিজেন্দ্র উহা পড়িয়া আমায় বলিয়াছিলেন;—"এ কি ব্যঙ্গ ?" আমি উত্তর দিয়াছিলাম আমার যা' ধারণা তাহাই লিখিয়াছি; এজন্য আপনার সহিত পরামর্শ করার অপেক্ষা করি নাই। আজ রঙ্গ-রচনাকে ছাপাইয়া দ্বিজেন্দ্রলালের গভীর রচনাই বঙ্গসাহিত্যে এক নূতন জোয়ার আনিয়াছে।

খোলা-ভোলা সরল মানুষেরা কাপট্য সহ্য করিতে পারে না। এই জন্য বয়স্ক দ্বিজেন্দ্রকে আমরা অনেক সময়ে অসহিষ্ণু দেখিতে পাই। এ যদি দোষ হয়, তবে এ দোষের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। দ্বিজেন্দ্রের সরল স্বভাব কাপট্যের শিরে ভীমের গদার মত সোজা, সরল আসিয়া পড়িত। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত বিনয় দাম্ভিকের আত্মম্ভরিতায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত। এই সব সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালকে আমরা আর এক মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। কিন্তু যখনই মনে হয়; কেবল সত্যকে প্রতিষ্ঠাই তাঁর উদ্দেশ্য, তখন তাঁহার অসংযমের প্রতিও কেমন একটা মমতা আসিয়া উপস্থিত হয়।

মধ্যে অনেকদিন দ্বিজেন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। এমন কি পত্র-ব্যবহার পর্যন্ত বন্ধ ছিল। কাল বুঝি দুজনকে একটু দূরেই নিয়া ফেলিয়াছিল। হঠাৎ ঘুঘুডাঙ্গায় তাঁর সঙ্গে দেখা। সেদিন সুরেনবাবুর বাগানবাটীতে অক্ষয়বাবুর সম্বর্দ্ধনার উৎসব। আমি দূরে বসিয়াছিলাম; দ্বিজেন্দ্র কাছে ডাকিয়া লইলেন। হাতে হাত মিলিল। নিমিষে নীরবে কতভাবের উদয়-বিলয় হইয়া গেল, তা শুধু আমি জানি, আর তিনি জানেন। তিনি কথা কহিলেন;—গাঢ় কণ্ঠ—"আপনার আর দেখাই নাই।" তখনও অভিমান কাটে নাই। আমিও সেই সুরে বলিলাম—"সে উভয়তঃ"। কেহ যেন না মনে করেন; দ্বিজেন্দ্রের সহিত আমার মনান্তর ঘটিয়াছিল। তাঁহার সহিত কখনও আমার সামান্য মনো-মালিন্যও ঘটে নাই। এ ত বিদ্বেষের বিচ্ছেদ নয় ;—এ অহেতুকী অভিমানের ব্যবধান! লোকের ভিড়ে ও উত্তেজনায় তিনি অসুস্থ বোধ করিতেছিলেন; বিদায়ের বেলা আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"ভারতবর্ষের জন্য কবিতা চাই।" আমি রঙ্গভরে বলিলাম—"যো হুকুম।" তারপর সজলনেত্রে যতক্ষণ দেখা গেল, তাঁহাকে দেখিলাম; তাঁহার বিহনে সেই বিশাল সভা যেন

জনশূন্য মনে হইল। কে জানিত তাহার সঙ্গে সেই মিলনই চিরবিচ্ছেদের মুখবন্ধ। দ্বিজেন্দ্র সম্বন্ধে আর যদি কিছু জানিতে চাও, প্রশ্ন করিও; এলোমেলো স্মৃতি হইতে গুছাইয়া উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। লেখক দ্বিজেন্দ্র বড়; না মানুষ দ্বিজেন্দ্র বড়;—আমাদের উত্তর পুরুষগণ যদি তাহার সহজ মীমাংসা করিবার সুবিধা পান তজ্জন্য এই সামান্য স্মরণ-চিহ্ন সেই পরলোকগত মহাত্মার প্রীতি-তর্পণের উদ্দেশ্যে, তাঁর অনুজাধিক প্রিয় জীবন-চরিতকারকে পাঠাইয়া আজি তৃপ্তিলাভ করিলাম।

৩৫।২, বীডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা
২৩শে মাঘ, ১৩৭২ শাল।

তোমারই—
শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

২

গীতিস্মরকার দ্বিজেন্দ্রলাল

(স্মৃতিচারিণী)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আমাদের যুগে বহু কবি ও গুণী পিতৃদেবের কবিতার ও গানের উচ্ছ্বসিত গুণগান করলেও ইদানীন্তনদের মধ্যে সে-উচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়েছে। আমি অবশ্য একথা জানি যে, রুচির টেম্পারেচার অনেক ওঠানামা ক'রে তবে দাঁড়ায় যেখানে সে হয়ে ওঠে স্থায়ী তথা অচ্যুত। কীট্‌সের বিখ্যাত কবিতা Hyperion-কে তদানীন্তন উন্নাসিকেরা এমন কশাঘাত করেছিলেন যে, রোগদুর্বল কীট্‌সের অকালমৃত্যু হয় সে জন্যে। শেলি তাঁর বিখ্যাত Adonais কবিতায় এ নিন্দকদের পাল্‌টা কশাঘাত করেছিলেন "Obsceme ravens clamorous o'er the dead" ব'লে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কীট্‌সের তর্পণ করেছিলেন গেয়ে :

"The one remains, the many change
and pass,
Heaven's light forever shines,
earth's shadows fly."

অর্থাৎ

একেশ্বর চিরঞ্জীবী, অসংখ্যেরা ক্ষণলীয়মান,
স্বর্গপ্রভা অমরণী, মর্ত্যছায়া উধাও চঞ্চলা।

উন্নাসিক ক্রিটিকেরা তবু মানেন নি, বলেছিলেন, কীট্‌স ব্যর্থ সাহিত্যিক, অকবি। কিন্তু অজহুরীরা জহরকে মেকি বললে হবে কি, তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই কীট্‌স ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবিদের প্রাপ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য পেয়েছিলেন কাব্যরসিকদের সৎসঙ্গে। ব্লেকের সম্বন্ধেও ঐ কথা। তাঁর মৃত্যুর একশো বৎসর পরে তবে তিনি প্রথম শ্রেণীর কবি ব'লে মান পেয়েছিলেন। কে না জানে ?

দৃষ্টান্ত-বাহুল্য অনাবশ্যক, কারণ, একথা আজ সর্ব-স্বীকৃত যে, মহৎ সৃষ্টি সব সময়ে না হ'লেও অনেক সময়েই মহৎ ব'লে মান পায় না তখনি তখনি। চিরন্তন মহিমাকে কষতে হয় কালের নিকষে, উপায় নেই। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভা তাঁর মৃত্যুর পরে অনাদৃত হওয়ার জন্যে আমার ব্যক্তিগত ভাবে দুঃখ হ'লেও, আমার মধ্যে যে-কবি গুণী সাহিত্যিক ও সমালোচক আছে সে মানে বৈকি বেনেদেত্তো ক্রোচের কথা যে "জগতে যদি অসম্ভব ব'লে কিছু থাকে তবে সে এই যে প্রতিভাধর যথাকালেও সর্ববরেণ্য হ'ল না।" আমি যে মনে মনে নিশ্চিত জানি যে ইদানীন্তন অনেকে দ্বিজেন্দ্রলালের গানে সুরে ও কাব্যে যদি সাড়া নাও দেন তবে তাতে তাঁর দীপ্ত কবি-প্রতিভার বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না—যথাকালে তিনি তাঁর কবি-বৃত্তির প্রাপ্য প্রণামী পাবেনই পাবেন।

এ-বিশ্বাসকে কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন—পুত্রের পিতার প্রতি পক্ষপাত, কাজেই ক্ষমনীয়। বললে আমি রাগ করব না, কারণ আমি স্বীকার করি আমার পক্ষে এ পক্ষপাত থাকাই স্বাভাবিক। কেবল আমি একটি অভিযোগের সম্পর্কে "গিল্টি প্লীড" করতে নারাজ যে, এ পক্ষপাতের স্বপক্ষে বলবার কিছুই নেই। সবচেয়ে বড় বলবার কথা আমার এই যে, আমি তাঁকে দেখেছি দিনের পর দিন তেমনি অনায়াসে অপূর্ব কবিত্বময় গান বাঁধতে—যেমন অনায়াসে পাখী ওড়ে আকাশে, ফুল ফোটে কুঁড়িতে, মেঘে জাগে বিদ্যুৎ। ভাবুন—সে-যুগে মাত্র বারো বৎসর বয়সে তিনি বেঁধেছিলেন শুধু এই সুন্দর গানটি নয় (সমস্ত গানটি আর্যগাথা প্রথম ভাগে দ্রষ্টব্য)

গগনভূষণ তুমি জনগণমনোহারী।
কোথা যাও নিশানাথ হে নীলনভোবিহারী!

সেই সঙ্গে সুর দিয়ে এমন চমৎকার গেয়েছিলেন যে, আড়াল থেকে শুনে তাঁর বিখ্যাত ওস্তাদ পিতা চমৎকৃত হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি বড় কবি ও গুণী হবেন। আর শুধু শৈশবে কবিতা লেখাই নয়, তাঁর মহাপ্রয়াণের আগের দিনেও (২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০) তিনি বেঁধেছিলেন তাঁর শেষ দু'টি অবিস্মরণীয় গান: "ভারত আমার" ও "যেদিন সুনীল জলধি হইতে।" তাই ত সব বুঝেও আমার মন ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে যখন দেখি যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই এখনও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর কবির ক্ষণায়ু কৃতিত্ব নিয়ে মেতে ওঠেন, অথচ

দ্বিজেন্দ্রলালের মতন প্রথম শ্রেণীর কবি ও গীতিস্বরকারকে হাসির গানের কবি বা চারণ কবি নাম দিয়ে মনে করেন যথেষ্ট তর্পণ হ'ল।

কিন্তু কবি নিজে জানতেন যে, তিনি স্বধর্মে সব আগে কবি এবং অবিস্মরণীয় কবি। স্মৃতিচারণের প্রথম খণ্ডে ২৫ পৃষ্ঠায় আমি তাঁর একটি ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করেছি—যেটি তিনি খুব জোর দিয়েই বলতেন। আমি সেসময়ে ওস্তাদী গানের গোঁড়া হয়ে উঠেছিলাম। তিনি সস্নেহ হেসে বলতেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে (২৪ পৃষ্ঠা): বাঙালী হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীত শিখবে বাংলা গানকেই বড় করতে—হিন্দুস্থানী ওস্তাদ বনতে নয়। কারণ বাঙালী হ'ল স্বভাবে কবি, স্রষ্টা ও ভাবপ্রবণ—কালোয়াতিকুশল নয়। আমি তার্কিক ভঙ্গিতে বলতাম: "কেন বাবা? স্বরেন মামা?" (বিখ্যাত খেয়ালী।—আমার পিতামহ কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ও ছিলেন ধুরন্ধর খেয়ালী মনে রাখবেন!) তিনি হেসে বলতেন: "তিনি যত বড় গাইয়েই হোন্ না কেন রে, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই লোকে তাঁকে ভুলে যাবে—দেখে নিস্।" আমি রোখালো স্বরে বলতাম: "সে ত সবাইকেই যাবে।" তাতে তিনি আরো একগাল হেসে বলতেন: "না রে না, আমাকে কি রবিবাবুকে ভুলে যাবে না। আর কেন যাবে না জানিস্? —এই জন্যে যে, আমরা রেখে যাচ্ছি যা বাঙালীর প্রাণের জিনিষ—স্বরে বাঁধা গান। আমি যে কী সব গান বেঁধে গেলাম সেদিন তুইও বুঝবিই বুঝবি।"

এ শুধু তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী নয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও উঠতে-বসতে বলতেন যে, তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—তাঁর গান। একথা আজ বোধহয় কেউই অস্বীকার করবেন না যে, অন্ততঃ আমাদের দেশ সব আগে গানেরই দেশ, আর কোন দেশের মাটিকেই গানের গঙ্গা এমন উর্বর করে নি। "অন্ততঃ আমাদের দেশ" বলছি এইজন্যে যে, য়ুরোপে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক তাঁরাই যাঁরা মহাকবি—যথা হোমর, শেক্সপীয়র, দান্তে, গেটে…ইত্যাদি। জার্মানিতে শূবর্ট-স্যুমান-ব্রাহ্ম-প্রমুখ, ইতালিতে স্কার্লাত্তি-লিও-কালদারা-প্রমুখ বা ইংলণ্ডে সালিভান-প্যারি-স্ট্যানফোর্ড প্রমুখ কতিপয় গীতিস্বরকার প্রতিষ্ঠা পেলেও তাঁদের গানের সঙ্গে শেক্সপীয়র দান্তে বা গেটের কাব্যমহিমার তুলনাই হয় না, কিন্তু বাংলা দেশের মাটিতে এখনও সব আগে ফসল ফলে গানের। পথ চলতে ঘাসের ফুলের মতনই আমাদের মাটিতে ফলে গীতিস্বরকারের ফসল: বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস,

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, শশিশেখর, জয়দেব-বর্গীয় বহু সাধক বৈষ্ণব কবির পদাবলী শুনে আজও আমাদের বুকে অশ্রুসাগর দুলে ওঠে। অজস্র লোকসঙ্গীত আজও আমাদের গ্রামে ঘরে ঘরে ঝংকৃত। রামপ্রসাদী, শ্যামাসঙ্গীত, সারি, ভাটিয়ালি, আউল-বাউলের রকমারি সুরেলা গান শুনে আজও মুগ্ধ হয় আমাদের গুণী ভক্ত কবি। সর্বোপরি এযুগেও আমাদের সর্বসাধারণের বুকে দোলা দিয়েছে কোন্ জাতের কবি ? না, গীতিস্বরকার রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত। না, একথা বললে কোন কবির কাব্যমহিমাকেই ক্ষুণ্ণ করা হয় না, হ'তে পারে না, কারণ বলেছি—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এজাহারে—যে, কাব্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশে বাক্-এর ঝংকৃত মুহূর্তের পরিচয় মেলে এক সুরের সঙ্গে বাণীর মিলন-বাসরে, তাই দ্বিজেন্দ্রলাল বা রবীন্দ্রনাথ সব আগে গীতিস্বরকার এ অঙ্গীকার করলে তাঁদের বহুমুখী বিচিত্র প্রতিভার অমর্যাদা করা হয় না। ইংরাজীতে বলে : "let first things come first." নাট্য-সাহিত্য, কথা-সাহিত্য, দর্শনসাহিত্য, প্রবন্ধ-সাহিত্য—এই সবই আদরণীয় বৈকি, কিন্তু "গানাৎ পরতরং নহি" এ বাণী শুধু আপ্তবাক্যের নজিরে নয়, আমাদের হৃদয়ের সাড়ার নজিরে অঙ্গীকৃত হয়ে এসেছে আবহমানকাল। রামায়ণ এককালে গীত হ'ত। মহাভারতের শ্রেষ্ঠ জীবনবেদের নাম "গীতা"। শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্র মন্দিরে মন্দিরে গাওয়া হয় আজো। মীরা, কবীর, দাদু, তুলসীদাস, রবিদাস, নামদেব, তুকারাম—আরো কত মরমিয়া তথা সাধক কবিরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁদের ভজন ও "অভঙ্গ"র প্রসাদেই। তুলসীদাসের রামচরিতমানস উত্তরভারতের পার্বণসঙ্গীত, গুরু নানকের গুরুগ্রন্থ ভারতের নানা প্রদেশের "গুরু-দ্বারে"ই এখনো সুগায়কেরা গেয়ে থাকেন এবং হাজার হাজার নরনারী শোনেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা—অক্লান্ত আগ্রহে। অপিচ, শুধু সংখ্যার সাক্ষ্যেই নয়—ভারতবর্ষের কবিগুণী যোগীযতিদের এজাহার উদ্ধৃত ক'রেও প্রমাণ করা যায়, গানকে বহু মনীষী ধর্মসাধনার একটি প্রধান অর্ঘ্য হিসাবেই বরণ ক'রে এসেছেন চিরকাল—বলেছেন, "গানাৎ পরতরং নহি"।

"দ্বিজেন্দ্রকাব্য সঞ্চয়ন" সংকলনটি আমি প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম খানিকটা এই গুণী ও কবিদের সাক্ষ্যের খবর দিতেই বলব। তাই আমি চেষ্টা করেছিলাম নানা কবি ও গুণীর সহযোগ পেতে। কিন্তু সময়াভাবে অনেককেই

আবেদন জানাতে পারি নি, তাছাড়া চার-পাঁচজন মনীষী কথা দিয়েও কথা রাখেন নি। তাই সঞ্চয়নের ভূমিকায় আমি আপ্তকাম হই নি—যাঁদের কাছে সাড়া পাব আশা করেছিলাম তাঁরা সাড়া দেন নি ব'লে।

তাঁর শততম জন্মোৎসবের পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে আমার প্রার্থনা—যেন আজ আমরা ওজস্ ভক্তি প্রেম ও হাসির কিছু পাথেয় অন্ততঃ আহরণ করতে শিখি তাঁর কাব্য গান স্বর ছন্দ নাট্য হাস্যরস দেশভক্তি, ভজনকীর্তনাদির রস-লোক থেকেও বুঝতে শিখি, মানুষ হিসেবেও তিনি মহাজন ছিলেন চরিত্রে বীর্যে সততায় নিষ্ঠায় ও অধ্যবসায়ে।

এবার ভূমিকায় সমাপ্তি টেনে তাঁর গানের ও স্বরের কথা পাড়ি। আমার বাল্যকালে কলকাতায় পিতৃদেব "স্বর-ধাম"-এ এসে বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গে এ-আনন্দনিলয়টি হ'য়ে ওঠে বাংলার কবি গুণী মনীষীদের একটি রসসভা। একথা আমি আমার "স্মৃতিচারণ" প্রথম পর্বে ফলিয়েই লিখেছি। তাতে এও লিখেছি যে, স্বরধাম-এ আসার আগে যখন আমরা ৫ নম্বর স্বকিয়া ষ্ট্রীটে থাকতাম তখন মোড়ের মাথায় ডাক্তার কৈলাস বস্থর মনোরম হর্ম্যে প্রায়ই নানা ওস্তাদের গান শুনতে যেতাম। সেখানেই শুনি, প্রথম ভারত-বিখ্যাত অপ্রতিদ্বন্দ্বী ধ্রুপদী শ্রীঅঘোর চক্রবর্তী মহাশয়ের ধ্রুপদ ও কিন্নরকণ্ঠ রায়বাহাদুর স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অপরূপ খেয়াল—যাঁর গান শুনে অঘোরবাবু যে অঘোরবাবু তিনিও মুগ্ধ হয়ে তাঁর চিবুক ধ'রে আদর ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"এমন কণ্ঠ কোথায় পেলে বাবা?"—গুণী গুণং বেত্তি, বটেই ত।

সে সময়ে এসব ঘটনা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাই নি, তাই ভেবে দেখি নি যে, হিন্দুস্থানী কালোয়াতী গানের অনুরাগী বাংলার ঘরে ঘরে মেলে না। কিন্তু পিতৃদেব শুধু ওস্তাদী গানের অনুরাগী ছিলেন না, ছিলেন উপাসক। তাঁর কত বাংলা গানই যে এই সব ওস্তাদদের কাছে শোনা নানা রাগের প্রেরণালব্ধ তার মাত্র একটু খবর আমি রাখি। কিন্তু সে খবরের খুঁটিনাটি থাক্। কেবল একটি স্মৃতিকথা পরিবেশন করব আজ। কেন—ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সে যুগে গ্রামোফোনে পুরুষদের মধ্যে মৈজুদ্দিন খাঁ ও লালচাঁদ বড়াল ও বাইদের মধ্যে বিনোদিনী ও কৃষ্ণভামিনীর খুব নামডাক। লালচাঁদ বড়ালের একটি রেকর্ড আমি আজও শুনি—স্বরটমল্লার—"এ হো রাজা।" আহা কি

গান! বেশ মনে পড়ে প্রথম যেদিন গ্রামোফোন কোম্পানীর উপহার একটি গ্রামোফোন ও হাজার রেকর্ড পিতৃদেবের কাছে আসে (তিনি ছয়টি হাসির গান গ্রামোফোনে দিয়েছিলেন তার দক্ষিণা) আমি মহোৎসাহে তাঁকে ডেকে আনি—"শুনুন শুনুন—কি গানই গেয়েছেন লালচাঁদ বড়াল!" পিতৃদেব হাসিমুখে লেখা ছেড়ে এসে গানটি শুনে একটু চুপ ক'রে থেকে গ্রামোফোনের সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ক'রে চোখ মুছে ফিরে গেলেন—ব্যস্, একটি কথাও না। এ বানিয়ে বলা নয়, আজো স্পষ্ট দেখতে পাই তাঁর গৌরবর্ণ মুখ রাঙা হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দণ্ডবৎ প্রণামে।

স্মৃতিচিত্রটি অবান্তর নয়। এক ইংরাজ কবি বলেছেন—পিতৃদেব প্রায়ই আবৃত্তি করতেন—"He best can paint them who shall feel them most." ঐ দেখুন, মনে প'ড়ে গেল তিনি আর একটি কবির চারটি চরণ উদ্ধৃত করতেন। কবির নাম মনে নেই কিন্তু চরণ চারটি মনে গেঁথে আছে (আমার স্মৃতিশক্তি ও কণ্ঠ এ দুই বাহনের কাছে আমি যে কত ঋণী!)—

For forms of government let fools contest
For whatever is best administered is best.
For modes of faith let graceless zealots fight,
For his cannot be wrong whose life is in the right.

ভালোই হ'ল এ শ্লোকটির অবতারণা ক'রে। কারণ এ থেকে দেখতে পাবেন—তিনি কি ধরণের কবিতা ভালোবাসতেন—ঋজু, সরস, তেজস্বী, আদর্শবাদী। আমরা রূপায়িত করতে পারি ত শুধু তাকেই, যার রূপ আমাদের ধ্যানলোকে পূজা পেয়েছে আমাদের প্রাণ-পূজারীর কাছ থেকে।

ফিরে আসি এবার তাঁর সুরের ও গানের প্রসঙ্গে।

আমার অনেক বারই মনে হয়েছে যে, তিনি সুর ও কাব্য এই দুই কবচ-কুণ্ডল নিয়েই জন্মেছিলেন—সংস্কৃতে যাকে বলা হয় "সহজাত"। তাই সুর শুনলেই তাঁর মনে অম্নি গান জেগে উঠত। একদিনের ঘটনা আজো মনে পড়ে—স্পষ্ট। এক অন্ধ গায়কের গান হয় ঝামাপুকুরে হেম মিত্রের বাড়ী। গায়ক গেয়েছিলেন ঝিঁঝিট খাম্বাজে—"তারিণী গো মা, কেন সিঙ্গির সাথে এত আড়ি? মানুষ মারলে টেরটা পাবে ছুটতে হ'ত হরিণ বাড়ী।" (হরিণ

বাড়ীর অর্থ যে জেলখানা সেদিন আমি প্রথম শিখি, তাই এ আস্থায়ীটি আরো মনে আছে।)

যা হোক্‌, গানটি শুনেই পিতৃদেব বললেন—"কি চমৎকার সুর রে"—বল ত! ব'লেই বাঁধলেন তাঁর বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীত (সেটি পরে "পরপারে" নাটকে ন্যস্ত হয়)—

এবার তোরে চিনেছি মা আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি?
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা পাঠিয়ে দিছি যমের বাড়ি।

আর একবার তদানীন্তন একজন বিখ্যাত গায়ক "কাণা শরৎ"-এর একটি টপ্পা—

"ছি ছি নিঠুর কপট তুমি প্রাণসখা"

শুনেই তিনি তৎক্ষণাৎ গান বাঁধলেন—

আমি রবো চিরদিন তব পথ চাহি'
ফিরে দেখা পাই আর নাই পাই।

রবীন্দ্রনাথও বিখ্যাত ধ্রুপদী শ্রীরাধিকা গোস্বামীর মুখে নানা গান শুনে সেই সেই সুরে বাংলা গান বাঁধতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর তফাৎ এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল বিলেতে থাকতেই রীতিমত নানা আইরিশ ও স্কচ গান গাইতে শিখেছিলেন ও বিলেতেই ঠিক সেই সব সুরে বাংলা গান বসাতেন। সে গানগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র পরে আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগে ছাপানো হয়েছিল। গানগুলি রসোত্তীর্ণ হয়েছিল এমন কথা বলব না। কিন্তু তাঁর মুখে কোন কোন গানের ও সুরের বাংলা প্রতিরূপ শুনে এত মজা লাগত আমাদের যে, মায়া ও আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গাইতে গাইতে হেসে গড়িয়ে পড়তাম। একটি গানের নমুনা দেই। Some Folks গানের তিনি তর্জমা করেছিলেন একই ছন্দে ও সুরে—

কেউ কেউ করে হায়
কেউ কেউ করে কেউ কেউ করে কেউ কেউ মরতে চায়
আমি তুমি তার কেউ নই
বেঁচে থাক সে হাসিখুসি প্রাণ সব হাসে যারা দিন রাত
যেন মজার বাদশা—যে বলুক না খুসি যে বাত।

এ গানটি পড়লে নিশ্চই আপনি মুগ্ধ হবেন না, কিন্তু তাঁর স্বরে যদি এ গানটি গাই কোন আসরে— (আমাকে ধরলে গেয়ে দিতে পারি আজও)— তা হ'লে যে আপনি উৎফুল্ল হয়ে উঠবেনই উঠবেন এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। আর কেন উৎফুল্ল না হয়ে পারবেন না, বলব ? কারণ, এ স্বরে যে বিলিতি প্রাণশক্তি আছে তার ছোঁয়াচ আপনার প্রাণে লাগবেই লাগবে— এম্‌নি ছিল তাঁর বিদেশী স্বরকে আত্মসাৎ করবার সহজ প্রতিভা! এ প্রতিভার মূলেও ছিল তাঁর সাড়া দেবার ক্ষমতা ওরফে শ্রদ্ধা করবার শক্তি। না, তিনি বিলিতি গানকে শুধু শ্রদ্ধা করাই নয়—মনে-প্রাণে ভালবেসেছিলেন। ওস্তাদ বলতে যা বোঝায় তা তিনি ছিলেন না, কিন্তু এমন উদাত্ত ও স্বমিষ্ট কণ্ঠ আমি কমই শুনেছি। সে প্রবল পুরুষালি কণ্ঠে যে কোন গানই গাইতে না গাইতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। তার উপরে বিলিতি প্রাণশক্তির অবদান। তিনি দেশে ফিরেছিলেনও সাড়ে ষোল আনা সাহেব হয়ে। পরে এই মানুষকেই খালি গায়ে, খালি পায়ে স্বরধামে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে গুন্ গুন্ ক'রে গাইতে শুনেছি সংস্কৃত লঘুগুরুছন্দে বিশুদ্ধ ভৈরবীতে—

“পরিহরি ভবস্থখ দুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে,
বরিষ শ্রবণে তব জলকলরব, বরিষ স্বপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে।
মা ভাগীরথি! জাহ্নবী! স্বরধুনি! কলকল্লোলিনি গঙ্গে।”

তাঁর সম্বন্ধে আমি আমার নানা লেখায় লিখেছি খুব জোর দিয়েই যে, তাঁর ব্যক্তিরূপের বিকাশের ফলে নানা বিরুদ্ধ ভাবধারা তাঁর মধ্যে অঙ্গাঙ্গী হয়ে বিরাজ করত—যাকে ইংরাজীতে বলে প্যারাডক্স। এর একটি উদাহরণ— তিনি একদিকে ছিলেন যেমন তর্কপ্রিয়, অন্যদিকে তেমনি প্রেমিক ও ভক্তিপ্রবণ। আর্যগাথা প্রথম ভাগে উনিশ বৎসর বয়সেই তিনি প্রকাশ করেছিলেন সাতটি “ঈশ্বর-স্তুতি”। এ গানগুলির মধ্যে বালকসম্ভব সরলতার রস ছাড়া কোনও সমৃদ্ধ রস উপচিত হয়নি। কিন্তু আর্যগাথা দ্বিতীয় ভাগে ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি প্রকাশ করেন কৃষ্ণমুরলীর একটি অপরূপ ভক্তিস্নিগ্ধ তথা কবিত্বময় গান, যেটি গাইতেন তিনি স্বকীয় প্রাণস্পর্শী স্বরে—ভৈরোঁ রাগে (আমি এ গানটি আজও গাই মন্দিরে):

ঐ প্রণয় উচ্ছাসি' মধুর সম্ভাষি' যমুনায় বাঁশী বাজে !
ঐ কানন উছলি' "রাধে রাধে" বলি' যায় চলি' বনমাঝে !
পড়ে ঘুমাইয়ে ওই তারাকুল সই, অধরে মিলায়ে হাসি,
ঐ যমুনায় এসে নায় এলোকেশে নিভৃতে জোছনা রাশি।
ঐ নিশি পড়ে ঢুলে যমুনার কূলে, উছলে যমুনার বারি,
সখী, ত্বরা ক'রে আয় যাই যমুনায় হেরিতে মুরলীধারী।
ঐ সমীরণ ধীরে উঠিল জাগি'রে উদিল পূরবে ভাতি
ঐ কুঞ্জে গীত ওঠে, কুঞ্জে ফুল ফোটে, সখী রে পোহালো রাতি।

এই ভক্তিরস পরে ধীরে ধীরে তাঁর জীবনে রাতের রজনীগন্ধার মতনই ফুটে ওঠে—কিন্তু সে কথা যথাস্থানে। উপস্থিত বলি আরও কিছু যা বলবার আছে—তাঁর নানা গানে সুর দেবার পদ্ধতি সম্বন্ধে।

তিনি প্রায়ই সুরের সঙ্গে সঙ্গে গান বাঁধতেন—কোন্‌টা আগে আসত আর কোনটা পরে—কে বলবে ? এর একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত—তাঁর "বঙ্গ আমার জননী আমার" স্তোত্রটি। আমার স্মৃতিচারণ প্রথম খণ্ডের ২১ পৃষ্ঠায় আমি উদ্ধৃত করেছি তাঁর জীবনীকার ও প্রিয়বন্ধু দেবকুমার রায়চৌধুরীর সাক্ষ্য। জীবনীতে দেবকুমার বাবু লিখেছেন (দ্বিজেন্দ্রলাল দ্রষ্টব্য) :

একদিন—বোধ হয় অষ্টমী পূজার দিন—দুপুরবেলায় আহারান্তে বসিয়া আছি, (সে সময়ে তিনি গয়াতে পিতৃদেবের অতিথি, আমার বয়স তখন দশ বৎসর হবে) কবিবর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন : "দেখ, মাথার মধ্যে কয়েকটা লাইন ভারি জ্বালাতন করছে, তুমি একটু বস ভাই, আমি সেগুলি গেঁথে নিয়ে অসি।" একটু পরে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়া বলিলেন, "উঃ! কি চমৎকার গান বেঁধেছি! শোন"—এই বলিয়া গাইয়া উঠিলেন :

'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ !'...

হাততালি দিতে দিতে ঘরময় নাচিয়া নাচিয়া আবার গাইতে লাগিলেন :

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ !

এর মন্তব্যে আমি লিখেছি স্মৃতিচারণে : "আমার বয়স তখন নয় কি দশ, কঠিন সুরও গাইতে পারতাম বেশ স্বচ্ছন্দেই, 'বঙ্গ আমার'-এর সুর ত জলের

মতন সহজ। মায়া ও আমি উভয়েই তাঁর সঙ্গে গানটি গাইতাম—যেমন গাইতাম তাঁর আরও অনেক গান। পিতৃদেব এ-গানটির শেষ চরণে প্রথমে লিখেছিলেন : 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা হৃদয়রক্ত করিয়া শেষ।' কিন্তু দেবকুমার বাবু, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও বরদা চরণ মিত্র তিনজনেই বললেন যে, সে ঘোর বোমা-বিপ্লবের যুগে এ লাইনটি ছাপলে রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি ডিসমিস ত হবেনই, হয়ত পুলিপোলাও চালানও হ'তে পারেন। অগত্যা ঘোর অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিতৃদেব লেখেন : 'মানুষ আমরা নহি ত মেষ।' এজন্যে তাঁর মনে চিরদিন খেদ ছিল।"

এখানে লক্ষণীয় : "বঙ্গ আমার" গানটি বাঁধতে না বাঁধতে সুর এসে গেল —আর কি সুর বলুন ত—যে ষাট বৎসরেও পুরানো হয় না! মাস-খানেক আগেও পুণা রেডিওতে যখন গেয়ে এলাম : "আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য হৃদয়-রক্ত করিয়া শেষ"—তখন বুকে জেগেছিল কাঁপন। ওরা গানটি কলকাতায় পাঠিয়েছে। জানি না সেখানকার রেডিওর ভাণ্ডারী এটিকে আকাশমার্গে পরিবেশন করেছেন কি না। কিন্তু যা বলছিলাম।

সুর শুনতে না শুনতে তাঁর গান এসে যেত। একবার একটি মেঘমল্লার গান শোনেন—কোথায় মনে পড়ছে না—তবে গানটির প্রথম চরণ ও সুর আজও মনে আছে ; "ঘনঘটা ঘেরি আই কারী কারী ঘনঘটা।" অমনি তিনি বাঁধলেন, যেটি পরে তাঁর "দুর্গাদাস" নাটকে গেয়ে অভিনেত্রী সুশীলা সুন্দরী খ্যাতনামা হয়ে উঠেছিলেন রাতারাতি—

ঘন ঘোর মেঘ আই ঘেরি গগন
বহে শীকর 'স্নিগ্ধ চ্ছুসিত পবন···

একবার সে যুগের এক খ্যাতনামা টপ্পাগায়ক বকু বাবুর মুখে একটি সিন্ধুয়া টপ্পা শুনলেন (এটি আমি আজও গাই)—

এসো যদি খেলবে হরি, নারীর সনে হোলী খেলা
সেদিন বড় পালিয়েছিলে শাস্তি পাবে নিঠুর কালা।

শুনেই তিনি বাঁধলেন কি যে সুন্দর গান, যেটি পরে তাঁর 'ভীষ্ম' নাটকে বিন্যস্ত হয়েছিল (লঘু গুরু ছন্দে কি সুন্দর যে লাগে এ গানটি—যদি গেয়ে শোনাই তা হ'লে বুঝবেন)—

আইল ঋতুরাজ সজনি, জ্যোৎস্নাময় মধুর রজনি
বিপিনে কলতান মুরলি উঠিল মধুর বাজি'।
মৃদুমন্দ সুগন্ধ পবন-শিহরিত তব কুঞ্জভবন
কুহু কুহু কুহু ললিত তান মুখরিত বনরাজি।

এ প্রসঙ্গে একটু বলি তাঁর লঘু গুরু ছন্দে রচিত গানগুলি সম্বন্ধে। এ যুগে দেখতে পাই বাঙালী কবিদের মধ্যে কেউই লঘু গুরু ছন্দের খবর রাখেন না। (এক কবি নিশিকান্ত ও আমি এ ছন্দে কবিতা লিখেছি ও গান বেঁধেছি। কিন্তু ভরতচন্দ্র থেকে আরম্ভ ক'রে বহু কবিই এ সংস্কৃত ছন্দে কবিতা লিখে এসেছেন। এ নিয়ে আমার "ছান্দসিকী" গ্রন্থে বিশদ আলোচনা করেছি ব'লে এখানে শুধু এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হব যে, এ-ছন্দে গানের সুর ছাড়া পায় সহজেই সংস্কৃত গুরুস্বরের (আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ) দ্বিমাত্রিক উচ্চারণে। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এছন্দে অনেকগুলি চমৎকার গান বেঁধেছেন— রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'জনগণমন অধিনায়ক' জাতীয় সঙ্গীত এই ছন্দেই রচিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল আযৌবন এ ছন্দের অনুরাগী ছিলেন। আর্যগাথায় তাঁর "কি দিয়ে সাজাব মধুর মুরতি" গানটি তিনি—আশাবরী চৌতালে গাইতেন বহু গুরুস্বরকেই দ্বিমাত্রিক মর্যাদা দিয়ে, যদিও সর্বত্র নয়। কিন্তু তার পরে তিনি অনেক গানেই এ ছন্দকে মেনে চলেছেন আদ্যন্ত, যথা এ কি মধুর ছন্দ, নিখিল জগত সুন্দর, এস প্রাণসখা এস প্রাণে, এ কি শ্যামল সুষমা, পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে, ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা, ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে ইত্যাদি। এ ছন্দ তিনি ভালোবাসতেন আরো এইজন্যে যে, এ ছন্দে হিন্দুস্থানী নানা সুরের উদাত্ত ধ্বনি সহজেই গুরুস্বরের মাধ্যমে ঝংকৃত করা সম্ভব। কিন্তু যে কবিরা গান আদৌ বাঁধেন নি তাঁদের কাছে এ ছন্দের ওকালতি করা বৃথা, তাঁরা পেশ করবেনই করবেন এই সস্তা যুক্তি যে এ-ছন্দ সংস্কৃতে হিন্দিতে বা গুজরাতীতে সুষ্ঠু হ'লেও বাংলা কাব্যে অচল। এ তর্ক নিষ্ফল—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এ ছন্দে অনেকগুলি অনবদ্য সর্বাভিনন্দিত গান লেখা সত্ত্বেও যাঁরা এ ছন্দকে নামঞ্জুর করতে দ্বিধা করেন না, আমার যুক্তি তাঁদের মন টলাতে পারবে, এ আশা দুরাশা। তবু আমি যে লঘু গুরুর ছন্দের গুণগান করলাম, সে শুধু এই কথাটি নিবেদন করতে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাবে গুণী কবি গীতিকার

ও সুরকার ছিলেন বলেই এ ছন্দকে সর্বান্তঃকরণে ভালবেসে এ ছন্দে অনেকগুলি রসোত্তীর্ণ গান বেঁধেছিলেন—সুরের নেশাকে ছন্দের রঙে আরও রঙিন ক'রে জমিয়ে তুলতে।*

বস্তুতঃ সুর ও ছন্দে তাঁর প্রতিভা এমন স্বচ্ছন্দে বিপথেও পথ কেটে চলত যে, আমার মনে হ'ত সত্যিই যে সুরদেবী তাঁর সুরেলা মর্মকোষে তেমনি আনন্দেই তাঁর মধু জমা দিতেন যেমন আনন্দে কৃপণ তার আয় জমা দেয় ব্যাঙ্কের দুর্ভেদ্য কোষাগারে। সুর শুনতে না শুনতে তাঁর মনে জেগে উঠত ছন্দ, ছন্দের দোলা জাগতে না জাগতে আলো হয়ে উঠত সুর। সময়ে সময়ে তাঁকে সুর দিতে দেখতাম এতই সহজে যে মনে হ'ত কেবলই রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি: "যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।" আজ আমার শুধু এই খেদ হয় যে, এমন অসামান্য সুর-প্রতিভা পূর্ণবিকাশের মুখেই স্তব্ধ হয়ে গেল পঞ্চাশও না পেরুতে। রবীন্দ্রনাথের সুর-প্রতিভা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যদি দ্বিজেন্দ্রলালের সুরপ্রতিভার তুলনা করতে চাই তবে মনে রাখতে হবে, দ্বিজেন্দ্রলাল আরো ত্রিশ বৎসর বাঁচলে আরো কত কি অপরূপ সুর রচনা করতে পারতেন।

তবে তুলনা শুধু অবান্তর নয়, নিষ্ফলও বটে। কারণ মানুষের কাছে খতিয়ে মূল্যবান্ কি বস্তু? না, যা সে পেয়েছে, যাকে সে খাটাতে পারে, যাহকে নিয়ে ঐতিহ্য ব'লে গৌরব করতে পারে। তাই আনন্দের কথা এই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের যুগে সুরকার হিসেবে সুরের এই অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য উৎকীর্ণ ক'রে রেখে গেছেন তাঁর বহু রসোত্তীর্ণ গানের মর্মকোষে। আর সে কত রকম সুর বলুন তো!—ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, বাউল, কীর্তন, বৈঠকী, হাসির গান, স্বদেশী উদ্দীপনার গান, বিরহের অশ্রু, বীর্যের চমক, উদাসীর গান ......আরো কত রকমারি গান বিচিত্র সুরসম্পাতে তিনি সৃষ্টি করতেন, কি ক'রে বোঝাব গান না গেয়ে?

তবু কিছু বলা ত চাই। প্রবন্ধ লিখতে বসেছি যখন, যতটা পারি

---

* তাঁর লঘুগুরু ছন্দে বাঁধা গানগুলি সম্বন্ধে সম্প্রতি শ্রীনলিনীকান্ত সরকার একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছেন শারদীয়া সংখ্যা কথাসাহিত্যে। সেটি দ্বিজেন্দ্র-দীপালীতে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ফোটাবার ত চেষ্টা করতে হবে গানে স্বরে কোথায় তিনি ফুটে উঠেছেন ভাব-রূপের শিখরমহিমায়।

আমার মনে হয়, তাঁর গানের সুরুকারুকৃতি প্রথম ফুটে ওঠে আর্যগাথায় বিদেশী গানের তর্জমায়। এ গানগুলি রসোত্তীর্ণ হয় নি ব'লেই কিন্তু ব্যর্থ নয়। যেমন বহু কণ্ঠ-সাধনার পরে তবে কণ্ঠে স্বরের জৌলুষ খোলে, ঠিক তেমনি অনেক পরীক্ষার নিষ্ফলতার পরে তবে আসে সার্থক সফলতা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলা চলে: "Our splendid failures sum to victory."

দ্বিজেন্দ্রলাল আর্যগাথায় স্বদেশী সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বাঁধেন প্রধানতঃ প্রেম-সঙ্গীত ও প্রকৃতি-সঙ্গীত। তাঁর স্বদেশী সঙ্গীতের প্রথম অধ্যায়ে ছিল শুধু কান্না দেশের দুর্দশায়:

> "কেন মা তোমারি
> সহাস বদন আজ মলিন নেহারি ?

তারপরেই এল ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস: পুণ্যভূমি ভারত—

> "ছিল এ একদা দেবলীলাভূমি
> কোরো না কোরো না তার অপমান।"

তারপরে তিনি প্রেরণার জন্যে হাত পাতলেন আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ দেশভক্ত বীরদের কাছে। লিখলেন:

> জ্বালাও ভারত হৃদে উৎসাহ অনল
> ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।

স্মরণ করলেন প্রতাপ সিংহকে, গুরুগোবিন্দ সিংহকে, বুদ্ধকে—অর্থাৎ কিনা আর্য ইতিহাসকে। সব গানগুলির উদ্ধৃতি দেওয়ার স্থানাভাব। তার প্রয়োজনও নেই। শুধু একটি কথা বলবার আছে এ সম্পর্কে: যে, এ গানগুলি আজ পড়লে একটা কথা মনে না হয়েই পারে না: যে, আমাদের দেশমাতৃকাকে তিনি স্বামী বিবেকানন্দেরও আগে পুণ্যভূমি ব'লে চিনেছিলেন, নৈলে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বৎসরের যুবকের কণ্ঠে জেগে উঠত না: "ছিল এ-ভারত বসুধা-উদ্যান, জগতের তীর্থ পুণ্যময় স্থান।" এবং তারপরে ১৮০৬

খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে বসে তাঁর Lyrics of Ind-এও তাঁর পূজারী-হৃদয় অঙ্গীকার করত না: "O my land ! can I cease to adore thee ?"

শুধু তাই নয়, তিনি আবাল্য বিশ্বাস করতেন যে, আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে আমরা মুক্তিলাভ করতে পারি শুধু সুপ্ত বীর্যের পুনরুজ্জীবনে, এছাড়া আর পথ নেই। তাই ত তিনি গেয়েছিলেন উনিশ বৎসর বয়সেই:

এখনো আমরা সেই আর্যের সন্তান হে,
বহিছে শিরায় আর্য শোণিত প্রবল,
সেই বেদ সে-পুরাণ আজো বর্তমান হে,
সে-দর্শন যাহে মুগ্ধ আজো ভূমণ্ডল।

স্বামীজি বলতেন: "আত্মবিশ্বাসেই মুক্তি।" দ্বিজেন্দ্রলালও এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর প্রাণের বীর্যস্পন্দনে। আর এ-অনুভব তাঁর রক্তে দোলা দিত ব'লেই তাঁর কবি-প্রতিভার পরিণতির লগ্নে তাঁর নানা স্পন্দিত স্বদেশী গানে মূর্ত হয়ে উঠে সারা বাংলাদেশকে মাতিয়ে তুলেছিল, যার শেষ ডাক বেজে উঠেছিল: "আবার তোরা মানুষ হ।"

কিন্তু স্বদেশী যুগের আগেও তিনি অন্তরে গভীরে বেদনা বোধ করতেন আমাদের তামসিকতার কথা ভেবে, লোকাচারের পায়ে আমরা নির্বিচারে বিবেককে বলি দিতে চাই দেখে। তাই হাসির গানে প্রথমে ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছিলেন আমাদের নানা ভান, কাপুরুষতা, স্তাবকতাকে নিশানা ক'রে। সাধে কি শ্রদ্ধেয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত হাসির গান "পাঁচশো বছর এমনি ক'রে আসছি স'য়ে সমুদায়, এইটে কি আর সইবে না কো দুঘা বেশি জুতোর ঘায়" শুনে বলেছিলেন: "এ ত হাসির গান নয় দ্বিজেন্দ্রবাবু, এ যে কান্নার গান!"

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আর জাতীয় জীবনের অধোগতির দুঃখে তাঁর দেশভক্ত উদার প্রাণ নিত্য কেঁদে উঠত ব'লেই তিনি হাসির ব্যঙ্গের বিদ্রূপের আড়ালে গোপন করতে চাইতেন মনের জ্বালা, প্রাণের অবসাদ। আত্মধিক্কারের এ বেদনাকে সুরের ও ছন্দের কষাঘাতে তর্জমা ক'রে চাইতেন ঘুমন্তদের ঘুম ভাঙাতে।

বটে, কিন্তু আমরা অনেক কিছুই করতে চাইলেও পারি কই? এ-পারবার

একটি পথ—আলঙ্কারিকদের ভাষায়—"কাব্য-সম্পদ"। অর্থাৎ কবি তাঁর আন্তর ঐশ্বর্যের প্রসাদেই পারেন তাকে সম্ভব করতে যা সে-ঐশ্বর্য বিনা অসম্ভবই থেকে যায়। দণ্ডীর মতে এই কাব্য-সম্পদের তিনটি আনুষঙ্গিক বা "কারণ" আছে ঃ অলৌকিকী চ প্রতিভা শ্রুতঞ্চ বহুনির্মলম্।

অমন্দশ্চাভিযোগশ্চ কারণং কাব্যসম্পদঃ ॥

অর্থাৎ প্রথম চাই প্রতিভার জাদু, দ্বিতীয় নির্মল শ্রুতি, তৃতীয় অমন্দ অভিযোগ অর্থাৎ নিষ্ঠা—অধ্যবসায়, application ; এই তিনটি গুণের সমাবেশ তাঁর মধ্যে ছিল ব'লেই দ্বিজেন্দ্রলাল পেরেছিলেন জাতিকে দেশভক্তিতে উদ্বোধিত করতে। তাঁর কাব্যে গানে ও স্বরে তাঁর প্রাণশক্তির অধ্যবসায়-আযৌবন চেয়েছিল আমাদের সচেতন করতে দু'টি উপায়ে ঃ এক, আমরা কি হয়েছি তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে ; দুই, কি হ'তে পারি তার আভাস তথা নির্দেশ দিয়ে আমাদের অতীত গৌরবকে পূজা করতে শিখিয়ে এবং প্রথমে দেশ ও তারপরে বিশ্বমানবকে ভালোবাসার বাণী তাঁর কাব্যে গানে ও স্বরে মূর্ত ক'রে তুলে। তাঁর বহুমুখী কবি-প্রতিভা ও সাহিত্যিক কীর্তি সম্বন্ধে "দ্বিজেন্দ্র দীপালী"তে অন্য কবিরা নিশ্চয়ই আলোচনা করবেন। তাই আমি শুধু এখানে তাঁর গান ও স্বর সম্বন্ধে আরো কিছু বলব যা বলতে আমার প্রাণ চেয়েছে বহুবারই—বিশেষ ক'রে তাঁর গান গাইতে গাইতে।

বলেছি—দ্বিজেন্দ্রলাল যেমন আমাদের ওস্তাদী গানের অনুরাগী ছিলেন তেমনি অনুরাগী ছিলেন বিদেশী গানের। তিনি 'ইংরাজী ও হিন্দু সঙ্গীত' নামে একটি নিবন্ধে এক স্থানে লিখেছেন যে, আমাদের 'রাগ-রাগিণীগুলি যেন একটি আশ্রয় অবলম্বন করিয়া থাকে···সে আশ্রয় বিচ্যুত হইতে চাহে না। ইংরেজী সঙ্গীতে প্রতি গানের স্বর নিরাশ্রয়।···তাহারা কোন নির্দিষ্ট ভিত্তি হইতে উঠে না, বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে শেষ হয় না।···ধূমকেতুর মত কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া যায় তাহার ঠিকানা নাই।' লিখে রাগ-সঙ্গীতের একটি বড় সুন্দর উপমা দিয়েছেন ইংরেজী সঙ্গীতের পাশাপাশি।

লিখেছেন যে, হিন্দু সঙ্গীতে 'আগে যেন একটা স্বরের সমুদ্র রচনা করিয়া লইতে হয়, রাগরাগিণীগুলি যেন সেই সমুদ্রের বক্ষে উর্মিমালার ন্যায়—তাহা হইতেই উঠে, তাহাতেই মিলাইয়া যায়।" পক্ষান্তরে বিলিতি গানের স্বরগুলি

'যেন হাউয়ের মত একেবারে উর্ধ্বে উঠিয়া চলিয়া যায় এবং সেখানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গরাশি প্রক্ষিপ্ত করিয়া শূন্যমার্গেই নিভিয়া যায়।"

এ উদ্ধৃতিটি মূল্যবান্ আরও ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পাশাপাশি উর্মিলার উপমার জন্যে। আমাদের সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ যেন সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, গভীরতা, প্রশান্তি। সে জলতঙ্গে উচ্ছল গতিও হয়ত পাই কোন কোন বলিষ্ঠ রাগে—যথা, ভূপালী, মালকোষ, হিন্দোল, দুর্গা। কিন্তু তাতে নেই এই 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ'-ঝিলিক। দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশী সঙ্গীত থেকে আহরণ করেছিলেন এই দীপ্তির জৌলুষ ওরফে প্রাণশক্তি—সংস্কৃত পরিভাষায় যার নাম ওজস্। আমার মনে হয় যাঁরাই আমাদের ইদানীন্তন স্বরকারদের স্বর মন দিয়ে শুনেছেন তাঁদেরই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশেছে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরকারুর ওজঃসম্পদ যা তাঁর কাব্য-সম্পদের সঙ্গে জুড়ি হাঁকিয়েছে তাঁর সব বলিষ্ঠ গানেই, যথা :

ভূতনাথভব ভীম বিভোলা, বঙ্গ আমার ভারত আমার, সেথা গিয়াছেন তিনি, মেবার পাহাড়, ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, ঘন তমসাবৃত প্রভৃতি।

এই ওজঃশক্তি তাঁর অন্যগানেরও তল্পি বয়েছে কিন্তু খানিকটা ছদ্মবেশেই বলব, অর্থাৎ আমাদের বাউল কীর্তন রাগসঙ্গীতকে মেনেও তাঁর ওজস্বিনী প্রতিভা এনেছে অপর্যাপ্ত আবেগের পুরুষালি উদ্দীপনা। যথা, তাঁর প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে, (জয়জয়ন্তি) পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে (ভৈরবী), মহাসিন্ধুর ওপার থেকে (দেশ), গালভরা মা ডাকে (বাউল), ওকে গান গেয়ে চ'লে যায় (কীর্তন), কি দিয়ে সাজাব মধুর মুরতি (ধ্রুপদী আশাবরী চৌতাল), যাও হে স্থখ পাও (ইমন কল্যাণ তেওরা)...আরও কত প্রাণস্পর্শী গানেই না স্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁর আশ্চর্য অঘটনঘটন-পটীয়সী পৌরুষদীপ্তি! এক এক ক'রে এসব গানের উল্লেখ ক'রে প্রবন্ধের কায়াবিস্তার করার প্রয়োজন নেই। কেবল এই সূত্রে একটি কথা না ব'লে থাকতে পারছি না যে, তিনি তাঁর নানা স্বদেশী গানে করুণ রাগের সুরের মধ্যে দিয়েও বিকীর্ণ করেছেন ঐ বৈদেশিক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, যথা 'সেথা গিয়াছেন তিনি'—ইমনে, বা 'বঙ্গ আমার' —কল্যাণে, বা 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে' ভূপালী রাগে। আমাদের রাগে বলিষ্ঠতার আভাস আদৌ নেই বলি না—শঙ্করা, সিন্ধুড়া সোহিনী ও আরও কয়েকটি রাগে আবেগের প্রবলতা নিজেকে জানান দিতে পারে। কিন্তু

আমাদের রাগসঙ্গীতের প্রধান কৃতিত্ব—শান্তি, করুণা, স্বপ্নাবেশ, প্রীতি, ভক্তির সাত্ত্বিক রস। তাই নিবিড়তা ওরফে intensity-রূপ রাজসিক ভাবকে পাশ কাটিয়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত (রাগালাপ, কীর্তন ও বাউল) চেয়েছে গভীরতা ওরফে depth-কে নিয়েই ঘর করতে। এই-ই ছিল আমাদের সঙ্গীতকারদের জানা পথ। দ্বিজেন্দ্রলালই প্রথম আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে বৈদেশিক প্রাণশক্তির নিবিড়তার রসদ্যুতি আবাহন ক'রে ভারতীয় আত্মিক সুরের সঙ্গে বৈদেশিকী ওজঃশক্তির সমন্বয়ে এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করেছিলেন—যার ফলে শুধু যে তাঁর সুরের নানা বৈদেশিকী চলাফেরাকে অচেনা মনে হয় না তাই নয়, বিদেশীরাও তাঁর সুর শুনে বলতে বাধ্য হয় : "এ কী! এসব অচিন সুরও যে আমাদের কণ্ঠে সহজেই বসে!" এ-অত্যুক্তি নয়, আমি এদেশে ওদেশে নানা বিদেশীকেই তাঁর গান শিখিয়ে তাদের মনে চমক জাগিয়েছি। একটি মাত্র উদাহরণ দেই ১৯৫৩ সালে সানফ্রান্সিস্কোর এশিয়ান আকাদেমিতে রীতিমত গান শেখাতাম আমেরিকান ও আরও নানা জাতের ছাত্রছাত্রীকে। তারা তাঁর ধনধান্য পুষ্পেভরা গানটি গাইতে গাইতে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। বলত : "কী সুন্দর সুর!" তাঁর "যেদিন সুনীল জলধি হইতে" গানটি বাংলায় গেয়ে জর্মন ভাষায় গেয়েছি জর্মনিতেও উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পেয়েছি গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জর্মন ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে। এ-কৃতিত্বের গৌরব আমার প্রাপ্য নয়—প্রাপ্য তাঁর, যিনি এ-সুর রচনা করেছিলেন, ভারতীয় আত্মিক শক্তির সঙ্গে য়ুরোপীয় প্রাণশক্তির সমাহারে। তাই একথা বললে একটুও বেশি বলা হবে না যে, তাঁর ছিল সেই শ্রেণীর দুঃসাহসী প্রতিভা—যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে : হিন্দু সঙ্গীতের বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেমাবেশ ও শান্তির সঙ্গে মেলাতে পারে বিলিতি সঙ্গীতের প্রাণচাঞ্চল্য, ওজস্, আত্মবিশ্বাস ও গতিবেগ। তাই তাঁর গানে পদে পদে পাই ওদেশের উচ্ছলতার সঙ্গে আমাদের দেশের আত্মসমাহিতি।

একথা প্রমাণ করতে বহু উদাহরণ দিতে পারি কিন্তু তা হ'লে প্রবন্ধের কায়া বিপুল হয়ে উঠবে। তাই শুধু দু'টি উদাহরণ দিয়েই ইতি করব।

ইংরাজিতে গতিশক্তিকে বলে movement; ওরা সেই সব গানই বেশি ভালবাসে যাদের মধ্যে movement বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। সুর বাজল এই

এখানে—ঐ টপ্‌কে গেল পাঁচ-সাতটা স্বর ডিঙিয়ে ওখানে! movement-এর একটি প্রধান প্রকাশ এই উল্লম্ফনে বা লাফালাফিতে। আমাদের রাগসঙ্গীতে কোন বড় গুণীর আলাপ একটু শুনলেই দেখা যায় আমরা কি ভাবে রাগের বিস্তার করি: একটু একটু ক'রে সা রে গা, ফিরে এল রে গা পা, ফিরে এল রে সা। ক্রমশঃ এক এক পর্দা ক'রে ধীরে ধীরে উঠে অবশেষে আস্থায়ী পৌঁছয় অন্তরায় প্রথম ধাপে—অর্থাৎ চড়া সা-তে। ওদের দেশের শ্রোতারা আমাদের এই ধীরগতি শুনতে পারে না বেশিক্ষণ। কান ওদের তেমন সূক্ষ্মশ্রুতি নয় ত, পারবে কোত্থেকে? বুঝবে কেমন ক'রে কত সূক্ষ্ম স্বরকারুকৃতি আমাদের রাগসঙ্গীতে মর্যাদা পেয়েছে কি অশান্ত স্বরের মিড়ের গমকের স্বর-বিহারের (improvisation) তানাদির সাধনায়।

ওরা বলবে: দূর হোক্ গে, এস লাফিয়ে লাফিয়ে চলি। এই গাইছি মুদারার গা তো?—হু—শ্! দেখ, গলা পৌঁছল এক লাফে তারার রে-তে! এই গাইছি তারার গান্ধার, নেমে এলাম মুদারার ঋষভে। এরি নাম movement, স্বরগ্রামের বিস্তার (range) কথায় কথায়। দ্বিজেন্দ্রলাল এই movement ভালবাসতেন এর মধ্যে প্রাণশক্তির চমক্ পেতেন ব'লে। তাই তাঁর নানা স্বদেশী গানেই তিনি এনেছিলেন এই স্বরের টপ্‌কে টপ্‌কে চলা। যথা, সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির গানে শি—র এক লাফে মুদারার গা থেকে লাফ দিয়ে পৌঁছল তারা-র গা-তে। তেমনি সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি-তে জ—ন্ প্রথম বার মুদারার মা থেকে লাফ দিয়ে পৌঁছল ছটা স্বর ডিঙিয়ে তারার রে-তে, দ্বিতীয় সে যে আমার জন্মভূমি-র জন্ম গাওয়া হ'ল মুদারার কোমল নি তে, কিন্তু তারপরেই ভূমি—মাটি ছিল রেখাবে ফিরে পাঁচটা পর্দা এক লাফে নেমে। আর এ বৈদেশিকী গতিলীলা তিনি শুধু যে তাঁর স্বদেশী গানেই প্রবর্তন করেছেন তা নয়—তাঁর অন্য অনেক গানেও এ-চাল পরিস্ফুট হয়েছে। অথচ মজা এই যে, শুনলে একবারও মনে হয় না শ্রুতিকটু কি জোর ক'রে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা।

আমি বলছি না একথা যে, আমাদের সব সঙ্গীতেই এ-গতিলীলার প্রবর্তন কাম্য বা শোভন। তবে কোথায় কোন্ চাল শোভন আর কোথায় অশোভন তার কোন বাঁধাধরা সূত্র নেই ব'লেই প্রতিভাধরের কাছে দিশা চাইতে হয়

পথ চিনতে—কোন্ পথে চললে পদযাত্রার আনন্দ বাড়বে আর কোন্ পথে চললে খানায় প'ড়ে পা ভাঙবে।

আমাদের রাগসঙ্গীত সুরের বিকাশে মহিমময়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাই যখন বিদেশীরা বলে এ-সঙ্গীত বড় বেশি plaintive বা কান্নাভরা, তখন তাদের পিঠ পিঠ বলা বলে: আমাদের রাগসঙ্গীতের গভীরতার মর্ম বুঝতে হ'লে সব আগে চাই অন্তঃশ্রুতির বিকাশ, নৈলে বোঝা যায় না যে আমাদের কারুণ্য কান্না নয়—সে পড়ে "unheard melody"-র পর্যায়েই—আমাদের বেহাগ'-বসন্ত পূরবী, সিন্ধু, কানাড়া, বাগেশ্রী আর কত গভীর গম্ভীর উদাস-মধুর প্রাণকাড়া রাগে।

কিন্তু সেই সঙ্গে একথা না মানলে সত্যের অপলাপ হবে যে, আমাদের রাগ-সঙ্গীতে বীররস তেমন প্রাধান্য পায় নি, যেমন পেয়েছে শান্তরস। দ্বিজেন্দ্রলালই স্বদেশীযুগে প্রথম বীররসকে আবাহন করেন রাগসঙ্গীতের রাগভঙ্গ না ক'রে। তাই তাঁকে উপাধি দিতে হয় বীররসের ভগীরথ, যাঁর প্রতিভার প্রসাদে আমাদের গানে ও সুরে নামল বৈদেশিক ওজনের ধারা—রাগসঙ্গীতের যাহ্নুতে ভাগীরথী হয়ে।

তাঁর গান ও সুরের সম্বন্ধে আরো অনেক কথাই বলবার আছে—যা বলবার মতন। কেবন মুশকিল এই যে, গানের অলোচনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ব'লে বোঝানো—explanation—নয়, এতে ক্লান্তি আসে। চাই গেয়ে-শোনানো demonstration, তাই তাঁর গান ও সুরের সম্পর্কে আর দু' একটি কথা যথাসম্ভব সংক্ষেপে ব'লেই এ পত্রের সমাপ্তি টানব।

দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনে কবিশক্তির উন্মেষ হয়েছিল শৈশবেই। পরে প্রৌঢ় বয়সে তাঁর কবিপ্রতিভা ধীরে ধীরে নাটকের মধ্যে দিয়ে নিজেকে নতুন ক'রেই খুঁজে পেয়েছি রকমারি নাট্যসঙ্গীতে। তাঁর ইচ্ছা ছিল অপেরা রচনা করার। তাঁর "সোরাব-রুস্তম" নাটিকায় তিনি প্রথম এ-পরীক্ষায় আংশিক সাফল্যলাভ করার পরেই তাকে কাল আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে না গেলে—ভারতীয় নাট্যকলা আজ বহুসমৃদ্ধ হ'য়ে উঠত নাট্যসঙ্গীতের এক নব বিকাশে, যার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন বিদেশী সঙ্গীত থেকে। একথা মনে করার প্রধান কারণ—তাঁর নানা কোরাস গান রচনার পদ্ধতি বৈদিকযুগে আমাদের

নানা মন্ত্র ও সূক্ত বহুকণ্ঠে গীত হ'ত—সামগানেরও উল্লেখ পাই নানা গ্রন্থে। কিন্তু তবু বলব—আমাদের রাগসঙ্গীতে মূলতঃ একক সঙ্গীতই বটে, বহুর স্থান নেই তাতে। বস্তুতঃ, আমাদের জাতীয় চরিত্রবৈশিষ্ট্য বরাবরই চ'লে এসেছে একলার পথে—বহুর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে আমরা বেগ পাই। তাই organisation-এর কৃতিত্বে আমরা বিদেশকে একটু-আধটু অনুকরণ করতে শিখলেও ওদের বিরাট্ সংগঠন-নৈপুণ্যের তুলনায় আমরা এখনো নাবালকই বলব। আমাদের জাতীয় জীবনের নানা বিভাগে বড় বড় সঙ্ঘ গ'ড়ে তুলতে হ'লে আমাদের দীক্ষা নেওয়া দরকার পাশ্চাত্ত্যের কাছে—একথা স্বামী বিবেকানন্দ প্রায়ই বলতেন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একথা প্রতি সঙ্গীতকারেরই মনে হয় ওদেশে যেতে না যেতে। আমাদের দেশে হাল-আমলে যে একতান বাদ্য—অর্কেস্ট্রার—সৃষ্টি হয়েছে, তার মূলেও আছে বিদেশের প্রেরণা। অবশ্য এ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গীতে হার্মনির কোন বিশিষ্ট বিকাশ হয়নি—ভবিষ্যতে হবে কি না জোর ক'রে বলা কঠিন। কিন্তু একটা নব বিকাশ এখনই হ'তে পারে : সমস্বরে (in uni-on) কোরাস গানের প্রবর্তনে। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল চেয়েছিলেন আমাদের রাগসঙ্গীতের স্বকীয়তাকে বজায় রেখে এই কোরাস গীতভঙ্গির আমদানী করতে আমাদের নানা গানে—বিশেষ ক'রে নাট্যসঙ্গীতে। এই নব সৃষ্টির ফল তিনি প্রথম পরীক্ষা করেন তাঁর হাসির গানে নানা নতুন সুরে কোরাস-ধুয়া এনে—যথা, সাধে কি বাবা বলি, গীতার মত নাই ত শাস্ত্র, ছেড়ে দিলাম পথটা…ইত্যাদি। পরে যখন দেখলেন এ-পদ্ধতিতে গাইলে শ্রোতারা সহজেই সাড়া দেয় তখন সুরু করলেন এই গীতিরীতি : 'বঙ্গ আমার জননী আমার, ধনধান্য পুষ্প ভরা, আজি গো তোমার চরণে জননী, যখন সঘন গগন গরজে, আজি এসেছি এসেছি, যদি এসেছ এসেছ…প্রমুখ বহু নাট্য-সঙ্গীত চালু করতে। এই নূতন সৃষ্টির কাজে তাঁর দ্রুত সাফল্য দেখে অন্য অনেক নাট্যকারও চেয়েছিলেন তাঁদের নাটকে এই ধরনের একতান গীতের প্রবর্তন করতে। কিন্তু এক আলিবাবার সস্তা সুরের কোরাসের আংশিক সাফল্য ছাড়া আর কোথাও কোন নাটকে কোরস গান রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে উঠতে পারত কিন্তু তাঁর নাটক তিনি ঠাকুর বাড়ীর অভিনয়ে এত চমৎকার জমিয়ে তুলতেন যে, তার পরে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে আদৌ জমত না।

এক "চিরকুমার সভা" ছাড়া তাঁর কোনও নাটকই বাঙালী-শ্রোতা গ্রহণ করে নি মনে-প্রাণে—দু'চার জন অনুশীলিত শ্রোতা ছাড়া।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল দেখতে দেখতে আমাদের দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তাঁর নাটকের নানা কোরাস গানের প্রসাদে—যে জন্যে তাঁকে কেউ কেউ আজো "চারণ কবি" অভিধা দিয়ে থাকেন। আমি আজ পর্যন্ত এ-অদ্ভুত অভিধাটির তাৎপর্য খুঁজে পাই নি। কারণ কবি যদি কবি না হন তবে চারণ কবি কাণামামাও থাকেন না, হয়ে দাঁড়ান—নেই মামা। তবে হয়ত "চারণ কবি" বলতে এ চারণ পূজারীর দল মান দিতে চেয়েছিলেন তাঁকে দেশভক্ত সঙ্গীতকার ব'লে। কিন্তু মুশ্‌কিল কি জানেন? মুশ্‌কিল এই যে, দেশভক্তিই বলুন আর ভগবদ্‌ভক্তিই বলুন কাব্যে বা গানে সে উদ্দীপক হ'য়ে ওঠে তখনই যখন সে কাব্যে কাব্যরস ও গানে যুগপৎ গীত ও সুরের রস সঞ্চার করতে সক্ষম হয়। এর মামুলি দৃষ্টান্ত কে না জানে? ভালবাসতে পারে অনেকেই। কিন্তু যারাই ভালবাসতে পারে তারাই প্রেমের কবিতা লিখতে পারে না। বস্তুতঃ, যে-কোন গভীর অনুভবকে অপরের মনে-প্রাণে সঞ্চারিত করতে পারার পরম কৌশলের নামই আর্ট বা শিল্প প্রতিভা। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের গান চারণ-সঙ্গীত ছিল কিনা সে বিচার তাঁর গীত ও সুর সৃষ্টির মূল্যায়নে অবান্তর। দেখতে হবে—তাঁর গান বাঁধবার বা কবিতা রচনা করবার সহজ প্রতিভা ছিল কি না। এক কথায়, তিনি স্বভাব-কবি ও গীতিসুরকার ছিলেন কি না। কারণ এ প্রতিভা নিয়ে যদি তিনি না জন্মাতেন তা হ'লে হাজার দেশভক্তি থাকলেও লিখতে পারতেন না এমন দেশান্তরের গান:

মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় রঞ্জিত করি' কাণার তীর
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত অযুত যাহার ভক্তবীর।

বা স্বদেশ মহিমার প্রাণকাড়া গান:

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি

আরও পরিষ্কার ক'রে বলতে হ'লে বলা যায়: তাঁর গীতিপ্রতিভা ও সুরপ্রতিভা ছিল ব'লেই তিনি প্রথম শ্রেণীর স্বদেশী গান, হাসির গান, প্রেমের গান, ভক্তির গান ও আরো নানা সুরের গান রচনা করতে পেরেছিলেন

অবলীলাক্রমে। তাই তাঁর গান বা সুরের মূল্যায়নে এ-বিচার অবান্তর, তিনি 'চারণ-কবি'ছিলেন কিনা। দেখতে হবে তাঁর কবি-প্রাণের নানা অভীপ্সা ফুলের মতনই সহজিয়া ছন্দে ফুটে উঠেছিল কি না রসতরুর নিখুঁত আলোপদ্ম হয়ে।

কিন্তু পত্র-নিবন্ধ শনৈঃ শনৈঃ অতিকায় হ'তে চলেছে। তাই রাশ টানতেই হবে। বলব শুধু আর একটি কথা।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গঙ্গাযমুনা সঙ্গম মনোহর হয়ে উঠেছে এ হ'ল তাঁর গানের মাত্র একটি বৈশিষ্ট্য। তাঁর সব রসোত্তীর্ণ গানেই, আরো অনেকগুলি রসের স্ফুরণ লক্ষ্যণীয়। এ-স্ফুরণের প্রভা বিচিত্র। তিনি আবাল্য শুধু যে গান বেঁধেছেন তাই নয়, গেয়ে আনন্দ পেয়েছেন ও বহু শ্রোতাকে আনন্দ পরিবেশন ক'রে এসেছেন—প্রথমে তাঁর অপূর্ব স্বদেশী ও হাসির গানে তার পরে প্রকৃতির ও প্রেমের গানে, সব শেষে তাঁর ভক্তির ও স্তবের গানে। তিনি এমন অনেক প্রেমের গান লিখেছেন যা শুধু মর্মস্পর্শী নয়, যার মধ্যে প্রেমের বেদনার আলো কবিত্বের মেঘে আনন্দের ইন্দ্রধনু রচনা করেছে। দ্বিজেন্দ্রকাব্য সঞ্চয়নে আমি তাঁর সাঁরিয়স গানকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেছি : পূজা দেশ প্রেম প্রকৃতি ও বিবিধ। এ গানগুলির ছত্রে ছত্রে কবিত্ব ফুটে উঠেছে, কিন্তু সে কবিত্ব আলো হয়ে ওঠে শুধু তখনই, যখন সে ফুটে ওঠে সুরের কাঠামোয়।

তাঁর কবিপ্রতিভার বহুমুখী বিকাশ কিভাবে হয়েছিল—রকমারি সুরে তালে ছন্দের সমন্বয়ে—তা নিয়ে আপনারা নিশ্চয়ই দ্বিজেন্দ্র দীপালিতে আলোচনা করবেন, তাই আমি আজ শেষে বলব তাঁর কবিশক্তির আর একটি বিকাশের কথা সম্বন্ধে এ নাস্তিক যুগে হয়ত আর কেউই কিছু বলবেন না।

ভাগবত আবির্ভাব হয়ে এসেছে যুগে যুগে অধর্মের অভ্যুত্থানের গর্ব খর্ব করতে। তাঁর লীলা এই ভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে—আসুরিক দাপাদাপির পরেই নব দৈবী অভ্যুদয়—কুরুক্ষেত্রের বুকেই ধর্মক্ষেত্রের নব স্ফুরণ। তবু মন্ত্রগুপ্তির পথেই ভগবান্ অসুরকে আস্কারা দিয়ে থাকেন—রটিয়েছেন আমাদের নানা পুরাণ ইতিহাস ও মহাকাব্যের প্রণেতা। শ্রীঅরবিন্দও তাঁর মহাকাব্য সাবিত্রীতে বলেছেন এ মন্ত্রগুপ্তির কথা, লিখেছেন আকাশবাণীর উপদেশ :
"Speak not my secret name to hostile Time"

কিন্তু হ'লে হবে কি, আমার মন মানা মানে না। কারণ দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে ভক্তির যে-বিকাশ আমি চাক্ষুষ করেছি ও তাঁর নানা ভক্তির গান গেয়ে আমার সাধকজীবনে যে প্রত্যক্ষ লাভ করেছি তার সম্বন্ধে আমার সাধ্যমত কিছু ব'লে তাঁকে তাঁর ভক্তিসঙ্গীতে প্রণামী না দিলে আমি শান্তি পাব না। তবে এবিষয়ে বলবার অনেক কিছু থাকলেও সাধ্যমত সংক্ষেপেই বলব—সংক্ষেপকথকতা আমার স্বধর্ম না হওয়া স্বত্বেও।

দ্বিজেন্দ্র-কাব্য সঞ্চয়নের ভূমিকায় চিন্তাশীল সমালোচক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন যে, ভক্তিবাদের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণে কোন "সহজ স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ ছিল না, বরং যুক্তিবাদের দ্বারা কষিত তাঁর সংশয়ী মনে ইহমুখিনতার টানটাই সমধিক প্রবল ছিল।"

আমার মনে হয় এ-ধরনের বিচার বড় হাল্কা বিচার—যাকে ইংরেজীতে বলে Superficial। বহুদিন আগে গ্যেটে এ মহাসত্যটির উল্লেখ করেছিলেন যে, মানুষ যত উচ্চ-বিকশিত হয় ততই তার মধ্যে আত্মবিরোধ Self Contradiction বাড়ে। সমর্সেট মমও শুধু ব'লেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁর নানা গল্পে দেখিয়েছেন একটি বিচিত্র সত্য : যে মানুষের চরিত্রে সুসঙ্গতির অভাব পদে পদেই প্রকট হয়—আনি আজ যা ভাবি কাল তার উল্টো পথে চলি, পরশু ফিরে আসি নিজের ঘরে, কিন্তু ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেও ফের হ'তে চাই উধাও বেদুইন! যুগে যুগে বহু মহাজনের মধ্যেই দেখা গেছে এ সত্যের অনস্বীকার্য এজাহার। বেশি দূরে যাবার দরকার কি? শ্রীঅরবিন্দকেই ধরুন না। তিনি ছিলেন প্রথমে নাস্তিক (একথা তিনি আমাকে স্বহস্তে লিখেছিলেন একাধিক পত্রে) পরে হলেন দুর্জ্ঞেয়বাদী agnostic, পরে একেশ্বরবাদী, পরে বহু দেববাদী গুরুবাদী তথা সর্বাস্তিবাদী। তাই যে-মানুষ বাইরে যুক্তিপ্রিয় সে কেন অন্তরে ভক্তিবাদী হ'তে পারবে না? যে মানুষ নৈষ্কর্মবাদী মায়াবাদী সে শঙ্করাচার্যের মতন অক্লান্ত কর্মী হয় নি কি? বিবেকানন্দ স্বাবলম্বী ও সংশয়ী হয়েও গুরুবাদের কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বলেন নি কি যে তিনি গুরুরই সৃষ্ট মানুষ—গুরুদাস ও গুরু প্রণাম সম্বল? আমি নিজেই কি কম সংশয়ী ছিলাম, না আজও সব সংশয়কে এড়াতে পেরেছি? কিন্তু তাই ব'লে কি আমি ভগবৎ কৃপায় অবিশ্বাসী বলবেন? যদি হতাম তা হ'লে আমার জীবন কি এমন পথ

নিত যে-পথ আমার সাবেক-কালের বন্ধুদের প্রায় কারুরই অনুমোদিত নয় ?

না এ তর্কের কথা নয়, আমি পদে পদে উপলব্ধি করেছি যে, নিজেকে চেনার মতন কঠিন কাজ খুব কমই আছে। এ-কথা যদি সত্য হয় তা হ'লে কী ক'রে জোর ক'রে বলব কোন মহাজনের স্বধর্ম কি ?

না। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্বভাবের উদাসী ও স্বধর্মে কবি গীতিকার সুরকার তথাভক্ত প্লাস আরও আর অনেক কিছু—যার খবর আমরা রাখি না। একথা আমি আমার স্মৃতি-চারণে বলেছি নানা সুরেই ফলিয়ে। তাই এখানে শুধু এইটুকু বলব জোর দিয়েই যে, দ্বিজেন্দ্রলাল অন্তরে প্রচ্ছন্ন ভক্ত ছিলেন। আমি যে দেখেছি পদে পদেই তাঁর কণ্ঠে ভক্তির আবেগ উৎসধারার মতনই উর্ধ্বায়িত হ'তে। কতবারই তাঁর চোখ চিক্ চিক্ ক'রে উঠতে দেখেছি গাইতে গাইতে (লঘুগুরু ছন্দে অপরূপ ভৈরবীতে) ঃ

নূপুর শিঞ্জিত নৃত্যবিমোহন কপট চপল চতুরালি।
প্রেমনিমীলিত নয়ন বিলোল কদম্বতলে বনমালী ॥

স্মৃতিচারণে লিখেছি বৈষ্ণব সাধকের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন তাঁর গৌরকীর্তন শুনে ঃ

ও কে যায় নেচে নেচে আপনায় বেচে পথে শুধু প্রেম যেচে যেচে,
ও কে দেবতা ভিখারী মানব দুয়ারে দেখে যারে তোরা দেখে যা।

গৌরাঙ্গের এ-দেবমানব-রূপের বর্ণনা এমন প্রাণস্পর্শী ছন্দে সুরে ভাবে—এ কি ভক্ত-কবি ছাড়া আর কারও পক্ষে সম্ভব ?

তাঁর মধ্যে আরও কত পৌরাণিকী ভাবধারাই যে উচ্ছল হয়ে উঠত !— যথা ভাগবতী গোপীর অহৈতুকী প্রেম। এ গানটি প'ড়ে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন যে, গোপীপ্রেমের প্রাণের কথাটি—রাগানুগাপ্রীতির মর্মবাণী— এযুগে কাউকে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করতে তিনি দেখেন নি। গানটির যেমন ভাব, তেমনি সুর ঃ

তুমি যে হে প্রাণের বঁধু—আমরা তোমায় ভালবাসি
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা, তাই ত কাছে ছুটে আসি।
তুমি শুধু দিও হাসি, আমরা দিব অশ্রুরাশি
তুমি শুধু চেয়ে দেখ বঁধু, আমরা কেমন ভালবাসি।

শেষে অহৈতুকী প্রীতিতে আত্মনিবেদন কি সুন্দর!

ভালবাস নাহি বাস নইক তারও অভিলাষী,
আমরা শুধু ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।

এরই নাম গোপীপ্রেম-সমর্থা ভক্তি—যে আত্মনিবেদনের পরম আবেগে ওঠে "প্রেমভক্তি"র তন্ময়তায়—মন্ময়টা কাটিয়ে।

কৃষ্ণ শিব শক্তি—ভারতের ভক্তিবিলাসের এই তিনটি মূলধারাতেই তিনি সাড়া দিতেন। শিবের শুধু নানা নাম বেঁধে লঘুগুরু ছন্দে ধ্রুপদী চালে তাঁর গম্ভীর উদাস ভাব ফুটিয়ে তোলা—এ কি ভক্ত-কবি ছাড়া আর কারুর পক্ষে সম্ভব?

ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী।
ভূজঙ্গ ভৈরব বিষাণ ভীষণ প্রশান্ত শঙ্কর শ্মশানচারী।

এ গানটি ১৯৫৩ সালে আমি বিশ্বভ্রমণে সর্বত্রই গেয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছি—অল্ডাস হাক্সলি থেকে বার্টরাণ্ড রাসেল পর্যন্ত—"দেশে দেশে চলি উড়ে" দ্রষ্টব্য।

শ্যামা সঙ্গীতেও ভক্তি ভাব কত সহজেই না তাঁর কলকণ্ঠে উচ্ছল হয়ে উঠত:

একবার গালভরা মা ডাকে।
মা ব'লে ডাক মা ব'লে ডাক মা ব'লে ডাক মাকে)
ডাক এমনি ক'রে আকাশ ভুবন সেই ডাকে যাক ভ'রে
(আর) ভায়ে ভায়ে এক হয়ে থাক যেখানে যে থাকে।

কালীর করালীমূর্তি ভাবোচ্ছ্বাস পাই নানা সাধকের গানেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন কবিত্ব, উপমা, আবাহন?

চরণ ধ'রে আছি প'ড়ে একবার চেয়ে দেখিস্ না মা!
মত্ত আছস্ আপন খেলায়, আপন ভাবে বিভোর বামা।...
হাতে মা তোর মহাপ্রলয়, পায়ে ভব আত্মহারা
মুখে হাহা অট্টহাসি অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা

কিন্তু এ রুদ্রাণীর মধ্যে দিয়ে কবি ডাক দিলেন করুণাময়ী শিবানী মা-কে কি মনোহর উপমায়:

আয় মা, এখন তারারূপে, স্মিতমুখে শুভ্রবাসে,
নিশার ঘন আঁধার দিয়ে ঊষা যেমন নেমে আসে।

তারা ক্ষেমঙ্করী ক্ষেমা ! অভয়ে অভয় দে মা ॥
কোলে তুলে নে মা শ্যামা, কোলে তুলে নে মা শ্যামা !

কতদিনই না এ-গান গাইতে গাইতে শুধু যে আমার চোখে জল ভ'রে এসেছে তাই নয়, শ্রোতাদের চোখেও জল ঝরেছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের আর এক আকূতি—জগন্মাতার সর্বব্যাপী রূপকে প্রণাম :

প্রতিমা দিয়ে পূজিব তোমারে এ বিশ্বনিখিল তোমারি প্রতিমা।
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো ? মন্দির যাহার দিগন্ত নীলিমা !

প্রথমে রূপের তর্পণ বিগ্রহে, তার পর সারা বিশ্বে :

খুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা !
দুয়ারে দাঁড়িয়ে হাতটি বাড়ায়ে ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ী মা !

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে ভাবতে—এমন অত্যাধুনিক বিলাত-ফেরত তর্কপ্রিয় তীক্ষ্ণধী মানুষের মনে কেমন ক'রে জেগে উঠল এমন ছবি আকাশগঙ্গার :

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে !
নারদকীর্তন পুলকিত মাধব বিগলিত করুণা ক্ষরিয়া
ব্রহ্মকমণ্ডলু উচ্ছলি' ধূর্জটি জটিল জটাপর ঝরিয়া,
অম্বর হইতে সম শতধারা জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে
নামি ধরায় হিমাচল মূলে মিশিলে সাগর সঙ্গে !

ভক্তিমান্ মনীষী শ্রীমদনমোহন মালব্য আমার সঙ্গে দেখা হ'লেই চাইতেন এ গানটি শুনতে আর বলতেন—শঙ্করাচার্যের গঙ্গাস্তোত্র "দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ! ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে"র পরে এমন উদাত্ত মধুর প্রাণকাড়া গঙ্গাস্তব আর কেউই লেখেনি আজ পর্যন্ত—প্রত্যেক হিন্দুর এটি গাওয়া চাই।

আরও উদাসীর গানেও ভক্তিরস :

পাগলকে যে পাগল ভাবে
(এখন) সে পাগল কি ঐ পাগল পাগল একদিন সেটা বোঝা যাবে।
নিমাই সন্ন্যাসী ছিল প্রেমের পাগল হয়ে শুনি
জ্ঞানের পাগল হয়ে বুদ্ধ রাজ্য ছেড়ে হ'ল মুনি।
ব্রহ্মা পাগল ধ্যান করি, পরের জন্য পাগল হরি,
ভাবে পাগল শ্মশানভূমে বেড়ায় ভোলা উদাস ভাবে।

তাঁর শেষ জীবনের শেষ অধ্যায়ের একটি অপরূপ গান তিনি গাইতেনকি তন্ময় হয়ে ভুলব কি কোনদিন ?—

নীল আকাশের অসীম ছেড়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো
আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বালো ?

আলোর সমুদ্র যে উচ্ছল চারিদিকে—কেন থাকব ঘরের মধ্যে ছোট প্রদীপ জেলে ? অমনি ডাক বেজে উঠল অসীমার :

সাঙ্গ আমার ধূলা খেলা সাঙ্গ আমার বেচাকেনা,
এইছি ক'রে হিসেব নিকেশ যাহার যত পাওনা দেনা।
এখন বড় শ্রান্ত আমি. ওমা, কোলে তুলে নে মা,
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো !

এমন পরম নির্বেদ, অসীমার চরণে ঠাঁই চাওয়ার আকুল ডাক কি ভক্ত-কবি ছাড়া আর কারুর গানে এমন ছবিখানি হয়ে ফুটে উঠতে পারে ?

মানুষ সংসারে হাবি-জাবি কত কি-ই না চায় ! দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর উদাসী প্রেরণায় "পাগলকে যে পাগল ভাবে" গানটির প্রথম অন্তরায় লিখেছিলেন :

নয় কে পাগল ভুবন 'পরে ? কেউ বা পাগল মানের তরে
কেউ বা পাগল রূপের লাগি' কেউ বা পাগল ধন লোভে।

কত সত্যি কথা ! আমরা মোহের ফেরে প'ড়ে নিত্যই ছায়াকে বুকে চেপে ধরতে চাই কায়াভ্রমে। এও তা অবান্তর ভোগের উপকরণ বাড়িয়ে আশা-কুহকিনীর কুহুধ্বনির পিছু নিয়ে শেষে নিরাশ হই যখন দেখি সে কথা দিয়ে কথা রাখে না, সুখ দেব ব'লে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু সুখের পরেই দেয় বহু দুঃখ, আসে স্বপ্নভঙ্গ। তখন সে দেখে :

"জীবনটা তো দেখা গেল, শুধুই কেবল কোলাহল···
প'ড়ে আছে অসীম পাথার সবাই তাতে দিচ্ছে সাঁতার···
ডুব দিয়ে আজ দেখব নিচে কতখানি গভীর জল।"

কিন্তু এ-সন্ধানের পরে শোনা যায় আর একটি বিচিত্র আহ্বান—জীবনের কোলাহল যাকে ঢাকে সেই অশ্রুত সুর—জগন্মাতার ডাক—কানে ভেসে আসে। সে ডাক যে শুনতে পায় তারই তো নাম ভক্ত—যার কাছে এ-পরম

আলোর ডাক শোনার পরে আর সবই হয়ে গেছে পাণ্ডুর অর্থহীন। তাই তখন সে গেয়ে ওঠে সোচ্ছ্বাসে :

"আর কেন মা ডাকছ আমায় ? এই যে এইছি
তোমার কাছে।
আমায় নাও মা কোলে, দাও মা চুমা, এখন
তোমার যত আছে।"

অন্বেষণের পরে সে যে খুঁজে পেয়েছে বিশ্ব-জননীকে তাই বলে :

"সাঙ্গ হ'ল ধুলাখেলা, হয়ে এল সন্ধ্যাবেলা,
ছুটে এলাম এই ভয়ে মা, শেষে তোমায় হারাই পাছে"

কিন্তু পাওয়ার পথেও এ হারাই-হারাই ভয় জাগে কার মনে ?—শুধু তার, যে জগতের মাকে ভালবেসে সেই প্রেমের আলোয় চিনতে পেরেছে নিজের মা ব'লে। কিন্তু না, তার আর ভয় কোথায়—যে পেল অভয়ার বরাভয় ? তাই সব শেষে সে শুধু গায় পরম নির্ভয়ে, গভীর স্নেহে :

"আঁধার ছেয়ে আসে ধীরে, বাহু দিয়ে নাও মা ঘিরে,
ঘুমিয়ে পড়ি এখন আমি মা তোমার ঐ বুকের মাঝে।"

সাহিত্যের নির্যাস ফুটে ওঠে কাব্যের রসে, কাব্যের নির্যাস ফুটে ওঠে গানের গোলাপে, গানের গোলাপের প্রাণ-সৌরভ ফুটে ওঠে সুর ও মধুবাণীর সঙ্গমে, আর সব শেষে এ শুভদৃষ্টির উলুধ্বনি বেজে ওঠে বিন্দুর সঙ্গে সিন্ধুর অন্তিম মিলনবাসরে। যে গানে এই পরম সমাপ্তির আভাস দিতে পারে এমন প্রেমের বাঁশিসুরে তারই ত নাম কবি গুণী তথা অনির্বচনীয়ের পসারী।

শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী-প্রণীত

দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিতীয় সংস্করণ

শোভন সংস্করণে পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে মহাত্মা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺সার গুরুদাস, ৺স্যর রাসবিহারী, সার আশুতোষ, সার জগদীশচন্দ্র, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, নাট্যাচার্য্য ৺গিরীশচন্দ্র, (বিহার ও ওড়িষ্যার গভর্ণার) মাননীয় লর্ড এস. পি. সিংহ, দেশমান্য শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী কবিবর ৺অক্ষয় বড়াল, কবি ও জজ ৺বরদাচরণ মিত্র, প্রসিদ্ধ কবি ও লেখক বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কবি ও নাট্যকার প্রমথনাথ রায়চোধুরী, 'সাহিত্য'-সম্পাদক ৺সুরেশ সমাজপতি, সাহিত্যরথী, পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু প্রভৃতি এদেশের প্রধান-প্রধান ব্যক্তি, সাহিত্যরথিগণ ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বজন-বন্ধুরা রচনাদি দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

তদ্ভিন্ন, ইহাতে দ্বিজেন্দ্রলালের বহুবিধ অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত রচনা, অসংখ্য পত্রাবলী ও তজ্জীবনের অনেক গোপন রহস্য ও ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এই নূতন ধরণের বহু-বিচিত্র তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশংসাসূচক পত্রাবলীর ভিতর হইতে অতি সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি অভিমত এস্থলে মুদ্রিত করা গেল :—

The Bengalee 24, September, 1917—"* * * The book is really a remarkable contribution to the biographical literature of Bengal. * * * The author is perhaps the most competent biographer of Dwijendralal. He has painted him as he was, with all the lights and shades ofhis character. He has displayed a wonderful insight into human nature in tracing the psychological

development of the great genius with which the poet was born. * * * The author of the biography has brought out all these features of the poet with the brush of a master. * * * Babu Devakumar is not merely a great poet and artist but also an art-critic with finest susceptibilities and appreciation. The 'study' of Dwijendralal's works ('Dwijendra-Sahitya-Avas') is a master-piece in manner, indiction and appreciation. We are confident that every creader of the biography will close the volume with a sense of sincere satisfaction. The book is copiously illustrated. (*Review extending over nearly a column and a half*)

The Amrita Bazar Patrika, 6, December, 1917— "* * * Babu Devakumar Raychoudhurie has already won for himself a recognised place among the best of the living Bengalee poets of Bengal. * * In his new role as a biographer of one of the greatest poets of modern Bengal, he has achieved a success which very few Bengalee biographers have done. * * * The narrative throughout is given in the book intelligebly and enticingly and Dwijèndralal the man as well as Dwijendralal the poet is presented to the reader's gaze in a flood of light. * * * The little silhuettes, of which there are not a few in the book, reveal the graver side of the character of the departed poet and as such as only Babu Devakumar's close intimacy with the subject of his memoirs could render possible of delineation. * * * A good introduction, which contains a short but pregnant letter from the pen of Sir Rabindranath too, considerably enhances the value of this most interesting and valuable book. * * * Altogether Babu Devakumar's tribute to the memory of Dwijendralal is one which only a poet could pay to the memory of a poet and we confidently commend to the public to read, buy, and profit by this exhanstive and well-presented study. (*Review in the Leader extending over a column.*)

The Empire, 12, September. 1917.—Mr. D. L. Ray

was a poet and a playwright of perhaps the highest order and what is more he was a Patriot in the truest sense of the term. The publication, therefore, of a work on the life of so great a man seems eztremely timely and the literature of Bengal has been immensely enriched by the addition of tha volume by Mr. Devakumar Raychaudhuri, the celebrated poet-Zemindar, * * *. The author, who by the way, was one of the most intimate friends of the late Mr. Ray has taken great pains to make the work extremely interesting by adding, among other documents, certain letters of this national poet of Bengal ; and in this he has been emminently successful,—so much so that the volume reads almost like a novel. He has a powerful way of saying his say. * * * The work under notice has sufficiantly established Mr. Raychoudhury's position as one of the most competent biographers of the day and the publication, which we welcome and unhesitatingly commend to the Bengalee-reading public, will, we are sure, command a very large sale. * * *' (Review in an editorial note entitled 'The national poet of Bengal.')

The Harold. 24, September, 1917—Babu Devakumar Raychoudhury * * has done a great service to the Bengalee literature by publishing an ably-written biography of the late Mr. D. L. Ray. * * * Mr. D. L. Ray as a poet is well-known to us ,but not so Mr. D. L. Ray as a man. Babu Devakumar has done an invaluable service by revealing the man to the people of Bengal. The inner man is as dividly portrayed in the book as the outer one, and it is a pleasure to note that when the book is finished one can have no other feeling for the poet of'Amar Desh' than that of whole-hearded admiration and veneration. The book is full of intoresting anecdotes concerning the life of the great poet and reads like a charming story. * * * But big as the present volume is, one would be tempted to go through it in one sitting. (Review extending over a column and half in the Leader.)

'নায়ক' (সন ১৩২৪, ৬ই আশ্বিন এবং ২৬'এ পৌষের দেড়স্তম্ভব্যাপী মন্তব্য হইতে)—

'** বইখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। উহার ছাপা, ছবি, বাঁধাই সবই মনোহর; লিখন-ভঙ্গীও অতি সুন্দর এবং বিষয়ে-বিন্যাস উপযোগী হইয়াছে। ** দেবকুমার দ্বিজেন্দ্রের একজন অন্তরঙ্গ মিত্র ছিলেন। দেবকুমারের বন্ধু-বাৎসল্যও অপূর্ব্ব। *** সেই দেবকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের এই জীবন-কথার লেখক। আবার বলি, সত্যই বইখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। *** সকলকে এখনই এমন বইখানি খরিদ করিয়া পাঠ করিতে বলিতেছি।'

ভারতবর্ষ। (১৩২৫ সনের বৈশাখ সংখ্যায় 'দ্বিজেন্দ্রলাল' শীর্ষক সুদীর্ঘ সূত্রটুকু সমালোচনা হইতে)—

'*** আমরা বলি সাধনার মূল সূত্রটুকু শুধু জানিলে হইবে না; সাধককে চিনিতে হইবে। ** ভিতরের মানুষটি যে বিশেষত্বটি অবলম্বন করিয়া লীলাখেলা করিয়াছেন তাহা কাহারও আকস্মিক কৃতিত্ব নয়,—যুগের ক্রমোন্নতির চিত্র, আমাদের বিশ্বাস মানুষ হিসাবেও, অসামান্য প্রতিভার অধিকারিগণ, স্খলন, পতন ত্রুটি সত্ত্বেও, এমন কিছু মহৎ, এমন কিছু বৃহৎ জীবনে প্রকট করিয়া যান, যাহা ভবিষ্যতে জন্ম-পত্রিকার মত জাতীয় ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তোলে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির হিসাবেও এইসকল জীবনচরিত পঠন-পাঠনার অপরিত্যাজ্য উপাদান। ইহা ছাড়াও, এই শ্রেণীর সাহিত্যের আর একটি সার্থকতা—জাতীয় ঋণ-পরিশোধ। প্রত্যেক, মনীষাসম্পন্নের যেমন অন্ধ স্তাবক জোটে তেমনই অকারণ বিদ্বেষ্টাও দেখা যায়। এই উভয় দলের কবল হইতে ঠিক মানুষটিকে উদ্ধার করিবার জন্য নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিতের প্রয়োজন। ইহাই মহতের প্রতি মহান সম্মান প্রদর্শন এবং ব্যক্তিকে পূজা করিতে শিখিয়া জাতিকে পূজনীয় করিবার পাকা বন্দোবস্ত। *** শ্রেষ্ঠ সমালোচক না হইলে কেহ উৎকৃষ্ট চরিতকার হইতে পারে না। সমালোচনা কার্য্যের বিচারণা, চরিতকথা কারণের অনুধাবনা। সমালোচনা বিষয়ের পরিচয়-পত্র, জীবনচরিত ব্যক্তির ইতিবৃত্ত। *** যেমন সকলের জীবন চরিত রচিতে নাই, তেমনই চরিতকথা রচনায়ও সকলের অধিকার নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের এই ইতিহাস

প্রকাশে দেববাবু তাঁহার ন্যায্য অধিকারের সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। দেববাবু বিখ্যাত সুকবি ও সুলেখক। * * 'দ্বিজেন্দ্রলাল' রচনায় দেবকুমারবাবু তাহার প্রিয়তমের জীবনটিকে সেই একনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার রসে ছানিয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। * * * শ্রেষ্ঠ জীবনচরিতের লক্ষণ, সহানুভূতির সঙ্গে নিরপেক্ষতা, হৃদয়-অনুশীলনের পাশে পাশেই মস্তিষ্ক-বিশ্লেষণ, সমসাময়িক মিত্রগণের স্মৃতির চিত্র-সূচী ও পারিপার্শ্বিক ঘঠনাবলীর প্রভাব-প্রদর্শনের সহিত সাময়িক ভ্রান্ত-সংস্কারের অপনোদন এবং অজ্ঞাত ও দুষ্প্রাপ্য ঘটনা ও সংবাদের সংগ্রহ। আলোচ্য গ্রন্থে এসকলই অল্পবিস্তর পরিণতি লাভ করিয়াছে। তদুপরি রচনার যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ—সেই মৌলিকতা আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে আকর্ষণ করিয়াছে।—বঙ্গাক্ষরে ইংরাজী জীবনচরিত আছে।—এটি যেন তাহার কার্য্যকর প্রতিবাদ। * * কিন্তু গ্রন্থকার অতি সাবধানে অত্যন্ত দক্ষতার সহিত আপনাকে সেই অনিবার্য প্রবল প্রভাবের কবল হইতে যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করিয়াছেন। ইহা সহজ কৃতিত্বের কথা নয়। তাঁহার বলিবার ভঙ্গী ও ভাষা অতি সুন্দর। ছায়ার 'দ্বিজেন্দ্রলাল' পড়িতে পড়িতে কায়ার দ্বিজেন্দ্রলালকে বার বার মনে আসে।

* * * যিনি মায়ার তুলিতে এমন ছায়াবাজী দেখাইতে পারেন তাঁহার রচনাকে পুনর্ব্বার বলি, স্বাগত। * * * দেবকুমারবাবুর উদার বন্ধুপ্রীতি একদেশদর্শী 'বসোয়েলী' মূঢ় ভক্তি নয়। দেববাবুর প্রেম-পক্ষপাতটি অতিক্রম করিয়া পাঠকের দৃষ্টি তাঁহার স্পষ্টবাদী নিরপেক্ষতার দিকেই আকৃষ্ট হয়। দ্বিজেন্দ্র-চরিতকার নিপুণ চিত্রকরের মত দ্বিজেন্দ্রলালের 'হুবহু' মূর্ত্তিটি লোক-লোচনের গোচরে আনিয়াছেন। * * * দেববাবু দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা তিনি না বলিলে জানিবায় আর কোন উপায় ছিল না। তাঁর বিষয়ের পরিকল্পনা, অভিব্যক্তির প্রণালী, রসগ্রহাণার্পনের ক্ষমতা, যুক্তিতর্কের শৃঙ্খলা, সুদীর্ঘ ধারাবাহিক বর্ণনায় আগাগোড়া কৌতূহল-উদ্দীপক সঙ্গতি-রক্ষার চাতুর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকৃতই প্রশংসনীয়। এ গ্রন্থ লঘু সাহিত্যের ন্যায় সরস ও চিত্তাকর্ষক, অথচ ইহাতে গভীর মনন ও বীক্ষণের নিদর্শন যথেষ্ট। * * * * * * * * * যতকাল বঙ্গভাষা আছে, দ্বিজেন্দ্র থাকবেন। যতদিন দ্বিজেন্দ্র আছেন, তাঁহার এই জীবনচরিত তাঁহার স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্য বিরাজ করিবে।'

নব্য ভারত। মাঘ ১৩২৪।—

'*** *** শ্রীযুক্ত দেবকুমারবাবু দ্বিজেন্দ্রলালের একজন অকৃত্রিম সুহৃৎ, সুহৃদয় ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি। ** পুস্তকখানি নিরপেক্ষভাবে লিখিত, ইহা অন্ধ স্তাবকের বিবৃতি নয়। ভাষা ও রুচি অতি সুন্দর, পরিমার্জ্জিত। *** পুস্তকখানির খুব আদর হইয়াছে, শুনিয়াছি; প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক ইতিমধ্যেই প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। এ সংবাদে আমরা যারপরনাই আনন্দিত। ** কেননা, প্রতিভার আদর না বাড়িলে দেশের মঙ্গল নাই।'

বরিশাল হিতৈষী। ২২' আশ্বিন, ১৩২৪।—

'** খ্যাতনামা গ্রন্থকারের পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। * এ ধরণের জীবনী বঙ্গসাহিত্যে নূতন। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত গ্রন্থকর্ত্তার একান্ত বন্ধুত্ব ও আন্তরিক যোগ ছিল। সেইজন্যই তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে এমন যথার্থভাবে আঁকিতে সক্ষম হইয়াছেন। গ্রন্থকার কবির দোষ-গুণ অকুণ্ঠিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। যাঁহার লেখনী-নিঃসৃত দেশাত্মবোধের উন্মাদকর সঙ্গীত ও নাট্যাবলী প্রত্যেক গ্রামে—নিভৃততম পল্লীকোণে পর্য্যন্ত গীত ও অভিনীত হইয়াছে, চাকরী রূপ সোনার বেড়ী পায় পরিয়াও যাঁহার স্বাধীন চিন্তা চিরদিনই দেশের মঙ্গলোদ্দেশ্যে নিয়োজিত ছিল, তাঁহার জীবনের সহিত পরিচিত হওয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ** বহুবিধ কৌতুহলোদ্দীপক ইতিহাস ও বিবরণাদি এ গ্রন্থে উপাদেয়রূপে প্রদত্ত হইয়াছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব 'ভাইস্‌চান্সলার,' সার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম্-এ; এল্, এল্, ডি; সি, আই, ই।—

"কৃতার্থ করিয়াছেন। বিশেষ আগ্রহ ও আনন্দের সহিত আপনার রচিত পুস্তক পাঠ করিয়াছি। অভিন্নহৃদয় কবি-বন্ধুর সুনিপুণ লিপিকৌশলে স্বর্গীয় কবির জীবনাখ্যায়িকা বড় মনোজ্ঞ, বড়ই মধুর হইয়াছে। * অনেক অপ্রকাশিত অজ্ঞাত তথ্যের প্রকাশে দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র-গৌরব অধিকতর উজ্জ্বল হইল, সন্দেহ নাই। * * এত সুন্দর জীবনচরিত লেখা সম্ভব মনে হয় নাই। কিন্তু আপনি সে ভ্রম তিরোহিত করিয়াছেন। * * বাঙ্গলার

সমাজ ও সাহিত্য তাঁহার নিকটে যে কত ঋণী তাহা আপনি ধীরতা, বিবেক ও স্বাধীনতার সহিত দেখাইয়া অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। * * *

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি, সার্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী এম্-এ; এল্, এল্, বি; বার-য়্যাট্-ল।—

'দ্বিজেন্দ্রলাল' গ্রন্থ সব বিষয় অতি সুন্দর হ'য়েছে। অনেক দিন এত ভাল লেখা জীবনী পড়ি নাই। রচনা, বলিবার ধরণ সবই খুব ভাল। তুমি সাহিত্য হিসাবে একখানি অতি উচ্চদরের গ্রন্থ আমাদিগকে দিয়াছ।'

প্রসিদ্ধ কবি ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এ, বি-এল্; এম্, আর, এ, এস্।—

জীবনচরিতখানি দ্বিজেন্দ্রলালের, আর তাহার লেখক তুমি। কাজেই এ গ্রন্থকে আমি বড় আদরের পদার্থ মনে করি * * * তোমার অতি মধুর ও সরল প্রবাহময় ভাষায় দ্বিজেন্দ্রের জীবনী যেরূপ মনোহরভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহাতে এই গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্য প্রভূত পরিমাণেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। * * উপাদানগুলি যে কৌশলে গুছাইয়া লইয়াছ তাহাও অতীব প্রশংসনীয়। * * সর্ব্বাংশেই যাহাতে সরস, সুখপাঠ্য ও সুন্দর হয় তাহা তুমি করিয়াছ এবং সার্থক হইয়াছ। কাজেই এ গ্রন্থখানি আমাদের সাহিত্যের সম্পদ্ বহুগুণেই বাড়াইয়াছে বলিতে পারি।'

লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী।—

দীর্ঘ-প্রত্যাশার পর তোমার 'দ্বিজেন্দ্রলাল' উপহার পাইয়া কি যে আনন্দ হইল তাহা আর কি বলিব। * * কবি যেমন কবিকে বুঝে,—যেমন প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, আত্মায় আত্মা ঢালিয়া তার প্রত্যেক নাড়ীর স্পন্দনটি অনুভব করে, তেমনটি আর কে পারে? * * তুমি দ্বিজেন্দ্রপ্রেমে মাতোয়ারা। কিন্তু সাহিত্য-সংযম তোমার নিকটে প্রিয়তর। এই সুবৃহৎ গ্রন্থের আর একটি বিশেষত্ব—ইহা বঙ্গাক্ষরে বিলাতী ঢঙ্গের জীবনচরিত নহে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাতগমন যেমন কেবল তাঁহার প্রতিভা-বিকাশেরই সহায় হইয়াছিল

তাঁহার জীবনচরিতও তেমনই আধুনিক বিজ্ঞানের কলে পড়িয়া তার খাঁটি স্বদেশী ছাঁচটিকে আরও সুন্দরতর করিয়াই প্রকাশ করার সুযোগ পাইয়াছে। ইহার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তন্মধ্যে ইহার সরস ভাষা. বিষয়-বিন্যাসের নিপুণতা ও চরিত্র-বিশ্লেষণের নূতন পদ্ধতি প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। * * * এ গ্রন্থ গুণরাশির আধার। * * রবীন্দ্রে-দ্বিজেন্দ্রে মতান্তর ও মনান্তরও খুবই সুন্দরভাবে দেখাইয়াছ; তবে, উল্লেখ কিছু সংক্ষিপ্ত হইলে আরও ভাল হইত। * * * গ্রন্থের নূতনত্ব, মৌলিকতাই আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা ও সর্ব্বাগ্রে আকর্ষণ করিয়াছে। তোমার ধারণাটি সত্যই একটা সাহসিকতা দেখাইয়াছে। ভাষাটি বড় সুন্দর ও যথাযোগ্য। স্পষ্টতা, নির্ভীকতা, সত্যবাদ ইহার ছত্রে ছত্রে প্রকটিত। এ বড় সহজ সাহিত্য-সাধনা ও সংযমের পরিচায়ক নহে।* * তুমি দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়া শুধু বন্ধুকৃত্য সম্পন্ন কর নাই,—বঙ্গসাহিত্য, ও বাঙ্গালী জাতির যথার্থই গৌরববৃদ্ধি করিয়াছ। এজন্য তোমাকে আমি বার বার অভিনন্দন করি। * * * মুক্তকণ্ঠে আবার বলি, তোমার "দ্বিজেন্দ্রলাল" চমৎকার।"

প্রবীণ লেখক, "পতাকা" ও "নবপ্রভার" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি-এ, বি-এল্—

'দ্বিজেন্দ্রলাল' পড়িয়াছি। পড়িতে পড়িতে কখনও তোমাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে, কখন বা চোখ জলে ভিজিয়া গিয়াছে। এরকম ভাবের পুস্তক, এ ভাবের সুন্দর জীবনী ইহার পূর্ব্বে যে আর প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তো মনে হয় না, প্রাণপূর্ণ, সজীব. সুপরিস্ফুট তোমার "দ্বিজেন্দ্রলাল" জীবনী তরঙ্গভঙ্গে লীলাময়ী, বৈচিত্র্যপূর্ণা, * * * বৈশিষ্ট্যে প্রভাময়ী। ভাষার সরলতা, লালিত্য, সৌন্দর্য্য আছে;—ঘটনাবিবৃতিতে শৃঙ্খলা, বাঁধুনি ও নৈপুণ্য আছে। ঘটনা-পরম্পরায় প্রীতিপূর্ণ ও কৌশলময় সমাবেশ ও সংযোজনায় জীবনীখানি ফুটন্ত ও জীবন্তভাব ধারণ করিয়াছে। * * * বুদ্ধদেব, জার্ম্মান দার্শনিক অয়কেন (Eucken) প্রভৃতি দ্রষ্টা ও উপদেষ্টাগণ ধর্ম্মজীবন ও চরিত্রগঠন পক্ষে জীবনী সাহিত্যকে বড়ই উচ্চাসন অর্পণ করিয়াছেন। * * *"

Late Sir Dr. Rashbehary Ghosh, M. A., D. L., Ph. D.,

C. I. E.' C. S. I., &C. &C. (৺ সার ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, এম্-এ, ডি-এল্ ; পি-এইচ্, ডি ; সি, আই, ই ; সি, এস, আই।)—

"Thanks for your 'Dwijendralal,' I have gone through the volume with an amount of pleasure and pride and I am glad to say that it is one of the most ably-written biographies that I have ever read in any literature. Your services to the Bengalee literature is indeed invaluable."

স্বনামধন্য দেশনায়ক, "ভক্তিযোগ"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, এম্-এ, বি-এল্—

"বাহবা! বাহবা! তোমার "দ্বিজেন্দ্রলাল" পড়িয়া প্রভূত আনন্দ পাইয়াছি। যেমন লোক তিনি তেমনই তাঁহার চরিত্রলেখক তুমি। * * লিখিবার কায়দা চমৎকার হইয়াছে। চরিতাখ্যানে দেখিতেছি তুমি সিদ্ধহস্ত। * * দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রদ্ধা তোমার গ্রন্থখানিকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে, অথচ নিরপেক্ষ ভাবও যথেষ্ট আছে। ভাষাপ্রবাহে কলনদী। কি সুন্দর গ্রন্থই লিখিয়াছ! * * এ পুস্তকখানি তোমার জয়স্তম্ভ। দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় স্বদেশগতপ্রাণ মহাত্মার এমন জীবন চরিত্র লিখিয়া আমাদিগের কতই উপকার করিলে! * * তোমার নিকটে বঙ্গসাহিত্য বিশেষভাবে ঋণী রহিবে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব "ভাইস্-চান্সলার", হাই-কোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি, শুদ্ধস্বত্ব ৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ এবং ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। * * এই সুদীর্ঘ পুস্তকখানির (কোথাও ধীরে কোথাও অধীরে) ইতিমধ্যেই বহুস্থান পাঠ করিয়াছি। যতদূর পাঠ করিলাম তাহাতে (লেখার পরিচয় বলিব না, কারণ তোমার লেখার পরিচয় বহুকাল পূর্ব্বেই পাইয়াছি) পুস্তকখানির প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছি। ইহাতে জীবনচরিত রচনায় অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বিশেষভাবে বঙ্গসাহিত্যের জীবনচরিত বিভাগে ইহা একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ বলিয়াই পরিগণিত হইবে। * * ইহাতে যে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের অনেকগুলি স্থূল ও সূক্ষ্ম কথা বিবৃত আছে কেবল তাহা

নহে,—তাঁহার মনুষ্যত্বের ও কবিত্বের বিশেষত্বব্যঞ্জক সমস্ত কথাগুলি একটি অলক্ষিত সূত্রে আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত এমনভাবে গ্রথিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিতে করিতে কবিবর কেমন মানুষ ও কেমন কবি ছিলেন তাহা অনায়াসে আনন্দের সহিত অনুভব করিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রচিত্রাঙ্কণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সংসৃষ্ট নানা বিষয়ে দেশের সমসাময়িক চিত্রও চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষাগত গুণও ইহার ভাবগত গুণের অনুযায়ী। ইহার ভাষা সরল ও সুমিষ্ট,—কোথাও শাদামাটা, কোথাও সমলঙ্কৃত;—এবং সর্ব্বত্র যথাযোগ্য। ইহা প্রকৃতই একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে।"